

ISSN 1813-0402

সাঁদেপনা সাহিত্য

২৮তম সংখ্যা ■ ডিসেম্বর ২০১৯



কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

A Research Journal
Faculty of Arts
University of Rajshahi

গবেষণা পত্রিকা

২৮তম সংখ্যা ■ ডিসেম্বর ২০১৯



A Research Journal

**Faculty of Arts
Rajshahi University**

A Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

Vol. 28
December 2019

Published by
Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Dean, Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

Cover Design
Rashed Sukhon

Printed by
The Bengal Press
Rani Bazar, Rajshahi - 6100

Price : Tk. 350.00 \$ 6

Contact Address
Chief Editor, A Research Journal (Faculty of Arts)
Deans Complex
Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh
Tel. +88-0721-711144
E-mail: dend.arts@ru.ac.bd
Web: www.ru.ac.bd/arts

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Dean, Faculty of Arts
Rajshahi University

Members

Professor Shamima Akter
Chairman
Department of Philosophy

Professor Mortuza Khaled
Chairman
Department of History

Professor Abdullah Al Mamun
Chairman
Department of English

Professor P.M. Shafiqul Islam
Chairman
Department of Bengali

Professor Md. Fazlul Haque
Chairman
Dept. of Islamic History & Culture

Professor Md. Nizam Uddin
Chairman
Department of Arabic

Professor Muhammad Mahbubur Rahman
Chairman
Department of Islamic Studies

Dr. Dino Bandhu Pal
Chairman
Department of Music

Professor Md. Ataur Rahman
Chairman
Department of Theater

Professor Md. Ataullah
Chairman
Department of Persian Language and Literature

Professor Md. Nasir Uddin
Chairman
Department of Urdu

Professor Bipul kumar Biswas
Chairman
Department of Sanskrit

Message from the Chief Editor

The 28th volume of the Research Journal of the Faculty of Arts is published with 21 research articles contributed by the faculty members of the Departments of Philosophy, History, English, Bengali, Islamic History & Culture, Arabic, Islamic Studies, Theater, Sanskrit and Urdu. The articles are of diverse characters and will come to the use of the students and researchers of various disciplines, specially of the Faculty of Arts.

The publication of the journal is the result of collective efforts of all the scholar members of the editorial board. They have ungrudgingly helped me in its publication. I am grateful to them for their cooperation. I thank the officers of the faculty for their assistance and also the employees of the Bengal Printing Press for their support.

Professor Dr. Md. Fazlul Haque

Chief Editor and Dean

Faculty of Arts

University of Rajshahi

Rajshahi-6205

সূচিপত্র

ড. মো. আলতাফ হোসেন(২)	অর্থব্যবস্থা ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস: একটি নৈতিক মূল্যায়ন	১
মো. গোলাম সারওয়ার	প্রাচীন বাংলায় শৈবধর্ম: একটি পর্যালোচনা	১৭
ড. এ এফ এম মাসউদ আখতার	Sunetra Gupta's Fictional Narratives: Language and Style	৩১
ড. পি.এম. সফিকুল ইসলাম	ওঁরাও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা: একটি সাধারণ পর্যালোচনা	৪৩
সাদাম হুসাইন	জিয়া হায়দারের নাটকে গ্রুপ থিয়েটার প্রসঙ্গ	৫৭
শামসাদ জাহান	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি: লোকচার ও লোকভাষা	৭৩
ড. মো. আরিফুর রহমান	ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে কুষ্টিয়া জেলায় আন্দোলন-সংগ্রাম	৮৯
ড. মো. হারুন-অর-রশীদ	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: ধারা ও প্রবণতা	১০৩
ড. মো. সেতাউর রহমান	গবেষণা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ	১১৩
ড. মো. সাজিদুল হক	আহমাদ শাওকীর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য: একটি পর্যালোচনা	১২৫
ড. মো. আতোয়ার রহমান	ফী যিলালিল কুরআনের ভূমিকায় সাইয়েদ কুতুবের চিন্তা ও দর্শন	১৩৭
ড. মো. মতিউর রহমান	আরবী ভাষার সৌন্দর্য: একটি পর্যালোচনা	১৫১
ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান: ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর অবদান	১৬৫
ড. মো. আব্দুল হান্নান	বাংলাদেশে বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান: একটি পর্যালোচনা	১৭৭
ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান	হজ্জের বিধানাবলী: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	১৮৯
ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	সহীহ বুখারী: পরিচিতি ও পর্যালোচনা	২২৭
সুমনা সরকার	রবীন্দ্রনাটকে মুক্তির সন্ধান: অচলায়তন	২৫৫
ড. বিপুল কুমার বিশ্বাস	শূদ্রকের মূচ্ছকটিক প্রকরণে শিল্পসংস্কৃতি ও বিনোদন	২৬৫
ড. বেবী বিশ্বাস	বাল্মীকির সীতা ও ভবভূতির সীতা: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ	২৭৫
ড. হোসনে আরা আরজু	মুদ্রারাক্ষস নাটকে প্রধান চরিত্রচিত্রে বিশাখদত্তের সার্থকতা	২৮৭
ড. মো. আতাউর রহমান	ইকবাল সাহিত্যে ধর্ম ও জীবন দর্শন: একটি পর্যালোচনা	৩০৩

অর্থব্যবস্থা ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস : একটি নৈতিক মূল্যায়ন

ড. মো. আলতাফ হোসেন-২*

Abstract: Economic system plays a pivotal role in social stratification and to determine social classes. It is said that social status of a person is regulated and controlled by the economic condition of the people. Modern world is dominated basically by two types of economic system i.e. capitalistic and socialistic system. Islamic economic system and welfare state system (which is more or less a revised version of capitalistic system) are also existed parallaly. In capitalistic system, poor classes are exploited and neglected as in this system, maximum ammount of wealth are cumiliated in the hands of a few numbers of bourgeous. And in this system, poor class normally cannot change their condition. Socialist system claims equal distribution of wealth for the people and for this reason, it is expected that there will be no poor or neglected classes in the society. But in fact, it is evident that in a socialist country many people live under poverty line. In Islamic economic system several attempts are visible to upgrade the economic condition of the underprivileged classes and through this Islam attempts to upgrade their social status as well. Thus Islamic ecomic system is not a static one rather leaves options to upgrade the social status of the underprivileged class.

ভূমিকা

বর্তমান সময়ে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোয় ব্যক্তি ও দলের অবস্থান ভেদে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস তথা সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদার বিষয়টি দৃশ্যমান হয়। অবশ্য আধুনিক কালের জটিল সামাজিক কাঠামোয় একজন ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নে আরো অনেকগুলি ফ্যাক্টর কাজ করে। যেমন বস্তুগত সম্পদ, কৃতিত্ব, বংশানুক্রম, সামাজিক সম্বন্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রে নেতৃত্বের অবস্থান, কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা। এছাড়াও রয়েছে শারীরিক যোগ্যতা, মানসিক সক্ষমতা, শিক্ষা, সৃজনশীলতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কঠোর পরিশ্রম ও পারিবারিক অবস্থান।^১ তারপরও বলা যায় সামাজিক স্তরবিন্যাসের সাথে ‘সামাজিক শ্রেণী ও সামাজিক পদমর্যাদা’র প্রকৃতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। বস্তুত, এই দল আইনের মাধ্যমে অথবা ধর্মীয়ভাবে সংজ্ঞায়িত কিংবা অনুমোদিত কোনো দল নয় বরং সমাজের বাস্তব প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট দল যা জাতিবর্ণ ব্যবস্থা অথবা অন্য কোনো সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরনের মত বদ্ধ নয়। আর যেহেতু সামাজিক শ্রেণী (অর্থ বা সম্পদ কেন্দ্রিক হওয়ায়) তুলনামূলকভাবে মুক্ত-এর সদস্যপদ অর্জন করা যায়, তাই বর্তমানকালে সমাজবিজ্ঞানীগণ সম্ভবত এ ব্যবস্থাটিকে স্বীকার করে নিয়েছেন।^২ কিন্তু সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে বর্তমানে চালু

* প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

‘সামাজিক শ্রেণী ও সামাজিক পদমর্যাদা’কে অধিকতর সহনীয় বলে মনে করা হলেও এ ব্যবস্থার গভীরেও মানুষে মানুষে যে বিশাল পার্থক্য বিরাজমান তা একটু তলিয়ে দেখলে সহজেই দৃশ্যগোচর হয়। বিশেষ করে বস্তুতাত্ত্বিক তথা পুঁজিতাত্ত্বিক আধুনিক সমাজব্যবস্থায় সত্যিকারার্থে সমাজের নিম্ন শ্রেণী বলে পরিচিত^৩ ব্যক্তিবর্গ ক্রমান্বয়ে উচ্চবৃত্তদের দলে স্থান করে নিতে পারছে এমন উদাহরণ বিরল। সুতরাং এটা অতি সহজেই অনুমেয় যে, একটি সমাজে ‘সামাজিক শ্রেণী ও সামাজিক পদমর্যাদা’র নামে মানুষে মানুষে বড় ধরনের কোনো ব্যবধান থাকবে, না সেখানে সাম্য-মৈত্রী বিরাজ করবে, তা নির্ভর করে ঐ সমাজে কী ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে তার উপর। বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যতধরনের অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে তার মধ্যে পুঁজিবাদ তথা ধনতাত্ত্বিক অর্থব্যবস্থা অন্যতম। এ ছাড়া বর্তমান বিশ্বে সমাজতাত্ত্বিক অর্থব্যবস্থা পরিপূর্ণরূপে না থাকলেও কোথাও কোথাও এই ব্যবস্থা আংশিকভাবে বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া এখনও সমাজতাত্ত্বিক অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ‘সামাজিক শ্রেণী ও সামাজিক পদমর্যাদা’র মধ্যে একটি সমতা আনয়ন করা সম্ভব বলে অনেকেই মনে করেন। সে হিসাবে পুঁজিবাদের এবং সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে ইসলামের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করে ইসলাম কী ধরনের ব্যবস্থা প্রণয়ন করে যার মাধ্যমে ইসলামী সমাজে একদিকে শ্রেণীবৈষম্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় অপরদিকে আর্থিকভাবে নিম্ন শ্রেণীবলে পরিচিত ব্যক্তিবর্গ ক্রমান্বয়ে উচ্চবৃত্তের দলে স্থান করে নিতে পারে তা অতিসংক্ষেপে আলোচ্য প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য

প্রথমত: পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা হলো প্রধানতম শর্ত। আর সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হওয়ায় অধিকাংশ সম্পদ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং অধিকাংশ লোক সম্পদের মালিকানা হতে বঞ্চিত হয়। এর ফলে সমাজের ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পায়।^৪ দ্বিতীয়ত: পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে মুনাফার উদ্দেশ্যেই সকল প্রকার উৎপাদন পরিচালনা করা হয়। (মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে তারা বৈধ-অবৈধ কোন কিছুই পরোয়া করে না।) উৎপাদনকারীরা সামাজিক কল্যাণের দিকে নজর না রেখে বরং মুনাফা অর্জনের তাগিদেই উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করে। মুনাফা অর্জন তথা পুঁজি বানানোর লিপ্সা উৎপাদনকারীদের সকল প্রকার হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করে তোলে। আর পুঁজিই যে মানুষকে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে তার উপাস্য হয়ে দাঁড়ায় তা বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ফরহাদ মজহারের নিম্নরূপ মন্তব্য থেকে সহজেই অনুমেয়:

পুঁজি বানানোর লিপ্সা মানুষকে এতটাই বিকারগ্রস্ত করে যে, সে মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন মেটানোর জন্য যা যা দরকারী তা না বানিয়ে এমন জিনিষও বানায় যার মাধ্যমে টাকা উৎপাদনই মূখ্য লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। যদি বিষ বিক্রি করে সে টাকা বানাতে পারে তো সে তাই করবে। টাকা বানানোর জন্যে যদি কোটি কোটি মানুষকে অভুক্ত রেখে মারণাস্ত্র উৎপাদন করার প্রয়োজন হয়, নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে হলেও সে তাই করবে। পুঁজি নিজের পুঞ্জিভবন, ক্ষীতি ও বিস্তারের জন্য শুধু পরদেশ বা অন্যের ভূখণ্ড শুধু নয়, অনিবার্যভাবেই নিজের দেশ ও প্রকৃতি-যেমন কৃষি, গাছগাছড়া, প্রাণ ও প্রাণীকুল, পানি প্রভৃতিকে মুনাফা কামানোর ক্ষেত্র ও উপায়ে রূপান্তরিত করে থাকে। এমনকি মুনাফা অর্জনের জন্য সে নারী পাচার, শিশুপাচার, পতিতালয়ে মেয়ে বিক্রি করতেও দ্বিধা করে না। মোট কথা পুঁজিই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। পুঁজিই মানুষের একমাত্র উপাস্য হয়ে ওঠে।^৫

তৃতীয়ত: পুঁজিবাদে একচেটিয়া মজুদদারী হওয়ার প্রবণতা অত্যন্ত প্রকট। আর এরই ফলে সে সর্বগ্রাসী ব্যাপকতা লাভ করে।^৮ মূলত: তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে অনেক সময় ছোট ছোট কোম্পানীগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায় নতুবা বড় বড় কোম্পানীর লেজুড়ে পরিণত হয়ে যায়। তখন বাজারে দ্রব্যের যোগান ও দাম নিয়ন্ত্রণ করার একক অধিপতির দায়িত্ব পালন করে একচেটিয়া কারবারীরা। কেননা একচেটিয়া কারবারে একজন মাত্র উৎপাদক বা যোগানদার থাকায় সে ইচ্ছামত দ্রব্যের মূল্য ও দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর সঙ্কটকালে তারা অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ও সেবা কিনে নিয়ে আকাশ ছোয়া দামের আশায় তা গুদামজাত করে রাখে। আর এতে সাধারণ লোক যে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা বলাইবহুল্য।^৯

চতুর্থত: পুঁজির উপজাত হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা পায়। একদিকে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের দিয়ে অধিক হারে পণ্য উৎপাদন করায়, অপরদিকে তাদেরকে দেয় ন্যূনতম পারিশ্রমিক। ফলে যে সামান্য বেতন শ্রমিকরা পায় তদ্বারা তারা একটি পুঁজিবাদী দেশের উৎপন্ন পণ্য সম্পূর্ণ ব্যয় করতে পারে না। এমতাবস্থায় ধীরে ধীরে উদ্ভূত পণ্য রাশীকৃত হতে থাকে পুঁজিবাদী দেশে। এ পণ্য বিক্রয়ের জন্য দেখা দেয় নূতন বাজারের প্রয়োজনীয়তা। এর ফলে জন্ম নেয় উপনিবেশবাদ। বাজার সন্ধান ও কাচামালের জোগানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেখা দেয় অপ্রতিহত বিরোধ ও সংঘর্ষ; যার পরিণতি যুদ্ধ।^{১০} এ প্রসঙ্গে ফরহাদ মজহার বলেন,

পুঁজিকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তা হলে এই পুঁজিই হয়ে যায় ‘বিশ্ব-ঐতিহাসিক’। তার মানে পুঁজির চরিত্রের মধ্যে তার সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠা, বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হওয়া, তার পুঞ্জিভবন ও আত্মক্ষীতি ইত্যাদি সবই নিহিত। পুঁজির ধর্ম এমনই যে, পুঁজি নিজের বাজার নিজে তৈরী করতে পারে, পুঁজির স্বভাবের মধ্যেই নিজের পুনরুৎপাদন নিজে সম্পন্ন করার শক্তি রাখে। মোট কথা, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিগ্রহের কারণ।^{১১}

পঞ্চমত: পুঁজিবাদের অনুষ্ণ হিসেবে সমাজে ব্যাপকভাবে সুদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা পায়। মূলত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় অর্থ সঞ্চয় এবং উহাকে মুনাফাজনক কাজে ব্যয় করার দিকেই ব্যক্তির যাবতীয় দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। আর এই অর্থ সঞ্চয়ের কাজ যে যে মাধ্যমে সংঘটিত হয় তার মধ্যে সুদী কারবার অন্যতম। বস্তুত সুদী কারবারের সুযোগ না থাকলে গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই ধুলিস্মাৎ হয়ে যায়। তাই বলা হয়ে থাকে সুদ ছাড়া পুঁজিবাদ দাঁড়াতে পারে না, চলতে পারে না ও সর্বগ্রাসী ব্যাপকতা লাভ করতে পারে না।^{১২}

ষষ্ঠত: পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।^{১৩} এহেন অবস্থায় ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারী অনেক ক্ষেত্রে লাভবান হলেও ভোক্তার ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশী। ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নিলে বা ব্যক্তির প্রতি সরকারের উদারীকরণ নীতি গ্রহণের কারণে একদিকে ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারী কৃত্রিমভাবে মূল্য উঁচুতে বেঁধে রেখে মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে জনগনকে দুর্ভোগের মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করে।^{১৪} অপরদিকে ভোক্তার ব্যক্তিগত পর্যায়ে ভোগের মাত্রা ব্যাপক আকারে বেড়ে যায়। উদারীকরণের পরপরই ভোক্তাঞ্জন সরবরাহের পরিমাণ অবিস্বাস্যরকমভাবে বেড়ে যায়। ব্যাংকগুলি ক্রেডিট কার্ডের ব্যবসা ও ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য ভোক্তাদের ঋণ সরবরাহ করতে শুরু করে। ব্যক্তির মধ্যে ভোগবিলাসিতা চরম আকার ধারণ করে। মুদ্রাস্ফীতি ফুলে-ফেঁপে ওঠে। গরীব-দরিদ্র-খেটে খাওয়া মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়। হত দরিদ্ররা এক দুর্বিষহ জীবন-ধারণ করে। মোট কথা আর্থিক উদারীকরণের ফলে অর্থনীতিতে তেজিভাব ও মন্দাবস্থা যা-ই দেখা দিক না কেন, দরিদ্র জনসাধারণের জীবন যাত্রার উপর তার প্রভাব সব সময়ই নেতিবাচক।^{১৫} কেননা, দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থিক সম্পদ ও

ক্রয়ক্ষমতা সীমিত, তাই অর্থনীতির তেজীভাবের সুফল তারা ঘরে তুলতে পারে না। অন্যদিকে নিঃপ্রাণ বা মন্দা অবস্থায় সাধারণত মানুষ চাকরী হারাতে থাকে; করের বোঝা, মুদাস্থিতি ও বেকারত্ব বেড়ে যায়; প্রকৃত মজুরী কমে যায়। কৃচ্ছতাসাধনের নামে তখন সরকারী ব্যয় কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে দরিদ্র মানুষের দুর্দশা আরো বাড়িয়ে দেয়।^{১৪}

সপ্তমত: পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মালিক ও মজুরের মধ্যে অধিকারের দিক থেকে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অধিকারের এ পার্থক্য যেমন আর্থিক দিক থেকে পরিদৃষ্ট হয় তেমনি তা সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। মালিক তার প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যাপক লাভই শুধু যে করে তা নয়; বরং মালিক পক্ষের কেউ যদি সরাসরি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের সাথে নিয়োজিত থাকে তাহলে তার যে পারিশ্রমিক (পুঁজিবাদী পরিভাষায় সম্মানী) তার সাথে শ্রমিক শ্রেণীর পারিশ্রমিকের মধ্যে থাকে আকাশচুম্বি পার্থক্য। একইভাবে পুঁজিবাদী সমাজে একজন বিত্তশালী মালিক সামাজিক যে-সকল সম্মান ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হন তা একজন শ্রমিক যে পবেন না তা বলাইবাহুল্য।

অষ্টমত: পুঁজিবাদের আরো যে সকল নেতিবাচক দিক রয়েছে তার মধ্যে আধ্যাত্মিক কুফল অন্যতম। এ মানুষকে নিছক ভোগসর্বস্ব প্রাণীতে পরিণত করে। এ ব্যবস্থা দুনিয়াকে কাল্পনিক বেহেশত বানিয়ে ছাড়ে। ফলে পরকালীন জীবনকে ক্রমান্বয়ে সে ভুলতে বসে। এ প্রসঙ্গে ফরহাদ মজহার বলেন, “পুঁজি তার পুঞ্জিভবন ও আত্মস্থিতির জন্য ক্রমাগত নতুন নতুন স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা তৈরী করে। যার কারণে এমন এক কাল্পনিক দুনিয়া তৈরী হয় যাতে ‘পরলোক’ ইহলোকে পরিণত হয় আর তার অনুসারীরা সেই কল্পনার পরলোকে ইহলোকে পেয়ে গিয়ে প্রকৃত যে ‘পরলোক’ যেখানে সকল কাজের জবাবদিহিতা করতে হবে –তাকে ঘৃণা করার এক উদগ্র বাসনা সৃষ্টি হয়।”^{১৫}

নবমত: সমাজে পুঁজিবাদের আরো অনেক প্রভাব রয়েছে। মানুষে মানুষে বিস্তারিত ব্যবধান, জুলুম, নির্যাতন পুঁজিবাদের অন্যতম অনুষঙ্গ। মূলত পুঁজিবাদী সমাজে সকল সম্পত্তি পুঁজিতে রূপান্তরিত হয় এবং পুঁজির মালিকই সমাজের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।^{১৬} পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানবতা যে করুণ পরিণতির শিকার হয় সে প্রসঙ্গে ফরহাদ মজহার বলেন,

মূলত পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সবখানেই মানবতার প্রতি অত্যাচার, অবিচার ও জুলুম অব্যাহতভাবে লেগেই থাকে। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা দুনিয়াকে তছনছ করে দেয়, সবকিছু ভাঙে। রাষ্ট্র বা জাতির যে শৃঙ্খলা বা বন্ধন অবশিষ্ট থাকে এর ফলে তা-ও আর থাকে না অবশিষ্ট। এর ফলশ্রুতিতে যা হয় তা হলো, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ এক চরম আকার ধারণ করে। পুঁজি সারা দুনিয়ার জনগনকে তার দাসে পরিণত করে। পুঁজির কাছে কোন ধর্ম, জাতি, দেশ ও সংস্কৃতির মানুষ নিরাপদ তো নয়ই; উপরন্তু এর দ্বারা মানুষ শোষিত, নির্যাতিত ও প্রতিমূহুর্তে নিপীড়িত হয়।^{১৭}

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অধীনে বিদ্যমান ‘সামাজিক শ্রেণী’র চিত্র

আধুনিক বিশ্বে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অধীনে বিদ্যমান ‘সামাজিক শ্রেণী’র চিত্র অবলোকন করলে দেখা যায়, সেখানে মানুষে মানুষে আয়-বৈষম্য অতি ব্যাপক। আর আয়-বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে বিরাজমান ‘সামাজিক পদমর্যাদা’রও যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা বলাইবাহুল্য। বর্তমান বিশ্বে ধনতান্ত্রিক তথা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার পাদপিঠ নামে খ্যাত আমেরিকার সামাজিক শ্রেণী’র চিত্র এক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে।

আমেরিকায় শিক্ষাগত অবস্থা, দৈনন্দিন আয়, সম্পদ এবং পেশাগত মর্যাদার উপর ভিত্তি করে সামাজিক শ্রেণীনির্ধারিত হয়ে থাকে। সে হিসাবে আমেরিকান সমাজে এগারো থেকে বারো শ্রেণীর মানুষের বসবাস। কিন্তু আমেরিকান সমাজে সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থার দিকে যদি নয়র ফেরানো যায় তাহলে দেখা যাবে সেখানে মানুষে মানুষে ব্যবধান অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিশাল। ‘জি. উইলিয়াম ডমহফ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এডওয়ার্ড এন. ভলফের’^{১৮} - নিউয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের-বরাতে দিয়ে তাঁর গবেষণা প্রবন্ধে দেখান যে, আমেরিকায় সম্পদ খুব অল্প পরিমাণ ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত। ১৯৮৩ সাল থেকে ২০০৭ সালের হিসাব অনুযায়ী ১% পরিবার (the upper class) ৩৪.৬% সম্পদের মালিক। পরবর্তী ১৯% পরিবার (the managerail, professional and small business stratum) ৫০.৫% সম্পদের মালিক। তার মানে গোটা আমেরিকার মাত্র ২০% মানুষের তথা পরিবারের হাতে সকল সম্পদের ৮৫% দখলে। বাকী মাত্র ১৫% সম্পদ নীচের ৮০% মানুষ (wage and worker) ভোগ করে।^{১৯} সম্পদের এই বিশাল ব্যবধান থেকে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকার মত বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদরাজির মালিকও দারিদ্র ও বেকারত্ব নিরসন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চহিদাপূরণ এবং আয় ও সমাজের বিশাল বৈষম্য হ্রাসে সমর্থ্য হয়নি। ফলে কিশোরী গর্ভবতী, পিতৃহীন পরিবার, অমোচনীয় বেকারত্ব, অপরাধ ও মাদকাসক্তির অবক্ষয়িত সমাজ ও সংস্কৃতির অন্ধগলিতে এদের জীবন তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।^{২০}

উপর্যুক্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় পুঁজিতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা যেকোনো সমাজে চালু থাকার কারণে মানুষে মানুষে যে ব্যাপক ব্যবধান বিরাজ করে তা প্রমাণিত সত্য। আর তাই পুঁজিবাদী সমাজ বিশেষ করে পাশ্চাত্য সমাজ এ ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে আসার প্রচেষ্টা হেতু যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তারা তার নাম দিয়েছে ‘সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা’।^{২১} যদিও এটি অতি সাম্প্রতিককালে (১৯৪১ সালে আটলান্টিক চুক্তি অনুসারে) গৃহীত একটা পদক্ষেপ। এবং এ পদক্ষেপও তারা গ্রহণ করেছে একান্ত বাধ্য হয়ে।^{২২} অর্থাৎ জনগণের পক্ষ থেকে উৎসারিত ক্রমাগত বিদ্রোহ-বিপ্লব থেকে রক্ষা পেতে, সমাজতান্ত্রিক মতবাদের আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে এবং রক্ত ও ঘাম পানি করে শ্রম করে যেতে অব্যাহতভাবে শ্রমিকদেরকে প্রস্তুত রাখার জন্যে। কিন্তু এরপরও বলা যায়, এ ব্যবস্থা সবার জন্য সমান উন্মুক্ত নয়। এ ব্যবস্থা শুধুমাত্র বিমাকারীদের নিরাপত্তা বিধান করে।^{২৩} অর্থাৎ সমাজে তারা ‘সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা’র নামে যে কর্মসূচী হাতে নিয়েছে সেখানেও তারা পুঁজিবাদী চরিত্র পরিত্যাগ করতে পারে নি। যার ফলে গরীব আরো যে গরীব হচ্ছে এবং ধনী আরো যে ধনী হচ্ছে তা উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আগেই প্রমাণ করা হয়েছে।^{২৪}

মোটকথা পুঁজিতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ‘সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদা’র নামে সমাজে মানুষে মানুষে ব্যাপক যে ব্যবধান তা আজও বিদ্যমান। বস্তুত আধুনিক যুগে প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থলে পুঁজিবাদী শ্রেণীর যে উদ্ভব ঘটেছে তারই পরিণতিতে আজও সম্পদ, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাতে। তাদের স্বার্থে সরকার ও সরকারী প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করার পূর্ণ ক্ষমতা ও যোগ্যতাও তাদেরই।^{২৫} এহেন সমাজে সাধারণ মানুষের স্বার্থ সর্বদা উপেক্ষিত হতে দেখা যায়। তারা তাদের আইনানুগ অধিকার থেকে সর্বদা থাকে বঞ্চিত। শ্রেণীস্বার্থের যুপকাঠে জনস্বার্থ সদা-সর্বদা হয় বলীর শিকার।

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, মানুষের দারিদ্র ও স্বীয় প্রয়োজন পূরণের অক্ষমতা শুধুমাত্র ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব ব্যর্থতা মাত্র নয়, বরং এ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যে ফল তা অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত স্বীকার করে নিয়েছেন।^{২৬} যদি মানুষে মানুষে ব্যবধান কমিয়ে আনতে হয়, নিম্ন শ্রেণীর মানুষকে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে উঠিয়ে আনতে হয়

তাহলে প্রয়োজন আর্থ-সামাজিক ইনসারফ প্রতিষ্ঠার। আর এটি সম্ভব হবে মানুষের প্রবৃত্তির তাড়না এবং জৈবিক প্রেষণাকে নিয়ন্ত্রণ করে নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণের মাধ্যমে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের সামাজিক অবস্থান

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষের ব্যাপক ব্যবধান হেতু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনিবার্য দুঃখদুর্দশা ও ভোগান্তি লাঘবের নিমিত্ত সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের উদ্ভব। এ ব্যবস্থা মনে করে সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপরীতে সর্বহারার শ্রেণীর উদ্ভবের অন্যতম কারণ সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা এবং অসম বণ্টন। যদি সমাজের অসম বণ্টন ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত মালিকানা ও বিশেষ স্বার্থভোগী শ্রেণীর উৎখাত করে সম্পদের বিভিন্ন মাত্রায় জাতীয়করণ এবং সম্পদের সমবণ্টন করা সম্ভব হয় তাহলে দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি ন্যায়বিচার করা সম্ভব হবে এবং একটি শ্রেণীহীন, শোষণমুক্ত সাম্যের সমাজ গঠন করা সহজ হবে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ শ্রেণীহীন, আয় ও সম্পদের বৈষম্যহীন একটি সমাজব্যবস্থার কথা বললেও বাস্তবে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের পিঠস্থান প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের বাস্তবতা সে কথাই বলে। সোভিয়েত ইউনিয়নে অসম বণ্টন ব্যবস্থা বিরাজমান^{২৬} থাকায় সেখানে সম্পদের বৈষম্য হেতু ক্রমান্বয়ে শ্রেণীব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।^{২৭} ফলে পুঁজিবাদী সমাজের ন্যায় মানুষে মানুষে ব্যবধান সেখানেও প্রকট আকার ধারণ করেছিল। সমাজের উচ্চ স্তরের লোকেরাই ধনতান্ত্রিক সমাজের মতো উচ্চ আয়ের পদমর্যাদাসম্পন্ন চাকুরীসমূহ পেত।^{২৮} নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য শ্রমিকদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। ক্ষেত্রবিশেষে তাদেরকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকেও বঞ্চিত করা হত। বিপরীতপক্ষে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী ব্যক্তিগণ সবকিছুই বিনাক্রমশে লাভ করত। তারা শুধু বিনামূল্যে প্রাসাদোপম বাড়ি ও গাড়িই যে পেত তাই নয়, প্রকাশ্য বেতন^{২৯} ছাড়াও গোপনভাবে প্রদত্ত অতিরিক্ত বেতন, হ্রাসকৃত মূল্যের দোকানে বিশেষ সুবিধাও ভোগ করত। সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বস্তরের অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকার পরও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর সন্তানগণ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার সুযোগের বেলায় সমাজের উপর স্তরের প্রভাব ও বিভ্রাটালী ব্যক্তিদের সন্তানদের তুলনায় কম সুযোগ লাভ করত। এ বিষয়ে বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ইয়ানোভিচের অবসারভেশন হলো : “যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যত বেশী ভবিষ্যৎ লাভজনক পেশার সাথে সংযুক্ত তাতে শ্রমজীবী মানুষের সন্তানদের প্রবেশের সুযোগ তত কম এবং ‘সাদা কলারধারী’ পেশাজীবীদের সন্তানরাই সেখানে সিংহভাগ দখল করে আছে।”^{৩০} আর এটি যে সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থায় পুরুষানুক্রমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য টিকিয়ে রাখার সুস্পষ্ট প্রবণতা, তা বলা যায়।

মূলত অব্যাহত আয়-বৈষম্য, কৃষকদের অন্নাভাব-দুর্ভিক্ষ হওয়া সত্ত্বেও ‘শ্রেণীহীন সমাজ’ নামে খ্যাত হওয়ার দরুণ একদলীয় কমিউনিস্ট শাসনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার অধিকারও কারো না থাকায় একপর্যায়ে ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে রাশিয়ায় গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ফলে সেখানে একদলীয় শাসনের অবসান হয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে মানুষ অগ্রসর হতে থাকে এবং এরই সাথে তাল মিলিয়ে নতুন অর্থব্যবস্থার দিকে তারা অগ্রসর হয়। এবং এই অর্থব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠা পেতে যাচ্ছে বিরাট একটা সংখ্যক ধনকুবেরদের স্থান দখল করতে। কিন্তু এত অল্প সময়ে এত সম্পদের অধিকারীদের^{৩১} উদ্ভব কীভাবে হতে পারল তা বোঝা যায় সাবেক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে আয়-বৈষম্যের ব্যাপক ব্যবধান থেকে।

এখন প্রশ্ন হলো, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে যেখানে বলা হয়ে থাকে শ্রেণীহীন সমাজ গড়ার কথা, সেখানে মানুষে মানুষে এত ভেদ-বৈষম্য কেন? এ প্রশ্নের উত্তর মার্কসবাদের বিশ্বদৃষ্টি ও কৌশলের মধ্যে নিহিত বলে মনে করা

যেতে পারে। মার্কসবাদের বিশ্বদৃষ্টি ও কৌশল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ মতবাদের যিনি মূল প্রবক্তা, মার্কস একদিকে মনে করেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক মানব প্রকৃতি বলে কিছু নেই। অপরদিকে তিনি মনে করেন, ধর্মশাস্ত্রের সমালোচনাই সকল সমালোচনা শাস্ত্রের মূল ভিত্তি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক মানব প্রকৃতি বলে কিছু নেই-এ মতের উপর ভিত্তি করে তারা ব্যক্তি মালিকানাকে অস্বীকার করে সকল সম্পদ জাতীয়করণ করে রাষ্ট্রের শাসকবর্গের হাতে ন্যস্ত করেন। তারা মনে করেন এ ব্যবস্থায় একই ব্যক্তি ভোক্তা, শ্রমিক, সরকারী কর্মচারী বা ব্যবস্থাপক হিসেবে নিজের ব্যক্তিস্বার্থকে ভুলে যেয়ে একমাত্র সমাজের সার্বিক কল্যাণবোধ দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হবে। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজের যদি একজন ব্যক্তিকে তার নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পদের ব্যাপারে (তিনি সামাজিক কল্যাণ সীমাকে লংঘন করবেন এ আশংকায়) বিশ্বাস করতে না পারা যায়; তাহলে অনুরূপ সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা নিরঙ্কুশভাবে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একদলীয় রাষ্ট্রের শাসকবর্গকে বিশ্বাস করা কীভাবে সম্ভব? কেননা, এ মতের প্রকৃত যে ভিত্তি বস্তুবাদ(এ মত মনে করে মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে সব কিছুই অসত্য, অর্থহীন ও অস্তিত্বহীন।)^{৩২} তথা নাস্তিকতাবাদ; সেখানে সর্বজ্ঞ এক স্রষ্টার সামনে জবাবদিহিতার কোনো ধারণা বা অনুশাসন কাজ করে না এবং একজন ব্যক্তি-মানুষের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি মৃত্যু পরবর্তী কোনো জীবন সম্পর্কিত ধারণা দ্বারা প্রভাবিত নয়।^{৩৩}

পরিশেষে উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মানব প্রকৃতির মধ্যে সম্পদ মালিকানাভুক্ত করার প্রবণতাকে স্বীকার করে, সর্বজ্ঞ এক স্রষ্টার সামনে জবাবদিহিতার ধারণাকে মনে বদ্ধমূল করে যদি সুস্থ ও সুষম ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরঙ্কুশ সাম্যের মানসিকতা নিয়ে সম্পদ বন্টন করা হয় তাহলে সম্ভব সমাজ থেকে ভেদ-বৈষম্য একটা সহনীয় মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করা।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক নীতি, কাঠামো ও পদ্ধতি রয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির এ অনন্য সাধারণ দিকটি সেক্যুউলার বস্তুতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপরীতে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে পরিপুষ্ট। তার মানে ইসলামের অর্থনৈতিক নীতিমালা ইসলামের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরই উপ-সেট ও প্রতিফলন।^{৩৪} ইসলামের সমস্ত অনুশাসনের মূল সূত্র ও উৎস এক হওয়ায় অর্থাৎ পবিত্র কুরআন হওয়ায় ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যক্তি ও সামাজিক ব্যক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলামের নৈতিক দর্শন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচীসহ অর্থনৈতিক দিকেরও ভিত্তি। ফলে এখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য নয়। আর তাই বস্তুগত প্রাচুর্যের চেয়ে এখানে বেশী জোর দেয়া হয় সমাজের সর্বাঙ্গীন ও ভারসাম্যমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে।

ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকৃত; যার কারণে ইসলামের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সমাজ তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের রাষ্ট্রশাস থেকে মুক্ত। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিকে চিত্রিত করা হয় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের ভূমিকা পালনকারী এক অপরিহার্য উপাদান রূপে। একইসাথে ইসলাম ব্যক্তিকে তার মূল্যবোধ এবং এরই আওতায় সামাজিক দায়-দায়িত্ব মেনে নেবার ওপরও সমান গুরুত্বারোপ করে। ফলে এখানে ব্যক্তি পুঁজিবাদী সমাজের ন্যায় যেমন লাগামহীন হয়ে পড়ে না; তেমনি সমাজতান্ত্রিক সমাজের ন্যায় সমষ্টির চাপে পিষ্টও হয় না। ইসলামী জনকল্যাণমূলক সমাজের ভিত্তি হচ্ছে দুর্বলতর মানুষের কল্যাণের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যেকের অংশগ্রহণের দায়িত্ব ও অধিকার। এ লক্ষ্যে ইসলাম সম্পদ বন্টনের মাধ্যম হিসাবে যাকাতকে অন্যতম খাত হিসাবে চিহ্নিত করে। আর যাকাত ব্যবস্থার পিছনে ইসলাম যে উদ্দেশ্য নিরূপণ করে তাহলো যাকাত গ্রহীতাকে তার অর্থনৈতিক অবস্থা এতখানি উন্নত করতে সহায়তা করে যাতে সেও অদূর ভবিষ্যতে যাকাতদাতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে।

ইসলামী সমাজের সর্বপ্রধান যে দায়িত্ব তা হলো এর সীমানায় শুধু দুঃস্থ কেন তাদের যদি কোন গৃহপালিত পশু থাকে তা-সহ তারা যেন অযত্ত অবহেলায় পড়ে না থাকে তার ব্যবস্থা করা।^{৩৫} সমাজ হতে বেকারত্ব দূর করে মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিকের জন্য সুন্দর জীবন, আবাসস্থল ও চিকিৎসা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দেয়া।^{৩৬} নবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেন : “যদি কোন এতীম রাস্তায় পড়ে থাকে, তার দায়িত্ব আমাদের (অর্থাৎ আমরা তার যত্ন নেব) কিন্তু যদি কোন অর্থ পড়ে থাকে, তার মালিক হবে এ অর্থের প্রকৃত স্বত্বাধিকারী।”^{৩৭} আর এ সকল লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ইসলাম স্বতঃস্ফূর্ত পদ্ধতি (দান, সাদকা, যাকাত) ছাড়াও প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ তথা নির্বর্তনমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করে। সমাজে সাম্যনীতি বাস্তবায়ন হচ্ছে কী-না তা দেখার দায়িত্বও ইসলামী সমাজের; ফলে ইসলামের স্থায়ী নিয়মগুলোর (উত্তরাধিকার নিয়ম প্রবর্তন, মোহরানা) পাশাপাশি ইসলামী সমাজের তথা রাষ্ট্রেরও অধিকার রয়েছে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের। যেমন কৃষি সংস্কার, ভূমি বণ্টন, শ্রম সংস্কার ইত্যাদি গ্রহণের।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার আওতায় স্বাধীনতা ভিত্তিক ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত হলেও এ ব্যক্তিমালিকানা অবাধ ও নিরঙ্কুশ হবার পরিবর্তে সব সময় তা সমষ্টির কাছে দায়বদ্ধতার নামান্তর। এখানে সকল সম্পত্তিকে আল্লাহর বলে ঘোষণা করার সাথে সাথে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা ব্যক্তির নিকট আমানত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সে হিসাবে ইসলাম ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে এমনভাবে কাজে লাগাতে বলে যাতে একইসাথে ইসলামী মূল্যবোধ অনুসারে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ সর্বোচ্চ হয়। যেহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তির মাধ্যমে সমষ্টির কল্যাণ সাধনও উদ্দেশ্য, তাই রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে ভালভাবে ব্যবহার হচ্ছে না এমন জমি বাজেয়াপ্ত করে নেয়ার।^{৩৮}

ইসলামী অর্থব্যবস্থার আরেকটি দিক হলো, এ সমাজের প্রত্যেকের একটা সুষ্ঠু জীবন নিশ্চিত করার জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখা। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ইসলাম খনিজ, জ্বালানী, পানি, নদী, সমুদ্র ইত্যাদিকে সমষ্টিগত সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মানুষকে সাদাসিধা জীবন-যাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ জন্য এ ব্যবস্থায় ভোগ্যপণ্য উৎপাদন এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে জনগণের গরিষ্ঠ অংশের চাহিদাপূরণ হয় এবং বিলাস দ্রব্যাদির দিকে খুব বেশী উৎপাদন প্রয়াস নিয়োজিত না হয়। যদিও ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতি অনুযায়ী পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় চাহিদা ও সরবরাহ দ্বারা কিন্তু কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সরবরাহ কমিয়ে মূল্যবৃদ্ধির প্রয়াস বন্ধ করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে রাষ্ট্র। একইসাথে অবৈধ এবং নেশা জাতীয় পণ্য যাতে উৎপাদিত না হয় রাষ্ট্র সেদিকেও লক্ষ্য রাখে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার আরেকটি অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম-অমুসলিম সকল ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং একই সাথে শ্রমদানকারীর জন্য একটা সম্মানজনক নিম্নতম মজুরী নিশ্চিত করা^{৩৯}। এক্ষেত্রে ইসলাম আয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় না। ইসলাম মনে করে আয় বৈষম্য উদ্দীপকের কাজ করে। কিন্তু তাই বলে এ বৈষম্য এমন পর্যায়ে পৌঁছানোকেও ইসলাম অবৈধ জ্ঞান করে যে পর্যায়ে পৌঁছালে সমাজে মানবিকতার ঘাটতি পরিদৃষ্ট হয়। এজন্য ইসলামের সার্বজনীন সাম্য ও সামাজিক ন্যায়পরতার দাবীর আলোকে এ বৈষম্য একটা নির্ধারিত মাত্রা অতিক্রম যাতে না করে সে দিকে ইসলামী সমাজ সর্বদা দৃষ্টি রাখে।^{৪০}

এখানে উল্লেখ্য যে, একটি সমাজে নানান প্রকৃতির মানুষের বসবাস। সেগুলোকে ধর্মীয়, (মুসলিম, অমুসলিম) পেশাগত (চাকুরী, অচাকুরী, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী), আর্থিক (ধনী, দরিদ্র, ফকীর-মিসকীন, উচ্চবৃত্ত, নিম্নবৃত্ত),

শারীরিক (সুস্থ, অসুস্থ, শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধী), অভিভাবকগত (ইয়াতীম, বিধবা), বাসস্থানগত (ছিন্নমূল, বস্তী), প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায়। কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সবগুলোকে সমন্বিতভাবে দেখা হয়েছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী অর্থব্যবস্থার যে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করা হলো এরই আলোকে ইসলাম ব্যক্তি ও দলের অবস্থান ভেদে সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদার বিষয়টিকে বিবেচনা করে থাকে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদা

ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদার বিষয়টি নিরূপণ করতে হলে প্রধানত দুটি বিষয়কে বিবেচনা করা প্রয়োজন। ১. ইসলাম মানুষের কর্মক্ষমতা, শক্তি-সামর্থ্য, প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তাকে বিচার বিশ্লেষণ করে।

২. ইসলাম মনে করে মানবজাতির সকলেই সমান ইয়যত, সম্মান ও স্বাধীনতা পাওয়ার অধিকারী।

প্রথমত: ইসলাম মনে করে মানুষের প্রকৃতিগত ক্ষমতা ও যোগ্যতাসমূহের মধ্যে যে বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে, তা এমন একটি বাস্তব সত্য যাকে অস্বীকার করা বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার আদৌ কোনো সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। আর এ জন্য নিছক বিভিন্ন পেশা গ্রহণজনিত (যেটা সমাজের স্বার্থেই প্রয়োজন) যে ভেদ যাকে ‘সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদা’ নামে আখ্যায়িত করা হয় ইসলাম তাকে সমর্থন করে। এ বাস্তব সত্যটিকে সমর্থন করে ইউসুফ আল কারজাভী বলেন,

ইসলাম জীবিকা ও রুটি-রুজির দিক দিয়ে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করে। কেননা তা যে জন্মগত কর্মক্ষমতা, শক্তি-সামর্থ্য, প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে নিহিত পার্থক্যের ফলশ্রুতি, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সে সাথে একথাও স্বীকার্য যে, এ পার্থক্য কমবেশী হওয়ার অর্থ এ নয় যে, ইসলাম ধনীদেব ধন বৃদ্ধির কাজ করবে এবং দরিদ্রদের তিল তিল করে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার জন্যে ছেড়ে দেবে, যার ফলে উভয় শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যটা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়ে যাবে।...না, ইসলাম এরূপ অবস্থার নয় পক্ষপাতি।”^{৪১}

এ প্রসঙ্গে আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীগণও সমাজে নানান স্তরের উপস্থিতিতে স্বীকার করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন, যদিও সকল মানুষ সমান, কিন্তু বাস্তবে দৈহিক, অর্থনৈতিক ও নানান সাংস্কৃতিক কারণে সমাজে মানুষে মানুষে তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে সরোকিন, ডেভিস ও মূর এবং অন্যান্য ক্রিয়াবাদী সমাজ বিজ্ঞানীগণ বলেন, “কোন সমাজই শ্রেণীহীন কিংবা স্তরবিন্যাস বিহীন নয়। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিই একটি নির্দিষ্ট অবস্থান লাভ করে— যে অবস্থানগুলো একই রকম নয়। ফলে অসচেতনভাবেই সামাজিকাবস্থানের তারতম্য সূচিত হয় যেখানে সচেতনভাবে সেই অবস্থানে যোগ্যতম ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে হয়। এ ধরনের ‘অসাম্য’, সমাজের কার্যক্রমগত দিক থেকে অবশ্যম্ভাবী। সে কারণেই শ্রেণীহীন বা স্তরবিন্যাস বিহীন সমাজ একটি অলীক কল্পনা মাত্র।”^{৪২} তাঁরা আরো বলেন, “মার্কস বর্ণিত শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজেও শ্রেণী ও স্তরবিন্যাসের অস্তিত্ব নির্দেশ করা যায়। যেমন একজন রাজনৈতিক ক্ষমতাস্বত্ব ব্যক্তি ও একজন শ্রমিকের সামাজিক অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, নারী পুরুষের দৈহিক গড়নের কারণে শ্রমবিভাজন সংক্রান্ত সামাজিক পার্থক্য রয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন পেশা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে পার্থক্য রয়েছে।”^{৪৩} উপর্যুক্ত আলোচনাকে সামনে রেখে তারা মনে করেন যে শ্রেণীহীন বা স্তর-বিন্যাস বিহীন সমাজ কখনই সম্ভবপর নয়। সুতরাং ইসলাম দৈহিক ও মেধাগত ভিন্নতাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মেধা-মনন, চেষ্টা-শ্রম এবং কর্মের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন পেশাকে অবশ্যই স্বীকৃতি দেয়। কারণ, একই মানুষ একইসাথে অনেক বিষয়ে কর্মদক্ষ হতে পারে না। বৈধ পথে যেকোনো শ্রেণীপেশার কাজকে ইসলাম ছোট করে দেখেনা।

দ্বিতীয়ত: ইসলাম সকল মানুষকে এক আদমের সন্তান হিসেবে বিবেচনা করে।^{৪৪} সে মনে করে মানব জাতির সকলেই সমান মর্যাদা, ইচ্ছা ও স্বাধীনতা পাওয়ার অধিকারী।^{৪৫} আর তাই সে অর্থনৈতিক সাম্য অপেক্ষা সামাজিক সাম্যের উপর অধিকতর গুরুত দেয়। যেহেতু ইসলামে সামাজিক মর্যাদা সকলের সমান। আর এ কারণেই ইসলাম সমাজে ব্যক্তির দৈহিক ও মেধাগত পার্থক্যের দরুন অর্থনৈতিক বৈষম্যকে স্বীকার করে নিলেও সে একই সাথে মৌলিক চাহিদা পূরণে সকল মানুষের সমতাকেও সমান প্রাধান্য দেয়। আর এ জন্য ইসলাম মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য এক ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক বিধান দেয়। অর্থনৈতিক এ বিধানে কোন মানুষ যেমন অন্যকারো দাসে পরিণত হয় না, তেমনি সে সম্পূর্ণ লাগাম ছাড়াও হয় না।^{৪৬} সুতরাং সামাজিক পেশা ও শ্রেণীর নামে বিদ্যমান পুঁজিবাদী সমাজের ন্যায় ইসলামী সমাজেও যেন একই রকম ভেদ-বৈষম্য বিরাজ না করে তার জন্য ইসলাম দুটি পন্থা অবলম্বন করে। ১.জীবিকা অর্জনের সমান সুযোগ; ২.সম্পদ সবার মাঝে বিলি-বন্টনের ব্যবস্থা।

প্রথমত: ইসলাম জীবিকা অর্জনের জন্য সমান সুযোগ দান করে। ইসলামী প্রেক্ষাপটে সার্বিক অর্থনৈতিক নীতি হলো, প্রত্যেককে বয়স, গোত্র, ধর্ম এবং আঞ্চলিক মর্যাদা নির্বিশেষে তার সামর্থ্য বা যোগ্যতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের সমান সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ইসলাম সমাজের কর্ণধারদের ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে বা অন্যকোনো হাদিয়া গ্রহণের মাধ্যমে কাউকে অবৈধ পথে বেশী সুযোগ করে দেওয়া আর কারো বঞ্চিত করার সুযোগ দেয় না।^{৪৭} আবার মানুষ যাতে অলস বসে না থাকে, ভিক্ষার হাত কারো সামনে উন্মোচন না করে তার জন্য সে মানুষকে বার বার তাগিদ দেয় এই বলে যে, সে যেন নিজে উপার্জনের নীতি গ্রহণ করে, খোদার ইবাদতের পরপরই যেন সে তার জীবিকার অন্বেষণে বাহিরে বের হয়ে পড়ে;^{৪৮} কাজ করাকে সে যেন পূণ্য এবং অলসতাকে যেন পাপ হিসেবে গ্রহণ করে।^{৪৯} এরপরও দরিদ্র ব্যক্তি তার সাধ্যানুসারে চেষ্টার পরও জীবিকা অর্জনে অপরগ বা অসমর্থ হলে তাকে-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে-অবশ্যই মৌলিক বা অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা ইসলামের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত: ইসলাম সম্পদ সবার মাঝে বিলি-বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইসলাম মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এই মর্মে উপনীত হয় যে, সে একদিকে যেমন সম্পদ ভোগ-দখল করতে চায়, অপরদিকে তেমনি সে সম্পদ অন্যের জন্যে অকাতরে বিলিয়েও দিতে কুষ্ঠ বোধ করে না। অর্থাৎ ইসলাম মনে করে মানুষ নিছক ভোগ সর্বস্ব প্রাণী নয়, আবার সে বৈরাগ্যবাদীও নয়; বরঞ্চ তার অবস্থান উভয়ের মাঝামাঝি। মানুষ যদি নিছক ভোগসর্বস্ব প্রাণী হয় তাহলে সে কীভাবে সম্পদ লুণ্ঠন করা যাবে সে চেষ্টাই করবে; অপর দিকে সে বৈরাগ্যবাদী হলে দুনিয়ার কোন বস্তুরাজীরই তার কোন প্রয়োজন হবে না। কিন্তু ইসলাম মনে করে উভয় পন্থাই চরম। সে মনে করে মানুষের ভিতর উভয় গুণাবলীই রয়েছে। কেবল প্রয়োজন উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করা। এ প্রসঙ্গে ইউসুফ আল-কারযাভী,^{৫০} মুহাম্মাদ কুতুব,^{৫১} সাইয়্যেদ কুতুব^{৫২} প্রমুখের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানব প্রকৃতির মধ্যে সম্পত্তির মালিক হওয়া, অর্থাৎ দুনিয়াবী জিনিষের প্রতি যে স্বাভাবিক মোহ ইসলাম সেটিকে যেমন সমর্থন করে^{৫৩} তেমনি তার মধ্যে মানবতার কল্যাণের নিমিত্ত সব কিছুই বিলিয়ে দেওয়ার যে প্রবণতা রয়েছে সে সুপ্ত প্রবণতাগুলিকে বিকাশ ঘটানোর যে তাগিদ, ইসলাম সেটিও দিয়ে থাকে।^{৫৪} মোহ যেন নিছক ভোগের উপকরণ মাত্র না হয়ে তা প্রয়োজনের তাগিদে পরিণত হয়, সেটিকে নিশ্চিত করতে চায় বলে ইসলাম প্রতি মুহূর্তে ত্যাগ, দান, সাদকা ইত্যাদির জন্য মানুষের প্রতি বার বার আহ্বান জানায়।^{৫৫} এবং এর পরিণতিতে পুরস্কারের ঘোষণা যেমন দেয়, তেমনি সম্পদ কুখিগত করার প্রবণতার বিরুদ্ধে দোজখের কঠিন শাস্তিরও হুমকি প্রদান করে।^{৫৬}

মানুষের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের এ দিকটি আরো সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ফরহাদ মজহার। তিনি এ বিষয়ে যা বলতে চেয়েছেন তার মর্মার্থ হলো : মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষ যখন তার আত্মার বিকাশ ঘটাতে পারে (ইসলাম মানুষের আত্মার বিকাশ ঘটানোর বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।), নিজের স্বভাবকে বিকশিত করতে পারে, তখন তার মধ্য থেকে ‘আমি’ ভাবও ক্রমান্বয়ে কাটতে শুরু করে। মোট কথা, আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানই যখন তার জীবনের একমাত্র সাধনা হয় তখন সে তার নিজ প্রয়োজনের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্ব বেশী দিয়ে থাকে।^{৫৭}

বস্তুত আর্থিক সমতা আনয়নের এবং সমাজ থেকে ভেদ-বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ইসলাম অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা মূলনীতিসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে সম্পদের মালিকানা প্রশ্নে ইসলাম মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে^{৫৮} সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধতার সীমারেখা নির্ধারণ করে, মানুষের শোষণের হাতিয়ার সুদ এবং একচেটিয়া মজুদদারী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, মালিক-শ্রমিকের মাঝে ইনসাফ ভিত্তিক মুনাফা বণ্টনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যাকাত, সাদকা ইত্যাদি প্রবর্তনের মাধ্যমে সমাজে মানুষে মানুষে ব্যবধান কমিয়ে আনে, মিরাসী আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে সম্পদ তথা জায়গা-জমি একজনের হাত থেকে তা বহুজনের মাঝে বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করে; সর্বোপরি, সে ব্যক্তির আচার-আচরণে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনীতিতে সমতা আনার প্রয়াস পায়। অর্থাৎ ইসলাম কিছু বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য নিরূপণ করে; কিছু বিষয়ে বিধি-নিষেধ আরোপ করে, কিছু খাতের উল্লেখ করে যার মাধ্যমে সম্পদ সবার মাঝে একটা যৌক্তিক পর্যায়ে বণ্টনের ব্যবস্থা করা যায়, সম্পদের প্রবৃদ্ধিমূলক কিছু কর্মসূচী হাতে নেয় এবং কিছু বিষয়ে নির্বর্তনমূলক নীতি গ্রহণ করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, আলোচ্য প্রবন্ধটিতে ইসলামী অর্থব্যবস্থা আলোচনাকালে কেবলমাত্র এর তাত্ত্বিক দিক নিয়েই মূলত আলোচনা করা হয়েছে। পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা আলোচনাকালে যেমন যুক্তরাষ্ট্রে এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে অনুরূপ দৃষ্টান্ত ইসলামী অর্থব্যবস্থা আলোচনাকালে যদিও করা হয়নি তথাপি এখানে নবী মোহাম্মাদ (সাঃ) এর মদীনা রাষ্ট্র, চার খলিফার শাসনামল বিশেষ করে আমির মুয়াবিয়াহ’র ক্ষমতাগ্রহণের (৪১হিজরী, মোতাবেক ৬৬১ খৃষ্টাব্দ) পূর্ববর্তী সময় এবং পরবর্তীতে ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রঃ)-এর সময়কালকে দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।^{৫৯} তবে বর্তমানে মুসলিম দেশগুলির মধ্যে পাকিস্তান, ইরান ও সুদান ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ বেছে নিলেও^{৬০} পাকিস্তান ও সুদান রাজনৈতিক সংঘাত, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, ধনী ও প্রভাবশালীদের ঋণ মওকুফ ইত্যাদি নানা কারণে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান প্রকট আকার ধারণ করায় তা কাংখিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়। অবশ্য ইরান ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্যে পাকিস্তান ও সুদানের চেয়ে ভালো অবস্থানে আছে। সেটাও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধ, এর বৈদেশিক সম্পদ জব্দ করণ ইত্যাদি নানা কারণে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে।^{৬১} তবে আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামী অর্থব্যবস্থার যে রূপকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে তা কোনো মুসলিম দেশ যদি বাস্তবায়ন করতে পারে তাহলে শোষণ, অসাম্য ও অবিচারের বিপরীতে উক্ত দেশটি একটি কল্যাণময় রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

উপসংহার

ইসলাম যে অর্থব্যবস্থা প্রণয়ন করে তা একদিকে যেমন সকল মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম, অপরদিকে তা মানুষে মানুষে ব্যাপক ব্যবধান তথা শ্রেণী-বৈষম্য কমিয়ে আনার সহায়ক। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি মানুষের উপর উপার্জনের দায় যেমন রয়েছে তেমনি সমাজেরও দায় রয়েছে ব্যক্তি উপার্জন করতে অক্ষম হলে

তার দায়িত্ব গ্রহণ করার। এখানে লাগামহীনভাবে সব সম্পদের মালিকানা ব্যক্তির হাতে না থাকায় ব্যক্তি সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার করতে পারে না। আবার সকল সম্পদ ব্যক্তির নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রের হাতে অর্পণও করা হয় না বলে ব্যক্তি রাষ্ট্র-সরকারের অবৈধ কার্যক্রমের সমালোচনা করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির এমন কোন ভয় থাকে না যে, রাষ্ট্রের সমালোচনা করলে রাষ্ট্র বুঝি তার অন্ন সংস্থান বন্ধ করে দেবে। এ ব্যবস্থা নূন্যতম সবার চাহিদা মেটানোর নিশ্চয়তা দিলেও একইসাথে প্রতিটি ব্যক্তির যোগ্যতার (মেধা এবং উত্তম চরিত্রের সমন্বয়) নিরিক্ষে কর্ম-বণ্টনের সুযোগও করে দেয়। ফলে প্রত্যেকে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে আর্থিকভাবে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা লাভ করে। আর এরই নিরিক্ষে ধনীক শ্রেণী যাতে সঠিকভাবে তার সম্পদ বাড়াতে পারে তার জন্য নিরাপদ ব্যবস্থাও করে দেয়। অপরদিকে তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণের সম্পদের উর্ধ্বে নির্ধারিত পরিমাণে সম্পদ বের করেও নেয়; এবং সেগুলি বাকীদের মধ্যে বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থাও করে দেয়। নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, ইসলামী অর্থব্যবস্থায় আদল ও ইনসাফ পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীল। এখানে সম্পদের জন্য মানুষ নয় বরং মানুষের জন্য সম্পদকে বিবেচনা করা হয়।

তথ্যনির্দেশ

- ১ R. M. Maciver and Charles H. Page, *Society : An Introductory Analysis* (London : Macmillan & Co Ltd., 1964), p. 352. আরো দেখুন, ড. এম উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, অনুবাদ: ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব প্রমুখ (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১), পৃ. ৮৪।
- ২ মুহাম্মদ মিজানউদ্দিন, *সমাজবিজ্ঞান : প্রত্যয় ও পদ্ধতি* (রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, প্রথম প্রকাশ-১৯৯১), পৃ. ৪৫।
- ৩ নিন শ্রেণীবলতে কুলি, মজুর, মুটে, শ্রমিক, স্বল্প বেতনে চাকুরী করে যেমন পিয়ন, আয়া, গ্রহরী এদের বুঝানো হচ্ছে।
- ৪ মোহাম্মদ লুৎফুল হক ও মোস্তাফিজুর রহমান, *আধুনিক অর্থনীতি* (ঢাকা : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিমিটেড, একবিংশতিতম সংস্করণ, ১৯৯৭), পৃ. ৫৪।
- ৫ ফরহাদ মজহার, *সাম্রাজ্যবাদ* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৮), পৃ. ৫৮-৫৯, ১০৬। এখানে উল্লেখ্য যে, আলোচ্য প্রবন্ধে পুঁজিবাদের যে বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হয়েছে সেগুলির সাথে সামঞ্জস্য থাকায় একাধিক স্থানে ফরহাদ মজহারের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কালে পুঁজিবাদের ক্রটি উল্লেখসহ আরো অন্যান্য বিষয়ে বহু ইসলামী পণ্ডিতদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।
- ৬ মুহাম্মদ কুতুব, *অস্তির বেড়াজালে ইসলাম*, সম. : ড: সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ. ৬৮।
- ৭ এম. এ. হামিদ, এম.এ., *ইসলামী অর্থনীতি: একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, অনুবাদ ও সম. প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, (অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, ১৯৯৯), পৃ. ১০১-২; *Philip`s Encyclopedia*ed. Lester Hawksby (London : Docklands E144JP, 2008), p. 524
- ৮ এক সময় ব্রিটিশ, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে যা করেছে আজকের বিশ্বে আমেরিকা তাই করেছে। বর্তমান বিশ্বের দেশে দেশে আমেরিকার ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, কাভালজিং সিংহ, বিশ্বায়ন: কিছু অমীমাংসিত প্রশ্ন, অনুবাদ: মনোয়ার মোস্তফা (ঢাকা : বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ও দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৬), পৃ. ৬৭-৯২।
- ৯ ফরহাদ মজহার, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৮।
- ১০ মুহাম্মদ কুতুব, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৬৮।

- ১১ In place of MERCANTILISM, Smith proposed the doctrine of LAISSEZ-FAIRE : that governments should not interfere in economic affairs and that free trade increases wealth. see, *Philip's Encyclopedia, op. cit.*, p. 685. আর এই লেইজে ফেয়ার পুঁজিবাদে রয়েছে সামাজিক ডারউইনবাদের মর্মার্থ তথা শক্তিশালীদের টিকে থাকার দর্শন। দেখুন, উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।
- ১২ ধনাত্মক সমাজে উদারীকরণের নামে ব্যবসায়ের বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির উপর থেকে উঠিয়ে নিয়ে ব্যক্তিকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়ে থাকে।
- ১৩ কাভালজিৎ সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।
- ১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।
- ১৫ ফরহাদ মজহার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।
- ১৬ মুহাম্মদ মিজানউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।
- ১৭ ফরহাদ মজহার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
- ১৮ এওয়ার্ড এন. ভলফ ২০১০ সালে ব্যাপকভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে ১৯৮৩ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সময়ের আমেরিকান সম্পদের নেট মূল্য এবং আর্থিক সম্পদের যে হিসাব দিয়েছেন তা বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, <http://www2.ucsc.edu/whorulesamerica/power/wealth.html> date 12.3.2012.
- ১৯ "They live outside the margins of ordinary American life, isolated and unassimilated, a Third World society within a First World nation. Theirs is a Hobbesian universe where life is nasty, brutish and often cut short by violence, disease and drugs. They live lives without: mothers without husbands, men without work, families without homes, days without structure, neighborhoods without hope. They are America's Underclass, a disturbing daily reminder that American Democracy has not measured out liberty and justice for all.

Members of the Underclass are not the same as the traditional poor. About 30 million Americans live below the poverty line, but..."Richard Stengel, "The Underclass : Breaking the Cucle", Time magazine, 10 October 1988, p. 26. Read more: <http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,968625,00.html#ixzz1p63iAa3I>
- ২০ 'সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা' মূলত কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা থেকে এসেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহে কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা প্রবর্তন করার পরও মানুষে মানুষে ব্যবধানের ক্ষেত্রে যে সংকটসমূহ রয়ে গেছে তা আজও দূর না হয়ে বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১৪৬।
- ২১ ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান* (২য় খণ্ড), অনুবাদ : মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, তৃতীয় প্রকাশ, ২০০৪), পৃ. ৩৯৯।
- ২২ ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, (২য় খণ্ড), পৃ. ৩৯৯-৪০০।
- ২৩ বিস্তারিত দেখুন, উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১৪৬।
- ২৪ মুহাম্মাদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।
- ২৫ উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।
- ২৬ উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।
- ২৭ 'Soviet society may be characterized as a class system.' Murry Yanowitch, *Social and Economic Inequality in the Soviet Union* (M. E. Sharpe, 1977), p.108.

- ২৮ উমর চাপরা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৫।
- ২৯ ১৯৩৭ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য যে মজুরী চার্টটি তৈরী করা হয় তাহলো : সাধারণ শ্রমিক ১১০ হতে ৪০০ রুবল; মধ্যম মানের কেরানী ৩০০ হতে ১০০০ রুবল; উচ্চমানের অফিসার ১০০০ হতে ১০০০০০ রুবল এবং প্রথম মানের নাগরিক ২০০০০ হতে ৩০০০০ রুবল। এ পরিস্থিতিতে হিসাব করলে যা দেখা যায় তাহলো শতকরা ১১-১২ জন উচ্চ শ্রেণীর শাসকগণই ভোগ করে জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ। দেখুন, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, নবম প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ৭২-৭৩।
- ৩০ উদ্ধৃত, উমর চাপরা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬।
- ৩১ রাশিয়ায় ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে বিলিনিয়রের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০১ জন। এদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ভ্লাদিমির লিসিন। তার সম্পদের পরিমাণ দুই হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার। দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি, আলেক্সি মোরদাশভ। তার সম্পদের পরিমাণ এক হাজার ৮৫০ কোটি মার্কিন ডলার এবং তৃতীয় ধনী ব্যক্তি মিখাইল প্রোকনরভ। তার সম্পদের পরিমাণ এক হাজার ৮০০ কোটি মার্কিন ডলার। দেখুন, এবনে গোলাম সামাদ, <http://www.sonarbangladesh.com/articles/IbnGolamSamad>
- ৩২ দেখুন, মুহাম্মাদ কুতুব, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৬২।
- ৩৩ উমর চাপরা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮৬।
- ৩৪ আলবার্ট টিভোয়েরম, “অর্থনীতি ও উন্নয়ন”, ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা সামাজিক প্রেক্ষাপট, অনুবাদ : এম রুহুল আমিন (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট, ২০০৩), পৃ. ১৫০।
- ৩৫ আবদুর রহীম, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯০।
- ৩৬ আবদুন নূর, লোক-প্রশাসন : সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট, ২০০৯), পৃ. ৮২।
- ৩৭ উদ্ধৃত, মুহাম্মাদ আহমদ সাকর, “ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকা”, ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা সামাজিক প্রেক্ষাপট, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১০৬।
- ৩৮ আবদুন নূর, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮৩।
- ৩৯ সরকারী কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের ব্যাপারে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ যে হাদিসটিকে সাধারণ মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেন তাহলো : “যে লোক আমাদের সরকারী কর্মচারী হবে, (সে যদি বিয়ে না করে থাকে, তবে) সে বিয়ে করে নিবে। তার কোন চাকর না থাকলে সে তা গ্রহণ করবে। তার ঘর না থাকলে সে একখানা ঘর প্রস্তুত করবে। এর অধিক যে গ্রহণ করবে সে হয় বিশ্বাস-ঘাতক, না হয় চোর।” দেখুন, উদ্ধৃত, আবদুর রহীম, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৫২।
- ৪০ আবদুর রহীম, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৫৩।
- ৪১ ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাণ্ডক্ত, (২য় খণ্ড), পৃ. ৪০৬।
- ৪২ মুহাম্মদ মিজানউদ্দিন, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৭। অবশ্য যোগ্যতম ব্যক্তিকে সমাজের যোগ্যতম স্থানে নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে কোন অবিচারকে ইসলাম সমর্থন করে না।
- ৪৩ উদ্ধৃত, মিজানউদ্দিন, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৮।
- ৪৪ দেখুন, কুরআন, ৭:৩১।
- ৪৫ দেখুন, প্রাণ্ডক্ত, ১৭:৭০।
- ৪৬ উমর চাপরা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৯৯। ১৮

- ৪৭ দেখুন, কুরআন, ২:১৮৮।
- ৪৮ দেখুন, প্রাণ্ডক্ত, ৬২:১০।
- ৪৯ দেখুন, প্রাণ্ডক্ত, ৯:১০৫।
- ৫০ দেখুন, ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাণ্ডক্ত, (২য় খণ্ড) পৃ. ৪১৮, ৪২৯।
- ৫১ দেখুন, মুহাম্মাদ কুতুব, প্রাণ্ডক্ত, পৃ.৮৩।
- ৫২ সাইয়েদ কুতুব, ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার, অনুবাদ : কারামত আলী নিয়ামী (ঢাকা : ইসলামিয়া কুরআন মহল, ২০০২), পৃ. ৬৬, ২৪২।
- ৫৩ “হে নবী! আপনি বলে দিন যে, যদি তোমরা আমার প্রভুর রহমত ভাঙারের মালিক হতে চাও তবে তা খালি হয়ে যাবার ভয়ে খরচ করা থেকে হাত গুটিয়ে নিতে।” কুরআন, ৪:১০০।
- ৫৪ ইসলাম অর্থনৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে একটি ভারসাম্যমূলক অবস্থা আনয়নের প্রয়াস চালায়। দেখুন, M. Raihan Sharif, *Guide to Islamic Economics : Nature, Concepts and Principles* (Dhaka : Bangladesh Institute of Islamic Thought, 1996), pp. 76-77.
- ৫৫ দেখুন, কুরআন, ৯:১০৩
- ৫৬ দেখুন, প্রাণ্ডক্ত, ৩:১৮০।
- ৫৭ দেখুন, ফরহাদ মজহার, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮০, ১০৬-১০৮।
- ৫৮ ইসলাম মনে করে মালিকানাগত দিক থেকে সকল সম্পদের মালিক আল্লাহ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষ সেই সম্পদের আমানতদার হিসেবে তা রক্ষণাবেক্ষণ করবে।
- ৫৯ দেখুন, ড. এম ওমর চাপরা, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ, অনুবাদ : ড. মাহমুদ আহমদ (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থাট, ২০১১), পৃ. ২০৯-১০; মুহাম্মাদ কুতুব, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৬।
- ৬০ মুসলিম দেশসমূহের আর্থিক ব্যবস্থার ইসলামী করণের প্রয়াসকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত ব্যাংকগুলোকে ইসলামী করণের প্রয়াস এবং দ্বিতীয়ত গোটা আর্থিক ব্যবস্থাসমূহকে ইসলামী করণের প্রয়াস। ব্যাংকগুলোকে ইসলামী করণের প্রয়াস হিসাবে ১৯৯৬ সালের শেষ অবধি সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে কমপক্ষে ৩৪টি মুসলিম ও অমুসলিম দেশে ১৬৬’র বেশী সংখ্যক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে ৮টি ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে, ৪৩টি মধ্যপ্রাচ্যে, ৩৫টি আফ্রিকায় ও ৮০টি এশিয়ায়। এই ১৬৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৩টি সরকারী মালিকানাধীন আর অবশিষ্ট ১৩৩টি বেসরকারী মালিকানাধীন। আর গোটা আর্থিক ব্যবস্থাসমূহে ইসলামী করণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় পাকিস্তান, ইরান ও সুদানে। বিস্তারিত দেখুন, ড. এম ওমর চাপরা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৮৪-৮৫।
- ৬১ ড. এম ওমর চাপরা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩০০-১১।

প্রাচীন বাংলায় শৈবধর্ম: একটি পর্যালোচনা

মোঃ গোলাম সারওয়ার*

Summary: Shaivism is one of the major traditions within Hinduism that reveres Shiva as the Supreme Being. The followers of Shaivism are called ‘Shaivites’ or ‘Saivites’. It is one of the largest sects that believe Shiva worshipped as a creator and destroyer of world. Shaivism has ancient roots traceable in the Vedic literature of 2nd millennium BCE. Inscriptions available from the time of the Guptas onwards, are sources of the information regarding the diffusion of Shaivism in Bengal. The Damodarpur copper plate inscription of Budhagupta refers to the installation of the phallic emblem of Shiva. The diety invoked in the Gunaighar copper plate of Vainyagupta. The coins struck by Samacharadeva (6th century CE) and Sasanka (7th century CE) bear representation of Siva. The Shaivite faith of king Sasanka is further corroborated by the account of Hiun Tsang. During the last quarter of the 7th century, east bengal was ruled by the Buddhist Khadga dynasty. But the emblems of Shaivism on their coins come to support the Shaivite leaning of the dynasty. Pala and Sena period witnessed the trend of Shiva worship with much popularity in Bengal.

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে একেশ্বরবাদী ধর্ম হিসাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে দুটি ধর্ম পরিচিত তা হলো বৈষ্ণবধর্ম ও শৈবধর্ম। একেশ্বরবাদী ধর্মকে ভাগবতধর্ম বলা হতো। ভাগবতধর্ম বৈষ্ণবধর্মের সাথে সাথে শৈবধর্মেরও বিশেষণ হিসাবে প্রযুক্ত হতো। পতঞ্জলি কোন কোন শৈব সম্প্রদায়কে শিবভাগবত বলে উল্লেখ করেছেন।^১ বৈষ্ণব ও শৈব উভয় ধর্মই ভক্তিবাদী। চর্যা, ক্রিয়া, যোগ ও জ্ঞান উভয় ধর্মেরই ব্যবহারিক দিক। বেদান্তের দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা শৈব ও বৈষ্ণব মতবাদকে বহুলভাবে প্রভাবিত করেছে। ব্রহ্ম, চিদ্র ও অচিদ্রের পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ধারণের নিরিখে শৈবধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে উঠে।

শৈবধর্মের মধ্যে বহু ও বিচিত্র ধারার সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সিন্ধু সভ্যতায় লিঙ্গ ও যোনির উপস্থিতি পরবর্তীকালের সুবিস্তৃত শিব ও শক্তির ধারণার সূচনা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত একটি সীলে ত্রিমুখ, দ্বিশৃঙ্গ, যোগাসনে উপবিষ্ট ও পশুবেষ্টিত যে মূর্তিটি অঙ্কিত দেখা যায় সেটিকে পৌরাণিক শিবপশুপতির আদিরূপ হিসেবে অনুমান করা হয়।^২ অপর একটি সীলে এই দেবতা যোগাসনে উপবিষ্ট এবং দু’পাশে দুটি নাগ জাতীয় মূর্তি দেখা যায়। হরপ্পায় প্রাপ্ত একটি পোড়ামাটির সীলে যোগাসনে উপবিষ্ট, শিরোভূষণযুক্ত এবং নানা প্রাণী পরিবেষ্টিত এক দেবতাকে দেখা যায়। সীলের পেছন দিকে

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

প্রদর্শিত বৃষ মূর্তি ও ত্রিশূলধ্বজ মূর্তিটির উপবেশন ভঙ্গী প্রভৃতি শৈব নিদর্শনের প্রতীক। বেদান্তের ভারতের ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে লিঙ্গ উপাসনা এবং তার সঙ্গে শিবের গভীর ও ব্যাপক সম্পর্ক লক্ষণীয়। সিন্ধু সভ্যতার লিঙ্গ সমূহ শৈব চিন্তাধারার প্রাগৈতিহাসিক সংযোগের ইঙ্গিত দেয়।^৭

ঋগ্বেদের রূদ্রকে পরবর্তীকালে শিবের সাথে অভিন্ন হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। রূদ্র হলেন ভীতিজনক দেবতা। তাই ঋগ্বেদে এই প্রার্থনা বার বার উচ্চারিত হয়েছে যে, তিনি যেন মানুষের ক্ষতির কারণ না হন।^৮ রূদ্র ঝড়ঝঞ্ঝা, অশনি, অগ্নি, সংক্রামক ব্যাধি প্রভৃতি নানা প্রকার বিপর্যয় ও দুর্বিপাকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যজুর্বেদের শতরুদ্রীয় অংশে^৯ রূদ্রের শতনাম কীর্তিত হয়েছে। এই নামগুলোর মধ্যে কয়েকটি তাঁর উগ্র রূপের পরিচয় দেয়। আবার কিছু নাম থেকে রূদ্রের মঙ্গলময় সত্ত্বার দ্যোতকতা লক্ষ্য করা যায়। অথর্ববেদে তাঁর কয়েকটি বিশেষ নাম পাওয়া যায়, যথা: রূদ্র, উগ্র, ভব, পশুপতি, মহাদেব ও ঈশান। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে^{১০} রূদ্র সর্বপ্রধান দেবতা এবং একেশ্বর হিসেবে কল্পিত হয়েছেন। এখানে তাঁকে মহাদেব, মহর্ষি, ভগবান, ঈশ, ঈশান ও শিব নামে অভিহিত করা হয়েছে। শিব নামটি এখানে রূদ্রের উপাধি হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে যে, তিনি প্রকৃতিরূপা মায়ার অধীশ্বর এবং এই বিশ্বভুবন তাঁর অবয়বের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। তিনি সর্বভূতে স্থিত শিব, ঈশ্বরগণের মধ্যে পরম মহেশ্বর, দেবতাগণের মধ্যে পরম দৈবত। তিনি হলেন বিশ্বশ্রষ্টা এবং তাঁর অনেক রূপ।

গ্রীক লেখকগণ এদেশে শিবপূজার ব্যাপকতা লক্ষ্য করেছিলেন এবং দেবতা দিওনিসোসের সঙ্গে শিবের সমীকরণ করেছিলেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে রূদ্র ও শিবের উল্লেখ আছে। এছাড়া শৈব সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ উল্লেখও মহাভাষ্যে লক্ষ্য করা যায়। পতঞ্জলি তাদের শিবভাগবত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। মহাভারত ও রামায়ণের বহুস্থানে শিব ও তাঁর অনুগামীদের উল্লেখ আছে তা থেকে এটি স্পষ্ট যে বৈষ্ণবদের মত শৈবরাও এই দুটি মহাকাব্য তাদের স্বার্থে ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছিলেন। মহাকাব্যদ্বয়ে শিবের মাহাত্ম্যের বিভিন্ন বর্ণনা দেখা যায়। মহাভারতে দক্ষযজ্ঞের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তখনও পর্যন্ত রূদ্র-শিব প্রাতিষ্ঠানিক দেবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হননি। রামায়ণে শিব শিতিকঠ, মহাদেব, রূদ্র ত্র্যম্বক, পশুপতি ও শঙ্কর নামে আখ্যায়িত হয়েছেন। শিবের সঙ্গে মিলনের জন্য উমার তপস্যার কাহিনী, কার্তিকেয়ের জন্মের কাহিনী, গঙ্গা আনয়নের জন্য শিবের উদ্দেশ্যে ভগীরথের তপস্যার কাহিনী, সমুদ্র মন্থনে শিবের বিষপান প্রভৃতি কাহিনী রামায়ণে স্থান পেয়েছে। মহাভারতেও এসব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে কৃষ্ণ কর্তৃক শিবের উপাসনার কাহিনী আছে। তবে মহাভারতে বেদ, সাংখ্য, যোগ ও পাঞ্চরাত্রের পাশাপাশি পাশুপত শৈবধর্মের স্বতন্ত্র স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।^{১১} পাশুপত মতবাদ ছাড়াও আরো কিছু শৈব চিন্তাধারা ভারতবর্ষে পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হলো নায়নার সম্প্রদায়, তামিল শৈবধর্ম, আগমাস্ত শৈবধর্ম, শিবদ্বৈত, বীরশৈব, কাশ্মীর শৈববাদ, কাপালিক, কালামুখ, মন্ডময়ুর প্রভৃতি।

শিব মনুষ্যমূর্তিতে এবং লিঙ্গরূপে সচরাচর পূজিত হন। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতকের উজ্জয়িনী থেকে প্রাপ্ত মুদ্রায় দণ্ডকমণ্ডলুযুক্ত ত্রিমুখ শিবের চিত্র দেখা যায়। তক্ষশিলার অনতিদূরে প্রাপ্ত একটি ব্রোঞ্জ সীলে ত্রিগুণসহ দ্বিভুজ একটি শিবমূর্তি অঙ্কিত আছে এবং এতে শিবরক্ষিত শব্দটি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। মউএস এবং গণ্ডোফারেসের তাম্রমুদ্রায়, কুষ্ণাণ শাসক কণিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেবের মুদ্রায় শিবমূর্তি অঙ্কিত আছে। বিম কদফিস নিজেকে শিবোপাসক বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর সুবর্ণ ও তাম্রমুদ্রার যেদিকে শিব ও তাঁর বাহননন্দীর মূর্তি অঙ্কিত সেই দিকে খরোষ্ঠী লিপিতে প্রাকৃত ভাষায় উৎকীর্ণ রয়েছে: ‘মহরজস রজতিরস সবলোক, ঈশরস-মহিশ্বরসবিম কদফিসস এতরস।’ তবে শিবমূর্তির প্রচলন হলেও দেখা যায় যে, শিবের লিঙ্গ

প্রতীকের জনপ্রিয়তাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় প্রতিটি শিব মন্দিরের গর্ভগৃহস্থ মূল বিগ্রহই হল শিব লিঙ্গরূপী। যদিও শিবের অসংখ্য মনুষ্য মূর্তি ও এসংক্রান্ত পৌরাণিক নানা কাহিনীর ভাস্কর্যরূপ মন্দিরের বিভিন্ন অংশে বর্তমান। ইলোরার বিখ্যাত কৈলাসমন্দির বা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের মূর্তিসংস্থান দেখলেই এটি লক্ষ্য করা যায়।^৮

শিবের মানবোচিত মূর্তিসমূহ প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত যথা: উগ্র মূর্তি ও সৌম্যমূর্তি। শিবের কাহিনী সম্বলিত উগ্র বা সংহার মূর্তির মধ্যে গজাসুরসংহার মূর্তি, ত্রিপুরাস্তক, অন্ধকারসুরবধ, জালন্ধরবধ, কালারি, কামাস্তক, শরভেশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ভৈরব, অঘোররত্ন, পাশুপত, ভীরভদ্র, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি উগ্রমূর্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এগুলোর সাথে পুরাণ কথার যোগ নেই। সৌম্য মূর্তি সমূহের মধ্যে চন্দ্রশেখর, উমাসহিত, আলিঙ্গন, বৃক্ষবাহন, সুখাসন, উমা-মহেশ্বর, সোমাক্ষন্দ, দক্ষিণামূর্তি, নৃত্যমূর্তি, চক্রদান, পাশুপতাস্ত্রদান, চণ্ডেশানুগ্রহ, রাবণানুগ্রহ প্রভৃতি। সদাশিব, মহাসদাশিব, মহেশ প্রভৃতি মূর্তির মধ্যে দার্শনিক তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

গুপ্ত যুগ হতে বাংলায় শৈব ধর্মের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বুধগুপ্ত এবং জয়াদত্তের দামোদরপুর তাম্রশাসনে^৯ দেখা যাচ্ছে যে, পঞ্চম শতকে উত্তরবঙ্গের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিব লিঙ্গের পূজা প্রবর্তিত হয়েছে। বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর^{১০} তাম্রশাসনে লক্ষ্য করা যায় যে, শৈবধর্ম এসময় রাজকীয় পোষকতা লাভ করেছিল। এখানে বৈন্যগুপ্ত ‘মহাদেব পদানুধ্যাত’ উপাধি গ্রহণ করেছেন। সুতরাং বৈন্যগুপ্ত শৈব মতের একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী ছিলেন তা উক্ত উপাধি গ্রহণ থেকে সহজেই বুঝা যায়। ষষ্ঠ শতকের সমাচারদেবের মুদ্রায়^{১১} মহাদেব শিবের এবং তাঁর বাহন নন্দীর চিত্র লক্ষ্য করা যায়। এই থেকে ধারণা করা যায় যে, বাংলার এই প্রাচীন রাজপরিবারটিও শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন। সপ্তম শতকের গৌড় রাজ শশাঙ্কের মুদ্রাতেও মহাদেব ও নন্দীর প্রতিকৃতি দেখা যায়। এছাড়া চীনা ভ্রমণ হিউয়েন সাঙের বিবরণী থেকেও শশাঙ্ক যে শৈবধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং শৈবধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন এসম্পর্কে জানা যায়।^{১২} সপ্তম শতকের শেষের দিকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বৌদ্ধ খড়্গ রাজবংশের শাসন পরিলক্ষিত হয়। আশ্রাফপুর তাম্রশাসনের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, খড়্গ রাজারা বৌদ্ধ হলেও শৈবধর্মের প্রতি তাঁদের অনুরাগ ছিল কারণ উক্ত লিপিতে মহাদেবের বাহন নন্দীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করা হয়েছে। এছাড়া খড়্গদের মুদ্রাতেও বৃষের চিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে। দেবখড়্গের মহিষী রাণী প্রভাবতী শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তিনি একটি অষ্টধাতু নির্মিত সর্বাঙ্গীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।^{১৩} এই প্রতিমাটির পাদপিঠের লিপিতে বলা হয়েছে যে, দেবী সর্বাঙ্গী হলেন দেবতা সর্বের শক্তি। দেবতা সর্ব হলেন বৈদিক রত্নদেবতার অষ্টরূপের অন্যতম রূপ। লোকনাথের ত্রিপুরা লিপি^{১৪} থেকে জানা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণ নরপতি ভরদ্বাজ গোত্রীয় করণ লোকনাথ শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন। এছাড়া এসময়কালে শৈবধর্মের প্রসার ও প্রতিপত্তির প্রমাণ পাহাড়পুরের পোড়া মাটির ফলকগুলিতেও লক্ষ্য করা যায়। এখানে দুটি ফলকে বস্তুলিঙ্গ ও মুখলিঙ্গরূপী শিব দেখা যাচ্ছে এবং এই দুটি প্রতিকৃতিতে ব্রহ্মসূত্রের বেটনও সুস্পষ্ট। পাহাড়পুর বিহারের প্রাচীর গায়ে কয়েকটি চন্দ্রশেখর শিবের প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে।^{১৫} এছাড়া তৃতীয় নেত্র, উর্ধ্বলিঙ্গ, জটামুকুট, বৃষবাহন, ত্রিশূল, অক্ষমালা, কমণ্ডলু প্রভৃতি শৈব লক্ষণ যুক্ত ফলকও এই প্রাচীর গায়ে রয়েছে। এই সমস্ত প্রত্ননিদর্শন সাপেক্ষে আমরা বলতে পারি যে, বাংলায় পালপূর্ব যুগেই অনেকগুলি রাজা ও রাজবংশের পোষকতায় শৈবধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল।

পাল ও সেন পূর্বে একই ধারার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শৈবধর্মের আরও জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্মপালের ২৬তম রাজ্যাক্ষে উৎকীর্ণ কেশব প্রশস্তিতে^{১৬} চতুর্মুখ শিবলিঙ্গ প্রতিমা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

রাজ্যপালের ভাতুরিয়া তাম্রশাসন, তৃতীয় বিগ্রহপালের ৫ম রাজ্যক্ষেউৎকীর্ণ গয়ালিপি, যক্ষপালের শীতলা লিপি এই সমস্ত লেখমালা থেকে দেখা যায় যে পাল যুগে লিঙ্গরূপী শিব পূজার বেশি প্রাধান্য ছিল। নারায়ণপালের ভাগলপুর লিপিতে^{১৭} দেখা যায় যে, নারায়ণপাল পাণ্ডপাত শৈব অনুসারী পূজক ও সেবকদের ভূমিদান করছেন। এছাড়া এই লিপিতে নারায়ণপাল কতৃক এক সহস্র শিব মন্দির প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়েছে। তবে আমরা ধারণা করতে পারি যে, এই সমস্ত শিব মন্দিরের উপাসনার প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে লিঙ্গরূপী শিবের প্রাধান্যই বেশি ছিল।

দিনাজপুরে প্রাপ্ত কন্মোজ রাজাদের স্তম্ভলিপি থেকে জানা যায় যে, গৌড়াধিপতি কন্মোজ রাজ প্রভু শম্ভুর একটি পবিত্র মন্দির স্থাপন করেছিলেন।^{১৮} কন্মোজ রাজ নয়পালেরও শৈবানুগত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। নয়পালের ইর্দা তাম্রশাসন^{১৯} শিবের নামে শুরু করা হয়েছে এবং এই লিপির ভূমিদান দেবতা শঙ্কর এর নামে কৃত হয়েছে। তৃতীয় গোপালের নিমদিঘী তাম্রশাসনের^{২০} শুরুর শ্লোকে প্রভু শম্ভুর উদ্দেশ্যে বন্দনা করা হয়েছে। এই লিপি হতে আরো জানা যায় যে, জনৈক ভবকাদেশ তাঁর নিকটাত্মীয় আদিদেবের স্মৃতিতে একটি শৈব মন্দির স্থাপন করছেন। এছাড়া তৃতীয় গোপালের চতুর্দশরাজ্যক্ষে উৎকীর্ণ রাজিবপুরে প্রাপ্ত সদাশিব প্রস্তরমূর্তি এবং এর পাদদেশের লিপি^{২১} থেকে জানা যায় যে, পাল আমলের শেষ দিকে বাংলায় শিবের সদাশিব রূপের প্রচলন হয়েছিল।

সম্ব্যাকরনন্দী রচিত *রামচরিত* থেকে জানা যায় যে, রামপাল রামাবতীতে তিনটি শিব মন্দির ও একটি একাদশ রুদ্রের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।^{২২} *রামচরিতের* শ্লোকসমূহে বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতাদের পাশাপাশি শিবেরও সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে।^{২৩} সম্ব্যাকরনন্দী নিজেই বিষ্ণু ও শিবের উপাসক ছিলেন বলে *রামচারিতে* উল্লেখ আছে। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে^{২৪} লক্ষণীয় যে, এখানে বৈদ্যদেব নিজেকে পরমবৈষ্ণব ও পরমমহেশ্বর হিসেবে ঘোষণা করছেন। এক্ষেত্রে বৈষ্ণব ও শৈব উভয় ধর্মকেই সমানভাবে পোষকতা দানকারী হিসেবে আমরা বৈদ্যদেবকে চিহ্নিত করতে পারি। বৈদ্যদেবের এই লিপি থেকে সমকালীন শাসকদের ধর্মীয় উদারতাবাদের চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

সেন শাসকদের লেখমালা থেকে দেখা যায় যে, সেন শাসকগণ শৈবধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রস্তি^{২৫} শুরু শিবের আশীর্বাণী দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এছাড়া এই লেখ হতে শিবের হরিহর রূপের মন্দির সম্পর্কে জানা যায়। বিজয় সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসন^{২৬} ও বল্লাল সেনের নৈহাটি তাম্রশাসনে^{২৭} শিবের দুই রূপ ধূর্জটি ও অর্ধনারীশ্বর এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেন রাজাদের সীলসমূহে সদাশিবের প্রতিকৃতি অঙ্কন করা হয়েছে যা থেকে ধারণা করা যায় যে, সদাশিব সেনদের পারিবারিক দেবতা হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লক্ষণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে^{২৮} পৌরাণিক শিবের অনিন্দসুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে শিব চন্দ্রকলা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে তাঁর জটাতে গঙ্গাজল ধারণ করে মস্তকে সর্পমালা দ্বারা শোভিত হয়েছেন। শিবের এই যোগী বেশের সুন্দর প্রাণচ্ছবির বর্ণনা দিয়েছেন সেন আমলের বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি উমাপতিধর। তাছাড়া উমাপতিধর নিজেই শিবের একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী ছিলেন। উমাপতিধরের কিছু শিব সম্পর্কিত কবিতা বিখ্যাত কবিতা সঙ্কলন *সদুজ্জিকর্ণামৃতে* স্থান পেয়েছে। *উমাপতিধর* রচিত এই সমস্ত কবিতায় শিবের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে।^{২৯} সেনযুগের সবচেয়ে বড় কবি হলেন জয়দেব। কবি জয়দেব বিষ্ণুর অনুসারী ছিলেন। বৈষ্ণব মতের লোক হয়েও জয়দেব মহাদেবের প্রশংসায় শ্লোক রচনা করেন যা থেকে অনুমিত হয় শৈবধর্ম এসময় ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় ধর্ম হিসেবে বজায় ছিল।^{৩০}

বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে শিবের বিভিন্ন রূপের মূর্তি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে রয়েছে চন্দ্রশেখর, নৃত্যপর, সদাশিব, উমামহেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর, কল্যাণসুন্দর, হরিহর এবং অঘোররুদ্র।

সদাশিব

পাল যুগের শেষ দিকেই বাংলায় সদাশিব রূপের চর্চা প্রচলিত হয়। তবে সেন রাজাদের রাজকীয় সীলসমূহে পাঁচ মাথা ও দশ বাহু বিশিষ্ট পদ্ম পাতায় বসা শিবের প্রতিকৃতি দৃষ্টে মনে হয় সেন রাজারা সদাশিবের প্রতি অনুগত ছিলেন। এটা বলা যেতে পারে যে, ধর্মশাস্ত্রসমূহ^{১১} দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার পরই সদাশিবের প্রতিকৃতি সেন শাসকদের রাজকীয় সীলে স্থান লাভ করেছিল।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ সদাশিব মূর্তি উত্তর বাংলায় পাওয়া গেছে। এই মূর্তিগুলো আদি মধ্যযুগের শেষ দিকে নির্মিত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। মূর্তিতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো দক্ষিণ ভারতীয় আগমের সাথে সম্পর্কিত। বস্তুত সদাশিব রূপ কল্পনা আগমাত্ম শৈবধর্মের সাথে সম্পর্কিত। উত্তর ভারতে সৃষ্ট সদাশিব রূপ কল্পনা ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ ভারতে প্রসারিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতীয় সদাশিবের এই রূপ সেন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় বহুল প্রচলিত হয়েছিল। তবে সেনদের আগমনের পূর্বেও বাংলায় সদাশিব আচনার তথ্য পাওয়া যায়। বাংলায় প্রাপ্ত বেশির ভাগ সদাশিব মূর্তির রূপ কল্পনা উত্তরাকামিকাগম এ বর্ণিত সদাশিব রূপের সাথে প্রায় পুরোপুরি মিলে যায়।^{১২}

ভারতের পশ্চিম দিনাজপুরে প্রাপ্ত তিন মাথা ও দশ হাত বিশিষ্ট সদাশিব মূর্তি বাংলায় প্রাপ্ত প্রাচীন সদাশিব মূর্তি। বর্তমানে এটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত আছে। মূর্তিটির পাদদেশের লিপি থেকে এটি কম্বোজ রাজাদের (৯৫০-১০৫০ খ্রী.) সমসাময়িক বলে ধারণা করা যায়। এখানে শিবের বাহন নন্দী অনুপস্থিত এবং পাদদেশে অঙ্কিত একটি হাতি সহ দুটি সিংহের প্রতিকৃতি থেকে সহজেই বৌদ্ধ প্রভাবিত নির্মাণ শৈলী হিসেবে মূর্তিটিকে চিহ্নিত করা যায়। এখানে শিব পূর্ণ উদার্যের ভঙ্গিত পদ্মাসনে সমাসীন। মূর্তিটির ডান দিকের হাতগুলোর ধারণকৃত নিদর্শন হলো শক্তি, ত্রিশূল এবং কাটাভঙ্গ আর বাম দিকের হাতগুলোতে রয়েছে উৎপল, ডমরু এবং সর্প।^{১৩} এ প্রসঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুরের প্রাপ্ত আরেকটি সদাশিব মূর্তিও উল্লেখযোগ্য। তিন মাথা ও দশ হাত বিশিষ্ট এই সদাশিব প্রস্তর মূর্তিটি ডান দিকের হাতগুলোতে শক্তি, ত্রিশূল অক্ষুণ্ণ এবং বাম দিকের হাতগুলোতে অক্ষমালা, উৎপল, ডমরু, সর্প ধারণকৃত অবস্থায় পদ্মাসনে বসা রয়েছে। এই মূর্তিটির পাদদেশে বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন দুই সিংহের মাঝখানে একটি হাতি প্রতিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে এই মূর্তিটি প্রথম মূর্তিটির সমসাময়িক বলে ধারণা করা যায়।^{১৪} তিন মাথা ও দশ বাহু বিশিষ্ট সদাশিবের তৃতীয় প্রস্তর মূর্তিটির প্রাপ্তি স্থান নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর। পাদদেশের উৎসর্গীকৃত লিপি থেকে ধারণা করা যায় যে, মূর্তিটি দ্বাদশ শতকের শেষের দিকের। এখানে দ্বি-পদ্মাসনে বসা শিবের বাহন নন্দীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে গঙ্গা ও যমুনা এবং গঙ্গা, যমুনারবাহন মকর ও কূর্মের সাথে ফুল ও ঘট নিয়ে এখানে উপস্থাপিত হয়েছেন। গণ পরিবৃত এই প্রতিকৃতিটি অনেকটাই উর্ধ্বলিঙ্গাকৃত হিসেবে লক্ষণীয়।^{১৫}

লিঙ্গশিব

প্রাচীন ভারতে লিঙ্গ প্রতীকে শিবের পূজা বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। এর ধারাবাহিকতা বাংলাতেও শিবলিঙ্গের উপাসনা জনপ্রিয়তা লাভ করে। মূলতঃ বিভিন্ন রূপের লিঙ্গোপসনা গুপ্ত যুগেই ভারতবর্ষের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। বিভিন্ন ধরনের মুখলিঙ্গের মধ্যে এক মুখ লিঙ্গ ছিল সবচেয়ে প্রচলিত রূপ। তবে পাহাড়পুরে মন্দির গাত্র হতে এক মুখ লিঙ্গের সাথে একটি চতুর্মুখ লিঙ্গ শিবের প্রতিকৃতিও পাওয়া গেছে।^{১৬}

ধর্মপালের ২৬রাজ্যকে উৎকীর্ণ কেশব প্রশস্তি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে বৌদ্ধগয়াতে একটি চতুর্মুখলিঙ্গ শিবের প্রতিকৃতি অধিষ্ঠানকরণ উপলক্ষে উক্ত প্রশস্তিটি রচনা করা হয়। গয়াতে অসংখ্য বৌদ্ধ নিদর্শনের উপস্থিতি থেকে সহজেই এই অঞ্চলে বৌদ্ধ প্রভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তবে জেনারেল কিটো যখন এই অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন তিনি গয়াতে বৌদ্ধ নিদর্শনের সাথে বিভিন্ন ধরনের শিব লিঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন।^{৩৭} সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে, গয়াতে বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি শিবলিঙ্গের উপাসনাও প্রচলিত ছিল।

পাল রাজা রাজ্যপালের সময়কালের একখানি লিপিস্থিত প্রস্তর ফলক রাজশাহীর অদূরে ভাতুরিয়াতে পাওয়া গেছে। এই লিপিতে^{৩৮} আটামুলা অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত দাস বংশের উদ্দেশ্যে প্রশংসা সূচক উক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। লেখের শুরুতেই প্রভু শঙ্কর আশীর্বচন দৃষ্টে সহজেই বুঝা যায় যে, দাতা শিবের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। এখান থেকে আরো জানা যায় যে, যশোদাস প্রভু শঙ্করের এক আড়ম্বরপূর্ণ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এই মন্দিরের চারপাশে বিভিন্ন দেবদেবীর আরো আটটি উপাসনালয়ের অবস্থান ছিল। এই যশোদাসের অনুরোধে রাজ্যপাল মধুস্রব নামক গ্রামটি দেবতা বৃষভধ্বজের অনুকূলে দান করেছিলেন। লিঙ্গ শিবের ঐতিহ্যগত স্বাস্থ্য উপাসনার নিরিখে বলা যেতে পারে যে, যশোদাসের মন্দিরের দেবতা শঙ্কর ছিল শিব লিঙ্গেরই প্রতিকল্প।

পাল শাসনামলের শেষের দিকে কিছু স্থানীয় প্রধানগণ গয়া নগরীকে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ হিসেবে গড়ে তুলতে যত্নবান হয়েছিলেন। এই স্থানীয় নেতারা নয়পাল ও তৃতীয় বিগ্রহপালের সময়কালে অধিরাজা হিসেবে ক্ষমতাবান ছিলেন। বিভিন্ন ধরনের প্রতিকৃতি দ্বারা গয়া নগরের সজ্জিতকরণের প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায় তৃতীয় বিগ্রহপালের ৫ম রাজ্যকে উৎকীর্ণ বিশ্বদিত্য-বিশ্বরূপের গয়া অক্ষয়ভাট প্রশস্তিতে।^{৩৯} এখানে বিভিন্ন দেবতার মূর্তি স্থাপনের সাথে সাথে দুটি শিব লিঙ্গ বৎস ও গঙ্গেসমূর্তি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া বিশ্বরূপ বিশ্বরূপেশ্বর নামেও একটি স্বনাম শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া এই লেখের ১৭তম শ্লোকে পরমপিতা মহেশ্বর নামক শিবের উল্লেখ করা হয়েছে। যক্ষপালের শীতলা মন্দির লেখের বিবরণেও শিবলিঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই লিপিতে সহস্রলিঙ্গ, কেদারেশ্বর, ফল্লনাথ, অধনারীশ্বর প্রভৃতি নামের লিঙ্গ শিবের উল্লেখ রয়েছে।^{৪০}

তবে সেনরা শৈবানুরাগী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেন শাসনামলের প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের মধ্যে শিবলিঙ্গের উপাসনার প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। তবে শিবের অন্যান্য রূপ উপস্থাপনার উল্লেখ সেন আমলের প্রাপ্ত নিদর্শনের মধ্যে পাওয়া যায়। বিশেষ করে পার্বতীর প্রতি শিবের প্রেমঘন মনোভাবের অঙ্কিত প্রতিকৃতি এসময় লক্ষ্য করা যায়। তবে শিব লিঙ্গের বর্ণনা সূচিত কোন প্রশংসাবাহীই সেন শাসনামলের কোন অংশেই পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুত আদি মধ্যযুগের এই পর্বে তান্ত্রিক উপাসনা পদ্ধতি শৈব ধর্মের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে শিব ও শক্তি ক্রমান্বয়ে অবিচ্ছিন্ন সত্ত্বাতে পরিণত হয় এবং শৈবগামিক ও তান্ত্রিক তত্ত্বসমূহ একীভূত হয়ে যায়। সুতরাং যেখানে শৈব ধর্মের বৃহত্তর পরিসরের মধ্যে শাক্ত চিন্তাধারা ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করছিল এরকম অবস্থার শিবের লিঙ্গকেন্দ্রিক উপাসনা এসময় একেবারেই পরিত্যক্ত হয়েছিল তা বলা যাবে না। কারণ এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, লিঙ্গ শিবের উপাসনার মূলে নিহিত ছিল সৃজনশীল শক্তির ধারণা। তন্ত্রসমূহে শিবলিঙ্গের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ব্রহ্মযামল তন্ত্রগ্রন্থে বান এবং স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে প্রত্যেক দেবদেবীর উপাসনার প্রধান সহায় হিসেবে বলা হয়েছে। এই ব্যাপারে প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণের নিরিখে আরো কিছু বলা যেতে পারে। নবম শতকে নির্মিত কতকগুলো বেলে পাথরের শিবলিঙ্গ যার চতুর্দিকে শক্তি

দ্বারা পরিবেষ্টিত নিদর্শনগুলো উত্তরবাংলার বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গেছে। বস্তুত শিব ও শক্তির একত্রীত উপসনা প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। তান্ত্রিক মতে ধারণা করা হয় যে, শিব ও শক্তির একীভবনের মাধ্যমেই মহাবিশ্বে সৃষ্টি প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

তান্ত্রিক মতবাদের ব্যাপক বিস্তার সেন শাসনামলে লিঙ্গোপসানাকে অনেকটা প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। তান্ত্রিক সংস্কৃতির ক্রমোন্নতির ইতিহাসের সাথে লিঙ্গোপসনা ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত। একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, শিবের বেশির ভাগ প্রতিকৃতিসমূহে তান্ত্রিক যোগী রূপের পরিস্ফুটন ঘটেছে। পরবর্তীতে শিবের নরত্বমূলক প্রতিকৃতি উপস্থাপনের ধারা পাবতীর প্রতি প্রেম ও আকর্ষণ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বিকাশ লাভ করে। শৈব ও শাক্ত এর মিলন তন্ত্রসমূহে অদ্বৈত রূপের প্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মৎসেন্দ্রনাথ (১০ম হতে ১১ শতাব্দী) রচিত তন্ত্রগ্রন্থ *কৌলার্জনান্যনির্ণয়*-এ শিব ও শক্তিকে অবিভাজ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনিভাবে আগুন থেকে ধোঁয়াকে, গাছ থেকে তার ছায়াকে আলাদা করা যায় না তেমনি শিবকে তার শক্তি থেকে আলাদা করা যায় না। তবে শিব বলতে এখানে লিঙ্গ শিবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।^{৪১} তবে সেনযুগের সময়কালে শিব ও শক্তির এই যৌথ প্রকাশিত রূপ গতি লাভ করেছিল যার ফলশ্রুতিতে শিবের লিঙ্গোপসনার প্রবণতা কমে গিয়েছিল বলে মনে হয়।

আরো বিভিন্ন ধরনের শৈব রূপের প্রতিকৃতি বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। বহুবিধ শৈব রূপের প্রতিকৃতির এই বাহুল্যতা আদি মধ্যযুগে এই অঞ্চলে শৈব ধর্মের পূর্ণ বিকাশের দিকটিকে তুলে ধরে। যদিও লিঙ্গোপসনা শৈব ভাবনার প্রধানতম ধারা তথাপি শিবের অন্যান্য রূপের প্রেক্ষাপটও মহাকাব্য ও পুরাণ সমূহে সমর্থিত হয়েছে।

মূর্তিসমূহে কৃপাময় এবং ধ্বংসাত্মক উভয় চরিত্রেই শিবের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় যেসব মূর্তিতে শিবের উপস্থিতি পাওয়া গেছে এর মধ্যে রয়েছে চন্দ্রশেখর, নটরাজ, সদাশিব, উমামহেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর, হরিহর, কল্যাণসুন্দর বা শিববিবাহ। এর মধ্যে ধ্বংসাত্মক রূপে একমাত্র নিদর্শন হিসেবে ‘অঘোররত্ন’ রূপের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

চন্দ্রশেখর

চন্দ্রশেখর শিবের পুরাতন অবয়ব সমূহের মধ্যে অন্যতম। তবে চন্দ্রশেখর রূপের সমর্থন কোন পুরাণে পাওয়া যায় না। পাহাড়পুরে মন্দির গায়ে কিছু চন্দ্রশেখর প্রতিকৃতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

নটরাজ

দক্ষিণপূর্ব বাংলায় দক্ষিণ ভারতীয় স্টাইলের কিছু নটরাজ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। যা থেকে ধারণা করা হয় যে, দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সেন শাসকরা বাংলায় এই জনপ্রিয় নটরাজ শিবের প্রচলন করেছিলেন। তবে প্রাথমিক নিদর্শন দৃষ্টে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, সেনদের আগমনের পূর্বেও বাংলায় নটরাজ শিবের অস্তিত্ব ছিল। যা হোক, নটরাজ শিবের ভঙ্গিমার মধ্যদিয়ে কলা, সঙ্গীত ও নৃত্যের উপর শিবের কর্তৃত্ব প্রকাশিত হয়েছে। চন্দ্র বংশের শাসক লডহচন্দ্রের ১৮তম রাজ্যাব্দের সময়কালীন একটি লিপি যুক্ত নটরাজ প্রতিমাত্রিপুরা অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে, যা থেকে সেন আমলের পূর্বেই নটরাজ শিব বাংলায় জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয়। এই মূর্তির প্রাপ্ত লিপি থেকে জানা যায় যে, এই মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্থানীয় ভবদেব এবং তাঁর পিতা কুসুমদেব। ধারণা করা হয় এই স্থানীয় নেতারা ই ছিলেন দেববংশের পূর্বসূরী। ঢাকা ও এর সংলগ্ন অঞ্চল রামপাল থেকে বেশ কয়েকটি নটরাজ প্রতিমা পাওয়া গেছে। যা থেকে মনে হয় নটরাজ এই অঞ্চলের জনপ্রিয়

দেবতা ছিলেন। ঢাকার রামপাল অঞ্চলে নটেশ্বর নামে একটি গ্রামের নাম এখনও নটরাজ শিবের স্মৃতি বহন করছে।^{৪২}

বাংলায় দশ বাহু ও বার বাহু বিশিষ্ট দুই ধরনের নটরাজ মূর্তি পাওয়া যায়। ঢাকা ও ত্রিপুরা অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রতিমাগুলোতে নটরাজের প্রথম হস্তযুগলে বক্ষস্থলের নিকট বীণা ধারণ করে, দ্বিতীয় হস্তযুগলে একটি সর্পকে আচ্ছাদনের ভঙ্গিতে ধারণ করে এবং অবশিষ্ট হস্তযুগল দ্বারা কেশচ্ছাদনের উপর কাল নিরীক্ষণরত অবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। ঢাকা জেলার শঙ্করবান্ধাতে প্রাপ্ত একটি নটরাজ প্রতিকৃতির দুই পাশে গঙ্গা ও গৌরীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এখানে নটরাজ বাহন নন্দী পৃষ্ঠে তাণ্ডব ভঙ্গীতে নৃত্যরত আছেন আর তাঁর দুই পাশের অনুচরদ্বয় উদ্ধমুখী ভঙ্গীতে প্রভুকে লক্ষ্য করছে। নটরাজের দশ হাতে দশ ধরনের নির্দশন পরিলক্ষিত হয় এর মধ্যে ডান দিকে হাতগুলোতে রয়েছে তরবারি, বর্শা, লাঠি ও ত্রিশূল আর বাম পাশে হাতে গুলোতে ঢাল ও অঙ্কুশ আর বাকি দুহাত নাচের মুদ্রাতে উপস্থাপিত হয়েছে। এই প্রতিকৃতির নিচের দিকে অর্ধেক সর্প ও অর্ধেক মানব বিশিষ্ট নাগ লক্ষ্য করা যায়।^{৪৩} এছাড়া দশ বাহু বিশিষ্ট আরো নটরাজমূর্তি গোবিন্দপুর, সুন্দরবন, ২৪ পরগণা প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

উমামহেশ্বর

আদি মধ্যযুগের বাংলায় তান্ত্রিক মতবাদের পরিব্যপ্ততার ধারাবাহিকতায় উমা-মহেশ্বর জনপ্রিয়তা লাভ করে। দেবপালের সমসাময়িক কালের ব্রোঞ্জ নির্মিত একটি উমা-মহেশ্বর প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে। উমা এখানে শিবের বামপাশের উরুতে পালিতাসন ভঙ্গিতে পদ্মাসনে সমাসীন এবং ডান পা আনতাবস্থায় শিব নন্দী পৃষ্ঠে স্থিরাবস্থায় বসে আছেন। এখানে উমার লম্বমান বাম পায়ের প্রান্তে তাঁর বাহন সিংহের উপস্থিতি দৃশ্যমান। শিব এখানে তাঁর উপরের ডান হাত দ্বারা নাগপাশধরে আছেন, যেখানে নিচের ডান হাত বরদ মুদ্রায় আছে। আর উপরের বাম হাতে ত্রিশূল ধরে নিচের বাম হাত দিয়ে শিব দেবী উমার বক্ষ স্পর্শ করছেন। দেবী এখানে তাঁর বাম হাতে পদ্ম ধারণ করে আছেন আর ডান করতল শিবের বাম পায়ের পাতায় স্পর্শ করেছে।^{৪৪} এই প্রতিকৃতিটি দেবপালের সময়কালের শিল্পোৎকর্ষতার স্বাক্ষর বহন করে। রাজ্যপালের ৩২তম রাজত্ববর্ষে আপনাক নামক বিহারের নিবাসী জনৈক গোপালনের পত্নী কর্তৃক উৎসগকৃত অনুরূপ উমা মহেশ্বর প্রতিমা ভারতীয় মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। উমা মহেশ্বরের আরো মূর্তি বাংলার বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর ও ভাওয়াল তাম্রশাসনের শুরুতে মহেশ্বরের সাথে উমার আর্শিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। মাধাইনগর লিপির প্রথম শ্লোকে দেখা যাচ্ছে উমা যেন মহেশ্বরের ক্রোড়ে বসে শরতের মেঘকে আলোকিত করছেন।

অর্ধনারীশ্বর

অর্ধনারীশ্বর হলো শিব ও পার্বতীর একত্রিত রূপ। বাংলায় এই রূপের প্রচলন তেমন লক্ষ্য করা যায় না। যক্ষপালের শীতলা মন্দির লেখ^{৪৫} থেকে অন্যান্য দেবতার প্রতিকৃতি স্থাপনের সাথে সাথে অর্ধনারীশ্বর এরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে^{৪৬} নৃত্যরত অর্ধনারীশ্বর এর আর্শীবাদী লক্ষ্য করা যায়। নটরাজ শিবের ভঙ্গিমায় নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত-অর্ধনারীশ্বর এর এই আর্শীবাদী উচ্চারণ শিবের ধ্বংসাত্মক ভাবের দিকটিকেই প্রতিভাত করে। সুতরাং অর্ধনারীশ্বরের এই প্রকাশভঙ্গী শিবের শক্তি সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। ঢাকার রামপাল-নামক স্থানে অর্ধনারীশ্বর এর একমাত্র প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে।

হরিহর

হরিহর বলতে শিব ও বিষ্ণুর একত্রিত রূপকে বোঝায়। বামন পুরাণেরশব্দকল্পদ্রুম অংশে হরিহর রূপের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। মাধাইনগর তাম্রশাসনের^{৪৭} স্তুতি শ্লোকে শিব ও বিষ্ণুর একীভূত রূপের প্রতি প্রণাম নিবেদন করা হয়েছে। বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে^{৪৮} প্রদুম্বেশ্বর মন্দিরের সংরক্ষণের সাথে সাথে এই মন্দিরের প্রধান অংশ হরিহর মূর্তি স্থাপনের উল্লেখ আছে। এই লেখটি দেওপাড়া গ্রামে থেকে উক্ত মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের নিকট হতে উদ্ধার করা হয়েছে। এই প্রদুম্বেশ্বরের মন্দিরটি সেন রাজারা স্থাপন করেছেন বলেই মনে হয়। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ মন্দিরের সংশ্লিষ্ট মূর্তি পাওয়া যায়নি। এর ফলে দেওপাড়া প্রশস্তির শ্লোকে বর্ণিত হরিহর রূপের মূর্তিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিয়ে নানা মত লক্ষ্য করা যায়। দেওপাড়া প্রশস্তির আলোকে উক্ত মন্দিরের মূর্তি বিন্যাস সম্পর্কিত এনজি মজুমদার কর্তৃক প্রদত্ত মতামত হল যে, এখানে উভয় সারিতে চারটি করে মূর্তি সংস্থাপিত ছিল, যেখানে প্রদুম্ন (বিষ্ণু-কৃষ্ণ), লক্ষ্মী, ঈশ্বর (শিব) এবং শৈলজা প্রতিমা স্থাপন করা হয়েছিল। এখানে দেবী মূর্তিগুলোকে মাঝে রেখে উভয় পাশে দেবতাদের মূর্তি সংস্থাপিত করা হয়েছিল। এন জি মজুমদারের মতে, সংস্থাপিত মূর্তির বিন্যাস ছিল এরূপ:

	A	B	C	D
(i)	বিষ্ণু	লক্ষ্মী	পার্বতী	শিব
(ii)	শিব	পার্বতী	লক্ষ্মী	বিষ্ণু

কিন্তু এন.জি মজুমদার কৃত এই বিন্যাসে বিতর্ক সৃষ্টির অবকাশ থেকে যায়। প্রথম সুপারিশ অনুযায়ী লক্ষ্মীদেবীকে বিষ্ণুর ডানে বসানো হয়েছে যেটি লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তিতাত্ত্বিক বিবরণের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া দ্বিতীয় প্রকারে পার্বতী শিবের ডানে স্থাপিত হয়েছেন। এর ফলে পার্বতী ও শিবের এই সামনাসামনি অবস্থান শিবের কল্যাণসুন্দর রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু এখানে কল্যাণসুন্দরের অবস্থান দেওপাড়া প্রশস্তির উৎসর্গীকৃত প্রতিমারূপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ভি.এস পাঠক উক্ত আর্শীবাদ শ্লোকের সঠিক অনুবাদ করে মতামত দিয়েছেন এভাবে:

We bow down to the temple called by the name of *Pradyumnesvara* which a place for the sport of union of the beloved Liakshmi and the consort of the daughter of mountain where under the apprehension of the cessation of the embrace, the goddesses placing themselves in between had created some distance even this image of the union of bodies (of Pradyumna and Isvara).^{৪৯}

এই মতানুযায়ী লক্ষ্মী ও নারায়ণকে সম্মুখ ভাগে এবং এর উল্টা অবস্থানে উমা-মহেশ্বরকে আলিঙ্গনাবস্থায় স্থাপন করা হয়েছে যেখানে বিষ্ণুর পেছনেই শিব অবস্থান করেছেন। কিন্তু মূর্তি বিন্যাসটা এরকম:

সম্মুখ ভাগে : লক্ষ্মীনারায়ণ

উল্টা অবস্থানে: শিবপার্বতী

মন্দিরের এইরূপ সম্ভাব্য প্রতিমা বিন্যাসের অনেকটাই যুক্তি যুক্ততা পাওয়া যায়। কেননা মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এর স্বপক্ষে কিছু প্রত্নউপকরণ পাওয়া গেছে। সুতরাং দেওপাড়া লিপির আলোকে প্রদুম্বেশ্বরে আমরা একই সাথে দেখতে পাই, (i) উমা মহেশ্বর, (ii) লক্ষ্মী নারায়ণ ও (iii) হরিহর।

কল্যাণ সুন্দর

শিবের কল্যাণসুন্দর বা শিব বিবাহ রূপটি পুরাণে বর্ণিত সতীর দেহ ত্যাগ এবং তারকাসুরকে পরাজিত করার পর শিব ও পার্বতীর পূর্ণমিলনের সাথে সম্পর্কিত। ঢাকা ও বগুড়া জেলায় কয়েকটি শিব বিবাহের প্রতিমা পাওয়া গিয়েছে যা বর্তমানে জাতীয় জাদুঘর ঢাকা ও রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। দক্ষিণ ভারতের শিব বিবাহ রূপের প্রতিমার সাথে বাংলায় প্রাপ্ত শিব বিবাহ প্রতিমার সাদৃশ্য খুব কম। বাংলায় প্রাপ্ত কল্যাণসুন্দর প্রতিমাগুলোতে বিবাহ ব্যাপারে বাঙালীর রীতি ও আচার পদ্ধতির ছাপ যেমন, সপ্তপদী গমন, বরের হাতে কর্ত্রী বহন প্রভৃতি স্থানীয় বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়েছে।^{৫০}

অঘোর রুদ্র

শিবের অপর নাম হল রুদ্র এবং রুদ্র হলেন ধ্বংসের প্রতীক। শিবের ভয়ঙ্কর রূপের মধ্যে অঘোর-রুদ্র এবং বটুক ভৈরব বাংলায় বহুল পরিচিত। বাংলাদেশে অঘোর-রুদ্রের দুটি প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে যা ঢাকা ও রাজশাহী জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। শৈবগম অনুসারে রুদ্র-শিবের পঞ্চরূপের (বামদেব, তৎপুরুষ, সদ্যোজাত, অঘোর ও ঈশান পঞ্চব্রহ্মা) মধ্যে অঘোর রুদ্র অন্যতম। সম্ভবত: পাল-সেন পর্বের অঘোর রুদ্র অনুসারী একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় বাংলায় গড়ে উঠেছিল যা পরবর্তীকালের সাহিত্যে অঘোরপন্থী নামে পরিচিতি পায়।^{৫১}

বটুক ভৈরব

বটুক ভৈরবের কয়েকটি মূর্তিও বাংলাদেশে পাওয়া গেছে। সর্বাঙ্গ নগ্ন, কাষ্ঠ পাদুকা, কুকুর সঙ্গী, অগ্নিপ্রভা, নরমুক্ত ও নরমুণ্ডমালা ও বিকট হাস্যবাদিত মুখবিশিষ্ট বটুক ভৈরবের প্রতিমা লক্ষণ দৃষ্টে সহজেই বলা যায় যে, এই ধরনের প্রতিমা আগমাস্ত্র শৈব ধর্মের ধ্যান ও কল্পনার সৃষ্টি। বাংলায় প্রাপ্ত বটুক ভৈরব প্রতিকৃতি সমূহের মধ্যে রঘুরামপুর নামক স্থানে প্রাপ্ত ঢাকায় জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত একটি বটুক ভৈরব মূর্তি উল্লেখযোগ্য। এখানে চার হাত বিশিষ্ট বটুক ভৈরব তাঁর নিজের বাম হাতে নরমুণ্ড ধরে আছেন আর উপরের বাম হাতে শোভা পাচ্ছে ত্রিশূল। নরমুণ্ডের মালা পরিহিত প্রতিকৃতিটির ডান দিকের হাতগুলো ভগ্ন। প্রসারিত পেট, বিকট চোখ আর ঠোঁট দুটির ভয়ঙ্কর হাসিময় ভঙ্গি প্রতিমাটির ভয়াবহ রূপকে তুলে ধরেছে। আরো লক্ষণীয় যে, প্রতিকৃতিটিতে নগ্নতা অনুপস্থিত।^{৫২}

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে, আদিমধ্যযুগের বাংলায় শৈব চিন্তার মধ্যে নানা বৈচিত্র্য বিদ্যমান ছিল। তথ্যের অপরিপূর্ণতার কারণে এই সমস্ত ধারণার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া অনেকটাই কষ্টসাধ্য। কাকাতীয় রাজা রুদ্রদেবের ১১৮৩ শতাব্দে উৎকীর্ণ প্রস্তরলিপি^{৫৩} অনুযায়ী চার প্রকার শৈব দার্শনিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানা যায়। এগুলো হল: (১) শৈব, (২) কৌলন্যায়, (৩) শৈব-শাসন বা কাপালিক ও (৪) পাণ্ডপাত। এর মধ্যে পাণ্ডপাত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পুরাণসমূহ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর নিরিখে বলা যায় যে, এই দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহ বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষব্যাপী ব্যাপ্ত হয়েছে। একাদশ-দ্বাদশ শতকে কৃষ্ণ মিশ্র রচিত *প্রবোধচন্দ্রোদয়* নাটকে শৈব ধর্মের বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা থেকে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন যে, উক্ত শৈব সম্প্রদায় সমূহের অস্তিত্ব বাংলায় বিদ্যমান ছিল। কেননা অনেকেই মনে করেন কৃষ্ণ মিশ্র বাংলার অধিবাসী ছিলেন। সমসাময়িক কালের বাঙালি লেখক ক্ষেমেশ্বর রচিত *চণ্ডকৌশিক* নাটকেও বিভিন্ন শৈব সম্প্রদায়ের কার্যকলাপের বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের তৃতীয় অঙ্ক হতে কাপালিকদের সম্বন্ধে জানা যায়। এখানে কাপালিকদেও সাথে জৈন সন্ন্যাসী ও একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর বিতর্কের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। *চণ্ডকৌশিক* নাটকের চতুর্থ অঙ্কে কাপালিকদের

উল্লেখ আছে। এই ধরনের সাহিত্যিক উপাদানসমূহ থেকে বাংলায় কাপালিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

এছাড়া বাংলায় পাশুপাত মতের বিস্তার সম্বন্ধেও তথ্য পাওয়া যায়। শিব-শ্রী কণ্ঠ ও তাঁর শিষ্য লাকুলীশ পাশুপাত শৈবধর্মের প্রবর্তক বলে খ্যাত। আঠারোটি আগম ও ছয়টি যামল বিশেষত: *পিঙ্গলামত যামলে* এই ধর্মের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

এসব গ্রন্থের মতে আর্যাবর্তই শিব সাধনার প্রধান ক্ষেত্র। কামরূপ, কলিঙ্গ, কঙ্কন, কাবেরী, কাশ্মীর ও গৌড়দেশ এই ক্ষেত্রের বাহিরে। গৌড়দেশ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, গৌড়ীয় সাধনগুরুরা আর্যাবর্তের গুরুদের সমকক্ষ নন।^{৭৪} তবে এখান থেকে ধারণা করা যায় যে, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর কালে উত্তর ভারত থেকে পাশুপাত ব্রাহ্মণ গুরুরা ও তাঁদের শিষ্যবর্গ বাংলায় আসেন এবং এদের প্রচেষ্টাতেই বাংলায় পাশুপাতধর্ম বিস্তার লাভ করে। নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে^{৭৫} বাংলায় পাশুপাতধর্ম সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এখান থেকে জানা যায় যে, সহস্র কার্ণকার্য সমন্বিত স্তম্ভে একটি বিশাল শৈব মন্দির স্থাপন করা হয় এবং এই মন্দিরে শৈব পাশুপাত সাধুদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে আরো বলা হয়েছে যে, রাজা নিজে কসলপোত নামক স্থানে মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন এবং উক্ত মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য মুকুতিকা নামক গ্রামটি দান করা হয়েছিল। সুতরাং এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, নারায়ণপাল বৌদ্ধ রাজা হলেও একজন শিবানুরক্ত ব্যক্তি ছিলেন। সর্বোপরি নারায়ণপালের এই রাজকীয় দানপত্রের আদেশে বুদ্ধের পরিবর্তে শৈব মত অনুযায়ী করা হয়েছিল। এখানে ‘ভগবান শিভভট্টারকমুদ্দিশ্য’ হিসেবে রাজা তাঁর নিজের পরিচয় দিয়েছেন। সম্মেলনে আগত পাশুপাত সাধুদের মন্দির সংলগ্ন স্থানে থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নারায়ণপালের এই লিপিতে এই একটি মাত্র পাশুপাত মঠই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে।

চাহমান রাজা বিগ্রহরাজের ১০৩০ খ্রী. উৎকীর্ণ হর্ষ প্রস্তরলেখতে^{৭৬} পাশুপতি শিবের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সামসারিকাকুল নামক প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। সামসারিকাকুল প্রথাকে শৈবধর্মের কৌল চিন্তার সাথে অভিন্ন বলে মনে হয়। কৌল চিন্তা পাশুপাত মত থেকে উদ্ভূত হয়েছে। শাক্ত ও তান্ত্রিক বৌদ্ধ চিন্তার সাথে শৈব মতের মিলনের মধ্যে দিয়ে কৌল ধর্ম বিকশিত হয়েছে। কৌলধর্মের প্রবর্তক হিসেবে মৎসেন্দ্রনাথের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে মৎসেন্দ্রনাথ ও লুইপাদ একই ব্যক্তি বলে মত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং মৎসেন্দ্রনাথ বা লুইপাদ যিনিই কৌলধর্মের গুরু হননা কেন তাঁরা যে বাঙালি ছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সুতরাং এই সমস্ত লেখমালা ও সাহিত্যিক উৎসসমূহ যা একেবারেই অপ্রতুল, এর নিরিখে আমরা প্রাচীন বাংলার শৈব ধর্মের যে চিত্র পাই, তাতে এটা ভালোভাবেই দৃষ্ট হয় যে, শৈব ধর্ম আদি মধ্যযুগের বাংলায় জনপ্রিয় ধর্মমত হিসেবেই প্রচলিত ছিল। শুধু তাই নয় বাংলার স্থানীয় বৈশিষ্ট অনুযায়ী এটি নানা ভাবে বিকশিতও হয়েছিল।

তথ্যনির্দেশ

১ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস* (কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য্যাং পাবলিশার্স প্রা.লি., ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৫৫।

২ J. Marshall, *Mohenjodaro and the Indus Civilization*, Vol. I, (London: Arthur Probsthain, 1931), p. 52-56.

- ৩ M.S Vats, *Excavation at Harappa*, (Bhartiya Publication house, 1974), pp. 129-130.
- ৪ আবদুল আজিজ আল-আমান কর্তৃক প্রকাশিত রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ অবলম্বনে, *ঋগ্বেদ সংহিতা, প্রথম খণ্ড* (কলিকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ২২৯-৩৭৮।
- ৫ www.holybooks.com/wp.../The_yajur-veda-Taiffiriya-sanhita-Taffiriya-sanhida.pdf, *The Yajur Veda* (Taittiriya Sanhita), p. 202.
- ৬ অতুল চন্দ্র সেন, সতীনাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ (সম্পা.), *উপনিষদ*, (কলিকাতা: হরফ প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ৩৭২।
- ৭ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট*, (কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. ২০১৩), পৃ. ১৪৪।
- ৮ তদেব, ১৫৪।
- ৯ R.G Basak, 'The Five Damodarpur Copper-Plate Inscriptions of the Gupta-Period' F.W. Thomas (ed.) *Epigraphia India*, Vol. XV, 1919-20, (Delhi: Archaeological Survey of India, 1982), p. 140.
- ১০ D.C Sircar (ed.), *Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilization*, Vol. I, (Calcutta: University of Calcutta, 1965), pp. 340-345.
- ১১ N.K. Bhattasali, 'The Ghugrahti Copper – Plate Inscription of Samachara-Deva', H. Krishna Sastri & H. Sastri (ed.), *Epigraphia Indica*, Vol. XVIII, 1925-26 (Delhi: Archaeological Survey of India, 1983), pp. 80-81.
- ১২ Thomas Watters, *On Yuang Chwang's Travels in India*, Vol. II, (Delhi: Low price Publication, 2004), p. 116.
- ১৩ N.K Bhattasali, *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*, (Dacca: Dacca Museum, 1929), pp. 203-204.
- ১৪ R.G. Basak, 'Tipperah Copper-Plate Grant of Lokanatha: The 44th year,' F.W. Thomas (ed.), *Epigraphia India*, Vol. XV, 1919-20, *op.cit*, pp. 301-315.
- ১৫ R.C Majumdar (ed.), *History of Bengal*, Vol. I, (Dacca: University of Dacca, 1943), p. 441.
- ১৬ অক্ষয় কুমার মৈত্রয়, *গৌড়লেখমালা*, রাজশাহী: বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৯-৩৩।
- ১৭ তদেব, পৃ. ৫৫-৬৯।
- ১৮ Rama Prasad Chanda, 'Dirajpur Pillar Inscription' *Journal &proceeding of the Asiatic Society of Bengal*, New series, Vol. VII, 1911.(Calcutta: Baptist mission, press, 1915), pp. 615-620.
- ১৯ N.G Majumdar, *Irda Copper-Plate of the Kamboja King Nayapaladeve*, N.P Chakravarti (ed.), *Epigraphia Indica*, Vol. XXII, 1933-34, (Delhi: Manager Publication, 1938), pp. 150-159.
- ২০ N.K Bhattasali, 'The Nimdighi (Manda) stone Inscription', Narandra Nath Low (ed.), *The India Historical Quarterly*, Vol. XVII, (Delhi: Caxton Publication, 1941), pp. 209-216.

- ২১ N.K. Bhattasali, 'The Rajibpur (Bangad) Sadasiva-image Inscription of Gopal III of Bengal', Narendra Nath Low (ed.), *The India Historical Quartely*, Vol. XVII, *op.cit*, pp. 217-222.
- ২২ R.C Majumdar, R.G Basak & N.G Banerji, *Ramacaritam*, (Rajshahi: Varendra Research Museum, 1939), pp. 107-108.
- ২৩ *Ibid*, pp. 77-78.
- ২৪ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭-১৩৭।
- ২৫ N.G Majumdar, *Inscription of Bengal*, Vol. III, (Rajshahi: Varendra Research Society, 1929), pp. 42-56.
- ২৬ *ibid*, pp. 56-67.
- ২৭ *Ibid*, pp. 68-80.
- ২৮ *Ibid*, pp. 92-98.
- ২৯ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান*, (কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪৮৩-৪৯৭।
- ৩০ তদেব, পৃ. ৫০৫।
- ৩১ P.V. Kane, *History of Dharmasastra*, Vol.II, Part II, (Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1941), p. 861.
- ৩২ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, (কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪১১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫১৫।
- ৩৩ Haridas Mitra, 'Sadasiva Worship in Early Bengal', *Journal & Proceedings of Asiatic Society of Bengal*, New series Vol. XXIX, 1933, (Calcutta: Baptist Mission Press, 1934), pp. 193-194.
- ৩৪ *Ibid*, P. 120.
- ৩৫ *Ibid*, P. 212.
- ৩৬ R.C Majumdar (ed.), *op.cit*, P. 440.
- ৩৭ M. Kitto, 'Notes on the Vihars and Chaityas of Behar' *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. XVI, Part-I, 1847, (Calcutta: Baptist Mission Press, 1847), pp. 277-278.
- ৩৮ D.C Sircar, 'Bhaturiya Inscription of Rajyapala', D.C Sircar (ed.), *Epigraphia Indica* Vol. XXXIII, 1959-1960, (Delhi: Manager Publication, 1963), pp. 150-155.
- ৩৯ D.C Sircar 'Fragmentary Inscription of Visvarupa or Visvadya, year 5 of Vighrahapala', D.C Sircar & H.K Narasimhaswami (ed.), *Epigraphia Indica*, Vol. XXXVI, 1965-1966, (Delhi: Manager Publications, 1970), pp. 89-92.
- ৪০ D.C Sircar, 'Inscription of Yakshapala', *Epigraphia Indica*, Vol. XXXVI, 1965-1966, (Delhi: Manager Publications, 1970), pp. 92-94.

- ৪১ Narendra Nath Bhattacharyya, *History of the Sakta Religion*, (Delhi: Munshiram Monoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1974), p. 116.
- ৪২ N.K. Bhattasali, *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculpturs in the Dacca Museum*, *op.cit*, P. 111.
- ৪৩ *Ibid*, P. 112.
- ৪৪ A.B.M Habibullah (ed.), *Nalini Kanta Bhattasali Commemoration Volume*, (Dacca: Dacca Museum, 1966), pp. 144-146.
- ৪৫ D.C Sircar, 'Inscription of Yakshapala', *Epigraphia Indica*, Vol. XXXVI, 1965-1966, *op.cit*, pp. 92-94.
- ৪৬ N.G. Majumdar, *Inscriptions of Bengal*, *op.cit*, pp. 68-80.
- ৪৭ *Ibid*, pp. 106-115.
- ৪৮ *Ibid*, pp. 42-56.
- ৪৯ V.S Pathak, 'Pradyunesvara Matif in the Sena Period', *Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal Letters*, Vol. XXII, 1956, pp. 67-70.
- ৫০ নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৫।
- ৫১ তদেব।
- ৫২ N.K Bhattasali, *Iconography Of Buddhist And Brahmanical Sculpturs In The Dacca Museum*, *op.cit*, p. 134.
- ৫৩ J. Ramayya Pantulu, 'Malkapuram Stone-Pillar Inscription of Rudradeva (Rudramba) Saka Samvat 1183' *Journal of the Andhra Historical Research Society*, Vol. IV, 1929, (Rajahmundry: Andhra Historical Research Society, 1930), pp. 147-162.
- ৫৪ নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৪।
- ৫৫ ধক্ষয়শুমার মৈত্ৰয়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫-৬৯।
- ৫৬ F. Kilhorn, 'Harsa Stone Isncription of the Chahaman Vighararaja' Jas Burgess (ed.), *Epigraphia Indica*, Vol.II, (Delhi: Motilal Banarsidass, 1970), pp. 116-130.

Sunetra Gupta's Fictional Narratives: Language and Style

A F M Maswood Akhter*

Abstract: In her debut novel, *Memories of Rain* as well as in her others, Sunetra Gupta effortlessly intersperses prose with poetry; her writing is complex, fusing stream of sensuous poetic imagery with stream of consciousness. A powerful delivery of interior monologue, figurative language, and continuous time-shifts invites the novelist's comparison with Virginia Woolf. *Memories of Rain*, however, in its lyrical evocation of Calcutta and its haunting memories, in its warped chronology alternating flashbacks and fantasy with the present, its paragraph-stretched sentences conjoined by commas and overflowing grammatical halts, remains to be a less experimental venture than her next fiction, *The Glassblower's Breath* where one encounters unconventional second-person narration, multiple perspectives about the protagonist, re-vision of the idyllic notion of home and a greater relish for the absurd. Moreover, here, as in Gupta's other works, even the quotidian gets imbued with a melancholic mysticism. Gupta's liking for poetic, lyrical and at times oblique titles for her works is evident too. Memory becomes a vital player in many of her novels, be it *Memories of Rain*, *Moonlight into Marzipan* or *So Good in Black*. Giving it the centre stage automatically leads her towards an experimental narrative technique, since memory – a highly subjective and elastic category blending fantasy with the past – keeps intervening in the linear flow of the plot. Interestingly, her stream-of-consciousness technique transforms language and punctuation marks from normative linguistic symbols into poignant emotional tools. By exploring the limits of ambiguity in language, she has evolved a personal literary idiom in which prose is pushed into a territory formerly accessible only to poetry. Gupta's long sentences, some going on for almost a page, are filled with adjectives, descriptions and double metaphors, and they meander through different thought processes, coming to a halt abruptly when she seems to have run out of breath. Curiously again, Gupta defies the need of a "good story" in order to weave a fiction, and the thinness of plot, evident in *A Sin of Colour* for example, is brilliantly obscured by her virtuosity with literary language. The issue of intertextuality is also important, especially in *Memories of Rain* where the influence and

* Professor, Department of English, Rajshahi University, Rajshahi

interplay of diverse texts provide the novel its context and meaning, and shape its narrative and characters.

I consider it pertinent to begin the discussion with how Rabindranath Tagore is integral to the linguistic and stylistic arrangements in Sunetra Gupta's fictional universe. That Tagore had a profound influence on her writing is most evident in her debut novel, *Memories of Rain* (1992) which won her the prestigious Indian Sahitya Akademi Award for 1996: “*Memories of Rain* is very clearly for me a celebration of my culture, and is recklessly adorned with my own personal translations of a number of Tagore songs that are central to my sensibilities.”¹ Here, as occasionally in her others, Gupta effortlessly intersperses prose with poetry, proving herself to be a creative translator of Tagore's songs and poems. An unmistakable Bengalianness pervades this novel, especially the expression of its female protagonist Moni's anguished passion and “dark” thoughts, articulated through Tagore's songs. The writing in *Memories of Rain* is complex, fusing stream of sensuous poetic imagery with streams of consciousness: a powerful delivery of interior monologue, figurative language, and continuous time-shifts invites the novelist's comparison with Virginia Woolf.

The novel itself, as already indicated, is replete with Gupta's own translations of a number of Tagore's songs, sometimes in both prose and poetry – mostly evoking monsoon but also related to love and puja – used to articulate its central emotions. Tagore's songs provide Moni a magnificent and exaggerated metaphor for her own adolescent pain, romanticism and sexuality. The anguish of the poet shapes the desolation and misery of her own charred passion. And finally it is a Tagore song that echoes one of the core themes of the novel – memories as an autonomous healing-space privileged with the sanctity of forgiveness. Tagore's songs resonate through the subtext of *A Sin of Colour* (1999) as well, voicing the unspoken angst and desire of Debendranath and Niharika.

If Tagore's songs are one constant through *Memories of Rain*, the other is a haunting evocation of Calcutta from multiple perspectives – whether it be a glimpse into its cosmopolitan past and present or its nostalgic image as a tired mother betrayed and abused by her own child. Calcutta has been represented from Anthony's superior gaze as well as from Moni's blending of nostalgic imaginings with apparently unbiased vintage footages of the city and its chequered history and geography. Moni's reminiscences create a collage of memories of Calcutta as well as the life and ethos of middle-class Calcuttan Bengalis of the 1970s – struck by both Tagore and communism – and their love for literature, music, theatre, *adda* and intellectualism. This is possibly Gupta's only novel in which she deigns to furnish intricate anthropological footnotes in order to translate her city to a Western audience. Untranslated Bengali words are sparse in *Memories of Rain* except the much familiar Bengali word for an elder brother, “dada” (178) while translated cultural details abound.²

There are exhaustive details about Durga Puja – complete with *anjali* or the offering of flowers to the goddess, and *bhasan*, the procession carrying the idol of the goddess to the river Ganga – and Kali Puja – the festival of fire – about idols, myths and rituals central to both occasions and the tropical festivity tensed with frantic shoppers. Of course, the “exotic” institution of arranged marriage is not left out, nor are some of the rituals of the elaborate Hindu wedding. The text is replete with another cultural trademark – the Bengali intellectualism and vibrant *adda*-culture which was almost metonymic of the urban Bengali youth way back in the 1970s. On the other hand, for Moni as for her brother, London was mapped by literary coordinates. She had fancied roaming with a Heathcliff-like beloved upon English moors. As Moni leaves, she remembers walking “upon the very streets that Dickens, Hardy, Virginia Woolf had trod” (148); the actual geographical points of Tottenham Court Road, Gower Street or University College Hospital become more like a dream. Her emotional geography of London cluttered by Big Ben and literary personae, sites and myths do not correspond to the aloof and uncaring city where she finally feels strangely trapped.

Memories of Rain, in a way, is an elegy for Bengali culture and for the genre of romance. Apparently it is about a middle-class Bengali romantic dream come true – a young sensitive girl married to and carried off across the seven seas by the white prince of her dreams. The novel is a rather anti-romantic sequel to the last line of this fairy-tale – “And they lived happily ever after.” The favourite fantasy translated into reality spells trauma for the girl, since the prince neither cares for nor respects her; the medieval genre of romance and its myth of true love become a weird joke in the context of Moni and her promiscuous husband. Moni’s return is ironically paralleled with Goddess Durga’s mythic annual visit to this earth, her father’s home, which is the occasion of Durga Puja in Bengal; she has accidentally timed her ticket on the eve of the Puja. Her return, however, is laced with bitterness and humiliation and she might not be as welcome back home as Devi Durga is. Debjani Ganguly has noted, “Whilst Moni is apprehensive about the possibility of rejection by her maternal city, her return to Calcutta is nevertheless rendered in mythical terms and enshrined by the ritualistic Durga Puja ceremony, a ceremony which enacts a welcome for the Goddess to her father’s home.”³ The mythic parallel pre-empts a healing possibility of the unconditional acceptance of a daughter come home, in spite of all humiliation and pain. But in the end, she too does manage to transform a traditional tale of woman’s victimhood and retaliation – the myth embodied in Euripides’ *Medea* – into one of agency without bitterness.

Memories become the redemptive gesture in this novel; they create the healing-space where nostalgia and compassion become possible; unfocused and uncensored memories provide Moni with moments of pure rebellion as well. On the eve of her departure, she floods Anthony and Anna with her hysterical “torrent of anecdotes”

(123) based on memories of Calcutta. In the process, she usurps her friends' stories as well, since she wants to reconstruct the Calcutta of the 1970s for these foreigners through a collage of private memoirs. It provides her a cathartic domain where she can fully inhabit her culture without inhibition or embarrassment and flaunt her resistance to integration into the British cultural mainstream. She regales them on that eve with literal translations of Bengali proverbs e.g. "picked snake gourd" meaning "died" or "moon of a moonless night" meaning "someone we do not see very often." Memories of these proverbs or of funny local superstitions – e.g. with the rats' blessing, children could have sharp rodent teeth sprouting once their milk teeth fell (154) – release her from the pain of a long-sustained suppressive elegant silence. Moni has again and again caught Anthony drifting away from her, locked in his own memories. Ironically, memories – personal as well as cultural – bind, as well as set us free; Moni, for example, is freed of her bitterness for Anthony and London by remembering her togetherness with both. Even as she leaves London, she carries the city with her in a series of nostalgic images – "watercress in the window, wild heath pond fringed by luminous rushes, ducks, foul geese among the violent yellow of new daffodils, the woman upon Oxford Street crushing ice cream cones to feed the pigeons" (172). And the novel ends with memory as the only viable idiom connecting Anthony and Moni. It finally becomes the elusive amniotic sap that could salvage the being. As implied in the title, the text builds itself as a self-reflexive house of memories – of persons, moments, cities and a culture – promising thereby both author and reader the *jouissance*, peace and *nest* that had escaped the questers within the novel, Anthony and Moni.

Memories of Rain, however, in its lyrical evocation of Calcutta and its haunting memories, its warped chronology alternating flashbacks and fantasy with the present, its paragraph-stretched sentences conjoined by commas and overflowing grammatical halts, has been a less experimental venture than her next fiction, *The Glassblower's Breath* (1993) where Gupta moves closer to her theorising about home and diaspora, exemplified by the novel's transnational characters seeking the healing-space of home in the very condition of being unhoused. *The Glassblower's Breath* has something of the quality of myth; her narrator, like T. S. Eliot's Tiresias, floats freely through every character's mind. Moreover, here, as in Gupta's other works, even the quotidian gets imbued with a melancholic mysticism. The protagonist does not have a name and is addressed throughout by the second person pronoun "you," maybe because, her identity can never be fully grasped. As in a house full of mirrors, her image is viewed through different perspectives, none of which is satisfactory or permanent. All the dislocations of life are articulated in this novel by multiple male narrators who trace the adventure of the female protagonist; the reader has to reconstruct her personality by stitching together these shards of narration. The possibility of authentic knowledge about the self is lost, as lost as the possibility of returning home.

The Glassblower's Breath, as I have already indicated, has a more unconventional style than *Memories of Rain*: the second-person narration,⁴ multiple perspectives about the protagonist, re-vision of the idyllic notion of home and a greater relish for the absurd. Many of the events in this book border on the surreal, such as Jonathan Sparrow's encounter with an eccentric aesthete who believes he has arrived to assist him in preparing a full alphabetical dinner.

The accent on individual politics and mental adriftness – which was explored through the lens of nostalgia and diaspora in her first two novels – becomes conspicuous in her characteristically lyrical third novel *Moonlight into Marzipan* (1995). This is a story of marriage and betrayal: Promothesh and Esha, dreamy young scientists who were classmates at Calcutta University, find their relationship changing after marriage. The title of this novel once again reveals Gupta's liking for poetic and at times oblique titles for her work; the title here refers to the process of photosynthesis – the means by which light is parcelled into usable energy by plants. Promothesh makes an accidental discovery about this fundamental process which promises fame and riches. Instead, it triggers a chain of events that begins with his arrival in London and ends with his infidelity and Esha's suicide; the astonishing discovery too is forgotten in the process. Into this morass of ambition and self-pity slip love in the form of his biographer Alexandra Vorobyova and the devil himself, in the form of Yuri Sen, also a Bengali researcher. Yuri Sen subverts the narrative by using italics and telling readers that Promothesh is incapable of writing to them. The blasphemous dream of creating paradise on earth and of articulating the secret of life turns into an interminable experience of hell.⁵

Moonlight into Marzipan has no reliable narrator, and from the opening pages, the reader has to struggle in order to locate the central characters and identify the perspectives from which they are viewed. When Alexandra goes away and abandons the text, Promothesh is left only with shreds of his life scribbled down in notes – the results of his long conversation and confessions with the dismissive narrator. The novel takes the form of a dialogue between Promothesh and the absent narrator, playing with the ambiguity and confusion between the subject and the object of narration. Personal pronouns "I" and "you" are peppered into the text in the attempt to reconstruct the trajectory of Promothesh's life, a project that remains unfulfilled in the text. There are constant shifts backward and forward in time and space, leaving the task of re-assembling the fragments of various overlapping and incomplete texts to the reader. In *Moonlight into Marzipan* too, as in the previous novel *The Glassblower's Breath*, characters are not representatives of a particular space or culture, but of human vulnerability, estrangement and appropriation of narration which cut across geographical boundaries and anthropological curiosity. The initial self-consciousness

and the desire to present Bengal are now over. As she tells in a 1996 interview: “My work is more ‘free’ now.”⁶

Gupta’s fourth novel, *A Sin of Colour* is about the choices made by its two protagonists, Debendranath Roy and his niece Niharika, when both are in the last phase of youth, during two different time periods. The narrative sprawls across Oxford and the United States, Calcutta and the rural Bengal, but most of the action takes place in Oxford and Calcutta, the twin geographies close to Gupta. Both characters are victims of unrequited love which colours their lives profoundly, eventually leading them to their sins.⁷ Through seven sections named after seven colours, starting with “Amethyst” and then moving through “Indigo,” “Azure,” “Jade,” “Saffron,” “Ochre” and “Crimson”, Gupta tells the story of three generations of a house in Calcutta called Mandalay. Built by a British officer, it passes into the hands of the wealthy Roy family. The multiple sins, each associated with a colour, are all fuelled by obsessional love and concern the one sin that forms the basis of this book – Debendranath’s retirement from this world; his desire for a life uncluttered by lies by running away from all ties makes the story take a curious turn when a man in his late thirties is last seen entering a punt on the Cherwell in Oxford. When he can no longer be traced, Debendranath Roy is presumed drowned. He leaves behind a pale and languishing widow in Oxford and a mystery that takes twenty years to unfold. It turns out that Debendranath had fled back to India where he had lived incognito; his growing blindness drives him back to the family and to his writer-niece Niharika, who is almost the only family member living in Mandalay.

The thinness of the plot, evident from the above summary of *A Sin of Colour* is also noticeable in Gupta’s first novel *Memories of Rain*, but in both these novels this thinness is brilliantly obscured by Gupta’s virtuosity with literary language. Again, *A Sin of Colour*, too, eludes chronology or the expectations from a linear story; the narrative unfolds like a conversation – picking one thread and jumping back and forth into the past – with repetitions becoming an inviting story-telling tool.

Gupta comes up with her fifth novel, *So Good in Black* (2009) after almost a decade of absence. Here too the characters are transnational and the geographies fluid, with a narrative featuring multiple registers and perspectives of myriad characters. Max Gate, an American travel-writer and his once beloved friend Byron Mallick, a charming and refined Bengali businessman, meet again in extraordinary circumstances on the shores of Bengal. It is the eve of transit of Venus in 2004 – a day astrologically associated with transformation of consciousness. Byron is facing charges of murdering a crusading journalist Damini whose cousin Ela haunts Max years after their affair has ended. Ela is caught between her deep attachment to Byron, her loyalty to her husband and her desperate love for Max. Meanwhile Max’s former brother-in-law, Piers

O'Reilly, is determined to bring Byron to justice. As the intricately layered tale unfolds, all certitudes about love, friendship and morality dissolve into tantalising ambiguity, defying easy resolution. As a critic says, "Sunetra Gupta's latest novel *So Good in Black* is a richly layered narrative of moral and emotional dislocation across time and space, which dissolves all notions of static truths."⁸ In the end, as many of the central characters orbit around the enigmatic Byron Mallick, only the redemptive power of memory seems able to heal the scars of loss and betrayal.

Memory, thus, becomes a vital player in many of her novels, be it *Memories of Rain*, *Moonlight into Marzipan* or *So Good in Black*. Giving it the centre stage, however, could demand an experimental narrative technique, since memory – a highly subjective and elastic category blending fantasy with the past – keeps intervening in the linear flow of the plot. This is particularly so in the novels of Sunetra Gupta in which thin plots are resolved by or revolve around momentous events like deaths, disappearances, drowning and suicides. She even defies the need of a story in order to weave a fiction: "The notion that a good story is crucial to good fiction seems very confining, as if there is a quality control checklist on commodities that works of art must meet."⁹

Importantly, Gupta's stream-of-consciousness technique transforms language and punctuation marks from normative linguistic symbols into poignant emotional tools. By exploring the limits of ambiguity in language, she has evolved a personal literary idiom in which prose is pushed into a territory formerly accessible only to poetry: "There is not enough of a space between poetry and prose and what I do. The novel swallows everything I do."¹⁰ The author discourses on her style and attitude to language and punctuation in several interviews and essays, as well as in a debate between two of her erudite characters, Jonathan Sparrow and "you," in *The Glassblower's Breath*:

He (Sparrow) snorted...Vowels are the essence of unambiguity, which I despise, vowels are the poor props of thin narrative, vowels emaciate the language, as do punctuation marks, paragraphs, and all other instruments of linguistic torture.

Why has man struggled to give definition to language, saddle the infinity between consonants with the cruel measure of vowel, why, when all else has been an obsession with the inconcrete, why chisel language when poetry must remain undefinable...language has been dragged into the arid plain of concrete communication, once poetry was language, when the unspoken chasms between the consonants were replete with dream, as now only the hollows between words and images may be...(132-33)

Gupta's sentence construction deviates from the classical grammatical sentence in English. Her long sentences, some going on for almost a page, are filled with adjectives, descriptions and double metaphors, and they meander through different thought processes, coming to a halt abruptly when she seems to have run out of breath. The dialogues are all without quotes and blend into the general narrative. Examples abound in *Memories of Rain*. Unlike the protagonist Moni in this novel who is a cautious, even reverent, user of the coloniser's tongue, Gupta forges her own variant of English as a signifier of power. As she comments in her essay "Avoiding Ambiguity": "in several post-imperialist cultures ... its very flexibility sometimes permits English to escape the fate of oppressor's language by mutating into a poetic hybrid, as in some examples of post-colonial literature."¹¹

Gupta's English reads like a translation of stylised, even poetic Bengali, in a perhaps unconscious continuum with many other Indian writers in English. Gupta justifies the poetic meandering of language and stylistic innovation by vouching for ambiguity in literature, a passion she shares with her character Sparrow: "In literature, it is often ambiguity itself that enriches our understanding of the human condition. ... Much of the potential energy of literature lies unlocked in the gap between word and referent. This plasticity of meaning is still exploited quite explicitly in poetry... Prose, however, appears these days to come under a different jurisdiction." She further reflects, "I was happily not aware of this when I sat down, more than fifteen years ago to write my first novel – *Memories of Rain*. I had no preconceived desire to play with words or sentence-structure, but what emerged was English that was largely devoid of fullstops, and where clauses often belonged to both its flanking sides ...".¹²

Gupta's reaction to punctuation, according to her own understanding, is "truly visceral," and she "physically abhor[s] the repeated use of the full-stop." She explains, "There is something too final about the full-stop – I am happy to use it judiciously, but mostly I rely on commas to separate interlinked ideas. Conversely, sometimes, the finality of a full-stop is not enough, and I need to employ paragraphs or even blank lines or a row of asterisks to create the correct pause between sections of prose." Gupta finally believes that "*It is natural that a writer's relationship with his punctuation should be emotional.*"¹³

Gupta dislikes the traditional precise sentence with its unambiguity and precision: the sentence, as she maintains in "Avoiding Ambiguity," evolved from the needs of logic and law, but these are not the priorities in fashioning her style. She culls canonical support for emotional revision/s of the conventional usage of punctuation and the sentence:

I am writing a book on contrasting narratives in literature and science, gathering examples of visceral responses to punctuation. Arvind

Krishna Mehrotra says the semicolon A.K. Ramanujan uses in his sentence acts as an osmotic membrane between the two languages and realities he inhabits.... As for my writing, reaching a point in a sentence which would naturally beg a full stop I would feel reluctant, thinking of a comma or dash.

It's about finding a style consistent with how I am feeling. When writing something, I see it as having its own cadence, form, and try and recruit punctuation to create, re-create that.¹⁴

Gupta however insists that she has never consciously adopted a particular style, and it was never part of her project to reject conventional grammar. Importantly, her reluctance to use full stops has to do, among other things, with her Bengali sensibility, as she explains: "Because in Bengali a full stop is represented by a vertical line and that has a more organic relationship with the rest of the letters. In English, this bullet thing is intrusive to my own construction."¹⁵ Bengaliness in Gupta's writing is not a carefully constructed identity that finds reassurance in difference with others but rather a function of her poetic self that is formed out of diverse, often contradictory, influences deriving from place, history and culture. The many references to monsoons and her evocative suggestions of the appeal of the long wet months are also indications of her distinct style.

I seek to wind up the present discussion by raising the issue of intertextuality in Gupta's fiction. Gupta's style, especially her stream of consciousness technique, textual experiments regarding punctuation and sentence-construction and her female protagonists – has earned her repeated comparisons with Virginia Woolf. Gupta herself cites the canon – though of Indian poetry in English – in order to justify her linguistic innovations. Woolf is not the only canonical shadow lurking through *Memories of Rain*; the novel is rather full of intertexts – cinematic and literary – jostling with each other. The canonical link runs deeper: there are at least two classic texts used as metaphor or pre-texts to this novel. One of them has been openly acknowledged – it is a contemporary revision in the Irish context of the Greek tragedy, Euripides' *Medea*.¹⁶ The other has only been subtly owned. It is a classic Bengali text, Maitreyi Devi's *Na Hanyate* about a young Bengali woman who has moulded herself according to Tagore's ideals of womanhood, idolises the poet and has a tumultuous but tragic love-affair with a white student of her father, Mircea Eliade.

Not only does *Memories of Rain* explore the influence of Rabindranath Tagore on the Bengali psyche, but it takes as prequel the text *Na Hanyate*, a more idyllic version of some of the favourite Bengali obsessions – for example, the old manic Anglophilia, the pervasive presence of Tagore being a continuous leitmotif. Both *Memories of Rain* and *Na Hanyate* thus engage with image-clusters vital to the life and

ethos of the middle-class Calcuttan Bengali. If *Medea* and *Na Hanyate* are the two major co-texts of this novel, then innumerable references to intertexts in multiple languages are sprinkled throughout. *Wuthering Heights* has shaped Moni's notion of doomed and passionate, though naively pure, love: "She had loved Heathcliff before she loved any man ... " (*Memories* 177).

Moni's sensibility, influenced greatly by the canon of English literature as represented in the Calcutta University undergraduate syllabus, learns to languish for surrender and death. John Keats is an oft-quoted poet in this novel; his "Ode to Melancholy" frames the dark evening of her first encounter with Anthony in monsoon-ravaged Calcutta. British texts have helped her map the sacred geography of London, the imaginary homeland of many cultured Bengalis' intellectualism and acquired literary taste. That is how Moni could visualise the "chalk cliffs of Shakespeare's demi-paradise" (157) Wessex or Bristol where Rammohan Roy lay buried, long before she had geographically visited these sites. When she was twelve she had fed upon the romanticism of Bankim Chandra Chatterjee's novels deeply influenced by Victorian fiction. As newly-wed Anthony caresses Moni's dark hair in tender ecstasy, she remembers Jibanananda Das's "untranslatable line" from the poem "Banalata Sen": "And her hair is a long-lost night of the ancient kingdom of Bidisha" (159); and as he makes furious love – with his lust for Anna in mind – to her, she can only compare the distant moon to Sukanta Bhattacharya's notoriously anti-romantic image of "charred bread in the eyes of the hungry" (89).

Archetypal myths from the epic *Mahabharata* – e.g. that of Satyabati the ferrywoman who got rid of the strong odour of fish that clung to her since birth and emerged lotus-fragrant from her illicit love with sage Parashar (162) – haunt Moni, as she looks at Anna who is flushed with love for her husband. The estranged couple's emotions are in the end connected through T.S. Eliot's "Marina"; Anthony remembers identical lines from the poem in order to capture the well of emotion within himself when his daughter is born, which Moni ironically does after six years to bask in his imagined pain on losing the child. The sahib is teasingly compared by her brother to one of those disheveled lovelorn alcoholic heroes of Sarat Chandra Chatterjee like Devdas. This further kindles Moni's passion, for she always expected her lover to emerge out of a book. Finally, more than Heathcliff, it was perhaps Tagore's couplet on fated love in his novel *Chaturanga* (*Four Quartets*) that pushed Moni to take the leap, to surrender to Anthony's fevered passion perfumed with potential disaster: "In the dying light of that March day/I saw in your eyes, my doom" (25). Tagore is, literally, the major context and co-text of this novel.

Canonical texts and historical and cultural icons echo in her other novels as well – *Moonlight into Marzipan* is inspired by *Oedipus* and *The Great Gatsby*, *So Good in Black* by historical accounts of the trial of Warren Hastings and *A Sin of Colour* by

Rebecca and the whispered rumour of the incest between Rabindranath Tagore and his sister-in-law. Besides, these texts from Gupta also abound in intertextual references. In *A Sin of Colour*, for example, Niharika's friend and aspiring suitor Rahul stages a Bengali version of the play "The Threepenny Opera" and Daniel Faradey whistles the theme of the play as Niharika finds him waiting for her after a gap of six long years. Again Niharika's mother, the beautiful and aloof Reba plays Medea – "a woman stunned beyond reason by the failure of love" (*Sin* 161). In *The Glassblower's Breath*, too, "you" enjoys reading *Anna Karenina* and remembers her conversation with John Sparrow on Rilke's Duino Elegies.

Gupta's fiction is thus immersed in conversation with the expanse of literature produced in different periods and diverse cultural settings: her extremely literary– even canonical– sensibility is revealed in the centrality and profusion of allusions and references that range from Euripides to Tagore. For a more nuanced understanding of her novels, it is, therefore, important to be aware of the influence and interplay of diverse texts providing the novels their context and meaning, and shaping their narratives and characters. The overwhelming canonical shadows lurking through the texts, their eclectic range of allusions and literary inspirations, need not, however, be construed as any conscious attempt on the part of the author at cultural integration, or at offering any thesis attesting the universality of human experience recorded in literatures irrespective of age and culture; it is rather, while revealing Gupta's extremely literary sensibility, mostly functional instead of theoretical: much of the development of the narrative significantly depends upon their intertextuality, their convergence with and deviation from the shadow of those intertexts.¹⁷

Notes and References:

I have used the following editions of Sunetra Gupta's novels for this writing: *Memories of Rain*. New Delhi: Penguin, 1992; *The Glassblower's Breath*. London: Orion, 1993. *Moonlight into Marzipan*. New Delhi: Penguin, 1995. *A Sin of Colour*. New Delhi: Penguin, 1999; *So Good in Black*. New Delhi: Women Unlimited, 2009. Specific page numbers for quotations from these editions are provided within brackets. Shortened titles of the books have been given with page numbers wherever necessary.

1. Gupta, Sunetra. "Memories of Rain." *Homepage*. 25 May 2009. <<http://www.sunetrugupta/Memories of Rain.asp>>
2. For a detailed discussion on the issue see my article titled "Sunetra Gupta's Memories of Calcutta and Tagore" published in *South Asian Review*. Vol. 32.2 (2011). pp. 85-112.
3. See Ganguly, Debjani. "Of Dreams, Digression and Dislocations: The Surreal Fiction of Sunetra Gupta." *The Postmodern Indian English Novel*. Ed. Vinay Kirpal. Bombay: Allied Publishers, 1996.
4. The referent of *you*, the unnamed female protagonist, remains constant throughout the text, whereas the focalisation changes constantly, either rendering the you-protagonist's point-of-view or the perspectives of the four men enamoured of her. There are also sections of 'ordinary' third-person narrative with internal focalisation on Rima, the niece. See Fludernik, Monika. "Colonial vs. Cosmopolitan Hybridity: A Comparison of Mulk Raj Anand and R K Narayan with Recent British and North American Expatriate

- Writing (Singh-Baldwin, Divakaruni, Sunetra Gupta).” *Hybridity and Post colonialism: Twentieth Century Indian Literature*. Ed. Fludernik. Tübingen, Germany: Stauffenburg, 1998. pp. 261-90. 279.
5. See Ponzanesi, Sandra. “Voyage to Hell: Sunetra Gupta’s *Moonlight into Marzipan*.” *Wasafiri* 26 (Autumn 1997): 73-75.
 6. Gupta. Interview to rediff.com. op.cit.
 7. As the author says, “The sins in the novel – and there are many – are all fuelled by obsessional love or infatuation.” See “A Sin of Colour.” *Homepage*. <<http://www.sunetrugupta.com/asinofcolour.asp>>.
 8. Gupta, Sunetra. “Of Lost Moorings.” Interview with Chitra Padmanabhan. *The Hindu Online* 5 Apr 2009. 20 May 2009. <<http://www.thehindu.com/mag/2009/04/05/stories/2009040550030200.htm>>
 9. Ibid.
 10. Gupta, Sunetra. “The Elements of Style.” Interview with Kim Nagy. 20 May 2009. <[http://www.sunetrugupta.com/reviews and interviews. asp](http://www.sunetrugupta.com/reviews_and_interviews.asp)>.
 11. Gupta, Sunetra. “Avoiding Ambiguity.” 13 Apr. 2009. <<http://www.sunetrugupta.com/essays2.asp>>.
 12. Ibid.
 13. Gupta, Sunetra. “Essays: lecture delivered in Melbourne in 2005.” 13 Apr. 2009. <[http://www. sunetrugupta.com/essays/the relation between language and thought.htm](http://www.sunetrugupta.com/essays/the_relation_between_language_and_thought.htm)>. Italics mine.
 14. Gupta. Interview with Chitra Padmanabhan. op.cit.
 15. Gupta. Interview with Kim Nagy. op.cit.
 16. Gupta. “*Memories of Rain*.” *Homepage*. op.cit.
 17. For a detailed discussion on the importance and implications of intertextuality in Sunetra Gupta’s fiction see my article titled “Texts within Text: The Shaping of Sunetra Gupta’s *Memories of Rain*” published in *Asiatic* (Humanities). Vol. 60.1 (2015). pp. 17-34.

ওঁরাও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা : একটি সাধারণ পর্যালোচনা

ড. পি. এম. সফিকুল ইসলাম*

Summary: Among all the tribal / ethnic people living in North Bengal the Oraon are one of the most important. They live in various districts of North Bengal and West Bengal. Not much work is done regarding the language of the Oraon. Two types of common languages are spoken by Oraon tribe – “Kurukh” and “Sadri”. “Kurukh” and “Sadri” languages have no alphabet. A general analysis has been attempted here regarding the language of the Oraon.

ওঁরাও নৃগোষ্ঠী এদেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মতো রক্ষণশীল। তাদের সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আছে। আছে নিজস্ব ভাষা। কথিত আছে ওঁরাওরা ভারতের ছোট নাগপুর থেকে বঙ্গদেশে অঞ্চলে এসেছিল।

গোত্র প্রথা ওঁরাওদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত্তি। ওঁরাওদের গোত্রগুলো পশুপাখি, মাছ, শাক-সবজি, ফল ইত্যাদির নামকরণে করা হয়।

গোত্রের পদবী :

	গোত্রের পদবী	IPA	অর্থ
১.	লাকড়া	lakRa	বাঘ
২.	তিগ্যা	tigæ	বানর
৩.	তিরী	tirki	ছোট হাঁস/পাখি
৪.	বাকুলা	bakula	বক
৫.	গেড়ে	geRe	হাঁস
৬.	খাঁখা	khakha	কাক
৭.	কেরকেটা	kerketa	একধরনের ধূসর পাখি
৮.	টপ্য বালাং টপ্য	Toppo/ balang Toppo	লম্বা লেজ বিশিষ্ট পাখি
৯.	মিন্জি	minji	মাছ
১০.	বাকলা	bakla	একধরনের ঘাস
১১.	কুজুর	kujur	ফল/লতা
১২.	পান্না	panna	লোহা

* প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১৩.	এককা	ekka	কচ্ছপ
১৪.	খালখো	khalkho	একধরনের মাছ
১৫.	ধানোয়ার	dhanoar	ধান
১৬.	বেক	bek	লবণ
১৭.	খেশ	khes	রক্ত/ধান
১৮.	লিঙ্গুরার	lindurar	মাছ
১৯.	কিন্দো	kindo	ধানের গুড়া
২০.	কিসপট্টা	kispotra	নাড়ীভূড়ি

ওঁরাও নৃগোষ্ঠীর মধ্যে দু'ধরনের ভাষা প্রচলিত আছে। যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। যথা

(ক) কুডুখ - KuRukh

(খ) সাদরী - Sadri

উত্তরাঞ্চলে 'কুডুখ' ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে পাশাপাশি সাদরিও আছে। তবে রাজশাহী ও সিলেট জেলায় সাদরির আধিপত্য বেশি। তবে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে এসব অঞ্চলেও 'কুডুখ' ভাষার প্রচলন পাওয়া যায়।

'কুডুখ' ভাষার সাথে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার সাদৃশ্য আছে। সাদরির সাথে উর্দু, পার্সী, হিন্দী, বাংলার মিশ্রণ আছে। সমগ্র উত্তরবঙ্গে কুডুখ ভাষা এক ও অভিন্ন নয়। অনেক ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য আছে। বর্তমান প্রবন্ধে রাজশাহীর গোদাগাড়ী অঞ্চলের সাদরি এবং রংপুর জেলার কুডুখ ভাষার পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ধ্বনিতাত্ত্বিক পর্যালোচনা-

মূলস্বর:	বাংলা	সাদরী	কুডুখ
এ	এই, সেই	এহে, সেহে ehe, sehe	এনু ennu
আ	খাই	খাখো/খাথি khakho, khathi	অনা/মোখনা ona/mokhna
ও	দই	দাহী dahi	দাহী dahi

বাংলার অনুরূপ সকল স্বরধ্বনি ওঁরাওদের ভাষায় থাকতে পারে। উল্লিখিত উদাহরণ প্রমাণ করে ওঁরাওদের ভাষায় কমবেশি মূলস্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয়।

দ্বি স্বরধ্বনি (Diphthong)

বাংলা	কুডুখ
ঐ	ঐ-লাগুন (অর্থাৎ এর জন্য)

কোনো কোনো সময় দ্বি-স্বরধ্বনির প্রয়োজন হয়।

আনুনাগিক স্বরধ্বনি :-

উংলা	সাদরি	কুডুখ
কুড়ি	ছুড়ি/বিশ chuRi/bis	বিশ bis
কুঁড়ি	মুকুল/কুঁড়ি mukul/ kuRi	পুপ pup
ধোয়া	ফিচেক/ধই phicek/dhoi	নোরনা norna
ধোঁয়া	ধুগা dhuga	ধুঙ্গা dhunga

ওঁরাও ভাষায় আনুনাগিক স্বর কোথাও আছে, কোথাও নেই।

সকল স্বরধ্বনির প্রয়োগ

স্বরধ্বনি	সাদরি	কুডুখ	বাংলা
ই	ইন্দরা indora	ইন্দিরা indira	কুয়া
এ	এইহে eihe	বারায় barai	এসো
এ্যা	এ্যা æ	এন্দেরা endera	কি
আ	আমরা amra	টটখা TaTKha	আম
অ	অহে Ohe	নিঙ্গান ningan	তাকে
ও	ওবশ Obos	চুপে রাহা cuperaha	নড়াচড়াহীন
উ	উকার ukar	আসগে asoge	ওর

রূপমূলের ব্যবহার

বাংলা	সাদরি	কুডুখ
ছাগলটা	ছাগরিটা chagrita	এ্যরাটা æraTa
মেয়েটি	ছুরিঠো chuRiTho	কুকোইটি kukoiti
মানুষেরা	আবদিনমেনে abdinmene	আলারমানে alarmane

প্রত্যয় সংযুক্তি

দ্বিতীয়া	সাদরি	কুডুখ
আমাকে	হামকে hamke	এ্যাংগাগো ængago
আমাদেরকে	হামনিকে hamnike	এমাগে emage
ও (সে)	সেহে sehe	আস aso

অপিনিহিতি :-

উত্তরাঞ্চলের উপভাষায় পূর্ণ অপিনিহিতি নেই। আছে অর্ধ-অপিনিহিতি। ওঁরাও ভাষায় এর তুলনা করার চেষ্টা করা হলো।

বাংলা	সাদ্রি	কুডুখ
ধ'র্যা	ধারিন/ঠেরকে dharin/Therke	ধারণা dharona
মার্যা	মেরকে/মারহিন/ডেরাহিন merke/marhin/derahin	লা-আই/কেরাই la-ai/korai
লিয়্যা	লেইকে/লিহিন leike/lihin	হোহুনা hohuna

প্রত্যয় সংযুক্তি অবশিষ্ট অংশ

বাংলা	সাদ্রি	কুডুখ
ও (সে)	সেহে sehe	আস aso
উই (তিনি)	সেহে sehe	আস aso
তুমি	তোয় toi	নিম nim
তোমরা	তুহনি Tuhni	নিম nim

একবচন			বহুবচন		
বাংলা	সাদ্রি	কুডুখ	বাংলা	সাদ্রি	কুডুখ
আমি	হাম ham	এন en	আমরা amra	হামনি hamni	এম em
তুমি	তোয় Toi	নিম nin	তোমরা tomra	তুহনি Tuhni	নিম nim

	কর্তা	কর্ম	করণ	অপাদান	সম্বন্ধ
	আমি	আমাকে	আমাকে দিয়ে	আমার থেকে	আমার
সাদ্রি	হাম ham	হামকে hamke	হামকে দেইকে hamke deike	হামারসে hamarse	হামার hamar
কুডুখ	এন en	এনগাগো engago	এ, হা তারকে e, ha, tarke	এমহা emha গুসলেক guslek	এম em

	কর্তা	কর্ম	করণ	অপাদান
	তুমি	তোমাকে	তোমাকে দিয়ে	তোমার থেকে
সাদরি	তোয় toi	তোকে toke	তোকে দেইকে toke deike	তোর-সে tor-se
কুডুখ	নিম nim	নিমগাগো nimgago	নিংহাতারকে ninhaTarke	নিংহা গুসলেক nitha guslek

বাক্য

বাংলা	সাদরি	কুডুখ
আমি বলি	হাম কাহনা/কাহিলা ham kahona/kahila	এনবাদান enbadan
তুমি বল	তয় কাহিন/কাহিসা toi kahin / kahisa	নিন বাদায় nin baday
আমি বলেছিলাম	হাম কেইরেহি ham keirehi	এন বাচকারকোন en backarkon
তুমি বলেছিলে	তোয় কেইরেহে/কেইরিহিন toi keirehe / keirihin	নিন বাচকারাকোয় nin backarackoi
আমি বলবো	হাম কাহাবো ham kahabo	এন বা-অন en / on
তুমি বলবে	তয় কাহাবে toi kahabe	নিম বা-আয় nim/ai

বাংলা	সাদরি	কুডুখ
ওকে দিয়ে	উকে দেইকে uke deike	আস তারকে as tarke
ওদেরকে দিয়ে	উমেনকে দেইকে umenke deike	আর তারকি ar tarki
থেকে	থিনাসে Thinasé	গুসলেক guslek
বনে	বাগাননে baganne	জাগালনু Jagalnu
তোকে দ্বারা	তোকে দেইকে toke deike	নিওহা তারকে nioha tarke
আমি	হাম ham	এন en
তুমি	তোয় toi	নিন nin
আমরা	হামনি hamni	এম em

বিভক্তি চিহ্নের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার সাথে ওঁরাও ভাষার সাদৃশ্য আছে।

ওঁরাওদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রূপমূল শব্দ সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো।

(১) রঙের নাম :

বাংলা	সাদ্ রী	কুডুখ
সাদা	চারকা carka	পানড্রু pandru
কালো	কের-ইয়া ker-ia	মোখারো mokharo
লাল	লাল lal	লাল lal
হলুদ	হেরদা herda	বালকা রাঙেগ balka range

২. গৃহস্থালী সামগ্রী :

বাংলা রূপমূল	সাদ্ রী	কুডুখ
ভাতের হাড়ি	ভাত হের ইয়া bhat heria	মানন্ড্রি কট্টু manondri Katru
কড়াই	কড়হেই Karhe	কারহাই Karhai
চামচ	কালছুর Kalchur	চামুচ Camuc
ঝাঁকা	ডালি dali	চাঙরি cangri
কুলা	সুপ sup	কেতের keter
কুঠি	চালকের ঘর caloker ghar	চালকি এরপা calki erpa
চালমাপার জিনিস	কাঠা - kaTha	পয়া- poya
বটি-	বটি- boTI	বাইঠি- baiThi
গামলা	ডোগরা Dogra	গামলা gamla
থালী	থেরয়া / থেরিয়া thera/ theria	থারিয়া tharia

৩. গাছপালার নাম :

বাংলা শব্দ	সাদ্ রী	কুডুখ
আম গাছ	আমবা গাছ amba gach	টাটখা মান্নে TaTTkha manne
জাম গাছ	জামুন গাছ Jamun gach	জাম্বু মান্নে Jambu manne
কাঁঠাল গাছ	কাঁঠার গাছ kaThar gach	গাঠরা মান্নে gaThra manne
পেয়ারা গাছ-	টারমাস গাছ Tarmash gach	টারমাসমান্নে Tarmach manne
বরই গাছ	বের গাছ ber gach	পান মান্নে pan manne
লেবু গাছ	লেম্বো গাছ Lembo gach	লিবু মান্নেরন libu manneran
তাল গাছ	তার গাছ tar gach	তাঁড় মান্নে taR manne
খৈজুর গাছ	খিজুর গাছ KhiJur gach	কিদা মান্নে Kida manne
তেঁতুল গাছ	তেঁতের গাছ teter gach	তিতালী মান্নে titali manne
কদম গাছ	কাদাম গাছ Kadam gach	কাদম গাছ Kadom gach
আমড়া গাছ	আমড়ো গাছ amRo gach	আমড়া গাছ amRa gach
ডালিম গাছ	ডালিম গাছ dalim gach	ডালিম গাছ dalim gach

৪. ক্ষেত ফসলের নাম :

বাংলা	সাদ্ রী	কুডুখ
ধান	ধান dhan	খেস্সে kesshe
গম	গহম gohom	গোহম gohom
ছোলা	বুট bu:.T	ছোলা chola
সরিষা	সোরষা Sorşa	মানি mani
আলু	আলু alu	আলুয়া alua
কলাই	কালেই kalei	দালী dali
পটল	পটল poTol	পটল poTol
করলা	করলা Karla	কালী Kala
সিম	সিমি Simi	সিমবী Simbi
বেগুন	বাগুন bagun	বাইগোন baigon
মরিচ	মেরচা merca	মারচা marca

৫. ফুলফলের নাম :

বাংলা	সাদ্রী	কুড়ুখ
কদম	কাদাম kadam	কাদম kadam
গাঁদা ফুল	গেন্দা ফুল genda phul	গোদা পুপ geda pup
নিম ফুল	নিম ফুল nim phul	নিম পুপ nim pup
আম	আমবা amba	টাটখা TaTkha
জাম	জামুন Jamun	জাম্বু Jambu
কাঁঠাল	কাঠার kaThar	গাটরা gaTra
লিচু	লিচু licu	লিচু licu
পেয়ারা	টারমাস Tarmas	টামরাস Tamras
জবাফুল	জবা ফুল Jaba phul	জবা পুপ Jaba pup

৬. বিভিন্ন পশুপাখির নাম :

বাংলা	সাদ্রী	কুড়ুখ
শুকর	শুয়ের suer	কিস্সি Kissi
গরু	গারু garu	আড়ো aRo
ছাগল	ছাগরি chagri	এড়া- era
পাঁতিহাঁস	বাকাত baKat	গেরে gere
মুরগী	মুরগী murgi	খের kher
কবুতর	কাবুতাব kabutab	কাবিতার kabitar
শিয়াল	শিয়ার- siar	চিগলা cigla
রাজহাঁস	হাঁস- has	রাজহাঁস raJhas
বিড়াল	বিলেই bilei	বেরখা berkha

৭. বিভিন্ন জন্তু জানোয়ার :

বাংলা	সাদরী	কুড়ুখ
কচ্ছপ	কোছুয়া Kochua	কাছুয়া Kachua
সাপ	সাপ sap	নেররে nerre
খরগোস	খরগোস khargos	খেরহা kherha
বাঘ	বাঘ bagh	লাকড়া LakRa
হাতি	হাতি haTi	হাথি haThi
বাদর	বানদারা bandara	বাদরা badra
ভালুক	ভালুক bhaluk	ভালুক bhaluk

৮. সংখ্যাবাচক শব্দ :

বাংলা	সাদরী	কুড়ুখ
এক	একঠো ekTho	অনটে onTe
দুই	দুঠো duTho	দুইটা duiTa
তিন	তিনঠো tinTho	তিনটা tinTa
চার	চারঠো chaTTho	চারটে carTe
পাঁচ	পাঁচঠো pacTho	পাঁচটে pacTe
ছয়	ছাইঠো chauTho	ছয়টে choiTe
সাত	সাতঠো SaoTho	সাতটে SatTe
আট	আটঠো aTTho	আটটে aTTe
নয়	নাইঠো nauTho	নয়টে noiTe
দশ	দশঠো dosTho	দশটে dosTe

৯. ওঁরাও ভাষার বিভিন্ন দিক :

বাংলা	সাদরী	কুড়ুখ
পূর্ব	পূর্বে Purbe	পূর্বে Purbe
পশ্চিম	পাছমে Pachme	পাঁচমে Pachme
উত্তর	উত্তরে uttore	উতরে utore
দক্ষিণ	দাখনে dakhne	দাক্ষিণে dakhine

১০. সময়বাচক শব্দ :

বাংলা	সাদ্রী	কুডুখ
সকাল	বিহান bihan	পাইরী pairi
দুপুর	দুপরা dupra	দুফার duphar
সন্ধ্যা	সানঝ sanjh	পুতবারি putbari
রাত	রাতি rati	মাখা makha

১১. কালবাচক শব্দ :

বাংলা	সাদ্রী	কুডুখ
গ্রীষ্মকাল	খরাকাল Kharakal	গারাম সময় garam somay
বর্ষাকাল	বার্ষাকাল barsakal	বারষা barsa
শরৎকাল	শরৎকাল saratkal	শরৎকাল sorotkal
হেমন্তকাল	হেমন্তকাল hemontokal	পুনাখেশে punakhese
শীতকাল	ঠান্ডাকাল Thandakal	পাইয়া paia
বসন্তকাল	বসন্তকাল basontokal	পুপপয়দান সামায় puppuidan samay

১২. বারের নাম :

বাংলা	সাদ্রী	কুডুখ
রবিবার	রোববার robbar	এতোয়ার etoar
সোমবার	সমবার sombar	সোমবার Sombar
মঙ্গলবার	মঙ্গলবার mangolbar	মাংগার mangar
বুধবার	বুদবার budbar	বদ্ধু baddhu
বৃহস্পতিবার	বিসুদবার basudbar	বিসতবার bisotbar
শুক্রবার	শুকুরবার sukurbar	শুকুরবার sukrubar
শনিবার	শানিবার Sanibar	শানচার sancar

১২. ওঁরাও সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। এখানে কয়েকটি প্রবাদবাক্য তুলে ধরা হলো। (সাদরী ভাষা)

১. উ বিটি / মিয়াছুয়াকে কাপার উচচা হয়।

u biti / miachuake kapar ucca hæi

অর্থ : মিয়া / বিটি ছুয়াটা বাগড়াহি হিকে।

mia / biTi chuaTa bagRahi hike

ভাবার্থ : ঐ মহিলার কপাল উচু আছে।

অর্থ : মহিলাটি বাগড়াটে।

১. ছুটুকু মাছার নাদীকের স্রোত আটকায়না।

ChuTku machar nadiker srot aTKayna.

অর্থ : দুর্বল আবাদিনও বাড়কা কাম করে পারায়না।

durbol abadino baRKa Kam Kare parayna.

ভাবার্থ : ছোট মাছও নদীর স্রোত আটকায়

অর্থ : দুর্বল মানুষও বড় কাজ করতে পারে।

৩. উ নাওয়া ঘর বানা হয়

U naoa ghar bana hay

অর্থ : উমর গেলাক

u mar gelak

ভাবার্থ : সে নতুন ঘর বানিয়েছে।

অর্থ : সে মারা গেছে।

৪. সুরের কান খালিন হয়।

Suer kan Khalin hai.

অর্থ : বারবার বলার পরে যে কথা শুনে না।

গান

সাদরী ভাষায় :-

১. কাহা সিরজালে রে মায়না

Kaha sirJale re mayna

kahe ubJale

২. রোহিতাস পাটেনামে সিরজালে রে মায়না

নাগপুরাণে খতা ডিসালে আড় পাড়াল

নাগপুরানে জানাম তোররে ।

rohitas patename sirJale re mayna
nagpurane khata disale aR PaRal
nagpurane Janam torre .

৩. ঘণ্টা কুমারী ঝুমুর বাজালে
সাজে গুতনি জাগালে
সাতে গুতনি দেখালারে

ghanta khumari Jhumar baJale
saJe gutni Jagale
SaTe guTni dekhallere.

কুড়ুখ ভাষায় গান :-

১. এসান নিন জান্মার্কী মায়না ওড়া
আউর এসান বারিচকী

esan nin garmarki mayna oRa
aur esan baricki

২. রোহিতায় গাড়নু জান্মার্কী মায়না ওড়া
নাগপুরনু খতা কামাকুনা বি টিড্ডিকি
নাগপুরনু জানাম হুচকী নিন ।

rohitay gaRnu Janmarki mayna oRa
nagpurnu Kh ta Kamakuna bi Tiddki
nagpurnu Janam hucki nin

৩. ঘাণ্টা রুনু খার খালাগি
সাতো গুগনিগার এজরার
সাতো গুতনিগার এরিয়ার নিমান ।

ghanta runu Jhunu Khar Khalagi
SaTo gutnigar ejrar
sato gutnigar eriar niman

বাংলা অনুবাদ :

১. কোথায় তোমার জন্ম হয়েছে রে ময়না পাখি
কোথায় এসে পড়েছো ।

২. রোহিতাস পাটনায় জন্ম তোমাররে ময়নাপাখি
নাগপুরে বাসা তৈরি করে ডিম পেড়েছো
নাগপুরের জন্ম হয়েছে রে তোমার ।

৩. ঘণ্টার রান্না বুনু বাজিয়েছো
সাত জাকে জাগিয়েছো
সাত জাকে দেখিয়েছো রে তোমরা ।

সৃষ্টির কাহিনী

অনেক অনেক আগে সৃষ্টিকর্তা সূর্য, চাঁদ, তারা আর পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সময় পৃথিবীতে গাছ-গাছালি, জীবজন্তু কোনো কিছু ছিলনা। সব জায়গায় শুধু পানি আর পানি ছিল। এখন ঈশ্বর গাছ গাছালি পানির মাছ, কাঁকড়া, আর দুনিয়ার জীবজন্তু সৃষ্টি করলেন। তারপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করবেন বলে ভাবলেন। সৃষ্টিকর্তা একটি পুরুষ ও একটি নারীর মূর্তি বানিয়ে রোদে শুকাতে দিলেন। শুকানোর পর তিনি পুরুষের মূর্তিতে প্রাণ দিলেন। তারপর নারীর মূর্তিতে প্রাণ দিলেন। এইভাবে পৃথিবীতে দু'জন মানুষ সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টিকর্তা ঠিক বয়সে তাদের বিয়ে দিলেন। আর ওদের মধ্যে থেকেই পৃথিবীতে অনেক মানুষ হলো।

(ওঁরাও জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি নিয়ে প্রচলিত লোককাহিনী)

সাদরী ভাষায় :

Sirganoken Kahani

Mela mela din age bhagoan dharmes, surjo, cand, binko ar dunia banainahai, sehe samai takhna duniame gach-gachari, jib janoar konoh ni Rahay Sob pakhe sudhu pani ar pani rahay. Takhna bh goan gach-gachari Paniker mach khakRo ri duniaker jib janoar banalei. Sekar porer bh goan abdin manua banak Katha hablie. bh goan ekTho beTa chua ar ekTho mia chuaker murti banayke rodome sukhaile delak. Tarp r biti chuarker murtine jiu delak. ebhabe duniade ekjoR abdin sirjalei. bh goan Thik samayne umenher biha delak. Ar umenker Thina sei pare duniame mela abdin h lay.

কুঁড়ুখ ভাষায়-

dher ulla age dharmes biRi, cando, linko, aun dharti kamcaracas, abaki dhartinu mannemas, enderahu maraca. hurmi gusan khali amme aur amme raca. abaki dharmes manne-mas. ammenta injo aur dhartinta hurmin kamcas. abaki as baas alarin kamos. dharmes khajjehi enta metas hi aur nta mukkahhi putli kamcas aur biRonanu khajjge cicas. Khayka poroas metas hi putlinu jia cicas. idihip r mukkahhi putlinu jia cicas. ennem dhartinu njoRa alarin kamcas. dharmes samai mot arin binjius aur ar guslekunam dhartinu mela alar manjar.

বর্তমান কাজে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী যথাক্রমে লিও লাকড়া ও গোলাপী তেরেজা খাঁখাঁ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রসহায়তা করেছে। লিও লাকড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম. এ. শ্রেণির ছাত্র এবং রংপুরের পীরগঞ্জে বাড়ী, গোলাপী খাঁখাঁ অনার্স চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী এবং রাজশাহীর গোদাগাড়ীর বাসিন্দা। কাজটি ওঁরাও ভাষার একটি সাধারণ পর্যালোচনা। বাংলা ভাষার সাথে ওঁরাও ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। ওঁরাও ভাষা নিয়ে আরও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৫
২. হুমায়ন আজাদ, *বাংলা ভাষা*, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৫
৩. পি.এম. সফিকুল ইসলাম, *রাজশাহীর উপভাষা*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২
৪. মালেক খোকন, *আদিবাসী জীবন গাঁথা*, প্রথম প্রকাশ, ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪
৫. রনজিত দেব, *উত্তরবঙ্গের উপজাতির ইতিবৃত্ত*, প্রথম প্রকাশ, মেইন স্ট্রিম পাবলিকেশন, ঢাকা ২০১৪
৬. রনজিত সিংহ, *বাংলাদেশের পনিপুরী ভাষা ও সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, একুশে বইমেলা, ঢাকা, ২০১৮
৭. চারুচন্দ্র সান্যাল, *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী*, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ডিসেম্বর, কলকাতা, ২০১৭
৮. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী জীবন ও লোকসাহিত্য : ওঁরাও*, প্রথম প্রকাশ, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১৯৯৯
৯. George Grierson, *A Linguistic Survey of India*, Vol. III, Reprint, Delhi, 1968

জিয়া হায়দারের নাটকে গ্রুপ থিয়েটার প্রসঙ্গ

সাদ্দাম হুসাইন*

Abstract: Zia Haider was a devoted activist of the group Theater movement of Bangladesh. He was the founder president of the 'Nagorik Natyasampradaya' of Dhaka, the founder president of 'Bangladesh Institute of Theater Arts' (BETA) in Chittagong and the director of 'University Theater' of Chittagong University. However, it is true that, through the establishment of a 'Nagorik Natyasampradaya', he hastened the movement of the group theater of this country and tried to reconcile this movement with the West. Four of his basic plays and translated plays were staged as a group theater. However, the 'group theater' is not available in other plays except his *Elebele* play. That is, the first and only play *Elebele* in the drama of Bangladesh, on the subject 'group theater'. Through the writing of the play *Elebele*, he lost the 'Director Mean's Dictator' style and won the group theater. That is, the main point of the article discussed.

জিয়া হায়দার (১৯৩৬-২০০৮) বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের অগ্রগণ্য নাট্যকারদের মধ্যে গণ্য একজন নাট্যকার। এই পরিচয়ের পাশাপাশি তাঁর আরও কৃতিত্ব এই যে, তিনি কবি, নাট্য-অনুবাদক, নাট্যনির্দেশক, প্রযোজনা-অধিকর্তা, নাট্যপ্রবন্ধকার, সংগঠক ও শিক্ষক। আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্ট-ওয়েস্ট সেন্টার থেকে নাট্যকলা বিষয়ে তিনিই দেশের প্রথম এম. এফ. এ। এছাড়া তিনি নাট্যকলা বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা নিয়েছেন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক; বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাজ্য শেক্সপিয়ার থিয়েটার; গোয়েটে ইন্সটিটিউট ফেলোপি (জার্মানি) থেকে। ফলে তিনি প্রত্যক্ষ পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে দেশীয় নাটক রচনায় একনিষ্ঠতার পরিচয় প্রদান করেছেন। সৃজনশীল চিন্তাচেতনা ও মননধর্মী নাট্যপ্রয়াসে জিয়া হায়দারের রয়েছে ভিন্নমাত্রিক দক্ষতা। নাট্যতত্ত্বের জটিল গ্রন্থি-উন্মোচন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে তিনি ছিলেন নিরীক্ষাধর্মী ও আধুনিকমনস্ক। তিনি নাটকের ক্ষেত্রে নির্দেশকের ভূমিকা, অভিনয় ক্ষমতা, সংলাপের মৌলিকত্ব ও ভাষাগঠনে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গির যে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, তা বাংলাদেশের নাটকে ভিন্নতার আভাস। তাঁর প্রকাশিত মৌলিক নাটক ৪টি— *গুড্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* (১৯৭০), *এলেবেলে* (১৯৭৮), *সাদা গোলাপে আঙুন* (১৯৮২), *পঙ্কজ বিভাস* (১৯৮২)। এছাড়া *চৌর্যপদ* (২০০৬) নামে আরেকটা নাটিকাও রয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধ ইউরোপের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনে যেমন প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি বিপর্যয় বয়ে আনে সাংস্কৃতিক জগতেও। এই বিপর্যয়ের অন্যতম ভয়াবহ শিকার জার্মানিতে মহাযুদ্ধের পরপরই নতুন রাজনৈতিক চিন্তা ও মার্কসবাদের প্রসার ঘটে। ফলে রাজনৈতিক সচেতন নাট্যকর্মীরা পুরোনো নাট্যধারা অস্বীকার করেন। কারণ, গতানুগতিক নাট্যকর্ম তথা 'কমার্শিয়াল থিয়েটার' রাজনৈতিক কিংবা শৈল্পিক কোনো

* এম. ফিল. গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

দিক দিয়েই তেমন সচেতনতা সৃষ্টি করতে, আন্দোলিত বা আলোড়িত করতে পারে না। এজন্য তাঁরা গতানুগতিক নাট্যকর্মকে বর্জনীয় বলে রায় দেন। সংগঠিত হয় শ্রমিক নাট্যদল। মার্কিন মুলুকেও তার অভিঘাত দেখা দেয়। ফলে ১৯২৯ সালে নিউইয়র্কে হ্যারল্ড ক্লারম্যান, চেরিল ক্রুফোর্ড, লি স্ট্রীসবার্গ প্রমুখ তরুণ নাট্যকর্মী ‘গ্রুপ থিয়েটার’ নাম দিয়ে একটি নাট্যদল গঠন করেন।^১ এঁরা একত্রিত হয়ে ১৯২৯ সালে *রেড রাস্ট* নাটক প্রযোজনা করেন। এরপর এখানে ক্রমান্বয়ে *রোর চায়না* (তেত্রিয়াকভ) *হাউজ অফ কনোলি* (পল গ্রিন) ইত্যাদি নাটক প্রযোজিত হয়। এরপর ১৯৩৫ সালে ক্রিফোর্ড ওডেটস্-এর লেখা *ওয়েটিং ফর লেফটি* নাটক প্রযোজনা করার পর বামপন্থী মতাদর্শাবলম্বী হিসেবে দলটি পরিচিতি লাভ করে।^২ সম্ভবত এঁদেরই অনুসরণে ১৯৩৩ সালে লন্ডনের থিয়েটারপাড়াতেও প্রতিষ্ঠিত হয় আরেকটি ‘গ্রুপ থিয়েটার’, এবং এরই ডেউ এসে লাগে ভারতের নাট্যজগতে। কারণ, বিশ শতকের চল্লিশের দশক ভারতবর্ষ তথা অখণ্ড-বাংলার আন্দোলিত সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্নিবর্ষণে এ দশকের সূচনা। বিশ্বযুদ্ধকালীন ১৯৪২ সালের ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন প্রতিরোধে ব্রিটিশ শাসকদের বর্বরতম অত্যাচার, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়নের বীভৎসতা, শাসক গোষ্ঠীর খাদ্য সংগ্রহের নীতি, মজুতদার ও কালোবাজারিদের সীমাহীন অর্থতৃষ্ণা, মুদাস্ফীতি ইত্যাদির প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ১৯৪৩ সালের দেশব্যাপী মন্বন্তর ও লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ইত্যাদি এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, যার বাস্তব ধাক্কা লেগে পুরাতন নাট্যচর্চার আদর্শ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বাস্তবের তাড়নায় বাংলা নাটকে এসে যায় নতুন যুগ, নতুন মানুষ। দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার মানুষ থেকে শুরু করে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে গ্রামীণ কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ শ্রমজীবী নারী-পুরুষ ও তাদের হাজারও সমস্যা, বিড়ম্বনা, দুঃখ, বেদনা, হতাশা, সংঘবদ্ধ আন্দোলন, সংগ্রাম, বিক্ষোভ, আশা-আকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠে নাটকের বিষয়বস্তু। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটক তার পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, নৃত্যগীত ও দার্শনিক ঐতিহ্য থেকে সরে আসে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন ও কৃষক-শ্রমিক সাধারণ মানুষের সংসারে। নাটকে এসে যায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ও বঞ্চনার কথা।^৩ ‘বিশ্ব নাটকের বিচিত্র শ্রোতের সন্ধান আমরা পেয়ে যাই। মানুষের ভেতরের অন্ধ অলিগলি, ধর্মবর্ণভেদ অস্বীকার করে পূর্ণাঙ্গ সত্যে এক বাস্তবরূপই পরিগ্রহ হতে শুরু করে নাটকে। নাটকের চরিত্র পাণ্টে যায়। সংলাপ নতুনরূপে ক্রিয়া সৃষ্টি করে।’^৪ মার্কসীয় দর্শনের বৈপ্লবিক চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্যবাদী চেতনার প্রসারে সক্রিয় হয়ে ওঠে ‘ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ’ (১৯৪৩)। এ সঙ্ঘের নাট্য-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এ-দশকে বাংলা নাটকের নতুন ধারাটির সূত্রপাত।^৫ এ গণনাট্য সঙ্ঘই হয়ে ওঠে বাংলার বঞ্চিত, শোষিত, নির্যাতিত ও মানবিক আশ্রয়হীন মানুষের মুক্তির নাট্যমন্দির। এ নাট্যমন্দিরে পৌরহিত্য করেন বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮), শঙ্খ মিত্র (১৯১৫-১৯৯৭), উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩)। শুরু হয় ‘নবনাট্য আন্দোলন’। এই নবনাট্য আন্দোলন-ই অখণ্ড-বাংলার প্রথম গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল নাট্যোৎসাহী ছাত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত *ড্রামাসার্কল* এই গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনেরই একটি রূপ। এই দলটি স্থানীয় নাট্যকলায় আধুনিক পাশ্চাত্য কলা-কৌশল প্রবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। *ড্রামাসার্কল* তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক স্যুভেনিরে উল্লেখ করেন :

আমরা বিশ্বাস করি মঞ্চ মায়ায় জগতে দৃশ্য পরিকল্পনায়, দৃশ্যপট প্রস্তুতিতে, শব্দসঙ্গীত আর আলোক প্রক্ষেপণে এবং সর্বোপরি সমন্বিত, সুসংহত মঞ্চ উপস্থাপনায় অর্থাৎ সৃষ্টিধর্মী কর্মের সমস্ত শাখায় সকলের সংবদ্ধ অংশগ্রহণের সম্ভব এই উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানো—

The theatre arts is a mimesis granda combination and synthesis of elements of all forms of arts... of the arts of letters of the auditory and the Visual. It appeals directly or indirectly both to the senses as well as the intellect. The art theatre is susch a grand mimesis aunique rorm of art.⁶

ড্রামাসার্কল প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় এর গুরুত্ব সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্যটি প্রাধান্যযোগ্য :

সাংস্কৃতিক আকাশে ড্রামা সার্কল লাটাইবিহীন ঘুড়ি উড়ায়নি। এই ‘কি এমন হলো’ ড্রামা সার্কলের পথিকৃতির ভূমিকা ও সুকৃতি, যার পথ বেয়ে বা সূত্র ধরে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের আজকের নাট্যচর্চা ও গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন; নাটকে পদ্ধতিগত প্রয়োগরীতি ও প্রকাশভঙ্গি। নাট্যমঞ্চায়নে প্রথম গোষ্ঠী চেতনা এদেশে প্রথম নিয়ে আসে ড্রামা সার্কল।^৭

ড্রামা সার্কলের নেতৃত্বে ছিলেন সৈয়দ মকসুদুস সালেহীন, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান, তৌফিক আজিজ খান, বজলুল করিম প্রমুখ। ড্রামা সার্কলের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয় কবর, মানচিত্র, কেউ কিছু বলতে পারে না, রক্তকরবী, বহিপীর, কালবেলা প্রভৃতি নাটক। ১৯৬৮ সালে জিয়া হায়দার ও আতাউর রহমানের উদ্যোগে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ‘নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়’ এদেশের নাট্য-আন্দোলনের ‘গোষ্ঠী চেতনার’-ই একটি বিকশিত রূপ। যার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন জিয়া হায়দার। মূলত ষাটের দশকেই বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন তার প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নেয়, যার বিকশিত রূপ প্রত্যক্ষীভূত হয় সত্তরের দশকে।^৮

নাট্যকার জিয়া হায়দারের মৌলিক চারটি নাটক ও রূপান্তরিত নাটকগুলো গ্রুপ থিয়েটার হিসেবেই মঞ্চায়িত হয়েছে। তবে, ‘গ্রুপ থিয়েটার’ বিষয়টি তাঁর এলেবেলে নাটক ছাড়া অন্য নাটকে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ‘গ্রুপ থিয়েটার’ বিষয়কেন্দ্রিক বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র নাটক এলেবেলে। নাটকটির রচনাকাল মে-জুন ১৯৭৫। এ বছরের অক্টোবর মাসে ‘দৈনিক সংবাদ’-এর সাহিত্য সাময়িকীতে নাটকটি প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রামের ‘থিয়েটার ৭৩’ এটি প্রথম মঞ্চে আনে ১৯৭৭-এর মে মাসে।^৯ মঞ্চায়নকালে নাট্যকার নাটকটির কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ন করেন। এরপর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক ঢাকায় আয়োজিত ১৯৭৮-এর জাতীয় নাট্য উৎসবে থিয়েটার ৭৩ নাটকটি মঞ্চস্থ করে ১৫-ই জানুয়ারি রবিবারে। অবশেষে নাটকটি ১৯৮১ সালের মে মাসে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়। নাটকটির শুরুতেই নাট্যকার ‘নাট্যকারের কথা’ অংশে বলেছেন :

ইমপ্রোভাইজেশনের ওপর ভিত্তি করেই এলেবেলে নাটকটির নিরীক্ষা। কাহিনী বা প্লট বলতে যা বোঝায় তার গুরুত্ব এতে খুব বেশি নেই। এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের ষাটের দশকে রেস্টুরেন্ট থিয়েটারের যে প্রচলন ঘটেছিলো এলেবেলের উপস্থাপনায় তারও আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

ইমপ্রোভাইজেশনে সাধারণত একটিমাত্র পরিস্থিতি অথবা কাহিনীক্রম (সিনারিও) দেয়া হয়; কুশিলবরা নিজ দক্ষতায় ও উপস্থিত বুদ্ধিমত্তায় তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, নাটকীয় পরিণতি দান করে। তবে, এখানে অতিরিক্ত একটি পদ্ধতি নেয়া হয়েছে, নিরীক্ষার অপর দিক-নির্দেশক গ্র্যাকশন বলে যাবে, কুশিলবরা তার নির্দেশই অনুসরণ করবে। কেননা ‘ডিরেকটর মানেই ডিক্টেটর’। বলা বাহুল্য, নাট্য সম্পর্কিত এই নীতি নাট্য প্রয়োজনায় অপরিহার্য; কিন্তু এ নাটকে সেই নীতির অনুসরণে একটি বক্তব্যও এসে গেছে : অযোগ্য ব্যক্তির অবিবেচনাপ্রসূত ডিক্টেটরশীপ পরিণামে বিপর্যায়ই এনে দেয়।^{১০}

এখানে নাট্যকার ইমপ্রোভাইজেশনের কথা বলেছেন। কারণ, ‘নাট্যচর্চায় ‘ইমপ্রোভাইজেশন’ অন্যতম আবশ্যিক অঙ্গরূপে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত।’ নাট্যকার জিয়া হায়দার এলেবেলে নাটকটিতে ‘রেস্টুরেন্ট থিয়েটার’র ধারণাকে আশ্রয় করেছেন এবং ‘ইমপ্রোভাইজেশন’ তত্ত্বটিকে ব্যবহার করেছেন। পাশ্চাত্যের ষাটের দশকের দিকে রেস্টুরেন্ট থিয়েটারের চর্চা শুরু হয়েছিল। ব্যবসায়িক প্রসার লাভের উদ্দেশ্যে রেস্টুরেন্ট মালিকরা এই আয়োজনটি করতেন যেন অতিথিরা তাদের সময়টিকে উপভোগ্য করে তুলতে পারেন। তবে তিনি তাঁর এই নাটকে ‘রেস্টুরেন্ট থিয়েটার’ এবং ‘ইমপ্রোভাইজেশন’ তত্ত্ব ব্যবহার করলেও তিনি ‘ডিরেকটর মানে ডিক্টেটর’

এবং ‘অযোগ্য ব্যক্তির ডিক্টেটরশিপ পরিণামে বিপর্যায় এনে দেয়’- এ দুটি কথাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। জিয়া হায়দারের এ দুটি কথার সাথেই ডিরেক্টর বা নির্দেশকের কথা রয়েছে। এখন আমরা নাট্য প্রয়োজনায় নির্দেশকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করছি।

নাট্যপ্রয়োজনায় নাট্যকারের পরে নির্দেশকের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। ‘নাট্যকারের পাণ্ডুলিপিটি বক্তব্য ও আঙ্গিকের উপাদান দিয়ে মালা গাঁথার মতো সুতোয় গেঁথে দর্শকদের সামনে শিল্পিত ও হৃদয়গ্রাহী করে যিনি উপস্থাপন করেন তিনি হলেন নাটকের নির্দেশক। এক কথায় নাট্যপ্রয়োগে তিনি কর্ণধর।’^{১১} আর এই কর্ণধর নির্দেশকই নাট্যকারের নাটকের পাণ্ডুলিপিটি হৃদয়ঙ্গম করেন, প্রয়োজনবোধে নিজস্ব ব্যাখ্যায় এবং প্রয়োগ কৌশলে দর্শককে একটি সফল মঞ্চনাটক উপহার দেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩)‘র *টিনের তলোয়ার* (১৯৭৩) নাটকের কথা। নাটকটি উৎপল দত্তের নিজের পরিচালনায় ১২-ই আগস্ট, ১৯৭১ সালে ‘পিপলস্ লিটল থিয়েটার’র প্রয়োজনায় কলকাতা শহরে, রবীন্দ্রসদন মঞ্চের প্রথম অভিনীত হয়। ১৯৭১ সালে অভিনীত নাটকটি যদি কোনো নির্দেশক আজকে ২০১৯ সালে মঞ্চস্থ করতে চান, তাহলে তিনি নিশ্চয় উৎপল দত্তের সেই *টিনের তলোয়ার* নাটকটিকে ছবছ তুলে ধরবেন না- বরং তিনি নাটকটি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করে নিজস্ব ব্যাখ্যায় আমাদের আজকের ২০১৯ সালের উপযোগী করে মঞ্চস্থ করবেন। দর্শকও বুঝতে পারবে যে, এ তাদের চোখে দেখা কোনো ঘটনা, এবং তারই বিরুদ্ধে প্রবল-প্রতিবাদ। এভাবে নির্দেশক নাটকের বক্তব্যকে নতুন ব্যাখ্যায় ও আলোকে সমন্বয় সাধন করে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেন। এক্ষেত্রে সফল ও রসোত্তীর্ণ প্রয়োজনার কৃতিত্ব নির্দেশকের ভাগ্যে জুটে যায়। তবে অসফল প্রয়োজনার দায়িত্বও তাঁকে বহন করতে হয়।

আমরা যে নির্দেশকের কথা বলছি- বলতে গেলে সব দেশের নাট্যাঙ্গনে সে নির্দেশক বা পরিচালকের উদ্ভব হয়েছে ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এই সময়ের মধ্যে এমন একটি থিয়েটারের জন্ম হলো যার সর্বময় অধিকর্তা হলেন নির্দেশক।^{১২}

আমরা জানি যে, প্রাচীন গ্রিসে শস্য, সুরা আর উর্বরতার দেবতা ডায়োনিসিয়া উৎসবে নাটক প্রদর্শিত হতো। তবে সে সময় অভিনেতার সংখ্যা ছিল সীমিত। কোরাসদল ছিল প্রথমে পঞ্চাশ জনের। আমরা প্রথম যে গ্রিস নাট্যকারের নাম পাই তিনি হলেন থেসপিস (খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক)। তাঁর সময় অভিনেতা ছিল একজন মাত্র। কোরাসদল এবং একক অভিনেতা নিয়ে পরিবেশিত হয়েছিল তাঁর নাটক। পঞ্চাশ শতকে এস্কাইলাস (খ্রিস্টপূর্ব ৫২৪/৫২৫-৪৫৬/৪৫৫)‘র অবিস্মরণীয় প্রতিভার স্পর্শে গ্রিক নাটক কালজয়ী শিল্পকলায় রূপান্তরিত হতে থাকে। কারণ, তিনি কোরাসের সংখ্যা কমিয়ে নিয়ে এলেন বারোতে, আর অভিনেতার সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়ে করলেন দুজন। এরপর অমর নাট্যকার সফোক্লিস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৯৭/৪৯৬-৪০৬/৪০৫) কোরাসের সংখ্যা একটু বাড়িয়ে করলেন পনেরো, আর অভিনেতার সংখ্যাতে যোগ করলেন আরো একজন, অর্থাৎ অভিনেতা হলো তিনজন।^{১৩} এরপর ইউরিপিডিস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০-৪০৬) নাটকে ছন্দের পরিবর্তন করেন, আয়তন বৃদ্ধি করেন, রঙ্গরসের বর্জন করে গাভীর্য নিয়ে আসেন। ‘সোফোক্লিস এবং ইউরিপিডিস চরিত্রের সংখ্যা দুই থেকে বাড়িয়ে তিন ও তার বেশি করেন। তবে একসঙ্গে তিনটির বেশি চরিত্রের উপস্থিতি বিশেষ দেখা যায় না।’^{১৪} তবে তখনকার নাটকে ‘নাট্যকার নাটক মঞ্চায়ন ও প্রয়োজনার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ নিতেন। বস্তুতপক্ষে তিনিই নাটকের জন্য সঙ্গীত রচনা করতেন, মঞ্চ-নির্দেশক হিসেবে কাজ করতেন, অভিনেতাদের তালিম দিতেন এবং প্রায়ই নিজেও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। কোরাসকে বাদ দিয়ে প্রায় কোনো নাটকেই তিনজনের বেশি অভিনেতা থাকতো না। তেমন প্রয়োজন পড়লে একজন অভিনেতা একাধিক ভূমিকায় অভিনয় করতেন। আর

স্ত্রী চরিত্রেও পুরুষই অভিনয় করতেন, কোনো নারী নয়। যেমনটি ছিলো বহু পরের শেক্সপীয়রের যুগেও।^{১৫} পরে উইলিয়াম শেক্সপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬) যখন নাটক রচনা করেন, তখন থেকে নাট্যপ্রযোজনায় নির্দেশকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এরপর হেনরিক ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬), স্টানিস্লাভস্কি (১৮৬৩-১৯৩৮) ও বার্টল্ট ব্রেখ্ট (১৮৯৮-১৯৫৬)র সময়ে নির্দেশকের ভূমিকা আরো বেশি গুরুত্ব পায়। ‘অবশ্য নাট্যকলায় সমৃদ্ধ প্রাচীন গ্রীক যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগসমূহে বিভিন্ন দেশে নাট্যদলগুলোতে একজন কর্তাব্যক্তি থাকতেন যাকে প্রযোজনার দায়িত্ব নিতে হতো। নাটক যখন দলগত ও যৌথ শিল্পকর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পেল তখন থেকেই একজন কর্তাব্যক্তির প্রয়োজন অনুভূত হলো। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিচিতি ছিল তাঁর; যেমন, অধিকারী, মধ্যস্থাত্মক ইত্যাদি। আসলে নাট্য নির্দেশককে তখন সুপার স্টেজম্যানেজার মনে করা হতো।’^{১৬}

নাট্যকার নাটক রচনা করে তাঁর কাজ শেষ করেন— সাহিত্য সৃষ্টিতেই তাঁর কাজের সমাপ্তি। তারপর চলমান ও দৃশ্যমান থিয়েটারের অঙ্গনে পদার্পণ করেন নির্দেশক, যিনি এই প্রয়োগশিল্পের জগতে দলনায়ক এবং এক অগ্রগণ্য সৃজনশীল ব্যক্তি। বিখ্যাত ইংরেজ অভিনেতা ম্যানেজার হেনরি আরভিং (১৮৩৮-১৯০৫) এই প্রসঙ্গে অনেকটা দৃষ্টান্ত বলেছিলেন— ‘নাট্যকারের চাইতে থিয়েটার বড়, কোনো ব্যক্তি বিশেষের মাউথপিসের তুলনায় এর পরিণতি অনেক গভীর ও ব্যাপক এবং সবশেষে নাটক থিয়েটারের জন্যে এবং থিয়েটার নাটকের জন্যে নয়।’^{১৭} একজন সত্যিকার নাট্য নির্দেশক এই উক্তিটির মর্ম বুঝতে পারবেন, এবং একজন নাট্য-নির্দেশকের দৃষ্টিকোণ থেকে আরভিং-এর উক্তি মোটেই দাম্ভিক ছিল না। নির্দেশকের কর্তব্য ও ভূমিকা সম্পর্কে নাট্য প্রাবন্ধিক লি-সম্পসন তাঁর *দি স্টেজ ইজ সেট* বইয়ে লিখেছেন যে, একজন ভালো নাট্য-নির্দেশককে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সম্পূর্ণ নাট্যনুষ্ঠানটি আগে থেকেই দেখতে হবে এবং প্রতিটি বিযুক্ত মুহূর্তগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে এক সুতোয় গাঁথতে হবে। এই অভিমত শুধু স্টানিস্লাভস্কি বা আঁতোয়ারই নয়— আরো অনেকের। অবশ্য বের্টল্ট ব্রেখ্ট এ বিষয়ে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর মতে এই দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ চেতনায় নাটকীয় শৃঙ্খলা অসম্ভব। তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতেন, যন্ত্রণায় কাতর শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সবারই একটি সাধারণ মাউথপিস থাকতে পারে না। ব্রেখ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, যতই বলা হোক না কেন ‘শিল্প নিরপেক্ষ’, কার্যক্ষেত্রে— শিল্প ক্ষমতাসীন প্রশাসনিক যন্ত্রের হাতের কর্কশ বীণা। এ-উপলব্ধিস্বরূপ তিনি তাঁর ‘এপিক থিয়েটার’-এ উদ্ভাবন করেছিলেন ‘alienation effect’— যাতে করে স্থবির চেতনা আঘাতে আঘাতে বুঝতে পারে যে, এ সমাজ গতিময় ও পরিবর্তনশীল।^{১৮} ‘এতকাল নাটক ও নাট্যকলাকে সাধারণ দর্শক-পাঠক থেকে শুরু করে নাট্যপ্রযোজক নাট্যকর্মী নাট্যতত্ত্ববিদ প্রমুখ যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে এসেছেন ব্রেখ্টের দৃষ্টিকোণ তা থেকে স্বতন্ত্র।’^{১৯} স্টানিস্লাভস্কির সঙ্গে ব্রেখ্টের পার্থক্য, ‘The aim of Stanislavsky was to make audiences forget that they were in a theatre. That of Brecht was to remind them by every possible means.’^{২০} ব্রেখ্ট আধুনিক থিয়েটারকে এপিক বা মহাকাব্যিক থিয়েটার রূপে দেখেছেন, নাটকীয় থিয়েটার রূপে নয়। যার কারণে তিনি নির্দেশক সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

ব্রিটিশ নাট্য-সমালোচক ও লেখক আইভর ব্রাউন (১৮৯১-১৯৭৪) তাঁর *Parties of the Play* (১৯২৮) গ্রন্থে নির্দেশকের কর্তব্য সম্পর্কে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন। তাঁর মতে নির্দেশকের অবশ্যই সহজাত অভিনয় ক্ষমতা থাকতে হবে। মঞ্চ প্রায়োগিক অসুবিধাগুলো তাঁকে যথার্থভাবে বুঝতে হবে। নির্দেশকের তার চেয়েও বড় কাজ হলো, নাট্যকার যে মূল বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তার দ্বারা প্রভাবিত না-হয়ে নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ নাটকটিকে বিচার করা। শব্দকে দৃশ্যমান এবং কল্পনাকে পরিবেশের বাস্তবতায় আবদ্ধ করাটাও নির্দেশকের কাজ। এককথায় বস্তু ও মননের সমন্বয় ঘটিয়ে নির্দেশক এক সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মে

নিয়োজিত হন, যেখানে তাঁর মূলধন হলো নিজের বোধশক্তি, অন্যের ধারণক্ষম যোগ্যতা এবং সর্বোপরি নাট্যশালার কারিগরি সুযোগ-সুবিধা। হেলেন গ্রিক চিরায় তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ *দ্য ইমারজেন্স অব দ্য ডাইরেক্টর*-এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, নির্দেশক হলেন এমন একক এক সৃজনশীল ব্যক্তি যে তাঁর সামগ্রিক অভিজ্ঞতার নিরিখে উপস্থিত বাস্তব অবস্থাসমূহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে থিয়েটারকে তার চূড়ান্ত সত্যনিষ্ঠ আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হন। ফাইলিস হার্টনোল (১৯০৬-১৯৯৭) তাঁর *The Oxford Companion to the Theater* (১৯৬৭) গ্রন্থে লিখেছেন যে, একজন আদর্শ নাট্যনির্দেশককে একাধারে অভিনেতা, অঙ্কন শিল্পী, স্থপতি, বৈদ্যুতিক কারিগর, ভূগোল ও ইতিহাসে পণ্ডিত, সুদক্ষ পোশাক ও দৃশ্যসজ্জা পরিকল্পনাকারী হতে হবে এবং সর্বোপরি তাঁর মানব চরিত্র বোঝার অসাধারণ ক্ষমতা থাকতে হবে।^{২১}

হেরল্ড ক্লারম্যানে (১৯০১-১৯৮০) তাঁর অভিমত হলো, যখন একজন নাট্য-নির্দেশক নাটকের কোনো দৃশ্যের কার্যক্রম আবিষ্কার করেন, তখন তাঁর কাছে মানবিক দ্বন্দ্বের প্রকাশটাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত, কেবল বিশুদ্ধ সংলাপ উচ্চারণ নয়। সম্ভাব্যত সে কারণেই বলা হয়, ‘বধির দর্শকই অভিনয়কলার প্রকৃত বিচারক’, কারণ, তার কাছে নাটকের সংলাপ গৌণ এবং দৃশ্যমান ঘটনাপ্রবাহ মুখ্য। ক্লারম্যান আরও মনে করেন, নাটকের সংলাপ জাগতিক ত্রিাকর্মের বিশ্বজনীন ভাষা নয়, সুতরাং সংলাপের সৃষ্ট প্রকাশ সুন্দর বাচনভঙ্গিতেই নিহিত নয়, সংলাপ সার্থকতা খুঁজে পায় নির্ভেজাল নাটকীয় সঙ্কল্পের মাধ্যমেই। নাট্যঙ্গনের চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নাট্য-নির্দেশনা সম্পর্কে প্রতিনিধিত্বমূলক বক্তব্য করেছেন :

জন-মেস-ব্রাউন বলেছেন, ‘নির্দেশক হলেন একজন সক্রিয় সমালোচক’। সুবিখ্যাত নাট্য-নির্দেশক টায়রন গাথরির অভিমত হলো, ‘নির্দেশক হলেন একজন আংশিক শিল্পী যিনি একদল শিল্পীর পৌরোহিত্য করেন এবং সেই শিল্পীরা কেউ ছেলে মানুষ, কেউবা উচ্ছৃঙ্খল, আবার কেউ কেউ মুহূর্তের ব্যবধানে উত্তেজিত, উদ্দীপিত বা নির্বাপিত।’ রুশ নির্দেশক ম্যেয়ারহোল্ড মনে করেন— ‘নির্দেশক, দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেন যেখানে দর্শক শুধু উচ্চারিত শব্দমালাই শ্রবণ করেন না বরং অন্তর্নিহিত ভাবটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।’ বিশিষ্ট ফরাসি নির্দেশক লুইজুভে নির্দেশকের দায়িত্ব সম্পর্ক বলেছেন, ‘নির্দেশককে এমন একটি ভূমি তৈরি করতে হয় যেখানে মঞ্চের প্রত্যেক ও মিলনায়তনের পরোক্ষ অভিনেতাদের (দর্শকদের) আত্মিক সাক্ষাৎ সম্ভব’।^{২২}

এবার বিভিন্ন নির্দেশকের মহড়ার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যিক। বেটল্ট ব্রেখ্ট মহড়া চলাকালীন সময়ে তাঁর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ওপর নির্ভর করে বসে থাকতেন আর বিশ্বাস করতেন যে, অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই তাঁকে তাঁর নিজের লেখা নাটকের অর্থউদ্ধারের পথপ্রদর্শন করবে। নির্দেশক ইউজিন ভক্তানগভ তাঁর শিল্পী কুশলীদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে বসতেন এবং সবাই মিলে নাটকের একটি সাধারণ ব্যাখ্যা ও অর্থে উপনীত হবার চেষ্টা করতেন। এইভাবে বিভিন্ন নির্দেশক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কর্তব্য সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। স্টানিস্লাভস্কি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বলতেন, ‘তুমি যে মঞ্চ দাঁড়িয়ে আছ একথা তোমাকে অবশ্যই ভুলে যেতে হবে’।^{২৩} টায়রন গাথরি বলেন, ‘সব ভুলে যাও, অবশ্য মঞ্চ তোমার নিজের কর্তব্য ছাড়া’।^{২৪} ম্যেয়ারহোল্ড অভিনেতা অভিনেত্রীকে বলতেন যে তাঁকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তিনি দর্শকদেরই একজন। তবে নির্দেশক সম্পর্কে ফরাসি অভিনেতা ও নির্দেশক লুই জুভেরের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবুও তাঁর বক্তব্যটির উদ্ধৃতি দেওয়া আবশ্যিক। কারণ, বক্তব্যটি মঞ্চনাটক নির্দেশনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্দেশকদের অনেকেই এই বক্তব্যের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। লুই জুভের বিষয়টি এভাবে উপস্থাপন করেছেন :

একটি রিহাসাল রুম, একজন লোক চোখ, কান এবং সমস্ত শাযুকে সজাগ রেখে, উত্তেজনায় কঠিন হয়ে একাধিক রিহাসাল দেখছেন। কখনও তিনি পরিতৃপ্তিতে হাসছেন, কখনও ভুরু কুঁচকাচ্ছেন, কখনও উত্তেজনায় পায়চারি করছেন, আবার কখনও-বা শ্রবণ-ইন্দ্রিয়কে কষ্ট দিয়ে ভুল উচ্চারণের সংলাপ শুনছেন এবং সর্বোপরি ভ্রান্ত ব্যাখ্যার অভিনয় দর্শন করছেন। বুঝতেই পারছেন এই লোকটি কে? ইনিই নাটকের নির্দেশক। এ লোকটিকে বলা যেতে পারে চেতনার উদ্যানপাল, ছিন্ন গ্রন্থির ধাত্রী, পরিবেশের মুচি, কথার রাঁধুনি, আত্মার গোমস্তা, থিয়েটারের সম্রাট এবং মঞ্চের ভূত্য, ভেলকিবাজ ও জাদুকর, ধাতুপরীক্ষক এবং জনতার কষ্টিপাথর, কূটনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, পরিসেবিকা, বাদ্যকর দলের অধিনায়ক, ব্যাখ্যাদাতা, চিত্রশিল্পী এবং পরিচ্ছদ প্রস্তুতকারক- এমনি শত শত সংজ্ঞায় তাঁকে ভূষিত করা যায় কিন্তু সবগুলোই অর্থহীন; নির্দেশকের কোনো সংজ্ঞা থাকতে পারে না, কারণ তাঁর কর্তব্য ও বৃত্তি সংজ্ঞাতীত এটাই হলো মোদ্দা কথা।^{২৫}

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা সচরাচর দু'ধরনের নির্দেশকের সাক্ষাৎ লাভ করি। প্রথম ধরনের নির্দেশকের কাছে নাটকই প্রথম ও প্রধান এবং দ্বিতীয় ধরনের নির্দেশক স্বয়ং নিজেকেই প্রথম ও প্রধান বলে মনে করেন এবং সে ক্ষেত্রে নাটক তাঁর কাছে যাত্রারঞ্জনর খড়িচিহ্ন মাত্র। এই ধরনের নির্দেশকের পতন প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। জিয়া হায়দার তাঁর *এলেবেলে* নাটকে এই দ্বিতীয় ধরনের নির্দেশকের কথাই বলেছেন ব্যঙ্গের সাথে এবং তার পতনও দেখিয়েছেন চমৎকারভাবে।

জিয়া হায়দার মূলত গ্রুপ থিয়েটারের লোক ছিলেন। গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর অভিমত :

থিয়েটার বিষয়টিই একাধিক ব্যক্তির সম্মিলিত কর্মফল, অর্থাৎ থিয়েটারকর্ম মাত্রই একটি গ্রুপের কর্ম।... নাট্য ইতিহাসের বিবর্তনে, বিশেষভাবে এই বিশ শতকে এতো দ্রুত যে সব drama genre-এর বিকাশ ঘটেছে ও ঘটছে তার পেছনে একমাত্র কারণ 'গ্রুপ থিয়েটারের' নীতি অনুসারে পাওয়া নাট্যকারের স্বাধীনতা। ... 'গ্রুপ থিয়েটারের' কর্মরীতির প্রতি লক্ষ্য করলে এটা দেখা যাবে যে, এর সমস্ত কর্মই যৌথভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে।^{২৬}

আমরা জানি যে, জিয়া হায়দার 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়' ও 'বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটার আর্ট (বিটা)'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইউনিভার্সিটি থিয়েটার'র পরিচালক ছিলেন। ফলে তিনি 'ডিরেক্টর মানে ডিক্টেটর' নীতিকে সম্ভবত খুব একটা ভালোভাবে নিতে পারেন নি। বরং তিনি গ্রুপ থিয়েটারের ব্যাপারে ছিলেন বেশি আগ্রহী। কারণ গ্রুপ থিয়েটারে সবার মতামত বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভালো কিছু নেওয়া হয়। যেমন : একজন একটা আইডিয়া দিল, একজন একটা সংলাপ দিল, এবং ডিরেক্টর সেটা নিজে ভালো বলে বিবেচনা করতে চাইলে গ্রুপের অন্যান্য সদস্যের মতামত গ্রহণ করবেন, আর খারাপ বলে বিবেচনা করলেও অন্যদের মতামতের ভিত্তিতেই বর্জন করবেন। এভাবে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে গ্রুপ থিয়েটার দর্শকদের ভালো কিছু উপহার দেয়। তবে সেখানেও ডিরেক্টরের ভূমিকা থাকে সবচেয়ে বেশি এবং গ্রুপের অন্যান্য সদস্য ডিরেক্টরের সিদ্ধান্তকে ভালোভাবে গ্রহণ করেন। নাটকে কী বিষয় উপস্থাপিত হবে- সেটা গ্রুপের সকল সদস্যই জানতে পারে। এ ক্ষেত্রে মঞ্চ হলো অভিনেতা-অভিনেত্রীর, কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীসমেত মঞ্চ হলো ডিরেক্টরের। আর 'ডিরেক্টর মানে ডিক্টেটরশিপ' নীতিতে ডিরেক্টরই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। এখানে ডিরেক্টর যা বলবেন, তা অভিনয়ের সাথে জড়িত সকল সদস্য মানতে বাধ্য থাকবে। ফলে এমনও ঘটনা ঘটে, নাটকে কী হচ্ছে- সেটা ডিরেক্টরই ভালো জানে, কিন্তু অন্যান্যরা জানেই না যে তারা আসলে কী করছে! এবং এ ক্ষেত্রে ডিরেক্টর যদি করতালি পাবার যোগ্য হন, তাহলে তিনিই পাবেন; আর গালি পাবার যোগ্য হলেও তিনিই পাবেন। নাট্যকার জিয়া হায়দার আলোচ্য *এলেবেলে* নাটকে মাত্র দুটি সংলাপের মাধ্যমে এই দুই ধরনের নীতির পার্থক্য দেখিয়েছেন :

ছেলে : রাগ করছেন কেন। আপনি নিজের দিকটাই দেখতে চাইছেন; অন্যের সমস্যাও বিবেচনা করতে হয়।

নির্দেশক : আগে আমারটা, কেবল আমারটাই। তোমাদেরটা গোল্লায় যাক, আমার কিছু যায় আসে না।^{২৭}

কিন্তু জিয়া হায়দার এমন কথা কেনো বললেন? আর কেনোই-বা তিনি এমন নাটক রচনা করলেন? আমরা যদি সে সময়ের দিকে চোখ তুলে তাকাই, তাহলে হয়তো কারণটা খুঁজে পেতে পারব। নাট্যকার যখন নাটকটি রচনা করলেন, তখন এদেশে গ্রুপ থিয়েটারের চর্চা কিছুটা বিম মেয়েছিল। কিন্তু এ সময়ের আরো কিছু আগে যারা এদেশে নাটক করতো তারা নিজেদের ঢাক নিজেরাই পিটাতে। কাগজে কাগজে যেসব প্রশংসা ছাপা হয়ে বেরুতো, তাতে নাটকের উপকার হয় নি; বরং ঢাক-ঢোল পিটানোই সায় হয়ে গেছে।^{২৮} এ সম্পর্কে মমতাজউদ্দীন আহমদ (১৯৩৫-২০১৯)‘র মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

তেয়াত্তর-চুয়াত্তর সালে নাটক থৈ থৈ করছিল, পঁচাত্তরে কিছুদিন বিম মেয়েছিল, ছিয়াত্তরে তেমন থৈ থৈ করা হৈ হৈ আর নাই; এখন কিছুটা স্থিতিস্থাপকতা এসেছে। এরই মধ্যে অনেক কটি গোষ্ঠী থেমে গেছে, কেউ কেউ হয়তো দম ধরে গুম হয়ে বসে আছে। যাদের সংগঠন মজবুত, সঙ্কল্প অদম্য এবং সুযোগ অনুকূল, তাঁদের গোষ্ঠী নিজেদের নিয়মে নিয়মিত নাটক করছেন। ভালো নাটক ভালোভাবে করতে হলে এখন গ্রুপ করতেই হবে। দলছুট একক প্রচেষ্টায় মঞ্চের আশেপাশে যাবার উপায় নাই। দশ-বিশ বছর আগে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যখানে বসে নাটক লেখা আর নাটক করার সেসব কায়দা-কানুনও গেছে। ওসব ছিল মৌসমী হিক্কা। এখনকার নাটক নাট্যকারের মুখের দিকে তাকায় না গোষ্ঠীর যৌথ সাধনার সঙ্গেই ধরা দেয়। আজকালকার নাট্যকর্মে ব্যক্তি এসে সিংহাসনে বসবেন আর গুণগ্রাহীরা দাঁড়ের ময়নার মতো শেখানো বুলি বলবে- সে যুগ হয়েছে বাসি। এখন ভাবনা-চিন্তা সবাইকে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হচ্ছে। কালকের সঙ্গে আজকের নাটকের দুস্তর ব্যবধান। যতই আপসোপ করি না কেন, আর সেই সহজ সিংহাসন পাওয়া যাবে না। নাটক করতে হলে কারিগর হতে হবে, কর্মী হতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ নিয়ে শখের নাটক করার কথা এ সময়ে আর ভাবা যাবে না।^{২৯}

জিয়া হায়দার এই ব্যাপারটিকেই উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্য তিনি নাটকে ‘ডিরেক্টর মানে ডিক্টেটরশিপ’ নীতিকে মানতেন না। আর মানলেও অযোগ্য ব্যক্তির ডিক্টেটরশিপকে কখনোই মেনে নিতে পারেন নি। কারণ, অযোগ্য ব্যক্তির ডিক্টেটরশিপের পরিণাম- ‘অনিবার্য বিপর্যয়’! এই ব্যাপারটিকে দৃশ্যায়িত করার উদ্দেশ্যেই তিনি রচনা করেছেন *এলেবেলে*।

‘নির্দেশক’ চরিত্রটি *এলেবেলে* নাটকের ‘অযোগ্য ব্যক্তি’, যিনি ছোটবেলায় ইংরেজি স্কুলে অধ্যয়নকালে একটি নাটকে ‘মৃতসৈনিক’-এর ভূমিকায় অভিনয় করে খুবই সুনাম অর্জন করেছিলেন, এবং পরে পত্র-পত্রিকার নাট্যসমালোচনা পড়ে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেছিলেন। ফলে তিনি নিজেকে সর্বসময় ‘সুদক্ষ অভিনেতা’, ‘শ্রেষ্ঠনাট্যবোদ্ধা’- সর্বোপরি ‘শ্রেষ্ঠনির্দেশক’ বলে করেন। তাছাড়া তিনি লক্ষ করেছেন এ দেশের নাট্যকর্মে নির্দেশকের ভূমিকা অদ্যাবধি কোনো গুরুত্ব পায় নি। এজন্য তিনি নিজে নাটকের নির্দেশনা দিয়ে নিজের প্রজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। সেটাই হবে তার কৃতিত্ব; সে কৃতিত্বের ইতিহাস যদি কেউ না-লেখে, তবে তিনিই ‘বেনামে’ তার ইতিহাস লিখে যাবেন। কারণ, স্ববিবেচনায় তিনিই এদেশের নাটকে বিপ্লব এনেছেন। যে বিপ্লবের কথা নাটকের শুরুতেই তিনি দর্শকের উদ্দেশ্যে সগর্বে বলেছেন :

সমাগত সুধী দর্শকবৃন্দ। আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। (সে বাও করে) রেস্টুরেন্টের ভেতরে নাটক। এই যে ব্যাপারটা, মানে রেস্টুরেন্ট ড্রামা, এদেশে নতুন; বিদেশে অবশ্য পুরোনো। আমি যদিও দেখিনি, শুনেছি। আর শুনেই, (অহংকার মিশ্রিত হাসিতে) আমার ইনটুইশন তো খুব প্রখর আর ক্রিয়েটিভ ফ্যাকাল্টিও প্রচুর— অতএব শুনেই আমি এ ধরনের নাট্যকর্ম চালু করার আয়োজন করেছি। আপনারা যারা এখানে এই সময়ে এসেছেন, এদিকে চা-টাও খাবেন, আর ওদিকে ফাও হিসেবে নাটকও দেখবেন— বেশ মজার উপরি পাওন কিন্তু। এমন একটি ব্যাপার আমাদের দেশে যুগান্তকারী, আমাদের দেশের নাট্যআন্দোলনে বিপ্লব। (বেশ জোর দিয়ে, গর্বের সঙ্গে) আমি বলতে চাই, এ বিপ্লবের সূচনা আমারই হাতে।... এর সমস্ত ক্রেডিট আমার। এর জন্য নাট্যআন্দোলনের ইতিহাসে আমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, থাকতেই হবে। (হাসি- হাসি মুখে গলার টাই নাড়াচাড়া করে)

আজকে শুভ উদ্বোধন। আপনারা তো জানেনই, রেস্টুরেন্টের নাম ‘এলেবেলে’। এলেবেলে রেস্টুরেন্টের প্রথম নাট্যানুষ্ঠান বলেই নাটকটির নামও দেয়া হয়েছে এলেবেলে। নাটকটি আমারই লেখা, আমারি পরিচালনা। পরিচালনা শব্দটা এখন পুরোনো হয়ে গেছে, সে জন্যে আর সবাই নির্দেশক কথাটি ব্যবহার করে। আর তাই আমিও... এভাবে বলাটাই ভালো : রচনা ও নির্দেশনা আবু আলি মিরধা, বি. এ. হন্স, এম. এ. থার্ড ক্লাশ ঢাক মানে ঢাকা— অর্থাৎ আমার।^{৩০}

থার্ড ক্লাশ নিয়ে এম. এ. পাশ করা এই নির্দেশক চরিত্রটি নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত দাম্ভিক। তিনি তার রেস্টুরেন্টে যে নাটকটি পরিচালনা করতে যাচ্ছেন, তাকে তিনি এক্সপেরিমেন্ট বা নিরীক্ষাধর্মী ব্যাপার বলতে চেয়েছেন। কারণ, এদেশে তিনিই প্রথম এ ধরনের নাটক প্রথম প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। অথচ তার নাটকটি লেখাই হয়নি। আইডিয়া, ডায়লগ, এ্যাকশন, এক্সপ্রেশন— সব তার মাথার মধ্যে জড়ো হয়ে আছে। তার ভাষায় :

নাটকটির রিহার্সাল ঠিক যেমন হওয়া দরকার, তেমনটি হয়নি। মাত্র... থাকগে, সেটা আপনাদের না বললেও চলবে। আসল কথা ঠিক মতো হয়নি। আর সবচেয়ে বড়ো কথা নাটকটি লেখাই হয়নি। আইডিয়া বলুন, ডায়লগ বলুন, এ্যাকশন, এক্সপ্রেশন— সব কিছু মাথার মধ্যে জড়ো হয়ে আছে, শুধু লিখে ফেললেই চলতো। কিন্তু সত্যি বলতে কি হয়নি...^{৩১}

—এ থেকে জানা যায় যে, তিনি তার নাটক লেখেনই নি। না-লিখলেও সমস্যা নেই। কারণ, ইম্প্রোভাইজেশন নাটক না-লিখলেও চলে, তাৎক্ষণিক একটা বিষয় নিয়ে ইম্প্রোভাইজেশন নাটক হয়। প্রাচীন গ্রিসে থেসপিস ডায়োনিসিয়া উৎসবে প্রথম দর্শকসমক্ষে তাৎক্ষণিক অভিনয়ের বিভিন্ন উদ্ভাবনী কৌশলের পরিচয় দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং তখন থেকেই ইম্প্রোভাইজেশনের যাত্রা। আমাদের দেশেও তাজিয়া মিছিলের সময় বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ একত্রিত হয়, এবং তারা ইমাম হোসেনের বিভিন্ন কার্যকলাপকে তাৎক্ষণিক অভিনয়ের মাধ্যমে দেখায়। কবি গানেও ইম্প্রোভাইজেশন ব্যবহৃত হয়। আর মানুষ প্রতিটা মুহূর্তে ইম্প্রোভাইজেশনের মধ্যে দিয়ে চলে। কারণ, মানুষের ভবিষ্যৎ অজানা। ধরা যাক একজন ক্রিকেটার ব্যাটিং করছেন, একজন বল করল— তখন ব্যাটসম্যান নিশ্চয় গ্রামার মেপে বলে আঘাত করবে না; বরং তিনি তাৎক্ষণিক বুদ্ধির জোরে বলটিতে আঘাত করবেন। এছাড়া ধরা যাক, একজন ব্যক্তি গ্রামে কিংবা গঞ্জে ডুগডুগি বাজিয়ে বানর খেলা দেখাচ্ছেন, বানর কি করবে, তিনি সেটা জানেন না; এসময় তিনি বানরের কার্যকলাপ দেখে তাৎক্ষণিক বুদ্ধির জোরে কিছু বলবেন বা করবেন। তাছাড়া আমরা কোনো জায়গায় কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে কিংবা অন্য কোনো কাজ করতে গেলে আমরা নিশ্চয়ই তাৎক্ষণিক বুদ্ধির জোরেই করে থাকি।

আর কাজ করার পর সপক্ষে যুক্তি দেখায়। এক্ষেত্রে শেক্সপিয়রের ‘পৃথিবী রঙ্গমঞ্চ, আমরা সবাই অভিনেতা’ উক্তিটিই যথার্থ। কিন্তু এলেবেলে নাটকের নির্দেশক চরিত্রটি ইম্প্রোভাইজেশন সম্পর্কে ভালো জানতেন না। অথচ তার নাটকের পাত্র-পাত্রী হিসেবে যে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রয়েছে তারা দুজনেই অত্যন্ত বিজ্ঞ ও তুখোড়। ইম্প্রোভাইজেশনের নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে সিকোয়েন্স বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, তারা ঘটনার বিস্তার ঘটাবে। কিন্তু নির্দেশক সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি এ্যাকশন বলে যেতে থাকবেন, ডিক্টেট করতে থাকবেন, তারা সেইমত অভিনয় করবে এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন মিউজিশিয়ানও ইফেক্ট মিউজিক নির্দেশ করবেন। এক্ষেত্রে নাটকের এই নির্দেশক চরিত্রটি ফরাসি অভিনেতা ও নির্দেশক লুই জুভের চিহ্নিত নির্দেশকেরই প্রতিচ্ছায়া। ‘জিয়া হায়দার দেখিয়েছেন নির্দেশকের এই অতিমাত্রায় ডিক্টেটর করার প্রবণতা ইম্প্রোর মূল আবেদনকে নষ্ট করে দেয়। সেখানে কল্পনা বা সৃজনশীলতার কোনো মূল্য থাকে না।’^{৩২} একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে :

- ছেলে : তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে চাইছো না।
- মেয়ে : ওটুকু অবিশ্বাসের সূতো মেয়েদের হাতে রাখতে হয়।
- ছেলে : তোমার ওই সূতো-ফূতো আমি ছিঁড়ে টুকরে টুকরো করে ফেলবো।
-
- নির্দেশক : (সঙ্গে সঙ্গে) স্টপ স্টপ ইট। ... এসব কি করছো তোমরা?
- ছেলে : কেন আপনাকে তো বলেছিই, আমাদের নিজস্ব চরিত্রই আমরা করে যাবো।
- মেয়ে : তা’ছাড়া এতো সুন্দর ইমপ্রোভাইজেশন কখনো ভাবতে পেরেছিলেন?
- নির্দেশক : আমরা নাটকের ঘটনায় সংঘাতের কারণ তোমাদের নিজস্ব প্রবলেম নয়, বুঝতে পেরেছো। ... ঝগড়া নয়, সংঘাত। তোমাদের ভেতর সিনেমা দেখা নিয়ে।
- ছেলে : সিনেমা!
- নির্দেশক : হ্যাঁ। ওই প্রসঙ্গেই তোমাদের সংলাপ, এ্যাকশন- সব
- ছেলে : সিনেমা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি বড়ো হাস্যকর। আপনি এমন তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে উত্তেজিত হবেন... ..
- কাঞ্চু : তুচ্ছ ব্যাপারই ও ভালো বোঝে। সিরিয়াস ব্যাপার স্যাপার... .. ওদেরটাই জমে উঠেছিল রে!
- নির্দেশক : কিন্তু নাটক আমার। ওদের নয়।^{৩৩}

নির্দেশকের এই ধরনের আচরণ ‘অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী’ প্রবাদটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নির্দেশক ইম্প্রোভাইজেশন সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা বা জ্ঞান না-রেখেই তার ব্যবহার পদ্ধতি এবং উপযোগিতা সম্পর্কে না-জেনেই, তিনি তা ব্যবহার করে যাচ্ছেন। আমরা দেখি যে, নাটকের শুরুর দিকে নির্দেশক দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ‘আসল কথা হচ্ছে আপনারা এটা জানেনই যে, নাটকের নীতি হচ্ছে নির্দেশক যা ইচ্ছে করবে, যা বলবে, অভিনেতার তা-ই মেনে নেবে, মানতে বাধ্য, অর্থাৎ কি-না নাটকের এথিক্স অনুযায়ী ডিরেকটর মানেই ডিক্টেটর, সর্বময় অধিকর্তা। সুতরাং আমার নির্দেশই চরম এবং পরম। ... আমি এই

নাটকের কুশিলবদের যা নির্দেশ দিয়ে রেখেছি এবং যেমন যেমন দেবো, তারা তাই বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করে অভিনয় করে যাবে।^{৩৪} এরপরে নাটক শুরু হবার পর তিনি নাটকের পাত্র-পাত্রীদের ডিক্টেটরশীপ মানতে বাধ্য করেছেন। প্রথমে পাত্র-পাত্রীরা ব্যাপারটা কিছুটা মেনে নিলেও পরে অবশ্যই মানতে চায় নি। এ সময় হঠাৎ তিনি নিজের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেছেন, ‘আমি নির্দেশ দিচ্ছি। কেন, তোমার জানা নেই, আমার নির্দেশ তোমাকে বিনা দ্বিধায় পালন করতে হবে?’^{৩৫} তার এসব কড়া-কথা নাটকের পাত্র-পাত্রীরা মানতে চায় নি, বরং তারা নিজেদের মতো করে অভিনয় করে গেছে। এরকম আচরণ দেখে তিনি নাটকের চরম পর্যায়ে বিরতি দিয়ে মঞ্চার লাইট বন্ধ করে দিয়েছেন, এবং কাঞ্চ ও মিউজিশিয়ানকে বেরিয়ে যেতে বলেছেন। এভাবে তিনি ‘ডিরেক্টর মানে ডিক্টেটরশীপ’ নীতিকে নাটকের সকল সদস্যকে মানতে বাধ্য করিয়েছেন।

নির্দেশক যে একজন অযোগ্য ব্যক্তি— সেটা তিনি নিজেও জানতেন। আর জানতেন বলেই বিরতির মাঝখানে ওয়েটারকে ডেকে বলেছেন, ‘গোয়েন্দাগিরি বোঝো? ... শোনো, ওরা আমার বিরুদ্ধে কি বলে, কি করে, এসব তুমি গোপনে জেনে নেবে। ওদের ওপর নজর রাখবে। তারপর আমাকে জানাবে। বুঝলে।’^{৩৬} শুধু ওয়েটারকে নয়, পরে তিনি তার বন্ধু কাঞ্চকেও পাঠিয়েছেন খবর নিতে। কারণ, তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে, নাটকের পাত্র-পাত্রী তার বিরুদ্ধে অবশ্যই কথা বলবে। আর একজন অপারগ ব্যক্তিই মাত্রই এ ধরনের জঘন্য কাজ করে থাকে। নির্দেশক নিজে অযোগ্য, অসমর্থ ব্যক্তি বলেই তিনি এমন কাজ করেছেন। এই অযোগ্য নির্দেশক সম্পর্কে নাটকের পাত্র-পাত্রী বলেছে :

- ছেলে : ... আলী সাহেবের নিজেরই তো আইডিয়া ঠিক নেই। তা’ ছাড়া আসল কথা হচ্ছে কি জানো, ঘটনা ঘটানোর মালিক তো আমরা। আমাদের দিয়েই তার প্ল্যান বলো আইডিয়া বলো, সব কিছুর কাজ হবে।
- মেয়ে : কিন্তু নির্দেশ তো দেবেন তিনি।
- ছেলে : তিনি যতোই হুকুমদারি করুক না কেন, আমরা যদি... বুঝলে...
- মেয়ে : তোমার এ্যাটিচুডটা কি বলো তো?
- ছেলে : তুমি এমন একটা ঘুঘু মেয়ে, আই মিন অভিনেত্রী হয়ে কেন যে এতো সিরিয়াস হয়ে পড়েছো?
- মেয়ে : আমার খুব নার্ভাস লাগছে।
- ছেলে : কেন?
- মেয়ে : এমন উদ্ভট ধরনের নাটক তো করিনি কোনোদিন। এমন ডিরেক্টরের পাল্লায়ও পড়িনি।^{৩৭}

শুধু এ কথা বলেই তারা স্থির থাকেনি। বরং বলেছে, মিরধা সাহেব যে জিনিস একখানা ছাড় করছেন তার সুবাসিত গন্ধে বমি বমি লাগছে।

নির্দেশক নিজের দাঙ্কিতা বজায় রাখার জন্যে বিরতির পর পুনরায় নাটক আরম্ভ করেছেন। এ সময় নাটকের পাত্র-পাত্রী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সাবলীলভাবে অভিনয় করছিল। কিন্তু নির্দেশক তার নিজের ঠাট ঠিক রাখার

জন্য মাঝে মাঝেই অভিনয়ের মধ্যে ডিক্টেটরশিপ করতে চেয়েছেন। বলেছেন, 'শেষটা হবে করুণ, বেদনা দায়ক; বুকটা ব্যথার ভারে সুমসাম করে উঠবে। গলার কাছে কি যেন একটা যন্ত্রণা দলা পাকিয়ে উঠবে, কান্না কান্না হয়ে যাবে কণ্ঠ। চোখের ভেতরে খড়কুটোর মতো কি যেন একটা খোঁচা দিতে থাকবে, অশ্রু গড়াতে যেয়ে মুক্তা হয়ে যাবে।'^{৩৮} এসব কথা শুনে পাত্র-পাত্রী বিরক্তি বোধ করে বলেছে :

ছেলে : বিরক্ত করবেন না তো!

নির্দেশক : বিরক্ত!

ছেলে : দেখুন, এখন মাথার ঠিক নেই...

নির্দেশক : মাথা! তোমাদের মাথার কোনো দাম নেই আমার কাছে। খালি কান দু'টোই ঢের, বুঝলে।

মেয়ে : কান।

নির্দেশক : হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার মাথা দিয়ে যা বেরোয় তা ওই কান দিয়ে শুনবে, আর তাই করে যাবে— আগুরষ্টাণ্ড [আন্ডারস্ট্যান্ড]।^{৩৯}

এছাড়া নির্দেশক আরো বলেছেন, 'নাটক আমার। মঙ্গল অমঙ্গলও আমার। কেবল আমারি। ... তোমরা নাটকে কুশীলব মাত্র; তোমাদের সত্তা তত্তা সবই আমার ইচ্ছাধীন।'^{৪০} এসব কথা শুনে নাটকের পাত্র-পাত্রী নির্দেশকে ব্যঙ্গ করেছে। মেয়ে চরিত্রটি ব্যঙ্গভরে ও রেগে বলেছে, 'আর ডিরেক্টর মানেই তো ডিক্টেটর।'^{৪১} এই ব্যঙ্গটাই নাট্যকার জিয়া হায়দারের এই নাটকের উদ্দেশ্য। তবে তিনি কেবল ব্যঙ্গ করেই সাস্ক করেননি, বরং ব্যঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ডিক্টেটরশিপের পতনও প্রদর্শন করিছেন নাটকের পাত্র-পাত্রীদের নির্দেশকের বিরুদ্ধে প্রবলপ্রতিবাদ করার মধ্য দিয়ে :

নির্দেশক : আমার নির্দেশ। ভুলে যেওনা, নাটকের ডিরেক্টর মানেই সর্বসর্বা। অতএব বিনা বাক্যে। বিনা প্রশ্নে আমার নির্দেশ তোমাদের মানতেই হবে।

ছেলে : (শ্লোগানের মতো করে বলতে থাকে) নির্দেশকের নির্দেশ...

মেয়ে : মানিনা, মানিনা।...

নির্দেশক : (অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে) কি, কি বললে?

ছেলে : তোমার হুকুম...

(এবার মিউজিসিয়ানও ছেলে ও মেয়ের সঙ্গে যোগ দেয়)

ছেলে
মেয়ে
মিউজিশিয়ান



মানিনা, মানিনা।

(ছেলে চেয়ার থেকে সরে আসে, তিনজনে নির্দেশককে ঘিরে ধরে, এবং শ্লোগান দিতে থাকে। মিউজিশিয়ান দ্রুত লয়ে বাজনা বাজাতে থাকে।)

নির্দেশক : (উন্মাদগ্রস্ত ভাবে) আমি হুকুম করছি, আমার হুকুম, আমার নির্দেশ, এখনো মেনে নাও, নইলে...

তিন জন : মানিনা, মানিনা।^{৪২}

শ্লোগান দিতে দিতেই ছেলে, মেয়ে ও মিউজিশিয়ান মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায় এবং ডিক্টেটরশিপেরও পতন হয়। এভাবে নাট্যকার 'ডিরেক্টর মানে ডিক্টেটর' রীতির পরাজয় এবং গ্রুপ থিয়েটারের জয় দেখিয়েছেন। কথাটার সপক্ষে আরো জোরালো প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা প্রয়োজন নাটকের 'উৎসর্গপত্র' :

মীর মকসুদুস সালেহীন ও বজলুল করিমকে বিনীত শ্রদ্ধায়
এদেশেরে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের দু'জন অগ্রপথিক^{৪৩}

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে জিয়া হায়দার একজন মৌলিক নাট্যকার। তাঁর স্বভাব এবং স্বর ছিল স্বতন্ত্র। যে কারণে তাঁর মৌলিক নাটকসমূহে এসেছে আলাদা আলাদা মেজাজ— যেখানে রয়েছে মানুষের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব, চিরকালীন সংকট, সামাজিক অসঙ্গতি, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস, মুক্তিযুদ্ধ, ধর্ষিত নারী, যুদ্ধশিশু, যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশ। এ যেনো তাঁর বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার প্রয়োগ। অর্থাৎ বিষয়-বৈচিত্র্যে তাঁর নাটক বহুমুখী।

জিয়া হায়দার ছিলেন প্রত্যক্ষ পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতায় পুষ্ট একজন আধুনিক নাট্যকার। তিনি অনেকবার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছেন। সেখানকার গ্রন্থাগারগুলোতে তিনি গবেষণা করেছেন, সেদেশের নাট্যশিক্ষক, নাট্যজন ও চিন্তাবিদদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, সেখান থেকে প্রয়োজনীয় বই-পত্র সংগ্রহ করে দেশে ফিরে গবেষণা করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন নাটকের শিক্ষকতা করেছেন এবং এদেশের নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। এছাড়া গ্রিক, ফরাসি, ব্রিটিশ, আমেরিকান, রাশিয়ানসহ বিশ্ববরেণ্য নাট্যকারদের সৃষ্টিশীল সাহিত্য তিনি পাঠ করেছেন এবং বিশ্বনাটকের প্রধান ধারা, চিন্তা, চর্চা ও প্রয়োগের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন নাট্যকার, নাট্যপরিচালক, নাট্যতাত্ত্বিক এবং চিন্তাবিদদের ওপর গবেষণা-প্রবন্ধও রচনা করেছেন। তবে তাঁরা কোনো নির্দিষ্ট কালের নন। কেউ ষোড়শ শতকের, কেউ উনিশ শতকের আবার কেউবা বিশ শতকের। এ থেকে বোঝা যায়, নাট্যকার জিয়া হায়দার কোনো বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে আবদ্ধ ছিলেন না। বরং দেশ-কালকে অতিক্রম করে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন একাল থেকে সেকালে, স্পর্শ করতে চেয়েছেন প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগ-যুক্তি-মেধা ও মননকে। ফলে তাঁর মৌলিক নাটকগুলোর মধ্যে বার্টল্ট ব্রেক্ট (১৮৯৮-১৯৫৬), স্যামুয়েল বেকেক্ট (১৯০৬-১৯৮৯) এবং অগাস্ত বোয়াল (১৯৩১-২০০৯)র প্রভাব লক্ষণীয়।

গ্রুপ থিয়েটারের একজন একনিষ্ঠ সেবক তিনি, এজন্য খুব কাছ থেকে গ্রুপ থিয়েটারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। ফলে তিনি কখনোই ‘ডিরেক্টর মানে ডিক্টেটর’ রীতিকে মানতেন না। আর মানতেন না বলেই তিনি গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের পাশাপাশি নাটকেও এই থিয়েটারি প্রয়োগ করে এই আন্দোলনকে আরো বহুগুণে বেগবান করার বাঞ্ছাপোষণ করেছেন। যা তাঁর আজীবন আন্দোলনেরই একটি বহিঃপ্রকাশ।

তথ্যনির্দেশ

১. জিয়া হায়দার, ‘গ্রুপ থিয়েটার ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত’, *নাট্য বিষয়ক নিবন্ধ*, (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮১), পৃ. ১৮-১৯
২. সুদীপ বর্মন, ‘গ্রুপ থিয়েটার : প্রেক্ষাপট’, *গ্রুপ থিয়েটারের নাটক : সামাজিক দায়বদ্ধতা*, (কলকাতা : পুস্তক বিপনি, ২০১১), পৃ. ৯
৩. মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৭), পৃ. ৯
৪. শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের নাটকের রূপরেখা*, (ঢাকা : গ্রাফোসম্যান পাবলিকেশন, ২০১৪), পৃ. ৫
৫. মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
৬. উদ্ধৃত : সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম পু.মু., ১৯৯৮), পৃ. ১২৭
৭. হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, ‘ড্রামা সার্কল : প্রসঙ্গ কথা এবং একক বজলুল করিম’, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, রামেন্দু মজুমদার সম্পা., (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৬), পৃ. ২১১-২১২
৮. কবীর চৌধুরী, ‘আমাদের নাট্যকর্ম : কাল ও আজ’, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, রামেন্দু মজুমদার সম্পা., পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭
৯. জিয়া হায়দার, ‘নাটকের কথা’, *এলেবেলে*, (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, মে ১৯৮১), [পৃ. সংখ্যা উল্লেখ নেই]
১০. জিয়া হায়দার, *এলেবেলে*, পূর্বোক্ত, [পৃ. সংখ্যা উল্লেখ নেই]
১১. আতাউর রহমান, ‘নাট্যপ্রযোজনায় নির্দেশকের ভূমিকা’, *নাট্যপ্রবন্ধ বিচিত্রা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৬১
১২. তদেব, ৬২
১৩. কবীর চৌধুরী, ‘গ্রীক নাট্যকলার কথা’, *নাটক : তত্ত্ব ও শিল্পরূপ*, রামেন্দু মজুমদার সম্পা., (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, আগস্ট ১৯৯৭), পৃ. ১২
১৪. সুমিত্রা চক্রবর্তী, ‘প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের শিল্পতত্ত্ব ও কাব্যতত্ত্ব’, *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব : ধ্রুপদী ও আধুনিক*, হাবিব রহমানের সংকলন ও সম্পাদনা, (ঢাকা : কথা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪), পৃ. ৫৩
১৫. কবীর চৌধুরী, ‘গ্রীক নাট্যকলার কথা’, *নাটক : তত্ত্ব ও শিল্পরূপ*, রামেন্দু মজুমদার সম্পা., পূর্বোক্ত, পৃ. ১০-১১
১৬. আতাউর রহমান, ‘নাট্যপ্রযোজনায় নির্দেশকের ভূমিকা’, *নাট্যপ্রবন্ধ বিচিত্রা*, পূর্বোক্ত, ৬২
১৭. তদেব, পৃ. ৬৩
১৮. তদেব
১৯. কবীর চৌধুরী, *ইউরোপের দশ নাট্যকার*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫), পৃ. ৭২
২০. Laurence, Kithchin, *Mid-Century Drama*, London, 1969, p. 73
উদ্ধৃত : কবীর চৌধুরী, ‘বার্টোল্ট ব্রেস্ট’, *ইউরোপের দশ নাট্যকার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

২১. আতাউর রহমান, 'নাট্যপ্রযোজনায় নির্দেশকের ভূমিকা', *নাট্যপ্রবন্ধ বিচিত্রা*, পূর্বোক্ত, ৬৩
২২. তদেব, পৃ. ৬৪
২৩. তদেব, পৃ. ৬৬
২৪. তদেব
২৫. তদেব
২৬. জিয়া হায়দার, 'গ্রুপ থিয়েটার ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত', *নাট্য বিষয়ক নিবন্ধ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮-২৩
২৭. জিয়া হায়দার, *এলেবেলে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮
২৮. মমতাজউদ্দীন আহমদ, 'বাংলাদেশের নাটক ও বিবিধ কথা', *সমকাল*, ইসমাইল মোহাম্মদ সম্পাদিত, বিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৮৫, পৃ. ৭৮
২৯. তদেব, পৃ. ৭৯
৩০. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *নাটক লেখার মূলসূত্র*, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫), পৃ. ১১৯
৩১. জিয়া হায়দার, *এলেবেলে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩
৩২. ফারহানা আখতার, *জিয়া হায়দার : জীবন ও নাট্যসাহিত্য*, (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী), জুন ২০১৪, পৃ. ৬৯
৩৩. জিয়া হায়দার, *এলেবেলে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮
৩৪. তদেব, পৃ. ৬-৭
৩৫. তদেব, পৃ. ১৮
৩৬. তদেব, পৃ. ৩২
৩৭. তদেব, পৃ. ৩৩-৩৪
৩৮. তদেব, পৃ. ৪৯
৩৯. তদেব, পৃ. ৫৩
৪০. তদেব, পৃ. ৫৬
৪১. তদেব
৪২. তদেব, পৃ. ৫৭
৪৩. তদেব, 'উৎসর্গপত্র' [পৃ. সংখ্যা উল্লেখ নেই]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি: লোকাচার ও লোকভাষা

শামসাদ জাহান*

Abstract: One of the best marxist writer in the field of bangla literatre, Manik Bandoapadhyay(1908-1956) in his short lifetime, wrote many novels and *PaddaNadir Majhi* is one of them. The livings and lifestyles of the fishermen who live in the bank of Bangladesh's most fearsome, mysterious and restless river have been made the background of the novel. Basically, reading this novel, it can be realised that it has been written on the basis of regionalism and mysteriousness, the real exploration of male and female relationships, freudism and marxism. The image of the livings of the people of ketupur, situated at the bank of sriver padma has been embodied in the novel. The novelist which describing the scenario of the livings of the riparian people, used dialect of that region and he also brought off various folklore. Dialect and Folklore have raised up the importance of the novel nonparametrically. In the title named *Manik Bandopadhyay's PaddaNadir Majhi: Dialect and Folklore I* have tried to enumerate these on the basis of the novel.

আধুনিক কথাসাহিত্যের অন্যতম রূপকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়(১৯০৮-১৯৫৬) সমাজের নগ্ন সত্যের উদঘাটক, ফ্রেয়েডীয় মনোবিকলন এ মার্কসীয় চিন্তার একজন ব্যঞ্জনাকার। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর পদচারণা লক্ষ করা যায়। তবে ঔপন্যাসিক হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত।

‘দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, গণআন্দোলন, মন্বন্তর, সাম্যবাদী রাজনীতি, গ্রাম্য মানুষের কলকাতা আগমন, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, দেশবিভাগ এবং বাস্তবতার উদ্বাস্ত সমস্যা সেই সময় মানিকের উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু।’^১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬) বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে একটি সমৃদ্ধ সংযোজন। এ উপন্যাসে পদ্মা-তীরবর্তী অঞ্চলের সমস্যাজর্জর সংগ্রামশীল মানুষের জীবনপ্রবাহের স্বরূপচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উপন্যাসের মূল বিবেচ্য বিষয় হলো একটি বিশেষ জনজীবনের সামগ্রিক বর্ণনা। এখানে তুলে ধরা হয় সে জীবনের চিন্তাধারা, বোধ-বোধি এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কীভাবে সে জীবনকে প্রভাবিত, সমৃদ্ধ ও সম্পূর্ণ করে। একটি বিশেষ ভৌগোলিক সীমা-পরিসর-অন্তর্গত মানব-সম্প্রদায়ের আচরণ, শিষ্টাচার, লোকাচার, বিশ্বাস-সংস্কার, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের যথাযথ রূপায়ণ ঘটেছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসে পরিবেশের পাশাপাশি ভাষাটাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের লোকজীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই লেখক ভাষা প্রয়োগ করেছেন।

নদী এবং নদী-তীরবর্তী মানুষকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনার সূত্রপাত ভারত-বিভাগের পূর্ব পর্যায়ে। নদীবাহিত বিভিন্ন অঞ্চলের সংগ্রামশীল মানুষের জীবনযাপন-পদ্ধতিকে শিল্প অন্তর্গত করে যাঁরা উপন্যাস রচনায় অগ্রণী

* এম. ফিল. গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। নদী আমাদের জীবনের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত, বিশেষত বাঙালিদের। ফলে বাংলা উপন্যাসে নদীর একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। নদীকে কেন্দ্র করে একটা অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় বয়ে চলে নিম্নবর্ণের মানুষের জীবন। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে পদ্মা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে পদ্মার তীরবর্তী মানুষের জীবন জীবিকা। এ উপন্যাসে চরিত্রগুলোর তেমন কোনো পরিবর্তন নেই, ধীর গতির এক অর্থনৈতিক জীবনের অংশীদার তারা। যে পরিবেশ, যে সামাজিক নিয়মের মধ্যে তারা জীবন কাটায় তার আর বদল ঘটে না, অপরিবর্তনীয় তাদের জীবন-দর্শন, প্রকৃতি-সংলগ্ন এ সমাজ প্রকৃতির মতোই স্থির। নদীকে কেন্দ্র করেই এদের বাঁচা-মরা, দিনযাপন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* ছাড়াও নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৬৫) এবং সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) *গঙ্গা* (১৯৫৭)। নদীমাতৃক এদেশে আছে ছোট-বড় নাম না-জানা নানা ধরনের নদ-নদী। এই নদীগুলোর তীরবর্তী অঞ্চলে মৎসজীবীদের বসতি। মাছ ধরাই তাদের মূল পেশা, মূল জীবিকা। তারা হাওর-বাওর, খাল-বিল, নদী-নালা, পুকুর-ডোবা প্রভৃতি জলাশয়ে মাছ ধরে, বেচে-কিনে জীবিকা নির্বাহ করে। সংসার চালায়। *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসটি মালো সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে রচিত। মাছ শিকারই এদের অর্থ উপার্জন ও জীবনধারণের একমাত্র উৎস। *গঙ্গা* উপন্যাসেও মালো সম্প্রদায়ের জীবনই বর্ণিত হয়েছে। তিনটি উপন্যাসেই সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণির জনজীবন এবং সেই সম্প্রদায়গুলোতে যে কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হয়, তা তুলে ধরেছেন উপন্যাসিকগণ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের পদ্মানদীর তীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের জেলেদের জীবন-চিত্র বর্ণনা করেছেন। জীবন-জীবিকা সেখানে দুর্বিষহ। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সবাই ব্যস্ত। দুবেলা দুমুঠো অন্নের জন্য তাদেরকে লড়াই করতে হয় পদ্মানদীর প্রতিকূল পরিবেশের সাথে।

মানিকের পিতা যখন সপরিবারে চাকরিসূত্রে টাঙ্গাইলে বাস করছিলেন সে সময় কিশোর মানিক পদ্মানদীর মাঝিদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিতির সুযোগ পেয়েছিলেন। এভাবেই মানিক জেলেদের জীবন সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন।^২

উপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস রচনার পূর্বেই পদ্মাপাড়ের মানুষের লোকাচার ও লোকভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। উপন্যাস যেহেতু বাস্তবজীবন কেন্দ্রিক, সেহেতু সেখানে অবাস্তব কোনো কিছু স্থান নেই। আর এই বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য উপন্যাসে সমাবেশ ঘটে চরিত্রের। চরিত্রভেদে চরিত্রের মুখে ভাষা দান করেন উপন্যাসিক। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবনপ্রণালী উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই স্তর অনুযায়ী ভাষা আলাদা আলাদা। ফলে, চরিত্র অনুযায়ী ভাষাতেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ উপন্যাসের ভাষা বিষয় ও চরিত্র উপযোগী হয়ে উঠেছে। শ্রমজীবী মানুষ তাঁর উপন্যাসের এক মৌলিক উপাদান। এ প্রসঙ্গে শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য:

পদ্মানদীর মাঝি' বোধ হয় তাঁহার রচিত উপন্যাসবলীর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। ইহার একটা কারণ অবশ্য বিষয়ের অভিনবত্ব— পদ্মানদীর মাঝিদের দুঃসাহসিক ও কতকটা অসাধারণ জীবনযাত্রার আকর্ষণীয় শক্তি। দ্বিতীয় কারণ, পূর্ববঙ্গের সরস ও কৃত্রিমতাবর্জিত কথ্য ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ। কিন্তু উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে হইার সম্পূর্ণরূপ নিম্নশ্রেণী-অধ্যুষিত গ্রামজীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতিবোধ, ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তিগুলির ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমানির্দেশ।^৩

এই উপন্যাসকে মোট সাতটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। সাতটি পরিচ্ছেদের মধ্যে একটি মাত্র উপকাহিনি আছে আর তা হলো হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়, তিনি ছিলেন মার্কসীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী। আর শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে তাঁর সংগ্রাম ছিল নিরন্তর। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে শ্রমজীবী জেলেদের জীবন-সংগ্রাম চিত্রিত হয়েছে। কেতুপুরে যখন কুবেরের শ্রমের মূল্য দেওয়া হয়নি, তখন ঔপন্যাসিক ধর্মহীন, গোত্রহীন, শোষণহীন ময়নাদ্বীপে স্থানান্তরিত করে শ্রমজীবী মানুষের জয় ঘোষণা করেছেন। লেখকের ইচ্ছে বা মনস্কামনা ময়নাদ্বীপের মতো একটি শ্রমজীবী মানুষের রাজ্য গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে আমরা হোসেন মিয়া চরিত্রটিতে লেখকের ছায়া দেখতে পাই। হোসেন মিয়া গড়তে চেয়েছেন শ্রেণি বৈষম্যহীন কৃষক সাধারণের নতুন দ্বীপ। সেই দ্বীপে বসবাসকারী জেলে মাঝিদের প্রাত্যহিক জীবন, প্রকৃতি এবং শোষণের বিরুদ্ধে তাদের অসহায় সংগ্রাম, নানা দোষ ত্রুটি নিয়ে তাদের জীবন-প্রবাহ বাংলা উপন্যাসের পাঠককে এক নতুন দিগন্তে উপনীত করেছে। এই প্রসঙ্গে নিতাই বসু বলেছেন:

তিনি দেখলেন, কোনো মানুষই বিচ্ছিন্ন বা একক নয়, তার আছে একটি সামগ্রিক সামাজিক সত্তা। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনা সবই সময় ও কালের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। মানুষের মূল্যবোধগুলি পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসে, পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থনীতিই একটা মৌল প্রশ্নের অবতারণা করে। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় মানুষের আত্মার আতর্জন শোনা যায়। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতায় এর প্রতিকার ঘটে না। মানুষের যাবতীয় বেদনার নিরসন হতে পারে শোষণহীন বৈষম্যহীন শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায়, যেখানে অর্থনীতির মূল কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্র, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে যা পরিচালিত হবে না।^৪

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নীতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন। অর্থাৎ, যে সমাজে সকলেই স্বচ্ছল জীবনযাপন করবে।

শোষণ, নিপীড়িত শ্রেণি দ্বন্দ্বের অসঙ্গতিতে বিভক্ত সমাজের বিবেকবান সাহিত্যিকের কাছে মার্কসবাদ একটি আদর্শ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলোতে মার্কসীয় দর্শন ও ফ্রেয়েডীয় চেতনা এ দুটো দিক সার্থকভাবে বিকাশ লাভ করেছে। মার্কসের রাজনৈতিক শ্রেণিচেতনা ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা তাঁর উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল। এই আদর্শই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুগ্ধ করেছিল। *পদ্মানদীর মাঝি* নিম্নশ্রেণির শোষিত বঞ্চিত মানবজীবনের আলেখ্য। যে জীবনে পদ্মাপাড়ের দুঃখপীড়িত মাঝিরা দুবেলার আহার জোগাতে পারে না। লেখক এই সংগ্রামমুখর জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায়। আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লিতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।^৫

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে কুবেরকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রেয়েডীয় ধাঁচে ঢালাই করেছেন। পঙ্গু মালাকে কেন্দ্র করে তার মানসতৃষ্ণির মধ্যে কোথাও যে অভাব ছিল, কুবের তা নিজেও জানত না। মালার বাবার বাড়ি চরডাঙ্গা বন্যা-প্লাবিত হলে সে তার ভাই-বোনদের নিয়ে আসার জন্য কুবেরকে পাঠায়। মালার বোন কপিলাকে কেতুপুরে নিয়ে আসার পর কুবের মালা ও কপিলার মধ্যে পার্থক্য অনুভব করে। কপিলার চঞ্চলতা কুবেরকে মুগ্ধ করে। পঙ্গু মালার স্থবিরতা তাকে বিমর্ষ করে তোলে। ফলে, একসময় সে কপিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে

পড়ে। শেষ পর্যন্ত কুবের যখন ময়নাদ্বীপের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায় তখন কপিলা তার সঙ্গে যেতে চায় এবং কপিলার জবানীতে ফুটে ওঠে-‘আমারে নিবা মাঝি লগে?’^৬

Folk এর বাংলা প্রতিশব্দ লোক। আর Life অর্থ জীবন। অতএব Folk Life এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে লোকজীবনকে দাঁড় করানো যায়। ‘Folk অর্থে উন্নততর সমাজের প্রান্তবর্তী উচ্চস্তরের শিল্পকর্মের তুলনায় রুচি, চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গীতে যা অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং দীনতাপূর্ণ।’^৭ অনুন্নত এই জনসমষ্টির আচার অনুষ্ঠান ধর্ম-বিশ্বাস সমাজ-সংস্কৃতি এক কথায় তাদের যাপিত জীবনকে নিয়ে যে অধ্যয়ন তা-ই Folk life. সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, ফোকলোর-কেন্দ্রিক গড়ে ওঠা যে জীবনব্যবস্থা সেটাই লোকজীবন। মধ্যযুগ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলা সমাজব্যবস্থা লোকজীবন ভিত্তিক, এই লোকজীবনের উপরেই পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাস নির্ভরশীল। লোকজীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় ফোকলোর গবেষক মুহাম্মাদ আবদুল খালেকের বক্তব্য থেকে:

লোকজীবনের ধারণার সাথে একটা আপেক্ষিক নিকৃষ্টতা বোধ জড়িয়ে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো সমাজের জীবন ও সংস্কৃতি উচ্চ-নীচ দুটি পৃথক পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে না পড়ে, ততক্ষণ সে সমাজে লোকসংস্কৃতির এবং লোকজীবনের পৃথক সত্তা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সুদূর প্রাচীন কাল থেকে আমাদের সমাজব্যবস্থা উচ্চনীচ দুটো শাখায় বিভক্ত, সে কারণে এখানে লোক-জীবন এবং লোকসংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক।^৮

গ্রামবাংলার লোকজীবনের সাথে লোকসংস্কৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। লোকসংস্কৃতিকে জানতে পারলেই লোকজীবনকে জানা যায়। লোকসংস্কৃতিগুলোই লোকাচারের অন্তর্ভুক্ত।

লোকচার ও লোকভাষা লোকসাহিত্যের মূল দুটি উপাদান। ‘ফোকলোর’কে মোট চারভাগে ভাগ করা— ‘লোকসাহিত্য, লোকাচার-লোকানুষ্ঠান, লোকশিল্প বা শিল্পগত ফোকলোর এবং লোকবিজ্ঞান ও লোক কারিগরি।’^৯ শরদিন্দু ভট্টাচার্য লোকসাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন:

বাংলার মেয়েরা যখন নদীতীর বা পুকুর পাড়ে স্নানের পর গামছা দিয়ে চুল ঝাড়ে তখন তারা তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করে। কিন্তু এই দৃশ্যটিই যখন কোনো লোককবি তার পালায় বা সাহিত্যে করেন উপস্থাপন; তখন তা হল ফোকলোর। নৈসর্গিক এই দৃশ্যটি একজন কবির হাতে শিল্পরূপ পেলো বলেই তা ফোকলোর বা লোককলায় রূপান্তরিত হলো।^{১০}

‘যে সাহিত্য সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে এসেছে, এখনো প্রচলিত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, সেগুলোই লোকসাহিত্য।’^{১১} লোককাহিনি, লোকগীতিকা, লোকসঙ্গীত, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, ধাঁধা, লোকনাটক বা যাত্রা, লোক-কবিতা প্রভৃতি লোকসাহিত্যের অন্তর্গত। যদিও বাংলা উপন্যাস মৌখিক সাহিত্য নয়, তবুও লোকসাহিত্যের এই উপাদানগুলো উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। প্রথমদিকে সাহিত্যগুলো মুখে মুখে রচিত হলেও পরবর্তীতে তা লিখিত রূপ পায়। এ প্রসঙ্গে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তি প্রণিধানযোগ্য:

লোকসাহিত্য কেহ লিখিয়া রচনা করিতে পারে না; যখন ইহার উদ্ভব হয় তখন ইহা মুখে মুখে প্রচারিত হয়। প্রথম অবস্থায় ইহা মুখে মুখে প্রচারিত হয় কিন্তু বহু সমাজেই যখন লেখার এমন ব্যাপক প্রচার হইয়াছে তখন ইহা লিখিয়া লইবার পথও রোধ করিতে পারা যায় না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তীকালে সমাজ যখন সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল, তখন সকল দেশেই স্মৃতিশক্তির যেরকম অনুশীলন হইত, আজ আর কোথাও তেমন হয় না। সেইজন্যই একদিন যাহা স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিল, আজ তাহাই লিখিত হইয়া সমাজের স্মৃতির ভার লাঘব করিতেছে।^{১২}

এই উক্তির আলোকে আমরা বলতে পারি লোকসাহিত্য শুধু অতীতের সামগ্রী নয়, লোকসাহিত্য বর্তমানেরও সম্পদ, লোকসাহিত্য শুধু গ্রামীণ অশিক্ষিত মানুষেরই সৃষ্টি নয়, শহুরে শিক্ষিত মানুষও লোকসাহিত্য সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে। নানা ধরনের লোকাচারকে কেন্দ্র করেই লোকসাহিত্য রচিত হয়।

লোকাচার বলতে বোঝায় কোনো একটি অঞ্চল বিশেষ করে কোনো একটি গ্রামীণ জনপদের মানুষের পালিত সামাজিক রীতি-নীতিগুলোকে। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করতে হলে তাকে কতকগুলো নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। সমাজের প্রতি, সমাজের সকল মানুষের প্রতি রয়েছে তার দায়িত্ব। ফলে সমাজে প্রচলিত লোকাচারগুলো পালন করাও সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পদ্মানদীর তীরবর্তী কেতুপুর গ্রামে বসবাসকারী মানুষজনও নানা ধরনের লোকাচারে আবদ্ধ। নদীকেন্দ্রিক জনজীবনকে কেন্দ্র করে *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসটি ছাড়াও আরও অনেক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস পাওয়া যায়। যেমন: *গঙ্গা ও তিতাস একটি নদীর নাম*। সমরেশ বসুর *গঙ্গা* উপন্যাসে দেখা যায়-জেলে, কৈবর্ত, নিকারি, চুনুরী, মালো এবং রাজবংশী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের মৎস্যজীবীদের। পূর্ব-দক্ষিণ থেকে লম্বা রাস্তা পেরিয়ে কেতুপুরের খাল গেট দিয়ে বাগবাজারের গঙ্গায় মাছ ধরতে আসার কাহিনি দিয়েই শুরু। অপরদিকে, অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* বাংলা উপন্যাস জগতের একটি বিশিষ্ট শিল্পকর্ম। তিতাস নদী-তীরবর্তী গোকর্ণ ঘাট অঞ্চলের জেলেদের জীবন-কাহিনি অবলম্বনে এ উপন্যাস রচিত। চারটি খণ্ডে বিভক্ত উপন্যাসে তিতাস নদী তীরবর্তী মালোদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, শ্রম-বিশ্রাম, সংকীর্ণতা, উদার্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা বেদনার প্রকৃত রূপকার উপন্যাসিক। এই উপন্যাসেও আমরা লক্ষ করি নদীকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবিকা। *গঙ্গা ও তিতাস একটি নদীর নাম* দুটি উপন্যাসেই দেখা যায় আয়ের উদ্দেশ্যে তারা নদীর বুকে ভেসে অন্যত্র পাড়ি জমায়। *গঙ্গা*’য় নিবারণ ও পাঁচু এবং *তিতাস একটি নদীর নাম*-এ কিশোর, সুবল, তিলক তিতাস নদী থেকে মেঘনা নদীতে পাড়ি দেয়। আর, *পদ্মানদীর মাঝি*’তে চুরির অপবাদকে মাথায় নিয়ে কুবের পাড়ি জমায় হোসেন মিয়ার সাজানো ময়নাদ্বীপে।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে নানা ধরনের পূজা, পার্বণ ও উৎসবের চিত্র পাওয়া যায়; যা লোকাচারেরই একটি অংশ। লোকউৎসবগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রথের মেলা, দুর্গা পূজা প্রভৃতি। যদিও কেতুপুরে রথের মেলা বসে না তবুও মেলার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় না তারা। অধিকাংশ গ্রামের মানুষ এ মেলা থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনে। রথ উৎসব হয় পদ্মার ওপারে সোনাখালি গ্রামে। উপন্যাসিকের বর্ণনায় তা উঠে এসেছে:

মেলার একটি প্রান্ত নদীতীরেই আসিয়া ঠেকে।... ভিড় বেশি হয় প্রথম এবং শেষ দিন, মাঝখানের ক’দিন মেলা একটু বিমাইয়া যায়। গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় ও শখের পণ্য সমস্ত। মেলায় আমদানি হয়, এমন কি শহরের নারী-পণ্যের আবির্ভাবও ঘটিয়া থাকে। কাপড়ের দোকান, মনিহারি দোকান, মাটির খেলনার দোকান, দোকান যে কতরকমের বসে তার সংখ্যা নাই। গরু-ছাগল বিক্রয় হয় মেয়েরা সাধ মিটাইয়া শাঁখা ও কাঁচের চুড়ি পরে, ছেলেদের কোমরে বাঁধিয়া দেয় নূতন ঘুনসি। কয়েকটি স্থানে গভর্নমেন্ট হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত জুয়াখেলা চলে। মেলার এটা একটা প্রধান অঙ্গ।^{৪৮}

লোকাচারের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আঁতুড়ঘর। সদ্য জন্ম নেয়া সন্তান ও প্রসূতি মা-কে যে ঘরে রাখা হয় সেটিই হল আঁতুড়ঘর। সন্তান জন্ম দেয়ার সময় ও পরবর্তী সময় সন্তান ও মাকে আঁতুড়ঘরে রাখা হতো। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কুবের। তার স্ত্রী মালা সন্তানসম্ভবা হলে সন্তান প্রসবের সময় তাকে আঁতুড়ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। এটি গ্রামীণ এক রীতি। উপন্যাসের ভাষায়:

ভদ্রলোকেরা উঠানে অস্থায়ী টিনের ঘর তুলিয়া দেয়, চৌকির ব্যবস্থা করে। যারা আরো বেশি ভদ্রলোক তাঁদের থাকে শুকনো খটখটে স্থায়ী আঁতুড় ঘর। কুবেরের তো সে ক্ষমতা নাই। তার যতখানি সাধ্য সে তো করিয়াছে। ভালো করিয়া বৃষ্টির ছাট আটকাইয়াছে, ঘর ছাইবার শনগুলি বিছানার তলে পাতিয়া দিয়াছে, দেবীগঞ্জের রেলকোম্পানির কয়লা চুরি করিয়া আগুনের ব্যবস্থা করিয়াছে। আর সে কী করিতে পারে?^{১৫}

সমাজের একটি অন্যতম ঘটনা বা বিষয় হলো বিয়ে। এর মধ্যে দিয়ে একটি নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে এই প্রথার আচারগুলো পরিবর্তিত হয়েছে। এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সময়ের প্রেক্ষাপটের আলোকে বিয়ের নানা প্রথা তুলে ধরেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পণপ্রথা। হিন্দু সামাজ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে পণপ্রথা প্রচলন যুগযুগ ধরে চলে আসছে। কুবের তার মেয়ের বিবাহ দিয়ে পণ-প্রাপ্তির আশা করেছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসে বিয়ের প্রথাটিকেও তুলে ধরেছেন কুবেরের মেয়ে গোপীর মাধ্যমে। বিয়ের যোগ্যপাত্রী গোপী। বয়স্ক মেয়েদের বিয়ের বাজারে কদর নেই। অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দেয়া হতো। এটিই ছিল তৎকালীন সমাজব্যবস্থার একটি নিয়ম। যুগল কুবেরের কন্যা গোপীকে বিবাহ করতে চায়। পণপ্রথার একটি চিত্র এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসের বর্ণনায়:

গোপীর বয়স এগার, কুবের মেয়ের বয়স এক বছর ভাঁড়ায় আর এক বছর হাতে রাখিয়া বলে-
নয়। ন বছর বয়সে যে মেয়ের এগার বছরের বাড়, বিয়ের বাজারে তার দাম আছে। গণেশের
শালা যুগল সম্প্রতি পাশের গ্রাম হইতে বোনের তত্ত্ব লইবার ছলে আসা-যাওয়া শুরু
করিয়াছে।...কুবের কীরকম দর হাঁকিবে জনিবার চেষ্টা করিয়াছে। স্পষ্ট করিয়া কুবেরও এখন
পর্যন্ত কিছু বলে নাই। কথা উঠিলে বহুক্ষণ ধরিয়া মেয়ের প্রশংসা কীর্তন করিয়া শুধু একটু আভাস
দিয়াছে দুকুড়ি তিনকুড়ি টাকার।^{১৬}

অদ্বৈত মল্লবর্মণও তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন।
উপন্যাসিকের বর্ণনায়:

এ-পাড়ার কুমারীরা কোনোকালে অরক্ষণীয় হয় না। তাদের বুকের উপর ডেউ জাগিবার আগে, মন
যখন থাকে খেলার খেলায় রঙিন, তখনই একদিন ঢোল সানাই বাজাইয়া তাদের বিবাহ হইয়া
যায়। তবু এই বিবাহের জন্যে তারা দলে দলে মাঘমণ্ডলের পূজা করে।^{১৭}

লোকউৎসব হিসেবে এই উপন্যাসে এসেছে মাঘমণ্ডলের পূজা। এই পূজা করে অবিবাহিত মেয়েরা, যোগ্য পাত্র
পাওয়ার জন্য। মাঘ মাসের ত্রিশদিন তিতাসের ঘাটে সকালে গোসল করে, ভাঁটিরফুল ও দূর্বাদলের পানি দ্বারা
সিঁড়ির পূজা করে এবং মন্ত্র পাঠ করে। শেষ ব্রতের দিন উৎসবের মধ্য দিয়ে দিনটি উদ্‌যাপন করে।
উপন্যাসের বর্ণনায় তা উঠে এসেছে:

তরুণ কলাগাছের এক হাত পরিমাণ লম্বা করিয়া কাটা ফালি, বাঁশের সরু শলাতে বিঁধিয়া ভিত
করা হয়। সেই ভিতের উপর গড়িয়া তোলা হয় রঙিন কাগজের চৌয়ারী ঘর। আজিকার ব্রত শেষে
ব্রতিনীরা সেই চৌয়ারি মাথায় করিয়া তিতাসের জলে ভাসাইবে, সঙ্গে সঙ্গে, ঢোল-কাঁসি বাজিবে,
নারীরা গীত গাহিবে।^{১৮}

লোকাচারে মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল লোকবিশ্বাস। প্রাচীনকাল থেকেই এই লোকবিশ্বাস গুলো
গড়ে উঠেছে এবং কালেকালে পরিবর্তী সমাজে চলে এসেছে। লোকাচারের মধ্যে আর একটি বিষয় লক্ষ করা
যায়, সন্তান জন্মদানের সঙ্গেসঙ্গে সন্তানের মুখে মধু দেয়া হয়, যাতে তার মুখ দিয়ে মিষ্টি কথা বের হয়।

মালার ও কুবেরের আলাপচারিতার সময় কুবের মালার উপর রাগারাগি করলে মালার ছোট্ট একটি উক্তির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়- ‘মায় নি মুখে মধু দিছিল আঁতুড়ে?’^{১৯} প্রাচীন এই লোকবিশ্বাসটি বর্তমান সময়ও দেখতে পাওয়া যায়। ধারণা হয়, সন্তান জন্মের সঙ্গেসঙ্গে মুখে মধু দিলে সেই সন্তান সহজে তিক্ত কথা বলবে না। এটি মূলত একধরনের লোকবিশ্বাস, যা লোকাচার হিসেবে সমাজে স্থান পেয়েছে।

ঔপন্যাসিক পদ্মাপাড়ের জেলেদের দরিদ্রতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁদের জীবনাচারগুলোকে সূক্ষ্মভাবে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন স্বীয় প্রতিভায়।

জেলেপাড়ার প্রায় সকল জেলেই রথের মেলায় যায়। এদের প্রত্যেকেই সাধ্যমতো কিছু না কিছু কিনে আনে মেলা থেকে। ফলে অন্যদিন অপেক্ষা এদিনটা তাদের কাঁটে অন্যরকম। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়:

সন্ধ্যার সময় জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে আজিকার সন্ধ্যাটি নামে সানন্দে। বৌরা হাসিমুখে লাল পাছাপাড় শাড়ি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, নৃতন কাঁচের চুড়ির বাহারে মুগ্ধ হয়, কাঁচ ও কাঠের পুঁতির মালা সমস্তে কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখে, ছেলেমেয়েরা বাঁশি বাজায় আর মাটির পুতুল বুকে জড়াইয়া ধরে।^{২০}

রথের পরেই দোল-উৎসবে আনন্দ-স্মৃতি করে গ্রামের লোকজন। কুবের দোলোৎসবের সময় চরডাঙ্গা শ্বশুরালায়ে যায়। চরডাঙ্গার মানুষ আনন্দের সঙ্গে পালন করে এ উৎসব। উপন্যাসের বর্ণনায়:

রং ও কাদা নিয়া গ্রামে দোলের উৎসব চলিয়াছে, রঙের চেয়ে কাদার পরিমাণটাই এই পাড়ার বেশি। চাষা-ভূষা জেলে-মাঝির পাড়া এটা, এখানে রঙের বড়ো অনটন।... সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় শোভাযাত্রার লোকেরা কুবের, বৈকুণ্ঠ ও অধরকে কাঁদা মাখাইয়া দিয়ে গেল, অধর ভিড়িয়া গেল দলে। তাই তাই নাচ, ছোট্টাছুটি, হৈচৈ, ডোবা পুকুরের পাক তুলিয়া যাকে খুশি ছুঁড়িয়া মারা-আনন্দ বটে দোলের।^{২১}

দুর্গা পূজার চিত্রও অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক। সমাজে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর লোক বসবাস করে। এই উপন্যাসে হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মের মানুষের জীবন শিল্পিত হয়েছে। হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গা পূজা। যদিও এই উৎসবের খুব বেশি বর্ণনা নেই উপন্যাসে। তবে লেখকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় এ সময় সব দিকেই ঢাক ঢোল বাজে অর্থাৎ সর্বত্রই উৎসবের আমেজ বিরাজমান থাকে। লেখকের বর্ণনায় উঠে এসেছে ‘কেতুপুরে চার দিন পূজার ঢাক-ঢোল বাজিল-উৎসব হইল। জেলেপাড়ার ছেলেবুড়ো দুবেলা ঠাকুর দেখিল, কেহ কেহ তাড়ি গিলিয়া খুব মাতলামি করিল’^{২২} সমাজে প্রচলিত উৎসবগুলো পালনের সময় বেশ কিছু আচার পালন করা হয়। তবে অঞ্চল ভেদে আচারগুলো আলাদা হয়ে থাকে। মূলত আচার ব্যবহারগত ফোকলোরকেই আমরা লোকাচার বলতে পারি।

অতিথি আপ্যায়নও লোকাচারের অন্যতম একটি উপাদান। পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে জেলেদের ঘরে খাবারের অভাব থাকলেও তারা অতিথি আপ্যায়নে কার্পণ্য করেনি। উপন্যাসের কাহিনিতে আমরা দেখতে পাই, বন্যার কারণে মালার ভাই-বোন তাদের বাড়িতে আসে। কুবেরের সংসারে খাবারের মুখ বাড়লেও কুবের তার শশুড়বাড়ির লোকজনের আতিথেয়তা করেছে হাসি মুখে। অপরদিকে, হোসেন মিয়াকেও কুবের যথেষ্ট সম্মান ও খাতির করে। হোসেন মিয়া তার বাড়িতে বিশ্রাম নেয়। হোসেন মিয়ার ঘুম ভাঙলে কুবের তাকে উদ্দেশ্য করে বলে:

যান নাকি মিয়া বাই? খিদায় কাতর হইছেন, সন্দ করি-রাইতে কিছু খান ত নাই। এক কাম করেন দুইগোটা আম খাইয়া যান।^{২৩}

উপন্যাস গদ্য-নির্ভর সাহিত্যকর্ম। উপন্যাসের কাহিনিকে বর্ণনার একমাত্র মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষা ছাড়া সাহিত্য কল্পনা করা সম্ভব নয়। উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন:

কবিতার মতো উপন্যাসের ভাষাও স্রষ্টার কল্পনার এক অলিখিত অনুশাসনের সূত্রে বাঁধা। সেখানেও ভাষা ব্যবহারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ নিদর্শন দ্বারা লেখকের ঔপন্যাসিক রস-স্বাদানের অব্যর্থ লক্ষ্যের কথা প্রমাণিত হয়। লেখকের জীবন-দৃষ্টি ও দর্শনের সঙ্গে ভাষা ওতপ্রোত সম্বন্ধে জড়িয়ে আছে।^{২৪}

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, ভাষা হলো সাহিত্যের প্রাণ। ভাষা আছে বলেই সাহিত্য জন্মালাভ করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে প্রাত্যহিক জীবনের ভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। গৌতম কুমার দাস উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে তাঁর মতামত দিয়েছেন-

যে কোনো উপন্যাসে ভাষার দুটি দিক লক্ষ্যণীয়; এক, বর্ণনার ভাষা, দুই সংলাপের ভাষা। বর্ণনার ভাষার সঙ্গে সংলাপের ভাষার রয়েছে সুস্পষ্ট পার্থক্য। সাধারণত যে জীবন ও পরিবেশ নিয়ে ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেন তার ভাষাও সেই পরিবেশ অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন। বর্ণনার ভাষা অনেকটাই ধারাবাহিক।...অন্যদিকে সংলাপের ভাষা নির্ভর করে চরিত্রের শিক্ষা, পরিবেশ, সামাজিক অবস্থা ও রুচির ওপর। সংলাপের ক্ষেত্রে চরিত্রানুগ কথ্য ভাষার (Dialect) উপরই নির্ভর করতে হয়।^{২৫}

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপন্যাসে এই দুই রীতিই ব্যবহার করেছেন। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের কুবের, মালা, কপিলা, রাসু, গণেশ, হোসেন মিয়া প্রভৃতি চরিত্রগুলোর মুখে ব্যবহার করেছেন গ্রামীণ জনপদের ভাষা।

এ উপন্যাসে রয়েছে লোকভাষার সর্বাধিক ব্যবহার। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের সকল চরিত্রের মুখেই লেখক ব্যবহার করেছেন গ্রামীণ জনপদের ভাষা। ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনার পূর্বে পদ্মাপাড়ের মানুষের লোকভাষা আয়ত্ত্ব করেছিলেন। তিনি সংলাপের ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন বাস্তব ও প্রচলিত বাকভঙ্গি। তাঁর ভাষারীতিতে কোন কোন অঞ্চলের ভাষা স্থান পেয়েছে সে সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য:

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সরাসরি কোনো সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের গ্রামীণ জনপদের ভাষা ব্যবহৃত হয় নি। তবে তাঁর গ্রামীণ জীবন-নির্ভর উপন্যাসে (পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি) চরিত্রগুলোর সংলাপে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তাকে পূর্ববঙ্গের উপভাষার পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বৃহত্তর ফরিদপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের গ্রামীণ জনপদের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। পদ্মানদীর তীরবর্তী গ্রামাঞ্চলের ভাষাকে মানিক সংলাপের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। জেলেদের বস্তুনিষ্ঠ ভাষা ব্যবহারে তাঁর কৃতিত্ব অতুলনীয়।^{২৬}

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ভাষার সুনিপুণকারিগর। যেখানে যে ভাষা উপযোগী সেখানে সে ভাষা প্রয়োগ করেছেন। কারণ, উপন্যাসে যথাযথ ভাষা-প্রয়োগ উপন্যাসের মর্যাদা বাড়িয়ে তোলে। উপন্যাসের ভাষারীতি প্রসঙ্গে সমালোচকের উক্তি-ভাষা-রীতি উপন্যাসের সমগ্র রীতি বা বিষয়বস্তু থেকে পৃথক কোনো ব্যাপার নয় এবং এটা একটা প্রাথমিক সত্য কথা যে, ব্যক্তি এবং সমাজ চেতনার সমগ্র মহিমাকে লেখক তার ভাষারীতির আধারে ধরে রাখেন।^{২৭} এই উপন্যাসে চরিত্রের মুখে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সেই ভাষাকে আমরা লোকভাষা, আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা বলে থাকি। এখানে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জীবন ও লোকভাষা স্থান পেয়েছে। ‘মানুষ আগে যেভাবে গল্প বলত, উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে অন্যভাবে বলতে শুরু করল। চরিত্র রচনায় বিশেষত্ব এল। চরিত্রেরা নানা স্বরে কথা বলতে শুরু

করল। উপন্যাসিকরা ভাষার সঙ্গে উপভাষাও নিয়ে এলেন চরিত্রের মধ্যে।^{২৮} উপন্যাসে অনেক জায়গায় সংলাপধর্মী ভাষা লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ, উপন্যাসের চরিত্রগুলো পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথনের সময় লোকভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ:

পিসি বলিল, ‘শুলি যে ধন? বৌ ওদিকে পোলা বিয়াইয়া সারছে, দেইখা আয়।’
গোপী বলিল, ‘বাই উ, ওই বাবুগোর পোলার নাখান ধলা হইয়াছে বাবা। নকুলার মাইয়া পাচী কী কইয়া গেল শুনবা? সায়েবগো এমন হয়না। না পিসি?’
কুবের চোঁচাইয়া ধমক দিয়ে বলিল, নকুল কি লো হারামজাদী? জ্যাঠা কইবার পার না?
গোপী মুখ ভার করিয়া বলিল, ‘ক্যান কমু জ্যাঠা? বজ্জাতটা আমারে যা মুখে লয় কয় না?’^{২৯}

মালা ও কুবেরের কথোপকথনেও লোকভাষা ব্যবহার করেছেন উপন্যাসিক:

মালা ভয়ে ভয়ে বলে, ‘আমারে দুগা মুড়ি-চিড়া দিবা গো?’
‘ক্যান, ভাত খাস নাই?’
‘খাইছি। ভাতে টান পড়ল, পেট ভইরা খাই নাই। অখন খিদায় পেট জ্বলে।’
‘জ্বালাইয়া মারস বাপু তুই।’^{৩০}

গণেশের শ্যালক যুগলের সাথে গোপীর বিয়ে দিতে চায় কুবের ও মালা। যুগল গোপীকে বিয়ে করার ব্যাপারে কিছু বলেছে কিনা তা জানতে চায় মালা কুবেরের কাছে। তাদের উজ্জিতে লোকভাষা ব্যবহার করে উপন্যাসিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন:

‘স্পষ্ট কইরা যুগল কিছু কয় না গোপীর মা।’
মালার গলাতেও এতটুকু ঝাঁজ নাই।
‘কয়না ক্যান? গোপীরে নিব না?’
‘গণেশা কয় নিব, যুগইলা কিছু কয় না। উদিন আমারে জিগায় খোঁড়ার মাইয়া নি খোঁড়া হয়।’^{৩১}

কুবের ও গণেশ ধনঞ্জয়ের নৌকায় কাজ করে। এক বর্ষায় তারা পদ্মায় মাছ ধরতে গেলে প্রচুর ইলিশ মাছ তাদের জালে ধরা পড়ে। ইলিশ মাছের বাজার-দর জানার জন্য কুবের আঞ্চলিক ভাষায় যদুকে বলে:

কুবের হাঁকিয়া বলে, ‘যদু হে এ এ এ— মাছ কিবা?’
খানিক দূরের নৌকা হতে জবাব আসে, ‘জবর।’
জবরের পর সে নৌকা হইতে পালটা প্রশ্ন করা হয়। কুবের হাঁকিয়া জানায় তাহাদের মাছ পড়িতেছে জবর।^{৩২}

গ্রামীণ জনপদের দৈনন্দিন কথোপকথনের বাস্তব চিত্র প্রকাশ পেয়েছে এই উপন্যাসে। কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই লেখক শব্দ ও বাক্য নির্মাণ করেছেন। উপন্যাসের বর্ণনায় ঝড়ে কেতুপুর গ্রামের অনেকের ঘরবাড়ি ভেঙে যায়। সে সময় হোসেন মিয়া তাদের সাহায্য সহযোগিতা করে, ফলে তারা নতুন ঘর পায়। বিনিময়ে হোসেন মিয়া সকলের কাছ থেকে কাগজে টিপসই নিয়ে রাখে। হোসেন মিয়া ও কুবেরের মধ্যে এ সময় লোকভাষায় আলাপচারিতা হয়:

টিপসই দেও কুবির- একুশ টাকা দশ আনার খত লিখছি- বাদ দিছি দুই টাকা। টিপসই দিয়া রাখ, যখন পারবা দিবা- না দিলি মামলা করুণ না বাই! ... জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, খত কিসির? লিখা থুইলাম, হিসাব থাকব—না—ত কিসির কাম খত দিয়া? কুবের বলিল, ‘পুরান বাঁশ পুরান বেড়া দিলি, খরচ কম হইত মিয়া বাই।’ ‘ক্যান? পুরান বাঁশ দিয়া কেন? খরচার লাইগা ভাইব না, খরচ তো দিছি আমি! না দেই নাই?’ ‘হ মিয়া বাই দিছেন, আপনাই দিছেন।’^{৩৩}

এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র হোসেন মিয়া। উপরিউক্ত সংলাপ থেকেই বোঝা যায়, সে ছিল গরীবের বন্ধু। ধনীদেব সঙ্গে সে ব্যবসা করলেও গরীব, খেটে খাওয়া জেলেদের সাথেই ছিল উঠা বসা। যাকে শাস্তি দেন নিমর্মভাবেই দেন। কিন্তু তার মাঝে রাগের কোনো প্রকাশ নেই। সব সময় তার মুখে হাসি থাকে। হোসেন মিয়া সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন:

হোসেন মিয়া এবং পদ্মা, কুবের ও তার সমগোত্রীয়দের কাছে অবশ্যই এক দুরতিক্রম্য বিধিলিপির প্রতীক। কিন্তু হোসেন মিয়া এবং পদ্মা পরস্পর সহযোগী কদাচ নয়। বরঞ্চ হোসেন মিয়া যেন পদ্মার প্রতিদ্বন্দ্বী। পদ্মার প্রতিকূলতায় তার ভূমিকা। পদ্মা- তীরবাসী জেলেদের অদৃষ্টের তথা পদ্মার কাছে সমর্পিত-ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার পটভূমিকায় হোসেন মিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র। সে নিজে ভবিষ্যৎ রচনায় বিশ্বাসী। তাই অকূল জলরাশির মাঝখানে দ্বীপ রচনায় একগ্রন্থিত এক কর্মিষ্ঠ ব্যক্তি হোসেন মিয়া। পদ্মার ত্রুর প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে হোসেন মিয়াই কঠিন হাতে পাঞ্জা ধরেছিল।^{৩৪}

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের ছোট-বড় সব চরিত্রের মুখেই আমরা লোকভাষার ব্যবহার দেখি। জমিদারের কর্মচারি শীতলবাবু কুবেরের কাছ থেকে সস্তায় মাছ ক্রয় করে। কুবের মাছ চুরি করে তার কাছে বিক্রি করে। শীতলবাবু ও কুবেরের মধ্যে এ সময় মাছ নিয়ে কথাবার্তা হয়:

‘মাছ লইয়া আয়। তিনডা আনিস।’
‘মাছ তো নাই শেতলবাবু।’
‘নাই কি রে, নাই? রোজ আমারে মাছ দেওনের কথা না তর? নিয়ে আয় যা, যা। বড় দেইখা আনিস।’
কুবের মাথা নাড়িল, ‘আইজ পারুণ না শেতলবাবু। আজান খুড়া সিদা মোর দিকে চাইয়া রইছে দেখ না? বাজারে কেনো গা আইজ।’^{৩৫}

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে ঔপন্যাসিক যে লোকভাষা প্রয়োগ করেছেন, সে ভাষায় এক ভাষা-মাধুর্য রয়েছে। শ্যালিকার সঙ্গে দুলাভাইয়ের এক অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায় উপন্যাসে। পদ্মানদীর মতো রহস্যময়ী কপিলা স্বামীগৃহে ঘোমটা টানা বধু, সে কিনা কুবেরের দিকে নুয়ে পড়ে অবাধ্য বাঁশের কঞ্চির মতো। কখনও সে জোর করে কুবেরের জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় আবার কখনও সে নিজেকে খোলসের মধ্যে আবৃত করে রাখে। কপিলায় জন্য যখন কুবেরের পরান পুড়ে তখন সে কুবেরকে উদ্দেশ্য করে বলে:

ক্যান মাঝি ক্যান? আমারে ভাব ক্যান? সোয়ামীর ঘরে না গেছি আমি? আমারে ভুইলো মাঝি পুরুষের পরান পোড়ে কয়দিন? গাঙের জলে নাও ভাসাইয়া দূর দ্যাশে যাইও মাঝি, ভুইলো আমারে।^{৩৬}

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের কথ্যভাষা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা সব সময়ই বৃহত্তর জীবনের স্বপ্নে অজানা পথে পাড়ি দেয়। সমাজতান্ত্রিক আবহ থেকে মুক্তি পেতে কল্পনা করে এক নতুন উপনিবেশের, যেখানে সে তার স্বপ্নকে রূপ দেবে। এ জীবন থেকে এক অন্যজীবনে প্রবেশ করবে। কুবের, হোসেন মিয়া, কপিলা এবং মালার জীবন প্রধান করে উপন্যাসের ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। সমাজের একটি চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক মানব জীবনকেই সেই সমাজের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছেন এবং সমাজের অবহেলিত ও নিচুতলার মানুষের জীবন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে দান করে আলাদা মাত্রা। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় পদ্মাপাড়ের মানুষের দারিদ্রের চিত্র প্রতীয়মান হয়:

দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রেসময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ-শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ায় ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাস্থ হয় না।^{৩৭}

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে লোকজীবনের সাক্ষাৎ ঘটে। এই উপন্যাসের বর্ণনায় নানা ধরণের লোকভাষা প্রয়োগ করে ঔপন্যাসিক উপন্যাসটিকে উপন্যাস জগতের অন্যতম একটি উপন্যাসে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। কুবেরকে কেন্দ্র করে দারিদ্র-পীড়িত গ্রাম বাস্তব দলিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করতে চাননি। তাকে সবাই ঠকাবে এ যেন সামাজিক ধর্মসম্পর্কিত নানা নিয়মের মধ্যে একটা নিয়ম।

মাছধরা ও জীবিকা-অর্জনের টানাপোড়নের মধ্য দিয়েও জেলেদের মনে গানের কলি যে ভেসে আসে তা সম্পর্কে অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতন লেখক ছিলেন। পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে কুবের, গণেশ ও ধনঞ্জয় তিনজন এক নৌকায় মাছ ধরে আর তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের কিশোর, সুবল এবং তিলকচাঁদ এক নৌকায় মাছ ধরে এ সাদৃশ্য উপন্যাস দু'টিতেই লক্ষ করা যায়। দুটি উপন্যাসেই দেখা যায় তারা যখন নৌকায় মাছ ধরে তখন গলা ছেড়ে গানও গায়। পদ্মানদীর মাঝি তে গণেশ মাছ ধরে আর গান গায়। ‘যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহারে পায় না কেন।’^{৩৮} এই গানগুলো লোকসাহিত্যেরই একটা বিষয়। এগুলোকে লোকসঙ্গীত বলা হয়। লোকসঙ্গীত জীবনান্বিত। তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে কিশোরের গলায় লোকসঙ্গীত তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক:

উত্তরের জমিনেরে সোনারবন্ধু হাল চষে
লাঙ্গলে বাজিয়া উঠে খুয়া।
দক্ষিণা মলয়ার বায় চান্দমুখ শুখাইয়া যায়
করি, ঠাই পাঠাইব পান গুয়া।^{৩৯}

এছাড়া পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে হোসেন মিয়ার কণ্ঠেও লোকসঙ্গীত প্রয়োগ করেছেন ঔপন্যাসিক। হোসেন মিয়া সুর করে গান বলে:

আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও
বোনধু কত ঘুমাইবা।
বায়ে বিবি ডাইনে পোলা আকাল ফসল রোও
মিয়া কত ঘুমাইবা।^{৪০}

গানগুলো উপন্যাসে ভিন্নমাত্রা দান করতে সক্ষম হয়েছে। গানগুলো শুধু গান হিসেবেই উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়নি। গানগুলোর অন্তর্নিহিত কথাগুলো জীবনের কথা ব্যক্ত করেছে; যা জীবনের মর্ম উপলব্ধিতে বিশেষ অবদান রেখেছে।

উপন্যাসের বর্ণনায় লেখক সাধুভাষা ব্যবহার করলেও চরিত্রের সংলাপে লোকভাষা ব্যবহার করেছেন। লোকভাষা প্রয়োগ করে মানুষের লোভ, হিংসা, শঠতা, দৈনন্দিন হাসি-কান্না, মান-অভিমান, ঝগড়া ফ্যাসাদের চিত্র উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসিক উপন্যাসের কাহিনি উপযোগী বাগধারা ব্যবহার করেছেন। যেমন: মুখে মধু দেওয়া, মাথা খাওয়া, সর্বসর্বা, পাষণ্ড প্রাণ, মাথায় থুওয়া প্রভৃতি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মূলত, তিনি অশিক্ষিত এক সমাজের চিত্র এঁকেছেন। যাদের ভাষায় রয়েছে আঞ্চলিকতার রেশ। উপন্যাসিক পরিবেশ ও অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু লোকশব্দ ব্যবহার করেছেন, তা নিম্নরূপ:

আঞ্চলিক শব্দ/ লোকশব্দ	চলিত শব্দ	আঞ্চলিক বাক্য
১. জিরাই	আরাম করি	জিরানের লাইগা মরস ক্যান ক দেহি? ^{৪১}
২. আইজ	আজ	আইজ পারাম না শেতল বাবু। ^{৪২}
৩. তুরা	তাড়া	রন শেতলবাবু, অমন তুরা কইরা যাইবেন না। ^{৪৩}
৪. নিয্যস	অবশ্যই	পয়সা নাই ত দিমু কি? কাল দিমু, নিয্যস দিমু। ^{৪৪}
৫. ফাউ	অতিরিক্ত/উপরি/ আসল পরিমাণের অতিরিক্ত কিছু	সাতটা ফাউ নিয়া আড়াই শর দাম দিছে। ^{৪৫}
৬. শুইনা	শুনে	নকুল দাস ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল। কুবেরকে দেখিতে পাইয়া ডাকিল, ‘অ কুবির, কোনো শুইনা যা।’ ^{৪৬}
৭. খালাস	ছাড়া পাওয়া	শ্যাম রাইতে তর বৌ খালাস হইছে কুবির। ^{৪৭}
৮. দুগা	দুটো	মালা ভয়ে ভয়ে বলে আমাকে দুগা-চিঁড়া দিবা গো। ^{৪৮}
৯. গোসা	রাগ	শেষে গণেশ আন্তে আন্তে বলিল, ‘গোসা করলা নি কুবিরদা?’ ^{৪৯}
১০. পয়হা	পয়সা	মালা আফসোস করিয়া বলিল, কবে গেল? আগে নি একবার কইলা? এক পয়হার সুই আইনবার কইতাম— কইলকাতায় পয়হায় দশখান পাওন যায়। ^{৫০}
১১. ডর	ভয়	হোসেন বলিল, ‘যাবা না ক্যান? ডর কিসের? আসমান দেইখা রওনা দিব, আসমান দেইখা ফিরবা। বাদলা দিনের ঝড় জানান দিয়া আহে!’ ^{৫১}

১২. ভাঁড়ায়	লুকায়	গোপীর বয়স এগার, কুবের মেয়ের বয়স এক বছর ভাঁড়ায় আর এক বছর হাতে রাখিয়া বলে-নয়। ^{৫২}
১৩. পোলা	ছেলে	ধনঞ্জয় অবাক হইয়া গেল। 'বিন্দা মাঝির পোলা? কস কী কুবির!' ^{৫৩}
১৪. কিবা	কী	কুবের বিরক্ত হইয়া কহিল, 'কিবা কমু খুড়া? আহুক জিগাইও।' ^{৫৪}
১৫. কোয়ানে	কোনখানে	কুবের জিজ্ঞেস করিল, 'কোনো গাঁও থেইকা আইলা মাঝি, যাইবা কোয়ানে?' ^{৫৫}
১৬. রাও	কথা	'কন থে আলি রাসু?' 'কই কুবিরদা, কই। তোমাগো দেইখা রাও সরে না, কতকাল পরে ফিরা আলাম।' ^{৫৬}
১৭. সিঙ্গি	সিংহ	পীতম শিহরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ময়নাদ্বীপে বাঘ-সিঙ্গি আছে না রাসু?' 'আছে না? বাঘ-সিঙ্গিতে বোঝাই।' ^{৫৭}
১৮. পাঁক	কাঁদা	'পাঁক মাইখা মরস করে কপিলা? মাইনষে কইব কী? যা বাড়িত্ যা।' ^{৫৮}
১৯. মাইয়া	মেয়ে	'কেডা জানে কবে মাইয়া সাইরা উঠ্যা বাড়িত্ যাইব! মাইয়ারে ফেইল্যা ক্যামনে ফিরুম মাঝি কাইল?' ^{৫৯}
২০. মুটাইছে	মোটা হয়েছে	নকুল তখনো শয়তানি করিয়া বলিল, 'যুগীর না পোলা হইব কুবির?' কুবের বলিল, 'কেডা জানে? মুটাইছে দেখলাম।' ^{৬০}
১৫. কোয়ানে	কোনখানে	কুবের জিজ্ঞেস করিল, 'কোনো গাঁও থেইকা আইলা মাঝি, যাইবা কোয়ানে?' ^{৫৫}

প্রথম দিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকজীবনকে প্রাধান্য দিলেও পরে তিনি সমাজকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন। অর্থাৎ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকে সমাজ-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির আলোকে দেখেছিলেন বলেই পরবর্তী সময়ে অঞ্চলিক সাহিত্য-ভাবনা তাঁকে প্রভাবিত করেনি। বিষয়টি সম্পর্কে মহীতোষ বিশ্বাসের অভিমত:

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও যশোর এবং তারশঙ্করের সাহিত্যে রাঢ় আদ্যন্ত পুনরাবৃত্ত হয়েছে, কিন্তু মানিক কখনই কোনো বিশেষ স্থানিকতার পটে লেখনীকে সীমাবদ্ধ করেননি। ১৯৩৬ সালে 'পদ্মানদীর মাঝি' প্রকাশিত হবার পর তিনি এই জাতীয় আঞ্চলিক জীবন নিয়ে আর কোনো উপন্যাস রচনা করেননি। তাঁর অন্য উপন্যাসের ভৌগোলিক পটভূমির পরিচয় নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ...কোনো নির্দিষ্ট আঞ্চলিক জীবনের স্থানিকতার মধ্যে তাঁর বিজ্ঞানী-দৃষ্টি পুরোপুরি সংহত হতে চায়নি। সাহিত্যিক হিসাবে এটা মানিকের দুঃসাহসও বটে।^{৬১}

পরিশেষে বলা যায়, লোকজীবন সম্পর্কিত উপন্যাস রচনা করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাস জগতে অবিস্মরণীয় স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি উপন্যাসের প্রয়োজনে চরিত্রগুলোর মুখে লোকশব্দ বা উপভাষা প্রয়োগ করেছেন। গ্রামের লোকঐতিহ্য, লোক-সংস্কার, লোক-উৎসবের বিবরণ উপন্যাসিক তুলে ধরেছেন চমৎকারভাবে। তাই বলা যায়, বাংলার গ্রামীণ জীবন বর্ণনায় লেখক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. সঙ্গীতা মুজমদার, দুই দশকের বাংলা উপন্যাস (১৯৫০-১৯৭০), (কলকাতা: গাঙচিল, ফেব্রুয়ারি ২০১২), পৃ. ৩৫
২. গৌতম কুমার দাস, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাস গ্রামীণ জীবন ও গ্রামীণ জনপদের ভাষা, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯), পৃ. ৩০৮
৩. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ৮ম সং, ১৯৯৬), পৃ. ৫১৬
৪. নিতাই বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ জিজ্ঞাসা, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৬), পৃ. ২৪৪
৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ রচনাসমগ্র, (ঢাকা: সালাউদ্দিন বইঘর, ২০১৫), পৃ. ১৪
৬. তদেব, পৃ. ৯০
৭. ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের সর্গক্ষণ ইতিহাস, ৩য় সং., (কলকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং. প্রা: লি., ১৩৭৭), পৃ. ১৪০
৮. মুহাম্মদ আবদুল খালেক, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃ. ৫২৬
৯. ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের উইলিয়াম থমস্‌ দি অ্যাথেনিয়াম পত্রিকায় লিখিত একটি পত্রে প্রথম Folklore শব্দটি ব্যবহার করেন। 'বর্তমানে Folklore শব্দটি একশব্দ হিসেবে প্রচলিত, কিন্তু আসলে শব্দটি দুটো পৃথক অর্থবহ শব্দের সমন্বয়ে গঠিত Folk এবং Lore। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে Folklore society প্রতিষ্ঠিত হয়-এই সোসাইটির মুখপত্র Folklore Records এবং পরবর্তীকালে Folk-Lore নামে পরিচিত পত্রিকাটিতে মাঝেমাঝে একটি হাইফেন দিয়ে শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তীকালে এই হাইফেন তুলে দিয়ে শব্দটিতে একটি শব্দে রূপান্তরিত করা হয়। [দ্রষ্টব্য, ডক্টর ময়হারুল ইসলাম, ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, পৃ. ৬।] "লোক" শব্দটি অধুনা বেশ পরিচিত পেয়েছে। এসেছে ইংরেজী 'ফোক' শব্দের বাংলা পরিভাষায়। 'ফোক' শব্দে সাধারণ জন বা জনসমষ্টি বোঝায়। বাংলায় লোক শব্দের প্রচলিত অর্থ প্রায় সমান। তবে লোক অর্থে মানুষই অভিপ্রেত। কিন্তু নৃবিদ্যা ও লোকসংস্কৃতিবিদ্যার কল্যাণে লোকশব্দের পারিভাষিক অর্থ হল- সমাজন মণ্ডলী বা জনপরিমেল। এক কথায় কোনো অঞ্চলের সংহত সমাজধারায় আবদ্ধ প্রান্তবাসী জনসমষ্টি, যারা পরস্পরায় বিশ্বাসী বলে সমবেতভাবে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ সেখানে স্তিমিত। এই রকম সমাজের নাম দেওয়া হয় লোকসমাজ। প্রাচীনকাল থেকেই 'লোক' শব্দের ব্যবহার যেটুকু পাওয়া যায় তার সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত অর্থের তেমন কোনো বিরোধ নেই।'
- [দ্রষ্টব্য, জীবনেশচন্দ্র নায়ক, "বাংলা কথাসাহিত্যে লোকায়ত জীবন", সাহিত্য-প্রবন্ধ প্রবন্ধ-সাহিত্য, হীরেন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণগোপাল রায় (সম্পা.), ২য় সং., (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৯), পৃ. ৮৮৪]
১০. ডক্টর ময়হারুল ইসলাম, ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, ২য় মু., (ঢাকা: অবসর, অক্টোবর ২০১৫), পৃ. ১২
১১. শরদিন্দু ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩
১২. ময়হারুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
১৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা লোকসাহিত্য, ২য় সং., (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৫৭), পৃ. ১১-১২
১৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
১৫. তদেব, পৃ. ১৯
১৬. তদেব, পৃ. ৩৩
১৭. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, তিতাস একটি নদীর নাম, অমর দাস (সম্পা.), (ঢাকা: সুচয়নী পাবলিশার্স, ২০১৭), পৃ. ৬১
১৮. তদেব, পৃ. ৬১

১৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪
২০. তদেব, পৃ. ২৫
২১. তদেব, পৃ. ৮৬-৮৭
২২. তদেব, পৃ. ৪৭
২৩. তদেব, পৃ. ৩১
২৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসে দ্বন্দ্বিক দর্পণ, ২য় সং., (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ৮
২৫. গৌতম কুমার দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৭
২৬. তদেব, পৃ. ৩৯৩
২৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, (কলকাতা: দে'জ পাবলিকেশন, ১৯৮০), পৃ. ৪৩
২৮. বিল্লব মাজী, “ভূমিকা”, উপন্যাসের ভাষা, (কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০০৭), পৃ. ১৬
২৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬
৩০. তদেব, পৃ. ৩০
৩১. তদেব, পৃ. ৩৪
৩২. তদেব, পৃ. ১০
৩৩. তদেব, পৃ. ৪৬
৩৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৪
৩৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২
৩৬. তদেব, পৃ. ৮৭
৩৭. তদেব, পৃ. ১৪
৩৮. তদেব, পৃ. ১১
৩৯. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
৪০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২
৪১. তদেব, পৃ. ১০
৪২. তদেব, পৃ. ১২
৪৩. তদেব, পৃ. ১২
৪৪. তদেব, পৃ. ১৩
৪৫. তদেব, পৃ. ১৩
৪৬. তদেব, পৃ. ১৫
৪৭. তদেব, পৃ. ১৫
৪৮. তদেব, পৃ. ৩০
৪৯. তদেব, পৃ. ১৯
৫০. তদেব, পৃ. ২০
৫১. তদেব, পৃ. ২২
৫২. তদেব, পৃ. ৩৩
৫৩. তদেব, পৃ. ২২
৫৪. তদেব, পৃ. ২২
৫৫. তদেব, পৃ. ৩৩
৫৬. তদেব, পৃ. ২৩
৫৭. তদেব, পৃ. ২৫
৫৮. তদেব, পৃ. ২৯
৫৯. তদেব, পৃ. ৪০
৬০. তদেব, পৃ. ৫৩
৬১. মহীতোষ বিশ্বাস, বাংলা উপন্যাস-প্রসঙ্গ: আধুনিকতা, (কলকাতা: রথযাত্রা, প্রথম একবিংশ সংস্করণ, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮৯

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে কুষ্টিয়া জেলায় আন্দোলন-সংগ্রাম

ড. মো. আরিফুর রহমান*

Abstract: Kushtia was within the context of Nadia district of the Bengal presidency under the British. At the time of the creation of the state of Pakistan in 1947, Kushtia district was formed along with Kushtia itself, Chuadanga and some parts of Meherpur Sub-divisions. The anti-British movement started in this country as a result of the fakir-sanyasi movement in 1760. The people of this district took part actively in this organized anti-British movement. They were also seen to take arms in their hands to join the subsequent anti-British democratic movements. As a result of its development, India got her independence in 1947 from British Colonial rule. The glorious contribution of the Kushtia people in the independent movement of India is still untained.

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ তথা বাংলার জনপদগুলো^১ বিদেশি^২ শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তবে সে সময় স্থানীয় অধিবাসীরা স্বাধীনভাবে বসবাস করতো। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে (১৫৭৬ সাল) বাংলার জনপদগুলো মুঘল শাসনের অধীনে চলে যায়। পলাশীর যুদ্ধে ভারতের ভাগ্য বিপর্যয় এবং ইংরেজ শক্তির বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যুগ পরিবর্তনের সূচনা হয়। পরবর্তী প্রায় দু'শো বছর ভারতবর্ষ (বাংলাসহ) ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক^৩ শাসনাধীনে চলে যায়। পলাশীর যুদ্ধের পর ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহের মাধ্যমেই শুরু হয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। তবে ১৮৫৭ সালের পূর্বে গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগতভাবে আন্দোলন গড়ে উঠলেও তা পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। ১৮৫৭ সালেই প্রথম ভারতে সম্মিলিত শক্তি ব্রিটিশদের মোকাবেলা করে। কিন্তু সেখানে ভারতবাসী পরাজিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাহ্নত হতে দেখা যায়। জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকেই সে সময় গড়ে উঠে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। বিংশ শতকের প্রথম দিকে এই সব রাজনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করে। এ সময় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাত ধরেই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন চূড়ান্ত দিকে ধাবিত হতে থাকে। সমগ্র ভারতবর্ষের ন্যায় বাংলায় কুষ্টিয়া জেলার^৪ মানুষও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে কুষ্টিয়া জেলার মানুষের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। আলোচ্য প্রবন্ধে কুষ্টিয়া জেলায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনের মাধ্যমে কিভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলন বেগবান হয় তা আলোচনা করা হবে।

ব্রিটিশ আমলে আন্দোলন-সংগ্রাম

হিন্দু জমিদার ও ব্রিটিশদের অধীনে কুষ্টিয়া জেলার মানুষ তুচ্ছ কারণে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হতে থাকে। তাই তারা এক সময় বিদ্রোহী হয়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিম্নে ব্রিটিশ আমলে কুষ্টিয়া জেলায় যে সকল বিদ্রোহ ও আন্দোলন হয়েছিল তা আলোচনা করা হলো।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা বিজয়ী হলে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের সূত্রপাত ঘটে। ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ১৭৬০ সালে প্রথম বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে।^৫ মজনু শাহের নেতৃত্বে বাংলায় ফকির-সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে এ আন্দোলন সংঘটিত হয়।^৬ মুঘল শাসনের মধ্য ও শেষভাগে ভ্রাম্যমাণ ফকির-সন্ন্যাসীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে জমি-জায়গা দখল করে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে।^৭ উল্লেখ্য বিহার ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে তাদের বড় একটা অংশ বসবাস করতো। কালক্রমে প্রয়োজনের তাগিদে তারা কৃষক ও কারিগর শ্রেণিতে পরিণত হয়। ইংরেজ শাসনের পূর্বে ভারতের কোন শাসকই সন্ন্যাসী ও ফকিরদের দলগতভাবে তীর্থ ভ্রমণে বাঁধা দেয় নাই। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে বিহার ও বাংলার ইংরেজ শাসকরা তাদের তীর্থ ভ্রমণে বাঁধা দেয়। শাসকগণ তীর্থ যাত্রীদের মাথাপিছু বিভিন্ন প্রকারের কর ধার্য করে।^৮ তারা একদিকে কৃষক অপরদিকে ফকির-সন্ন্যাসী। উভয় ক্ষেত্রেই তারা ইংরেজদের শোষণ ও উৎপীড়নের শিকারে পরিণত হন। ফলে বিদ্রোহ ব্যতীত তাদের জীবিকা ও ধর্ম রক্ষার অন্য কোন পথ খোলা ছিল না।^৯ তাই ফকির-সন্ন্যাসীরা সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইংরেজদের কুঠি, অফিস-কাচারি ও দেশীয় জমিদারদের উপর তারা আক্রমণ করে। তাদের রণকৌশল ছিল অতর্কিত আক্রমণ ও নিরাপদে পলায়ন। এই বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন- মজনু শাহ, মুশাক শাহ, ভবানী পাঠক, চেরাগ আলী, দেবী চৌধুরাণী, কৃপানাথ, সোবহান শাহ, করিম শাহ, মাদার বরু, নুরুল দীন, রমানন্দ গৌঁষাই ও শ্রীনিবাস।^{১০}

কুষ্টিয়া জেলাতে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। মেহেরপুর মহকুমার গাংনী থানার বেতবাড়িয়া গ্রামে মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে সন্ন্যাসীদের সবচেয়ে বড় আশ্রম ছিল।^{১১} এখান থেকে তারা কুষ্টিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন দরগা ও তীর্থক্ষেত্রে বিচরণ করতো। সেই সঙ্গে তাদের মতাদর্শও প্রচার করতো। তবে এখানে ব্রিটিশদের সঙ্গে ফকির-সন্ন্যাসীদের কোন সশস্ত্র যুদ্ধের কথা শোনা যায় না। হিন্দুভূষণ ছিলেন এই এলাকার ফকির-সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে। তাঁর নেতৃত্বে বেতবাড়িয়া আশ্রমে সন্ন্যাসী ও কৃষকদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হতো।^{১২} বহু বছর পর এই পরিত্যক্ত আশ্রমের মধ্য থেকে তলোয়ার ও অন্যান্য দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। ১৭৮৭ সালে ফকির মজনু শাহ মৃত্যুবরণ করেন। ফলে আন্দোলনের সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে এবং ফকির-সন্ন্যাসীদের মধ্যে সমঝোতা না থাকায় এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৮০০ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন চালু ছিল।

প্রজা বা কৃষক বিদ্রোহ

ব্রিটিশ আমলে জমিদারদের অধীনে যে সকল প্রজা ছিল তাদের প্রায় সকলেই কৃষক ছিলেন। তাই এই আন্দোলনকে কেউ প্রজা আন্দোলন আবার কেউবা কৃষক আন্দোলন বলে। বাংলার কৃষক বিদ্রোহগুলো বিচ্ছিন্নভাবে আরম্ভ হলেও তা পরবর্তীতে সুসংগঠিত রূপ লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, গাঁরো-হাজংদের বিদ্রোহ ও পাগলাপন্থী বিদ্রোহ প্রভৃতির মূল লক্ষ্য ছিল কৃষক সমাজকে শৃঙ্খলমুক্ত করে অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়ন।^{১৩} সে সময় কুষ্টিয়ায় জমিদারদের তেমন দৌরাত্ম ছিল না।^{১৪} ফলে এই এলাকার নায়েব-গোমস্তারা বেশি অত্যাচার করতো। ১৭০৪ সালে কুষ্টিয়া জেলা মুর্শীদ কুলি খানের অধীনে ছিল।^{১৫} পরবর্তীতে তিনি নাটোরের জমিদারের নিকট এই জেলা ইজারা দেন। কুষ্টিয়ার মুসলমানরা বেশিরভাগই ছিল ভূমিহীন চাষি। তারা হিন্দু জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের জমি চাষ করতো। এ জেলায় বড় কোন জমিদার না থাকলেও, ২/১ জন বড় জোতদার ছিল। জোতদারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- সাঁওতাল চাঁদ মিয়া, লাহিনী পাড়ার মীর মোয়াজ্জেম হোসেন (মীর মশাররফ হোসেনের পিতা),

মহিপুরের ময়েজ উদ্দিন ও ধরমপুরের মকবুল খাঁ প্রমুখ।^{১৬} তবে এই সমস্ত জোতদাররা কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছিল। কৃষক বিদ্রোহের সময় মীর মশাররফ হোসেনের ‘জমিদার দর্পণ’ নাটক কৃষকদেরকে আরও উজ্জীবিত করেছিল।^{১৭} তাই ব্রিটিশ সরকার জমিদার দর্পণ নাটক বন্ধের জন্য সুপারিশ করে। কৃষক বিদ্রোহের সময় চুয়াডাঙ্গা মহকুমার কৃষকরাও পিছিয়ে ছিল না। চুয়াডাঙ্গা, দামুড়হুদাসহ অন্যান্য থানাতে এ সময় খাজনা বন্ধ আন্দোলন চলে।^{১৮} মেহেরপুরের আমঝুপিতে মেদিনীপুরের জমিদারির কাছারি ছিল। গাংনী, তেঁতুলবাড়িয়া, কাজীপুর, সহগলপুর, শালদহসহ প্রভৃতি এলাকার কৃষকরাও এক সময় জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।^{১৯} এভাবে সমগ্র বাংলার ন্যায় কুষ্টিয়া জেলাতেও ব্রিটিশবিরোধী কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয়।

ওয়াহাবি আন্দোলন

এটি একটি ধর্মীয় আন্দোলন। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক হতে বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত প্রায় একশ বছর ভারতবর্ষ তথা বাংলার সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ওয়াহাবি আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।^{২০} আরব দেশের নজদ অঞ্চলের অধিবাসী মুহম্মদ-বিন-আবদুল ওহাবের নাম থেকে ওয়াহাবি কথাটি এসেছে।^{২১} তিনি মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক ধর্মভিত্তিক প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন। এটি ছিল মূলত এক পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন।

রায়বেরিলীর সৈয়দ আহমদ ভারতবর্ষে ওয়াহাবি আদর্শ প্রচারের পথিকৃত ছিলেন।^{২২} হজ্জ পালনকালে তিনি আবদুল ওহাবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং দেশে ফিরে ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। মৌলভী ইসমাঈল, মৌলভী মাসুদ আলী, মৌলভী বিলায়েত আলী এবং মৌলভী এনায়েত আলী সৈয়দ আহমদের একনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলন প্রচারে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সৈয়দ নেছার আলী খান ওরফে তিতুমীর বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন।^{২৩} তিতুমীরের এই আন্দোলন প্রথমে ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।^{২৪} বাংলার বহু কৃষক তার আন্দোলনে যোগদান করার কারণে সেটি গণআন্দোলনে রূপ নেয়। তিতুমীর জমিদার ও নীলকরদেরকে পরাজিত করে নদীয়া, যশোর, চব্বিশ পরগনা ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে।^{২৫} তিনি নারিকেল বাড়িয়াতে একটি ‘বাঁশের কেলা’ তৈরি করে তাঁর অনুসারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কুষ্টিয়া জেলাতেও তিতুমীর ওয়াহাবি আন্দোলন গড়ে তোলেন। কুষ্টিয়া জেলা ছিল তিতুমীরের চারণক্ষেত্র। কুষ্টিয়ায় ওয়াহাবি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কুমারখালীর অধিবাসী কাজী মিয়াজান। তৎকালীন কুষ্টিয়া অঞ্চলের অনেক মুসলমান স্বধর্ম ভুলে গিয়ে লক্ষ্মীপূজা, গাজন উৎসব ও অন্যান্য পূজাসহ ইসলাম বিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়ে।^{২৬} মুসলমানদের যথাযথ শিক্ষার অভাবে তারা হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাই কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন মহকুমায় তিতুমীর ওয়াহাবি আন্দোলন প্রচার করতে থাকেন। কুষ্টিয়া সদর মহকুমাতে কয়েক হাজার ওয়াহাবি মুজাহিদ ছিলেন। কুষ্টিয়া মহকুমার প্রায় প্রতিটি থানাতে এই আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। কুমারখালীর আফিল উদ্দিন বিশ্বাস এবং আজিম উদ্দিন মোল্লা ওয়াহাবি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।^{২৭} তারা দু’জন কাজী মিয়াজানের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা মহকুমাতেও ওয়াহাবি আন্দোলনের ঢেউ লাগে। চুয়াডাঙ্গার হলিয়ামারী ও চান্দুড়িয়া গ্রামে ‘হামকল’^{২৮} বাহিনীর দুটি উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি ছিল। এই ঘাঁটি থেকে ওয়াহাবি আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালিত হতো।^{২৯} হলিয়ামারী গ্রামের সেই ওয়াহাবি ঘাঁটি এখন তিতুদহ নামে সদর থানার একটি ইউনিয়ন। ওয়াহাবি আন্দোলনের আড়ালে যে কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে তা চুয়াডাঙ্গার মানুষকে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে

আরও বেশি উজ্জীবিত করে তোলে। চুয়াডাঙ্গার বাজিতপুরে মৌলভী মহম্মদ ইসহাক ও আসিরুদ্দিন ওয়াহাবি মুজাহিদ ছিলেন।^{১০} মেহেরপুরে ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতৃত্বদেন কুমারখালীর আফিল উদ্দিন বিশ্বাস ও আজিমউদ্দিন মোল্লা। তাঁরাই ওয়াহাবি আন্দোলনকে মেহেরপুরে সাংগঠনিক রূপ দান করেন। পরবর্তীতে তারা প্রাণ ভয়ে কাবুল ও কান্দাহারে পালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত ওয়াহাবি আন্দোলন কুষ্টিয়া জেলাতে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারেনি। কারণ জমিদার ও নীলকরদের অসহনীয় অত্যাচার ও তাদের সঙ্গে অনেকগুলো সংঘর্ষে ওয়াহাবি সদস্যরা দিন দিন দুর্বল হতে থাকে। এছাড়া ব্রিটিশদের উন্নত অস্ত্রের কাছে তারা পরাস্ত হয়। তবে পরবর্তীতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এটির ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়।

ফরায়েজি আন্দোলন

ফরায়েজি আন্দোলন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় সংঘটিত একটি ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলন।^{১১} আরবি ‘ফরায়েদ’ হলো ‘ফরীদ্বাহ’ বা ‘ফরীদ্বাতুন’ এর বহুবচন। তবে ফার্সী ভাষার অনুকরণে বাংলায় এর উচ্চারণ হলো ‘ফরায়েয’ এবং তা থেকে ‘ফরায়েজি’; যার অর্থ অবশ্য পালনীয়।^{১২} উপমহাদেশে যারা হাজি শরীয়তউল্লাহ’র অনুসারী অবশ্য পালনীয় কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে, তাদেরকে ফরায়েজি বলা হয়। ১৮১৮ সালে ফরিদপুরের অধিবাসী হাজি শরীয়তউল্লাহ ধর্মীয়-সামাজিক এই আন্দোলন শুরু করেন।^{১৩} ফরায়েজি আন্দোলন শুদ্ধিবাদী পুনর্জাগরণ আন্দোলন হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়।^{১৪} ইসলামের মূল স্তম্ভ মেনে চলা ও সমাজকে পরিশুদ্ধ করা ছিল এই আন্দোলনের মৌলিক দিক। হাজি শরীয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র দুদু মিয়া (মহম্মদ মহসীন ওরফে দুদু মিয়া) ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন।^{১৫}

হাজি শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলন কুষ্টিয়া জেলাতে খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি। ওয়াহাবি আন্দোলনের কুষ্টিয়ার নেতা কাজী মিয়াজানের পরবর্তী বংশধরগণ ফরায়েজি মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।^{১৬} এ জেলাতে ফরায়েজি ও ওয়াহাবি মতবাদের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিরোধের কথা শোনা যায়। চুয়াডাঙ্গা মহকুমাতে ফরায়েজি আন্দোলনকারীদের কর্মকাণ্ড লক্ষ করা যায়। আলমডাঙ্গাতে ফরায়েজি পাড়া নামক একটি এলাকাতে ফরায়েজি মতবাদের কিছু সংখ্যক লোক এখনো বসবাস করে। মেহেরপুর শহর এবং গাংনী থানার কাজীপুরে ফরায়েজি অনুসারী লোকজনের বসতি রয়েছে।^{১৭} সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী নিজেদেরকে ফরায়েজি মতবাদের উত্তরসূরি বলে দাবি করে। দুদু মিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই আন্দোলনকে সংঘবদ্ধ ও সুসংহত করেন। পরবর্তীতে দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে অন্যান্য স্থানের ন্যায় কুষ্টিয়াতে এ ফরায়েজি আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যায়। তবে বর্তমানে ফরায়েজি আন্দোলন না থাকলেও উক্ত মতাদর্শের লোকজনের এখনো দেখা পাওয়া যায়।

সিপাহি বিদ্রোহ

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যাওয়ার একশ বছর পর ১৮৫৭ সালে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইংরেজ শাসনে ক্ষুব্ধ এবং মর্যাদা ও সুযোগ বঞ্চিত এদেশীয় সিপাহিরা ১৮৫৭ সালে সর্বাঙ্গিক একটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মঙ্গলপাণ্ডে নামক একজন সৈনিকের নেতৃত্বে ২৯ মার্চ (১৮৫৭) কলকাতার ব্যারাকপুর সেনানিবাসে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে।^{১৮} পরবর্তীতে এই আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। কোম্পানির শাসনের অবসানের লক্ষ্যে এটি ছিল ভারতবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা। প্রথমদিকে সফল হলেও শেষ পর্যন্ত এই স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়।

সিপাহি বিপ্লবের সময় কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে বাংলার তদানীন্তন ছোট লাট স্যার এফ.জে. হ্যালিডে (F.J. Halliday) প্রেরিত এক রিপোর্টে নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে সিপাহিদের অসন্তোষের কথা তুলে ধরেন।^{১৯} কুষ্টিয়ার অসন্তোষের কথা তুলে ধরে কুলছিকাটা নীলকুঠির ম্যানেজার বলেন:

Since these unhappy disturbances began the factory, business every where has gone as regularly and quietly as if mutiny in the country had never taken place. I wish only the want of rain had disbanded sepoy have done and I shall have had little indeed to make anxious.^{৪০}

সিপাহি বিদ্রোহ দমন করার পর এদেশীয় বহু সিপাহি কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরে আত্মগোপন করে।^{৪১} পরবর্তীতে এই সকল আত্মগোপনকারীদের ধরে নিয়ে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়। সিপাহি বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেয়ার অপরাধে কুষ্টিয়ার বহু গ্রামবাসীকে নির্যাতন ও হত্যা করা হয়।^{৪২}

নীল বিদ্রোহ

প্রাচীনকাল থেকেই একমাত্র ভারতবর্ষে নীল প্রস্তুত হতো বলে অনেকে মনে করে।^{৪৩} ভারত থেকে বিভিন্ন দেশে তা রপ্তানি করা হতো। বাংলায় নীল শিল্পের প্রবর্তন হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে। ১৭৭৭ সালে লুই বনার (Louis Bonnard) নামক জনৈক ফরাসি বাংলায় প্রথম নীল চাষ আরম্ভ করে।^{৪৪}

১৮১৫ সালের মধ্যে বাংলার নদীয়া (কুষ্টিয়াসহ) যশোর, খুলনা, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় অসংখ্য নীলকুঠি স্থাপিত হয়।^{৪৫} কুষ্টিয়া জেলার নীল ছিল সর্বোৎকৃষ্ট।^{৪৬} সমগ্র নদীয়ায় ১৭,৬০০ বিঘা জমিতে ৭০০ মন নীল উৎপন্ন হতো। তার মধ্যে কুষ্টিয়া অংশেই বেশি নীল চাষ হয়েছে। ৩/৪টি গ্রামকে একটি নীলকুঠির অধীনে নিয়ে আসা হতো। প্রাচীনকাল থেকেই কুষ্টিয়া জেলা জনাকীর্ণ ছিল। এ জেলার অধিকাংশ জমি পলি সমৃদ্ধ ও উর্বর ছিল।^{৪৭} ফলে নীল উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত ছিল এ জেলার জমি। তাছাড়া অসংখ্য নদ-নদী এ জেলা দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় নীল চাষ ও পরিবহনের জন্য খুবই উপযোগী ছিল কুষ্টিয়া জেলা। কুষ্টিয়া জেলার চাষীদের দিয়ে জোরপূর্বক নীলচাষ করানো হতো। তাদের প্রাপ্য মজুরি দেয়া হতো না। নীলকরদের কথামত চাষাবাদ না করলে চাষীদের উপর চলতো নির্মম অত্যাচার। নীল চাষ করতে না চাইলে চাষীদের উপর বেত্রাঘাত করা হতো। এমনকি হত্যা করারও অসংখ্য নজির আছে।^{৪৮}

কুষ্টিয়ার মত চুয়াডাঙ্গা মহকুমাতে অসংখ্য নীলকুঠি গড়ে উঠেছিল। সিন্দুরিয়া, নিশ্চিন্তপুর, লোকনাথপুর, চন্ডীপুর, খাল-বোয়ালিয়া, কাঁচিকাটা ও জোড়াদহে অন্যতম বড় নীলকুঠি অবস্থিত ছিল।^{৪৯} সিন্দুরিয়া কুঠিতে ১৮৫৮-৫৯ সালে চুয়াডাঙ্গার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নীল উৎপাদিত হতো। সিন্দুরিয়া কুঠির অধীনে ১৬ হাজার ৬৫২ বিঘা জমিতে বছরে ৯৯৭ মন নীল উৎপন্ন হতো।^{৫০} এখানে ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৩৬৮ জন ব্যক্তি নীল উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল। চুয়াডাঙ্গার অপর একটি বড় কুঠি ছিল নিশ্চিন্তপুর। ফ্রেডারিক অ্যাসকল নামে একজন ব্রিটিশ বণিক সর্বপ্রথম এখানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জোহন এন্ড রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানির সবচেয়ে বড় ঘাঁটি ছিল এ নিশ্চিন্তপুর কুঠি।^{৫১} ২৪৭ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ১৩ হাজার ২০০ বিঘা জমিতে ৯০০ মন নীল উৎপন্ন হতো। এখানে প্রায় ২ লক্ষ চাষি কাজ করতো। লোকনাথপুর কুঠিতে ১০ হাজার বিঘা জমিতে ৬০০ মনের বেশি নীল উৎপন্ন হতো। এভাবে প্রায় প্রতিটি কুঠি ব্রিটিশদের বিপুল পরিমাণ আয়ের উৎস ছিল। ইংরেজ নীলকরগণ কুষ্টিয়া জেলায় চাষীর জমি জোরপূর্বক দাদন লিখিয়ে নিয়ে কোন অর্থ না দিয়ে তাদের গরু-লাঙ্গল দ্বারা নীলচাষ করিয়ে তাদের দ্বারাই কর্তন ও পচিয়ে নীল তৈরি করে নিয়েছে। অবাধ্য নীলচাষীকে অপহরণ করে হত্যা করতো যার আর কোন সংবাদ পাওয়া যেত না। বহু লোক নীলকরদের অত্যাচারে সহায় সম্পদ ফেলে অন্যত্র পালিয়ে গেছে। নীলকরদের বিচিত্র ধরণের অত্যাচারের চিত্র সর্বত্রই প্রায় একই রকম ছিল। মাথার উপর মাটি দিয়ে তার উপর নীলের চারা বপন করে গাছ বের না হওয়া পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রাখতো। এমনই পরিস্থিতিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দামুড়হুদা উপজেলার কৃষকরা।

মেহেরপুরে নীল বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে স্থানীয় জমিদার ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে। মেহেরপুরের শিকারপুর, সিন্দুরিয়া, তেরাইল, ভোলারদাঁড় ও ষোলটাকায় উল্লেখযোগ্য নীল কুঠি ছিল।^{৫২} কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা মহকুমার ন্যায় মেহেরপুরেও নীলকরদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা যায়। রতনপুরের নাটুদহের প্রয়াত জমিদার নফরপাল চৌধুরী এই অঞ্চলে নীল বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।^{৫৩} চর গোয়ালগ্রাম কুঠির ম্যানেজার ব্রুমফিল্ড সাহেব ও নায়েব উমেশচন্দ্র ঘোষালের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কৃষক-বিদ্রোহীরা তাদেরকে হত্যা করে।^{৫৪} হাফেজ ফরাজি, হরেকৃষ্ণ মণ্ডল, ভুলু কাঞ্চি ও আছের মণ্ডল এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৮৫৯-৬০ সালের দিকে স্থানীয় নীল চাষি, কৃষক ও তিতুমীরের হামকল বাহিনী এই অঞ্চলের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। বাংলায় নীল চাষ, নীলকরদের অত্যাচার ও নীল বিদ্রোহ নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র ‘নীলদর্পণ’ নামে একটি নাটক রচনা করেন।^{৫৫} নাটকটিতে এ অঞ্চলের নীল বিদ্রোহের নানাদিক তুলে ধরা হয়।

বঙ্গভঙ্গ

সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের চারণক্ষেত্র ছিল বাংলা প্রদেশ। হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ ভুলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছে এ অঞ্চলের মানুষ। এমনই প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশরা হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পায়তারা করতে থাকে। এমতাবস্থায় বিশাল বাংলা প্রদেশে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার কথিত লক্ষ্যে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বাংলাকে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করে।^{৫৬} প্রদেশ দুটি হলো:

ক) পূর্ববঙ্গ ও আসাম, যার রাজধানী ছিল ঢাকা।

খ) পশ্চিমবঙ্গ, যার রাজধানী ছিল কলকাতা।

বাংলা প্রদেশকে বিভক্তকরণের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শক্তির ‘Divide and Rule’ বা ভাগ কর এবং শাসন কর নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।^{৫৭} ব্রিটিশদের ভেদনীতি শুধু ভৌগোলিক বা প্রশাসনিকভাবেই ভাঙা নয়, এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ নিহিত ছিল। এ সময় কুষ্টিয়া জেলা পূর্ববঙ্গের মধ্যে পড়েছিল। তখন নদীয়া জেলা তথা কুষ্টিয়া জেলাতেও বঙ্গভঙ্গের ঢেউ লাগে। কৃষ্ণনগরের কংগ্রেস নেতা তারাপদ বন্দোপাধ্যায় নদীয়া জেলায় এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।^{৫৮} এই আন্দোলকে বেগবান করতে এ সময় তিনি কুষ্টিয়া ভ্রমণ করেন। তখন মেহেরপুরে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির তহবিলে মেহেরপুরবাসীর পক্ষ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়।^{৫৯}

স্বদেশি আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটিশবিরোধী সক্রিয় স্বদেশি আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯০৫ সালের পূর্বে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। তখন বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব প্রত্যাহারের দাবিতে প্রবল আন্দোলন সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ করা হলে ১৯০৫ সালেই স্বদেশি আন্দোলন গড়ে ওঠে।^{৬০} এমতাবস্থায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট মন্ত্রে উজ্জীবিত হতে থাকে বাংলার মানুষ।^{৬১} খুলনা, বাগেরহাট ও দিনাজপুরসহ বাংলার অন্যান্য স্থানে বিলেতি পণ্য বর্জনের ঘোষণা দেয়া হয়।

কুষ্টিয়া জেলায় এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। কুষ্টিয়ায় বিদেশি পণ্য বিক্রি প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। শুধুমাত্র পণ্য বর্জনেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্রিটিশদের অধীনে কর্মরত কুষ্টিয়ার সাধারণ মানুষ পণ্য বর্জনের পাশাপাশি কর্মবিরতি আন্দোলনও শুরু করে। চুয়াডাঙ্গার অনেক কংগ্রেস নেতাকর্মী স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল। উক্ত দুই মহকুমার তুলনায় মেহেরপুর মহকুমায় স্বদেশি আন্দোলনের

প্রভাব বেশি দেখা যায়। গাংনীতে আলফাজ মিয়া'র নেতৃত্বে স্বদেশি আন্দোলন পরিচালিত হতো।^{৬২} পিয়ার সর্দার, মানিক বিশ্বাস, শুধাংশু বাগচি, শিবকালী লাহিড়ী, মনি স্যান্নাল, বিজেন বোস ও বিভূতি বাবু স্বদেশি আন্দোলনের প্রত্যক্ষকর্মী ছিলেন।^{৬৩} গাংনীতে স্বদেশি আন্দোলনের ব্যাপকতা সম্পর্কে সবদেল মণ্ডল বলেন:

ধানখোলা গ্রামের আলফাজ মিয়া স্বদেশি আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তিনি ১৯৩০ সালের দিকে গাংনী বাজারে ব্রিটিশ থেকে আমদানিকৃত ধুতি কাপড় একজন ক্রেতার কাছ থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে প্রকাশ্যে আগুন ধরিয়ে দেন। আগুন দেয়ার অপরাধে আলফাজ মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারে আলফাজ মিয়া'র এক মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়।^{৬৪}

জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলন

১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারতবর্ষে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চলছিল। এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করা যাবে না বলে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা মনে করতেন। তাই বিপ্লবীরা আমেরিকা, ফ্রান্স ও আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতাকামীদের মতো সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশের অবসান ঘটানোর চিন্তা করে।^{৬৫} ফলে ব্রিটিশ বিরোধী বৈপ্লবিক আন্দোলন সমগ্র জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ১৯০২ সালে সতীশচন্দ্র বসু 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন।^{৬৬} সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর দল' প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করে।^{৬৭} একই সময়ে কুষ্টিয়া জেলাতেও দল দুটির কার্যক্রম শুরু হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হলে অবিনাশ চক্রবর্তীর উপর দলের দায়িত্ব (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে) অর্পিত হয়। অবিনাশ, বাঘা যতীন ওরফে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে (কুষ্টিয়ার কুমারখালীর অধিবাসী) তাঁর সহকারী নিযুক্ত করেন।^{৬৮} ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে যুগান্তর দলের প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত হয় বাঘা যতীনের উপর।^{৬৯} নেতৃত্বভার গ্রহণ করার পর যতীন্দ্রনাথ বিচ্ছিন্ন প্রায় সমিতিগুলিকে সংঘবদ্ধ করেন। যতীন্দ্রনাথ যুগান্তর দলের অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে ১৯১৮ সালে কুষ্টিয়ার রায়টায় রেলের ডাকগাড়িতে ডাকাতি করেন।^{৭০} যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে জার্মানি থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র আনার পরিকল্পনা করেন।^{৭১} সেই সঙ্গে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বন্দীদের মুক্ত করে স্বাধীনতা যুদ্ধে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করে। কিন্তু ব্রিটিশদের পরাস্ত করার মতো শক্তি-সামর্থ্য অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের ছিল না। এমনকি বাঘা যতীন প্রকাশ্যে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেও পারতো না। ফলশ্রুতিতে বাঘা যতীনের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। সুশীল কুমার সেনগুপ্ত, অতুলকৃষ্ণ বোস, জ্যোতিষ চন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী প্রমুখ যুগান্তর দলের অন্যতম সহযোগী ছিলেন।^{৭২} কুষ্টিয়া শহরে আমলাপাড়ায় যুগান্তর দলের একটি বড় ঘাঁটি ছিল। কুষ্টিয়ায় অনুশীলন সমিতির মূল উদ্যোক্তা ছিলেন পি. মিত্র।^{৭৩} এ সময় যুগান্তর দল ও অনুশীলন সমিতির ঐক্য গড়ে উঠে। তবে কুষ্টিয়ায় যুগান্তর দল সক্রিয় থাকলেও অনুশীলন সমিতির কর্মকাণ্ড তেমন বিস্তৃত ছিল না।^{৭৪}

খিলাফত আন্দোলন

এটি একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে খিলাফত আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষ মিত্রপক্ষে^{৭৫} ও উসমানীয় সাম্রাজ্য অক্ষশক্তিতে যোগদান করে।^{৭৬} কিন্তু যুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয় ঘটলে মিত্রশক্তি উসমানীয় সাম্রাজ্যের রাজ্যসীমা ও শক্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস করে।^{৭৭} এমতাবস্থায় ব্রিটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও খিলাফতের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে ভারতীয় মুসলমানদের মাধ্যমে গড়ে উঠা আন্দোলনকে খিলাফত আন্দোলন বলা হয়।^{৭৮}

অন্যান্য অঞ্চলের মতো অচিরেই এই আন্দোলন কুষ্টিয়া জেলাতে ছড়িয়ে পড়ে। কুষ্টিয়া জেলার ফরায়েজি ও ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতারা এই আন্দোলনে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলন চলাকালে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন স্থানে সভা, সমাবেশ, মিছিল ও মিটিং হয়েছে। মৌলভী আফছার উদ্দিন আহমদ, শামসউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ ঈসমাইল হোসেন সিরাজী, হেমন্ত কুমার সরকার, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার নির্মল কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী, ফতেহ চাঁদ ও মৌলভী এরাফ আলী খান এই জেলায় খিলাফত আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এ সময় বরিশালের চারণ কবি মুকন্দ দাস কয়েকবার কুষ্টিয়ায় এসে গান গেয়ে এ আন্দোলনকে সমর্থন করে যান। হিন্দু জমিদার, নায়েব, গোমস্তা ও মহাজনরা এ জেলার মুসলমানদেরকে তাদের আচার-অনুষ্ঠান পালনে বাধা দিত। কিন্তু উপরোক্ত নেতৃবৃন্দের বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে খিলাফত আন্দোলন চলাকালে তারা প্রকাশ্যে এসব কাজ করার সুযোগ পেত।^{৭৯} এ সময় খিলাফত কর্মীরা মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণসহ অন্যান্য সেবামূলক কাজ করে। খিলাফতকর্মী এরাফ আলী খান ১৯২১ সালে আমবাড়িয়া সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। খিলাফত আন্দোলন চলাকালে কুষ্টিয়ার মৌলভী আফছার ও তাঁর ছোট ভাই মৌলভী শামসউদ্দীন খেফতার হন।^{৮০} এ সময় তাদের মুক্তি ও উসমানীয় সাম্রাজ্যের খিলাফত পুনরুদ্ধার করার জন্য শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা মহকুমাতেও খিলাফত আন্দোলন ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এ আন্দোলনের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণ প্রতিবাদ সভা-সমাবেশ করে। উক্ত আন্দোলনের সময় মুসলমানরা ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি, পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরিধান করতেন।^{৮১} ১৯২০ সালের শেষ দিকে গাংনীর গাঁড়াডোবের মুন্সী জমিরুদ্দীন বিদ্যা বিনোদের নেতৃত্বে খিলাফত কমিটি গঠিত হয়।^{৮২} খিলাফত কমিটির নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়। প্রয়োজন হলে তুরস্কে যুদ্ধে যাবার সম্মতিসহ তাদের একটি তালিকা তৈরি করা হয়। ১৯২১ সালের মধ্যবর্তী সময় মেহেরপুরের মানুষ এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। কারণ এ সময় ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ ও স্বদেশি আন্দোলন চলছিল। কিন্তু হঠাৎ করে মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ফলশ্রুতিতে এ অঞ্চলেও আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। গান্ধীজি যে ঐক্যের আশায় খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল দিন দিন তা মরীচিকার মতো মিলিয়ে যায়। অনেকে মনে করতেন খিলাফত এর সমস্যা ছিল উসমানীয় সাম্রাজ্যের নিজস্ব ব্যাপার। তার সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের যুক্ত করা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। এছাড়া বেশ কিছু স্থানে আবারো সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ পরিলক্ষিত হয়। ফলশ্রুতিতে মহাত্মা গান্ধী এ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। খিলাফত আন্দোলনের প্রভাব কুষ্টিয়া জেলার মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে। ধর্মীয় কুসংস্কার সম্পর্কেও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। কুষ্টিয়াতে খিলাফত আন্দোলনের যবানিকাপাত ঘটলেও পরবর্তীকালে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে খিলাফত আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

অসহযোগ আন্দোলন

অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি ছিল খিলাফত আন্দোলন। ১৯২০ সালে গান্ধীজি ব্রিটিশ সরকারকে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান হতে বিরত থাকার জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান জানান।^{৮৩} এ সময় কংগ্রেসের অধিবেশনে সর্বাঙ্গিক অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জনগণ এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

সমগ্র ভারতবর্ষের ন্যায় কুষ্টিয়া জেলাতে এই আন্দোলনের কার্যক্রম লক্ষ করা যায়। মৌলভী শামসউদ্দীন আহমদ, মৌলভী আফছার উদ্দীন আহমদ, হেমন্ত কুমার সরকার, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার নির্মল কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী ও ফতেহ চাঁদ প্রমুখ কুষ্টিয়া জেলায়

অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।^{৮৪} কুষ্টিয়ায় ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করে, আইনজীবীরা আদালত বর্জন করে, কৃষকরা খাজনা বন্ধের আন্দোলন শুরু করে ও শ্রমিকরা শুরু করে ধর্মঘট। অসহযোগ আন্দোলনের দায়ে মৌলভী আফছার উদ্দীনকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিবাদে হাজার হাজার জনতা কুষ্টিয়া বড় রেল স্টেশনের নিকট রেল লাইনের উপর শুয়ে পড়ে।^{৮৫} অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় থাকায় সুখময় বন্দোপাধ্যায়, ফতেহ চাঁদ ও মৌলভী শামসউদ্দীন আহমদকে গ্রেফতার করা হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ চুয়াডাঙ্গা মহকুমাতে লক্ষ করা যায়। চুয়াডাঙ্গার সর্বস্তরের মানুষ অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। চুয়াডাঙ্গার অনন্তহীর মিত্র, তারাপদ, পণ্ডিত রবীন্দ্র আচার্য ও ফণীভূষণ রায় প্রমুখ এই আন্দোলনে জড়িত ছিল।^{৮৬} মেহেরপুরের সুধাংশ বাগচী, গাড়াডোবের শিবকালী লাহিড়ী, মনি স্যান্নাল, বিজেন বসু, বিভূতি বারু, পরিমল বাগচী ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অসহযোগ আন্দোলনের নেতা ছিলেন।^{৮৭} আপাতদৃষ্টিতে এ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এটা সমগ্র ভারতবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এক অজেয় উদ্দীপনা এবং আত্মোৎসর্গের এক মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। এই আন্দোলন সকল ধর্মের ও বর্ণের ভারতবাসীকে একই জাতীয়তাবোধের আদর্শে সংকল্পবদ্ধ করে।

আইন অমান্য আন্দোলন

১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়।^{৮৮} গান্ধীজি বড়লাট অরউইনকে ১১ দফা দাবি সম্বলিত চরমপত্র পাঠালে তা নাকচ হয়ে গেলে ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। ১১ দফা দাবিতে তিনি সকল শ্রেণির স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেন। ১১ দফার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দাবি- ক) কৃষকদের জন্য ৫০% খাজনা হ্রাস; খ) লবণ শুষ্ক লোপ করা; গ) বিনিময় হারের পরিবর্তন ও শুষ্ক সংরক্ষণ করা ও ঘ) রাজবন্দিদের মুক্তি ও রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার। গান্ধীজি প্রথমে ‘লবণ আইন’^{৮৯} অমান্য করে এই আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৯৩০ সালের ৬ এপ্রিল গান্ধীজি ডাঙিতে সমুদ্র তীরে লবণ তৈরি করে আইন ভঙ্গ করলে সমগ্র ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলন বিস্তার লাভ করে।

কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর মহকুমাতে আইন অমান্য আন্দোলন ততটা প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও চুয়াডাঙ্গাতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। চুয়াডাঙ্গাতে মদ, গাঁজা ও বিলাতি পণ্যের দোকানে পিকেটিং, সভা, শোভাযাত্রা, নিষিদ্ধ লবণ প্রস্তুত ও রাজদ্রোহমূলক পুস্তক পাঠ করে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে।^{৯০} সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলে স্বেচ্ছাসেবকরা তা অমান্য করে আন্দোলন চালাতে থাকে। আইন অমান্যের অভিযোগে আলমডাঙ্গার ছাত্র সমিতির সম্পাদক রণজিৎ সরকারকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া হরিদাস ভট্টাচার্য, ষষ্ঠীচরণ বিশ্বাস ও সরোজ সরকারকে গ্রেফতার করা হয়।^{৯১} তখন মূল নেতৃবৃন্দ কারাগারে থাকলেও বৈজনাথ বগলা ও শক্তিপদ চক্রবর্তী আন্দোলনকে অব্যাহত রাখে। এ সময় আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। তখন গিরীনাথ কুণ্ডু ও নির্মল নলিনী কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গার নেতৃবৃন্দকে নিয়ে চুয়াডাঙ্গাতে নতুন করে সংগঠিত হতে থাকেন। ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু চুয়াডাঙ্গা সফরে আসেন।^{৯২} তাঁর নির্দেশে হরিদাস ভট্টাচার্য ও সরজিৎ বন্দোপাধ্যায় এই আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। এ সময় তাঁরা কার্পাসডাঙ্গা, নাটুদহ, মহাজনপুর, দামুড়হুদা প্রভৃতি জায়গায় জনসভা করেন।^{৯৩} পরবর্তীতে কেন্দ্রীয়ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন স্তিমিত হতে থাকলে কুষ্টিয়া জেলাতেও এই আন্দোলনে ভাটার টান পড়ে। তারপর আস্তে আস্তে তা বন্ধ হয়ে যায়।

ভারত ছাড় আন্দোলন

১৯৪২ সালে ভারতবর্ষে ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু হয়।^{৯৪} ভারত ছাড় আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ হটাও আন্দোলন শুরু হয়। এটি তখন গণআন্দোলনে পরিণত হয়। ভারত ছাড় আন্দোলনে বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে। চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা থানায় এ সময় ভারত ছাড় আন্দোলনের পক্ষে শোভাযাত্রা বের করা হয়। চুয়াডাঙ্গায় শচীন্দ্রনাথ, সিংহরায়, পুলকেশ গোস্বামী, পল্টু বাগচী, শ্যামলাল বিশ্বাস, লালমোহন বিশ্বাস, অজিত নাথ, কমলেশ গোস্বামী ও রাধাবল্লব সূত্রধর প্রমুখ ভারত ছাড় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।^{৯৫} চুয়াডাঙ্গায় এই আন্দোলনের বিপ্লবীরা টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং রেল সেতু বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে তারা সফল হয়নি। তখন ব্রিটিশদের বিভিন্ন সরকারি অফিস-আদালতে হামলা চালানো হয়। এই সব বিপ্লবীদের সাধারণ মানুষ অর্থ, খাদ্য ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। এভাবে সর্বোত্তমভাবে ভারত ছাড় আন্দোলনে এ জেলার মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তেভাগা বা কৃষক আন্দোলন

মহাযুদ্ধ, মনস্তর ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উত্তর ঔপনিবেশিক ভারতে শোষিত কৃষক সমাজের ঐক্যবদ্ধ মুক্তিসংগ্রামই ছিল তেভাগা আন্দোলন।^{৯৬} দীর্ঘ দিনের ঔপনিবেশিক শোষণ, মজুতদার এবং অসৎ ব্যবসায়ীরা কৃষকদের অত্যাচারের ফলে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়। ভারতবর্ষের এই কৃষক আন্দোলনে কুষ্টিয়া জেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষক আন্দোলনের সময় বাংলাতে ১৯২০ সালে কুষ্টিয়া জেলার দামুড়হুদা থানাতে প্রথম কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।^{৯৭} নদীয়া জেলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হতে হাজার হাজার কৃষক এই সম্মেলনে যোগ দেয়। চুয়াডাঙ্গার খ্রিস্টান মিশনের পাদ্রী ফাদার বারেতা শুধু উদ্যোক্তাই ছিলেন না, তিনিই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।^{৯৮} কার্পাসডাঙ্গার এই কৃষক সম্মেলনের পর কুষ্টিয়া জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে সমাবেশ ও আন্দোলনের খবর পাওয়া যায়। কুষ্টিয়ার পোড়াদহ ও ভেড়ামারা অঞ্চলে কৃষকরা সংঘটিত হয়ে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। অবিভক্ত নদীয়া জেলার মেদিনীপুর জমিদারির বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া জেলায় প্রবল কৃষক আন্দোলন পরিচালিত হয়। তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলায় সক্রিয় বঙ্গীয় প্রজা সমিতির নেতৃত্বে আন্দোলন বেগবান হয়েছিল। কুষ্টিয়ার মৌলভী আফহার উদ্দীন আহমদ ও তাঁর ভাই শামসউদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে ১৯২৫ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গড়ে উঠে।^{৯৯} কৃষকদের অধিকার আদায়ের দাবিতে ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে এই সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হেমন্ত কুমার সরকারের উদ্যোগে ১৯২৯ সালে কুষ্টিয়ায় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই কৃষক সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মোজাফফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম, ত্রিপুরার ওয়াসিমুদ্দীন এবং গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ফিলিপ স্প্রাট উপস্থিত ছিলেন।^{১০০} ১৯৩৭ সালে বাঁকুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় কৃষক সম্মেলন। এই সম্মেলনে কুষ্টিয়া জেলা থেকে কৃষক কর্মীরা যোগদান করে।

১৯৩৮ সালে কুষ্টিয়া সদর থানার হরিনায়ণপুর গ্রামে বঙ্গীয় কৃষক সভার নদীয়া জেলা শাখার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আব্দুল মোমিন সভার সভাপতিত্ব করেন। কুষ্টিয়ার তিলকপুর গ্রামে ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় কৃষক সভার নদীয়া জেলা শাখার দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।^{১০১} মৌলভী আবুল হায়াত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় কুষ্টিয়া মহকুমায় ব্যাপক দুরবস্থা দেখা দিলে কৃষকরা ভুখা মিছিল বের করে। সেই সঙ্গে খয়রাতী সাহায্যের দাবি জানায়। ১৯৪৫ সালের ১৩-১৪ মার্চ বর্ধমান জেলার হাট গোবিন্দপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় কৃষক সম্মেলন। কুষ্টিয়া জেলা থেকে বহু কৃষক কর্মী পায়ে হেটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। এভাবে তে-ভাগা বা কৃষক আন্দোলনে কুষ্টিয়া জেলার অধিবাসীদের অসামান্য অবদান রাখতে দেখা যায়।

উপসংহার

প্রাচীনকাল থেকেই কুষ্টিয়া জেলার আন্দোলন-সংগ্রামের ঐতিহ্য রয়েছে। ব্রিটিশ আমলে প্রায় সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই জেলা। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। তারপর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শুরুতেই ভারতবর্ষে যে গুটি কয়েক অঞ্চলে বিদ্রোহ শুরু হয় এই জেলা তার মধ্যে অন্যতম। ভারতবর্ষে নীল আন্দোলনে কুষ্টিয়া জেলা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ফকির-সন্ন্যাসী, ওয়াহাবি, ফরায়েজি ও সিপাহী বিদ্রোহের মত গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে কুষ্টিয়ার জনগণ অসামান্য অবদান রাখে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ বিরোধী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কুষ্টিয়াবাসীর সক্রিয় অবদান ছিল। দীর্ঘ-আন্দোলনের ফলে প্রায় দু'শ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতবর্ষ মুক্ত হয়। ভারতবর্ষের ব্রিটিশবিরোধী মহান স্বাধীনতা আন্দোলনে বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার অধিবাসীরাও গৌরবে অংশীদার হয়ে রয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ প্রাচীন যুগে বাংলাদেশে কোন অখণ্ড রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিল না। বাংলার বিভিন্ন অংশ তখন বঙ্গ, পুন্ড্র, রাঢ়, গৌড়, সমতট ও হরিকেল প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে কুষ্টিয়া বঙ্গ ও সমতট জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে অনেকে মনে করেন।
- ^২ খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে গ্রীক বীর আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।
- ^৩ ল্যাটিন শব্দ 'কলোনিয়া' (Colonia) থেকে ইংরেজি 'কলোনি' (Colony) বা উপনিবেশ শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। উপনিবেশ শব্দটির মূল অর্থ হলো মানব সমাজের একটি স্থানান্তরিত অংশ। রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে উপনিবেশ বলতে বোঝায় রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন একটি ভূখণ্ড, যে ভূখণ্ড উক্ত রাষ্ট্রের কাছে নির্দিষ্টভাবে আনুগত্য প্রকাশ করে। আবার অনেকের মতে, কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিকানাধীন দূরবর্তী ভূখণ্ডকে উপনিবেশ বলে।
- ^৪ ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগের সময় কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর মহকুমার কিছু অংশ নিয়ে কুষ্টিয়া জেলা (বৃহত্তর কুষ্টিয়া) পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৮৪ সালে বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা ভেঙ্গে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর নামে তিনটি পৃথক জেলা গঠিত হয়। তখন থেকে পূর্বের কুষ্টিয়া জেলাকে বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা বলা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে কুষ্টিয়া জেলা বলতে বৃহত্তর কুষ্টিয়া বোঝানো হয়েছে।
- ^৫ সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* (কলকাতা: বুক ওয়ার্ল্ড, ১৯৬৬), পৃ. ১৭।
- ^৬ Shirajul Islam, 'Protest Movements and Insurgencies in the Eighteenth and Nineteenth Centuries', Shirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh, 1704-1971*, Vol-I (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1997), p. 145.
- ^৭ সুপ্রকাশ রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭।
- ^৮ রফিকুর রশীদ, *মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯), পৃ. ২৬।
- ^৯ সুপ্রকাশ রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮।
- ^{১০} রফিকুর রশীদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬।
- ^{১১} *ঐ*।
- ^{১২} *ঐ*।
- ^{১৩} আলী আহাম্মদ খান আইয়োব, *নেত্রকোণা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯), পৃ. ২৪।
- ^{১৪} রাজিব আহমেদ, *দামুড়হুদা উপজেলার ইতিহাস* (ঢাকা: আনন্দধারা, ২০১১), পৃ. ২৭।
- ^{১৫} শামসুল হুদা, *কুষ্টিয়ার ইতিহাস ঐতিহ্য মুক্তিযুদ্ধ*, দ্বিতীয় খণ্ড (কুষ্টিয়া: খন্দকার মোদাছেদ আলী, ২০১০), পৃ. ৪৯।
- ^{১৬} *ঐ*, পৃ. ৫২।
- ^{১৭} *ঐ*।
- ^{১৮} *ঐ*, পৃ. ২৭।

- ১৯ সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, *মেহেরপুরের ইতিহাস* (মেহেরপুর: বইসাগর, ১৯৯৩), পৃ. ১২।
- ২০ কাজী সুফিউর রহমান, 'ওয়াহাবি-ব্রিটিশ সম্পর্ক (১৯০৫-১৯২৫): রাজশাহী জেলা', *আইবিএস জার্নাল সংখ্যা-১১, ১৪১০* (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: আইবিএস, ২০০৪), পৃ. ৩৫।
- ২১ আবদুল মওদুদ, *ওয়াহাবী আন্দোলন* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৫), পৃ. ৮।
- ২২ Ram Gopal, *Indian Muslims: A Political History (1858-1947)*, (Calcutta: Asia Publishing House, 1959), p. 22.
- ২৩ A.F. Salauddin Ahmed, *Bangladesh Tradition and Transformation* (Dhaka: UPL, 1987), p. 3.
- ২৪ Muin-ud-Din Ahmad Khan, 'Muslim Reform Movement', Shirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh, 1704-1947, Vol-3* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1997), p. 213.
- ২৫ শ.ম. শওকত আলী, *কুষ্টিয়ার ইতিহাস* (কুষ্টিয়া: মণিকা কুটির, ১৯৭৮), পৃ. ৪৯।
- ২৬ ঐ, পৃ. ৫০।
- ২৭ শামসুল হুদা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬।
- ২৮ ওয়াহাবি আন্দোলনে নীল কুঠি ও মহাজনদের গোলাবাড়ি আক্রমণ ও ধ্বংসের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষিত একটি বাহিনী ছিল। তাদেরকে হামকল বাহিনী বলা হতো। হামকল বাহিনীর সদস্যরা ওয়াহাবি আন্দোলনের নিয়মিত যোদ্ধা ছিলেন।
- ২৯ রাজিব আহমেদ, *চুয়াডাঙ্গা জেলার ইতিহাস* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮), পৃ. ৪৩।
- ৩০ রাজিব আহমেদ, *চুয়াডাঙ্গা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮), পৃ. ২৬।
- ৩১ মোঃ ফায়েক উজ্জামান, 'বাংলার ফরায়েজি আন্দোলন ও সাইরেনিকার সানুসি আন্দোলন, উদ্দেশ্য ও তুলনামূলক পর্যালোচনা', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, চতুর্বিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৬), পৃ. ১৫৩।
- ৩২ মুঈন-উদ-দীন আহমদ খান, গোলাম কিবরিয়া (অনুদিত), *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭), পৃ. ১১।
- ৩৩ Muin-ud-Din Ahmad Khan, *op.cit.*, p. 191.
- ৩৪ মুঈন-উদ-দীন আহমদ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২।
- ৩৫ Muin-ud-Din Ahmad Khan, *op.cit.*, p. 201.
- ৩৬ রফিকুর রশীদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭।
- ৩৭ Muin-ud-Din Ahmad Khan, *Muslim Struggle for Freedom in Bengal* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1960), p. 40.
- ৩৮ Ashraf Siddiqui (ed.), *Bangladesh District Gazetteers, Kushtia* (Dacca: Bangladesh Government Press, 1976), p. 35.
- ৩৯ শ.ম. শওকত আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪-৫৫।
- ৪০ রফিকুর রশীদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭-২৮।
- ৪১ শ. ম. শওকত আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৫।
- ৪২ প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত, *নীল বিদ্রোহ ও বাঙালি সমাজ* (কলকাতা: র্যাডিকেল বুক ক্লাব, ১৯৬০), পৃ. ১।
- ৪৩ ঐ, পৃ. ৫।
- ৪৪ শ. ম. শওকত আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৫।
- ৪৫ ঐ, পৃ. ৫৬।
- ৪৬ রাজিব আহমেদ, *চুয়াডাঙ্গা জেলার ইতিহাস*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯।
- ৪৭ শ.ম. শওকত আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭।
- ৪৮ মো. হামিদুল হক মুন্সী, *আন্দোলন-সংগ্রামে চুয়াডাঙ্গা* (ঢাকা: এক মুঠো রোদুর, ২০০৬), পৃ. ১৭।
- ৪৯ রাজিব আহমেদ, *বাংলায় নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহ* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮), পৃ. ২৭।

- ৫১ ঐ ।
- ৫২ রফিকুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০ ।
- ৫৩ সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮ ।
- ৫৪ রফিকুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১ ।
- ৫৫ ব্লেয়ার বি কিং, ফরহাদ খান ও জুলফিকার আলী (অনু.), *নীল বিদ্রোহ, বাংলায় নীল আন্দোলন (১৮৫৯-১৮৬২)* (ঢাকা: আইসিবি, ১৯৫৯), পৃ. ১৪১ ।
- ৫৬ Ram Gopal, *op.cit.*, p. 12.
- ৫৭ মো. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯০৫-৪৭* (ঢাকা: তাম্রলিপি, ২০০৮), পৃ. ২৩ ।
- ৫৮ রফিকুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩ ।
- ৫৯ ঐ
- ৬০ মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮), পৃ. ৭ ।
- ৬১ কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিচ্রমা* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানি, ১৯৮৬), পৃ. ৬০০ ।
- ৬২ সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭ ।
- ৬৩ ঐ ।
- ৬৪ ঐ ।
- ৬৫ মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮ ।
- ৬৬ Petter Heehs, 'Revolutionary Terrorism', Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh 1704-1971, Vol-1* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1997), p. 206.
- ৬৭ মো. মাহবুবুর রহমান, *একাত্তরে গাইবন্ধা* (ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা, ২০০৫), পৃ. ২৬ ।
- ৬৮ শ. ম. শওকত আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬ ।
- ৬৯ ম. মনিরউজ্জামান, 'কুষ্টিয়া চরিতাভিধানের রূপরেখা', আনোয়ার আলী (সম্পা.), *১৩৮ তম বর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ ১৮৬৯-২০০৭*, (কুষ্টিয়া: কুষ্টিয়া পৌরসভা, ২০০৭), পৃ. ১২৫ ।
- ৭০ শামসুল হুদা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫ ।
- ৭১ শ. ম. শওকত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭ ।
- ৭২ শামসুল হুদা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭ ।
- ৭৩ শ. ম. শওকত আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬ ।
- ৭৪ ঐ ।
- ৭৫ ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, রাশিয়া, বেলজিয়াম, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও জাপানের সম্মিলিত শক্তিকে মিত্রশক্তি বলা হয়। আর জার্মানির নেতৃত্বে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও তুরস্কের সম্মিলিত শক্তিকে অক্ষশক্তি বলা হয় ।
- ৭৬ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাঙলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ১ ।
- ৭৭ শওকত আরা হোসেন, 'খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন এবং বাংলার রাজনীতি', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি), পৃ. ১০১ ।
- ৭৮ ঐ ।
- ৭৯ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২ ।
- ৮০ ঐ, পৃ. ১৬৩ ।
- ৮১ রাজিব আহমেদ, *চুয়াডাঙ্গা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯ ।
- ৮২ রফিকুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩ ।
- ৮৩ V.D. Mahajan, *Advanced History of India* (New Delhi: S. Chand and Company Ltd., 1993, Reprinted), p. 260.

- ৮৪ ঐ।
- ৮৫ শামসুল হুদা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১।
- ৮৬ রাজিব আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯।
- ৮৭ রফিকুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।
- ৮৮ V.D. Mahajan, *op.cit.*, p. 265.
- ৮৯ তৎকালীন ভারতীয় আইনে সুযোগ-সুবিধা থাকলেও জনগণ লবণ তৈরি করতে পারতো না। সরকারের লবণ কারখানা থেকে শুদ্ধ ও চড়া দামে লবণ ক্রয় করতে হতো।
- ৯০ রাজিব আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা জেলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬।
- ৯১ রাজিব আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।
- ৯২ ঐ, পৃ. ৫০-৫১।
- ৯৩ রাজিব আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা জেলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭।
- ৯৪ V.D. Mahajan, *op.cit.*, p. 270.
- ৯৫ রাজিব আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১-৫২।
- ৯৬ শরীফ আতিক-উজ-জামান, 'তে-ভাগার গল্প কৃষক আন্দোলনের ঐতিহাসিক দলিল', বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিংশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০২), পৃ. ৪৭।
- ৯৭ কুমুদনাথ মল্লিক, বিলু কবীর (সম্পা.), নদীয়া-কাহিনী (ঢাকা: বইপত্র, ২০১১), পৃ. ৪৪৫।
- ৯৮ ঐ, পৃ. ৪৪৬।
- ৯৯ ঐ, পৃ. ৪৪৭।
- ১০০ ঐ।
- ১০১ রাজিব আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: ধারা ও প্রবণতা

ড. মো. হারুন-অর-রশীদ*

[Abstract: The study mainly highlights some elements of the international affairs. Such as expectations for peace, national peace, nationalism, imperialism and colonialism, diplomacy, trade and commerce, balance of power, collective security and peaceful settlement, conflict of civilization and so on. Nevertheless, other additional image of the international affairs have briefly discussed in the article. The article assesses the role of the different big power during the 20th and starting of the 21st centuries about the international relation. Most of the big states tried their level best to retain it supremacy according to their needs and objectives in the word politics. The study is providing the useful information for the next generation having teaching and learning of international affairs.]

ভূমিকা

বিশ্ব সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে দ্রুত অনেক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, তবে যুদ্ধ হচ্ছে বিশ্বের নেতৃত্বের পরিবর্তন ও কৌশলগত অবস্থায়। পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় মানব সমাজ অবশেষে কোন ধরনের আকার ধারণ করবে তা বলা বেশ কঠিন। বিগত এক শতাব্দীতে বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলে যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে স্থিতিশীল কোন ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। বরং বিশ্বব্যাপী একটা অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার আবহ বিরাজ করছে। তাই বর্তমান ব্যবস্থাকে একটি অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

শান্তির প্রত্যাশা (Expectation Peace)

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় নতুন পরিবর্তনের লক্ষ্য করা গেলেও বিশ্ব এখনো ক্লাসিকাল ব্যবস্থা (classical system) থেকে মুক্ত হয়নি। জাতি-রাষ্ট্র (nation-state), রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতার ভারসাম্য প্রভৃতি ধারণাগুলো এখনো গতানুগতিক ধারণার দ্বারা কম-বেশী প্রভাবিত। তবে আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও বস্তুগত চাহিদাগুলো প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলো ধারণ ও পূরণ করতে যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগের প্রভূত অগ্রগতির ফলে সমগ্র বিশ্ব একটি ‘গ্লোবাল ভিলেজ’ এ পরিণত হওয়ায় চাহিদার ধারণাও অনেক পাল্টে গেছে যা প্রচলিত জাতি-রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার। অবশ্য এটাও অনস্বীকার্য যে, জাতি-রাষ্ট্রের কাঠামোর চাইতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কল্পিত উন্নয়ন না ঘটায় তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রাখতে পারছে না।

* প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

অপরদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির যথেষ্ট সুযোগ নিয়ে মানবতার নিরাপত্তা বিষয়টিকে উপেক্ষা করে উচ্চাভিলাসী কতিপয় জাতি-রাষ্ট্র, বাণিজ্যিক ও আধিপত্যবাদী মানসিকতা নিয়ে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করেছে। Toynbee বলেন, “Our problem is that technique have established a rudimentary world community but have not integrated it organically, morally or politically. They have created a community of mutual dependence, but not of mutual trust and respect”.^১

যে মারণাস্ত্রের অভিশাপে মানবতা প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল, সেখান থেকে মানব জাতি কী বেশী দূর অগ্রসর হতে পেরেছে? উপনিবেশবাদ, আধিপত্যবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র-কমিউনিজম, জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, গনতন্ত্র প্রভৃতি নীতি ও আদর্শবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মানবজাতি প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু সমাজের প্রধান প্রধান মৌলিক সমস্যা যেমন- খাদ্যাভাব, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বাসস্থান সংকট, চিকিৎসার অভাব, বর্ণ বৈষম্য, ধর্মীয় উগ্রতা, অনৈতিকতা, স্বৈরাশাসন, দুর্নীতি ও শোষণের মত অনাকাঙ্খিত বিষয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে শুরু হওয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জোয়ার প্রায় অর্ধশতাব্দী সময়কালে বিশ্বে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেও তা সংশ্লিষ্ট জাতি-গোষ্ঠির টেকসই ভাগ্যোন্নয়নে কোন স্থিতিশীলতার ধারা বজায় রাখতে পারেনি। বরং তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে ধ্বংসে পড়ে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো ও তার আন্তর্জাতিক প্রভাব বলয় যদিও মানব জাতিকে বিশেষ কিছু দিতে পারেনি, তবে পুঁজিবাদ ও আধিপত্যবাদী পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী দেয়াল নির্মাণ করে বিশ্ব ব্যবস্থায় (world system) একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু কমিউনিজমের পতনের ফলে সে দেয়ালটি ভেঙে পড়েছে। ফলে এক মেরুকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বে একক শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নবতর প্রেক্ষাপটেও পুরানো ইস্যুগুলোই এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশ্ব সমাজ এখন গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তনের মুখোমুখি। ঐতিহাসিক টয়েনবির মতে,

“For the first time in history man has at his disposal the knowledge and the facilities for providing a decent standard of livelihood for virtually the entire human race. He also has at his disposal, again for the first time in history, ‘power without limit,’ capable of destroying countless millions of people entire nations, and even civilization”.^২

দীর্ঘকাল আগে টয়েনবি যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, তা এখন যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। আজকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার সুযোগ নিয়ে বঙ্গোপসাগর অর্জন ও প্রয়োগের জন্য প্রতিযোগিতা চলছে যা সভ্যতার প্রতি বড় হুমকি। ফলশ্রুতিতে পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের যঁতাকলে পিষ্ট মানব সমাজ অন্তর্বর্তী এ সময়ে পুনরায় যুদ্ধ ও ধ্বংসের আতংকে আতংকিত।

মানব সভ্যতার বিকাশের এ যুগে বিভিন্ন জনগোষ্ঠি ও জাতি-রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে কোন পরিবর্তন সকল মানুষকেই তার ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত আচরণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠির আদর্শিক চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ বিশ্বের সকল সমাজকেই আন্দোলিত করে। এখন যে সকল বিষয় ও উপাদানগুলো জাতি-রাষ্ট্রের শক্তি যোগাতে ও ভূমন্ডলীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো আলোচনার বিষয় হতে পারে।

জাতীয় শক্তি (National Power)

জাতীয় শক্তি বলতে বুঝায় এক বা একাধিক রাষ্ট্রের উপর একটি রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা এবং নিজের উপর অন্য রাষ্ট্রের অনুরূপ প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাকে প্রতিহত করার সামর্থ্য। অন্য অর্থে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োগকৃত সকল ক্ষমতার সমষ্টিকেও জাতীয় শক্তি বলে অভিহিত করা যায়। একটি শক্তিমান রাষ্ট্র প্ররোচনা (Persuasion), পুরস্কার (reward), শাস্তি (punishment) ও বলপ্রয়োগের (force) মাধ্যম তার জাতীয় শক্তি ব্যবহার করে থাকে। জাতীয় শক্তি প্রয়োগের সকল পদ্ধতি অভিন্ন হলেও সকল জাতিরই একই মাত্রায় তা প্রয়োগ করতে পারে না। ভৌগলিক আয়তন, জনসংখ্যার আকার, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির পার্থক্যের কারণে এক একটি রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া অস্থায়ী কতিপয় উপাদান যেমন রাজনৈতিক ব্যবস্থা, প্রযুক্তি ও শিক্ষার মান, জাতীয় মনোবল ইত্যাদিও জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে তারতম্য ঘটিয়ে থাকে। সুতরাং জাতীয় শক্তি মানেই হচ্ছে তা আপেক্ষিক। বলাই বাহুল্য, শক্তি সর্বদাই পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন কারণে সময়ের বিবর্তনে একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির পরিবর্তন ঘটতে পারে। ইতিহাসই বিভিন্ন শক্তির উত্থান পতনের সাক্ষ্য বহন করে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পূর্ব পর্যন্ত জার্মানী ছিল এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। সে সময় ফ্রান্স, ইতালী ও জাপানের শক্তিও কম ছিল না।^৭ কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সবাইকে পেছনে ফেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন সে অতিসংবাদিত শক্তিদর রাষ্ট্র। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জোটের নেতৃত্বে থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আলাদা একটি প্রভাবলয় সৃষ্টি করেছিল যা পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী জোটের জন্য ছিল উদ্বেগের কারণ। অবশেষে সামাজতান্ত্রিক শক্তিজোটেরও পতন ঘটেছে। চীন ও ভারত এখন নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভাবের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।^৮

জাতীয়তাবাদ (Nationalism)

জাতীয়তাবাদ আধুনিককালের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল উপাদান হিসেবে কাজ করছে। বিগত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, জাতীয়তাবাদী চেতনার কারণে অনেক রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। উগ্র জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা এক একটি সমাজকে অভিশাপের আঁতাকুড়ে নিষ্ক্ষেপ করেছে। আর এ কারণেই দু'টি বিশ্বযুদ্ধে শত সহস্র জনপদ বিধ্বস্ত হয়েছে, আর প্রাণ হারিয়েছে লক্ষ লক্ষ নর নারী। উপনিবেশিক শাসনের শৃংখল থেকে মুক্তির জন্য বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী চেতনা মানবতার কল্যাণে বিশেষভাবে কাজে লেগেছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদী চেতনা মানবতার কল্যাণে বিশেষভাবে কাজে লেগেছিল। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা যখন কোন জনগোষ্ঠিকে ঘৃণা ও প্রতিশোধ পরায়ন করে তোলে তখন তা বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এ জন্যেই জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নিয়েই সামাজিক বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হায়েসের মতে,

Nationalism consists of modern emotional fusion and exaggeration of two very cold phenomena- nationality and patriotism.

প্রফেসর হ্যারাল্ড লাক্সির মতে, জাতীয়তাবাদ সাধারণভাবে একটি মানসিকতার ব্যাপার, যারা এর অংশীদার, এক ধরনের ঐক্যবোধ তাদেরকে অবশিষ্ট জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করে। সুতরাং জাতীয়তাবাদ হচ্ছে এমন একটি চেতনা যার মূল উৎসগুলো মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তিই একটি

বিশেষ সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে। বস্তুতঃ নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ ও অন্য সম্প্রদায় থেকে নিজেদের ব্যতিক্রমী মনে করাই হচ্ছে জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য।^৭

জাতীয়তাবাদ উন্মেষের ক্ষেত্রে সে সব উপাদান কাজ করে সেগুলো হলোঃ ভৌগলিক সান্নিধ্য, উদ্ভবগত ঐক্য, ভাষাগত ঐক্য, ধর্মীয় ঐক্য, রাষ্ট্রীয় ঐক্য, অর্থনৈতিক ঐক্য, ঐতিহ্যগত ও ভাবগত ঐক্য ইত্যাদি। হিটলারের উগ্র জার্মান জাতীয়তাবাদ, শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবাদ নীতি, ইহুদীদের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক একটি কালো অধ্যায়। ইহুদীদের উগ্র সাম্প্রদায়িক চেতনা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির আগুন জিইয়ে রেখেছে।

যুদ্ধ বিগ্রহ (War)

মানব সভ্যতার ইতিহাসে যুদ্ধ বিগ্রহ একটি নির্মম বাস্তব ঘটনা। মানবজাতি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতই অগ্রগতি লাভ করুক না কেন যুদ্ধ অবসানের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এটাই বোধ হয় চিরায়ত সত্য যে, যুদ্ধ ছিল, যুদ্ধ আছে, যুদ্ধ থাকবে। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে যুদ্ধকে অপরিহার্য ও কার্যকর কৌশল হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। আত্মরক্ষা শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য বা নিজ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি প্রায় সকল রাষ্ট্রেরই থাকে। কিন্তু বিপুল সংখ্যক জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে আধিপত্যবাদী ও আত্মরক্ষা কর্মকান্ডকে এখন ঘৃণার চোখে দেখা হয়। যুদ্ধের অভিশাপ ও প্রতিহিংসার কর্মকান্ড প্রতিরোধের জন্যই জাতিসংঘের মত আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা হয়েছিল। জাতিসংঘের কাজ হচ্ছে যুদ্ধ প্রতিরোধ করা এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা। বিশ্বে এখন যুদ্ধকে সাধারণভাবে ঘৃণা করা হয়। এতদসত্ত্বেও এখনো যুদ্ধপ্রবণ বিভিন্ন দেশ রয়েছে যারা বিশ্বে অস্থিতিশীলতা ও অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। এখন সাম্রাজ্যবাদ ও আত্মরক্ষা কর্মকান্ডের পুনরাবৃত্তির ধারা হ্রাস পেলেও অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র গড়ে তোলার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।^৮ অস্ত্রের ক্ষতিকর প্রভাব এখন এতটাই বেশী যে ক্ষুদ্র এলাকা ভিত্তিক ছোটখাট যুদ্ধেও ভয়াবহ জীবন বিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যবহার মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। যদিও জাতিসংঘের মত বিশ্ব সংস্থা ও অন্যান্য ফোরামে যুদ্ধ এড়াবার জন্য বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা চলছে, তবুও টেকসই কোন ব্যবস্থা আজো শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে পারেনি।

জাতি-রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্ব (Nation-State & Sovereignty)

জাতিরাষ্ট্রের ধারণার সাথে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ধারণাটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভৌগলিক সীমানাকে অন্য দেশের নাগরিকদের জন্য দুর্ভেদ্য করে তোলা হয়। ফলে পাশাপাশি একই ভাষা ও সংস্কৃতির অনুসারী হয়েও পৃথক রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য বন্ধুত্বের পরিবর্তে চরম শত্রুতা সৃষ্টি হতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া একই জাতি হওয়া সত্ত্বেও দুটি জাতি-রাষ্ট্র গঠন করে দীর্ঘদিন ধরে শত্রুতার মধ্যে চলছে।^৯ এ ধরনের মানসিকতা আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা কোন কোন ক্ষেত্রে দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিককালে জাতি-রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার মাত্রা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, একই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো নিজেদের সীমান্তের বাঁধাকে অতিক্রম করার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন হচ্ছে জাতি-রাষ্ট্র অতিক্রমকারী বৃহদাকার রাষ্ট্রসংঘ গঠনের একটি উৎকৃষ্ট উদ্যোগ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা চালু হলে জাতি-রাষ্ট্রের কাঠামো ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে যেতে পারে। আধুনিকতার প্রভাবে মানুষের মধ্যে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রে মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে মানুষের মধ্যে বহিরাগমনের হারও বেড়ে চলেছে। দক্ষ জনশক্তির অভাব পূরণের

জন্যও বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যাপক হারে জনশক্তি আমদানী করা হচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতি বিবেচনায় আসিয়ান, ইকো, নাফটা, ইইউ, সার্ক ইত্যাদি আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে উঠেছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য (Trade & Commerce)

কোন রাষ্ট্রই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অন্য রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে চলতে পারে না। কোন দেশই তার নাগরিকদের ভোগ ও ব্যবহারের জন্য সকল পণ্য যেমন উৎপাদন করেনা, তেমনি পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনে কাঁচামালও তার থাকে না। সুতরাং কাঁচামাল বা তৈরী পণ্য যেটাই হোক না কেন, অন্যের কাছ থেকে সংগ্রহ করতেই হবে। এক সময় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো শিল্পপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার নীতি চালু করেছিল। কিন্তু বহির্বিশ্বের সাথে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তারা বেশী দিন চলতে পারেনি। বহির্বাণিজ্যের দ্বার তাদের খুলে দিতে হয়েছে। এখন বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবাহ চলছে। কিন্তু এই সুযোগ পুরো মাত্রায় নিচ্ছে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশসমূহের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। এদের প্রভাবেই গঠিত হয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। এ সংস্থার আওতায় স্বাক্ষরিত চুক্তি কার্যকর হলে বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়বে। আশংকা করা হচ্ছে যে, এর ফলে বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ তারা শক্তিশালী অর্থনীতির দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না।

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ (Imperialism & Colonialism)

বর্তমানে সনাতন সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশিক দেশ না থাকলেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল্যায়ন করা হলে সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী চেতনা ও তার প্রয়োগ একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আজকে সামরিক শক্তির মাধ্যমে সাম্রাজ্য বিজয়ের কদাচিত ঘটনা ঘটলেও বাণিজ্য ও সাহায্য নীতির ব্যাপক প্রয়োগের মাধ্যমে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব বজায় রেখে চলেছে। নতুন ও দুর্বল জাতিগুলোর সম্পদের উপর আধিপত্য বিস্তারের কলাকৌশলকে এখন ‘নয়া উপনিবেশবাদ’ বলে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থনৈতিক নির্ভরতা, সামরিক নির্ভরতা ও আশ্রিত রাজ্য প্রকাশিত হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক নির্ভরতা, সামরিক নির্ভরতা ও আশ্রিত রাজ্য (satellite state) হিসেবে। লক্ষ্যনীয় যে, বিশ্বে কতগুলো রাষ্ট্র রয়েছে যারা উপনিবেশিক শাসন থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেও তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুরাতন উপনিবেশিক প্রভুর উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। এমনও দেখা যায় যে, কোন কোন দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে প্রকৃতপক্ষে কোন বৃহৎশক্তির অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। যেমন: উপসাগরীয় এলাকায় একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্রের সৃষ্টির পেছনে বৃহৎ শক্তিবর্গের অর্থনৈতিক স্বার্থ তথা তাদের সম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার উদ্দেশ্য কার্যকর ছিল। কোন কোন স্বাধীন দেশ সামরিক দিক থেকে বৃহৎ শক্তির উপর নির্ভরশীল যা উপনিবেশীকারই নামান্তর মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ কুয়েত, দক্ষিণ কোরিয়া সামরিক বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল।^৮ বিশ্বের বহু দরিদ্র দেশ যাকে উন্নয়নশীল দেশ বলে অভিহিত করা হয়, তারা খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ পাশ্চাত্যের বৃহৎ শক্তিবর্গ এবং তাদের কর্তৃত্বধীন বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ থেকে বড় অংকের ঋণ ও সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত তাদের অর্থনীতিকে ঝুঁকি মুক্ত রাখতে পারে না। আবার কোন কোন দেশ আশ্রিত রাষ্ট্র হিসেবে বৃহৎ শক্তির সরাসরি অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য পেয়ে থাকে; যেমন— ইসরাইল ও দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সরাসরি সাহায্য পেয়ে থাকে।^৯

শক্তিসাম্য (Balance of Power)

‘শক্তিসাম্য’-কে আধুনিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রধান উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কোন কোন সামাজিক বিজ্ঞানী, ‘শক্তিসাম্য’ নীতিকে সাধারণ সামাজিক নীতিরই একটি অভিব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেন। বস্তুতঃ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করা অপরিহার্য। সে জন্যেই শক্তিসাম্য নীতিকে আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান ভিত্তি বলে গণ্য করা হয়।

শক্তিসাম্য নীতির সংজ্ঞা দেয়া বেশ কঠিন। প্রফেসর ডিকিনসন ‘ভারসাম্য’ শব্দটিকে দু’ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ‘শক্তিসাম্য’ হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শক্তির এমন একটা ভারসাম্য অবস্থা যার দ্বারা কাউকেই এমন শক্তিশালী হতে দেওয়া হয় না যাতে অন্যের উপর সে নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস পায়। শক্তিসাম্য নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন চাপ ও শক্তির মাধ্যমে কোন শক্তিকেই এমন শক্তিশালী হতে দেওয়া হয় না যাতে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য কেউ হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। যখন কোন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের জন্য হুমকির সৃষ্টি করে তখন অন্যান্য শক্তিবর্গ যৌথভাবে ঐ শক্তিশালী রাষ্ট্রকে দমন করতে অগ্রসর হয়।^{১০}

শক্তিসাম্য নীতি প্রাচীন যুগ থেকেই কোন না কোন আকারে বিদ্যমান ছিল। আধুনিককালে শুধু তার ধরন ও পরিধির পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিককালে পঞ্চদশ শতাব্দীতে শক্তিসাম্য নীতি উদ্ভব ঘটে ইউরোপে। স্পেন, ফরাসী ও জার্মানীরা যখন ইতালীর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত হয় তখন এ নীতি বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

বিশ শতাব্দীতে ফ্রান্স, রাশিয়া ও বৃটেন একটি ত্রিপক্ষীয় জোট এবং জার্মানী, ইতালী ও জাপান অপর আরেকটি জোট গঠন করে শক্তিসাম্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এর ফলে ইউরোপ দু’ভাগে ভাগ হয়ে যায়। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রও একপক্ষে যোগ দেয়। ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট ব্লক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী ব্লকের উদ্ভব ঘটে। এ দুই জোটের নেতৃত্বে একাধিক সামরিক ব্লকও গঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর পতনের ফলে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলতে গেলে এককভাবে বিশ্ব রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। তার বিরুদ্ধে বিশ্বে কার্যকর কোন শক্তি বা জোটের অস্তিত্ব নেই বলেই চলে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো এবং চীন কখনো কখনো যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিরোধিতা করলেও তা শক্তিসাম্য নীতি রক্ষায় তেমন কার্যকর নয়। তবে বিশ্বের শক্তিদ্বার রাষ্ট্রগুলো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যা ভবিষ্যতই বলে দেবে।

শক্তিসাম্য নীতি কার্যকর রাখার কৌশল হিসেবে নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচি জাতিসংঘের মাধ্যমে বাস্তবায়নের চেষ্টা চললেও তাতে এখনো কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসেনি। বাফার স্টেট সৃষ্টি করে শক্তির ভারসাম্য রক্ষার কৌশলও অবলম্বন করা হয়ে থাকে। সাম্প্রতিককালে বাফার স্টেট হিসেবে কোন দেশ ভারসাম্য রক্ষায় তেমন ভূমিকা রাখতে পারছে না। এখন জাতিসংঘের নেতৃত্বে বহুজাতিক বাহিনী বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে বাফার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। আবার কখনও কখনও NATO জোটও এ দায়িত্ব পালনে ভূমিকা রাখছে।

মৈত্রী জোট গঠনের প্রবণতাও ইদানিং হ্রাস পেয়েছে। এখন বরং একমেরু কেন্দ্রিক বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। তবে প্রফেসর পি. হান্টিংটনের দৃষ্টিতে নতুন শক্তির ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। তবে প্রফেসর পি. হান্টিংটনের দৃষ্টিতে নতুন শক্তির উদ্ভব বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন ধারার সৃষ্টি করবে।^{১১}

কূটনীতি (Diplomacy)

কূটনীতি হচ্ছে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সরকারি পর্যায়ে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ। এছাড়া আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পেশাদার ও অভিজ্ঞ কর্মচারী দ্বারা পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োগকেও কূটনীতি বলে অভিহিত করা হয়। শান্তির সময় প্রতিনিধিত্ব এবং আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রে পরস্পরের সম্পর্ক রক্ষার পদ্ধতিই হচ্ছে কূটনীতি। রাষ্ট্রের আদর্শগত লক্ষ্য অর্জনে যে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করা হয় তার সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনই হচ্ছে কূটনীতির মূল কথা। প্রকৃতপক্ষে পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছার নীতি এবং কূটনীতি হচ্ছে পেশাদার ও অভিজ্ঞ কর্মচারী দ্বারা সে নীতির প্রয়োগ। কূটনীতিকরা স্বীয় রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকেন। কূটনীতিকগণ চুক্তি, সম্মেলন প্রভৃতিতে অন্তর্ভুক্ত দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সমস্যা নিষ্পত্তির খসড়া তৈরি করেন। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা চুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক যাতায়াত, টেলিযোগাযোগ, জাহাজ চলাচল প্রভৃতিসহ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উদ্বাস্ত সমস্যা সফরকারীদের ভ্রমণ সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রভৃতি কাজও সম্পাদন করে থাকেন। কূটনীতিকগণ এখন পূর্বাপেক্ষা কম স্বাধীনতা ভোগ করেন। তাদের কাজ এখন প্রধানতঃ তাদের অফিসের গভির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এতদসত্ত্বেও বলা যায় যে, কূটনীতিবিদদের ব্যক্তিগত ভূমিকা কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কূটনীতি শান্তি রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা ব্যবহারের এটাই সহজ সরল উপায়। দু'টি দেশের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়তে পারে। যুদ্ধে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু এ যুদ্ধকে এড়ানোর একমাত্র পথ হল কূটনৈতিক সম্মেলন। এ সম্মেলন করতে গিয়ে যদি বেশী খরচও হয় তবু এটা ভাল, কারণ শান্তিপূর্ণভাবে কূটনীতির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করলে বিবাদমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক ভাল থাকে। বন্ধুত্ব আরও সুদৃঢ় হয়। ভবিষ্যতে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা কম থাকে এবং ভবিষ্যত সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হয়। সুতরাং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে কূটনীতির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বিশ্বের সমস্যা যতই জটিল হচ্ছে কূটনীতির গুরুত্ব ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের জটিল সমস্যাগুলো সমাধানের একমাত্র পথ হল কূটনীতি। তাই আজ কূটনীতির গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। আর এ কারণেই প্রত্যেক রাষ্ট্রের জাতীয় নীতি ও আন্তর্জাতিক নীতি বাস্তবায়নের একমাত্র উপায় হল কূটনীতি।^{১২}

যৌথ নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসা (Collective Security and Peaceful Settlement)

সভ্যতার সূচনাকাল থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার আশায় মীমাংসা ও সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদ নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টা চলে আসছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব হয়ে উঠেনি। সেক্ষেত্রে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্ষমতার ভারসাম্য বিধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

বিশ্বের শান্তি-শৃংখলার পথে হুমকী স্বরূপ যে কোন আক্রমণকে প্রতিহত করার কৌশলকেই যৌথ নিরাপত্তা বলা হয়। সাধারণ ভাবে যৌথ নিরাপত্তা এমন এক ব্যবস্থা যাতে কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কেবলমাত্র সে রাষ্ট্র অথবা তার মিত্র রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। মূলত যৌথ নিরাপত্তা বিশ্বের সকল রাষ্ট্রে যৌথ শক্তির উপর নির্ভরশীল। এ ব্যবস্থায় প্রত্যেক রাষ্ট্র সকল রাষ্ট্রের এবং সকল রাষ্ট্র প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত (One for all and all for one)- এ নীতিতে বিশ্বাসী। যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যে সকল রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে যৌথ নিরাপত্তা বেঁটনী গড়ে তোলে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন রাষ্ট্র আক্রমণ করতে সাহস পায়না। এরূপ ক্ষেত্রে কোন একটি রাষ্ট্রের পক্ষে আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে সম্ভাব্য আক্রমণকারীর আত্মসনের ইচ্ছা থাকলেও সে তা করতে সাহস পায় না।

জাতিসংঘের দলিলে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা সুনির্দিষ্ট এবং ব্যাপকভাবে উল্লেখিত হয়েছে। জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্যেই হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং সে উদ্দেশ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরূপ যে কোন কর্মকাণ্ডকে বাধা দেয়া। অবশ্য কোন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে তার স্থির করার দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের উপর ন্যস্ত। কোন আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বা সামরিক অবরোধের সিদ্ধান্ত নিরাপত্তা পরিষদ গ্রহণ করে।

শান্তিপূর্ণ মীমাংসা বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার একটি অন্যতম ব্যবস্থা। যৌথ নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসা উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। জাতিসংঘ সনদে অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার (Negotiation), শুভেচ্ছা ও মধ্যস্থতা (Good Offices and mediation), অনুসন্ধান ও আপোষ মীমাংসা (Enquiry and Conciliation) এবং মধ্যস্থতা ও বিচারালয়ের মীমাংসা (Arbitration and Judicial Settlement) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।^{১৩}

অর্থনৈতিক হাতিয়ার (Economic Instruments)

অতীতের মত আধুনিককালেও আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক সুযোগ মত অর্থনৈতিক হাতিয়ার প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত শুল্ক সংরক্ষণ, আন্তর্জাতিক কার্টেল, পণ্য বাণিজ্য চুক্তি, কম মূল্যে পণ্য ক্রয় (Dumping), অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্রয় (Pre-emptive buying), শত্রু সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ, ঋণ ও অনুদান পণ্য বিনিময় চুক্তি (Barter Agreement), বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, কোটা এবং লাইসেন্স, ভর্তুকি প্রদান, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাণিজ্য, কাল তালিকাভুক্তকরণ, মূল্য হার বৃদ্ধি, বাণিজ্য বন্ধ ও বর্জন (Embargoes and boycotts) ইত্যাদি ব্যবস্থা অর্থনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সভ্যতার সংঘাত (Conflict of Civilization)

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর স্যামুয়েল হান্টিংটন মনে করেন যে, জাতীয় রাষ্ট্র এখন আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মৌল একক নয়। এখন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মত বৃহত্তর পরিধিতে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ঘটছে। হান্টিংটনে এ ধারণা সামাজিক বিজ্ঞান, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। এতদিন ভূমণ্ডলীয় ও জাতি-রাষ্ট্র ধারণাকে সামনে রেখে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মূল্যায়ন ও বিচার বিশ্লেষণ প্রাধান্য দেয়া হতো। এখন পণ্ডিত ও গবেষকরা সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্বন্দ্বকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূল্যায়নের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপীয় উপনিবেশের জিজির থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিম ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী পাশ্চাত্যের আদলে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। উপনিবেশিক যুগের অবসান ঘটলেও ঐ সমস্ত রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় পাশ্চাত্যের সাবেক উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো অব্যাহতভাবে কৌশল প্রয়োগ করে তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। সাম্প্রতিককালে উপনিবেশিক গোলামীর জিজির ছিন্ন করার মত পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যও বিভিন্ন দেশে প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।^{১৪} এ প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্যের শাসকরা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য নব নব কৌশল উদ্ভাবন করছে। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলো ভেঙ্গে যাবার পর থেকে এ প্রয়াস আরো বেশী জোরদার হয়েছে।

হান্টিংটন বর্তমান বিশ্বে তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান সভ্যতা ও সংস্কৃতির উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো: ১) পাশ্চাত্য সভ্যতা, ২) ইসলামী সভ্যতা ও ৩) কনফুসীয় সংস্কৃতি। এর মধ্যে শোষোক্তটি প্রধানত: চীনা ভাষাভাষী জনপদকে

ধারণা করে আছে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তার বিস্তৃতির প্রবণতা উল্লেখযোগ্য নয়। ইসলামী সংস্কৃতির রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। বিশ্বজনীন আবেদন রয়েছে এ আদর্শের। ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বহুলভাবে ইসলামী সংস্কৃতির কাছে ঋণী। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চার সূচনা হয়েছিল মুসলিম জ্ঞান-সাধকদের দ্বারাই। ইসলামের আবেদন এমনই সার্বজনীন যে তা ভাষা, বর্ণ ও ভৌগোলিক সীমারেখাকে অতিক্রম করে যায়। আজকের বিশ্বে যে কোন জাতি-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ইসলামী সংস্কৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া মোটেই কঠিন নয় এবং তার সাথে রয়েছে আন্তর্জাতিকতার উদার সংযোগ। ইসলামী সংস্কৃতির এরূপ ধারা এখন প্রবলতর হয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ করতে চলেছে। বিখ্যাত ইকোনমিস্ট পত্রিকা উল্লেখ করেছে যে, ইসলাম সত্যিকার অর্থে স্বতন্ত্র মহিমা নিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছে এবং বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের সংস্কৃতিই হবে পশ্চিমা জগতের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।^{১৫}

অপরদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিল্প বিপ্লবের পর অপ্রতিহত গতিতে সমগ্র বিশ্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে। নৌশক্তি উত্থানের পর ইউরোপীয়রা এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশ স্থাপনে সক্ষম হয়। আমেরিকার আবিষ্কার এবং সেখানে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ইউরোপীয় বিজ্ঞান চর্চা ও সংস্কৃতিকে আরো এগিয়ে দেয়। বিগত কয়েকশ বছর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চা, শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে পশ্চিমরা বিশ্বে তাদের প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করে নেয়। তবে পশ্চিমা জগত বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করলেও তাদের সামাজিক বন্ধন ও ধর্মীয়-নৈতিক সংস্কৃতির বিকাশে সাফল্য লাভ করলেও তাদের সামাজিক বন্ধন ও ধর্মীয়-নৈতিক সংস্কৃতির বিকাশে সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়েছে। এ কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ও জেরাল্ড ফোর্ডের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা স্যার সাইমেন ব্যারনের বিখ্যাত Whats Wrong with our Technological Society নামক গ্রন্থে।

ইকোনমিস্ট আরো উল্লেখ করেছে যে, “মুসলিম বিশ্বের সংস্কৃতিই হবে পশ্চিমা জগতের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী; ইসলামী আদর্শের অগ্রাভিযান শুরু হয়েছে এবং তাতে ইউরোপীয়দের মাথা গরম হয়ে উঠেছে, ইউরোপের দক্ষিণ ও পূর্বপ্রান্তে চন্দ্র নতুন দিনের ইঙ্গিত দিচ্ছে; একটি নতুন স্নায়ুযুদ্ধ আসন্ন এবং তা প্রশমিত হবার নয়” ইত্যাদি। পত্রিকাটির মতে ‘মার্কসবাদের অপমৃত্যুর পর গণতন্ত্র পৃথিবীর কোথাও বড় ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়নি।’ উদাহরণ হিসেবে আলজিরিয়ার কথা বলা যায়। সেদেশে ইসলামপন্থীদের গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় যেতে বাধা দেয়া হল আর গণতন্ত্রের পতাকাবাহী বৃটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রের শত্রু সেদেশের সামরিক চক্রকে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়েছে। প্যালেস্টাইনে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠায়, বসনিয় সংখ্যাগুরু মুসলমানদের অধিকার রক্ষায়, কাশ্মীরের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় বা চেকনিয়ার মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামে গণতান্ত্রিক পাশ্চাত্য জগত বিশেষ কোন আগ্রহ দেখাচ্ছে না এবং উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্য-সহযোগিতা করছে না। পশ্চিমাদের কাছে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সংজ্ঞা তাদের সুবিধাবাদী নীতির ধারায় পরিচালিত হচ্ছে।

উপসংহার

বিজ্ঞানের বিপ্লবসী থাবা মানব সভ্যতাকে সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। পুরাতন পৃথিবীর নীতিতে মানুষ যদি ক্ষুদ্র স্বার্থ-চরিতার্থ করবার জন্য প্রচেষ্টা করে তাহলে সমগ্র মানব সভ্যতার অস্তিত্ব বিপন্ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ছাড়া মানব সভ্যতার অগ্রগতির কোন পথ নেই। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বিষয় যাতে সহযোগিতার পথে পরিচালিত হয় সেজন্য কেবল রাষ্ট্র নেতা নয়; বরং সমগ্র বিশ্ববাসীকে সচেতন

হতে হবে। অতএব আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে কোন ব্যক্তিরই উদাসীন দর্শকের ভূমিকা পালন করা ঠিক নয়। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার ভাঙন, দক্ষিণ আফ্রিকায় গণনির্বাচনের মাধ্যমে বর্ণবৈষম্যহীন সরকারের প্রতিষ্ঠা, মধ্যপ্রাচ্যে ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থার গাজা ও জেরিকোতে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ, সর্বোপরি ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের মূলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বড় রকমের সংঘর্ষ বিশেষতঃ পরমাণু সংঘর্ষের সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান শতাব্দিতে আগামীকে স্বাগত জানানোর জন্য জাতিসংঘসহ উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহকে গ্রহণযোগ্য হতে হবে— আর তাতেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পাঠ সার্থক হবে।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ Toynbee, *Survey of International Affairs*, 1963, London: p. 73.
- ^২ *Ibid.*
- ^৩ Lipson, E, *Europe in the 19th and 20th Centuries*, London: 1956, p. 102.
- ^৪ *Ibid.*
- ^৫ ড. এমাজউদ্দীন আহমেদ, *রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা*, পাটুয়াটুলী, ঢাকা-১১০০, পৃ. ২৪০-২৪১।
- ^৬ M. S. Anderson, *The Eastern Question*, London: 1966, p. 122.
- ^৭ তদেব।
- ^৮ অসিত কুমার সেন, *আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ইতিহাস*, কোলকাতা: ২০০২, পৃ.
- ^৯ তদেব।
- ^{১০} ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, *আন্তর্জাতিক পরিক্রমা*, ৪১-৪২ বাংলাবাজার, ঢাকা: ২০০৩, পৃ. ১০-১১।
- ^{১১} তদেব।
- ^{১২} Toynbee, *op.ci.t*, p. 93.
- ^{১৩} ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২।
- ^{১৪} এ বি এম হোসেন, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস* (অটোমান সাম্রাজ্য থেকে জাতিসত্তা রাষ্ট্র), ইউ,জি,সি, আগারগাঁও-১২০৭, মে ২০১১, পৃ. ৪৮৩।
- ^{১৫} তদেব।

গবেষণা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ড. মো. সেতাউর রহমান*

[**Abstract:** Research and Islam are two components closely related with each other. Research is an essential context of the modern world. It is a well known process to investigate into existing knowledge and discover something new. It may be considered as a systematic observation also. On the other hand, research is one of the basic foundations of Islamic philosophy of life. Islam being a complete code of life, it is capable of facing all the global challenges of the modern world and able to put the right answer to the questions and solution to the growing demands of human beings. The first verse of Al-Qur'an has put so much stress on study, and the study is the first step of research activities. Al-Qur'an and Al-Hadith have given direct dictation about research and its significance. Al-Qur'an leads mankind to various religious, social, political and economic matters. Without research they cannot achieve those directions. By those instructions Al-Qur'an leads them to the field of thinking and research. The Prophet Muhammad (SAW) has instructed the Muslims to think about the importance of research and invest their time and merit for it. Research and investigation conduct the Muslims to the right path and protect them from going astray. This article aims at throwing light on the introduction of research and its significance and importance in Islam.]

ভূমিকা

গবেষণা সভ্য পৃথিবীর একটি অপরিহার্য অনুষদ। বর্তমান সভ্যতা ও আধুনিক প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার মূলে রয়েছে গবেষণা। গবেষণা শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক অভিধা। এ গবেষণা হচ্ছে ইসলামী জীবনাদর্শের অন্যতম মূলভিত্তি। ইসলাম চিরশাস্ত ও মানব প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ একটি জীবন দর্শন। এ দর্শন আধুনিক যুগের সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে সক্ষম। মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও যুগ-জিজ্ঞাসার সঠিক সমাধান ও সদুত্তর দিতে পারে ইসলাম। মানব জাতি সৃষ্টির পিছনে আল্লাহর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা। এ দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা বিশেষ দিক-নির্দেশনা দিয়ে যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে আল-কুরআন। আল-কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত বাণী- সূরা আল-'আলাকের প্রথম আয়াতেই আল্লাহ তা'য়ালা পড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।^১ পঠনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হয়। পঠনই হচ্ছে গবেষণার প্রথম ধাপ। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য জায়গায় সরাসরি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। গবেষণার প্রতি যথার্থভাবে গুরুত্ব প্রদানকারী জাতি সর্বক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করে। আমাদের জাতীয়

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে কাজিত উন্নয়ন সাধন করার লক্ষ্যে গবেষণা খাতকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা দরকার। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অন্যান্য ভাষায় সম্যক গবেষণাকর্ম পরিচালিত হলেও বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে গবেষণাকর্ম অপ্রতুল। তাই আমরা বিষয়টিকে গবেষণা শিরোনাম হিসেবে গ্রহণ করেছি। নিম্নে গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইসলামে এর গুরুত্ব সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করা হলো:

গবেষণা পরিচিতি

‘গবেষণা’ শব্দটির ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ হচ্ছে- গো+এষণা। এখানে ‘গো’ শব্দের অর্থ পৃথিবী এবং ‘এষণা’ শব্দের অর্থ ‘অনুসন্ধান’। গবেষণার সমার্থক শব্দ হচ্ছে- তত্ত্বাণ্বেষণ, অনুসন্ধান, বিকিরণ, জিজ্ঞাসা, তদন্ত, নিরূপণ ইত্যাদি।^১ এর ‘আরবী প্রতিশব্দ ‘(البحث)’ যার আভিধানিক অর্থ- মাটির ভেতর থেকে কোন জিনিস খুঁজে বের করা। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ Research. ‘Re’ prefix এর ইংরেজী প্রতিশব্দ ‘again’ যার অর্থ- পুনঃ পুনঃ ; আর ‘search’ শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ- Exploration, Investigation, Inquiry, Analysis, Examination, Study ইত্যাদি,^২ যার অর্থ- অনুসন্ধান করা। সুতরাং Research শব্দের অর্থ- পুনঃপুনঃ অনুসন্ধান করা। অতএব গবেষণা শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধানের মাধ্যমে অজানাকে জানা ও অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করা। কেননা গবেষণার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হচ্ছে গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনুপস্থিত বিষয়কে উপস্থিত করা।^৩ গবেষণা পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে মনীষীগণ এর নানারূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তবে সেগুলোর বিষয়বস্তু ও ভাবার্থ প্রায় কাছাকাছি। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে দু’একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো:

এ সম্পর্কে ড. ইয়াহুইয়া ওহায়ব আল-জাব্বুরী বলেন^৪- البحث طلب الحقيقة واذا علمها بين الناس ‘তত্ত্ব অনুসন্ধান করে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করাকে গবেষণা বলা হয়।’ বিশিষ্ট পণ্ডিত ‘আবদুর রহমান বলেন, ‘গবেষণা হলো বাস্তবতার অনুসন্ধান করে সঠিক বিষয়টি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া। গবেষণা পদ্ধতি হচ্ছে- জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন শাখাতে বাস্তবতার শেষপ্রান্তে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে গবেষক যে নীতি অনুসরণ করে চলে। এক্ষেত্রে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, সাহিত্য, ইতিহাস তথা মানবিক এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান সবই সমান।’^৫ Francis Rummel বলেন, ‘Research is a careful inquiry of examination to discover new information or relationship and to verify existing knowledge.’^৬ সার্বিক বিবেচনায়- জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আহরিত তথ্যকে একত্রচিহ্নে বিশ্লেষণ ও কর্ষণ করে অপেক্ষাকৃত নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকে গবেষণা বলা যেতে পারে।

দৈনন্দিন জীবনে মানুষের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। তাই এসব প্রয়োজন মেটাতে গবেষণা অনস্বীকার্য। গবেষণার ক্রমাগত উন্নতিতেই মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নসহ আধুনিক যুগের অসংখ্য আবিষ্কারে মানব জীবনে নব তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে।^৭

গবেষণার মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নে মানব জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং গোটা বিশ্ব আজ Global Village-এ পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞান হতে শুরু করে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও পরিবারসহ সর্বক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ ফল মানুষ আজ উপভোগ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষার উচ্চস্তরে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের জন্যই গবেষণায় আত্মনিয়োগ করা অপরিহার্য কর্তব্য। এসব স্থানের সার্বিক কার্যক্রম শিক্ষাদান ও গবেষণা নামক মৌলিক দু’টি উপাদানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে টিউটোরিয়াল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, অ্যাসাইনমেন্ট লিখন এবং এম. এ. শ্রেণীতে থিসিস গ্রন্থ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর গবেষণায় হাতেখড়ি হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা গবেষণার সূচনা, পদ্ধতি ও ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। গবেষণার

প্রধান প্রধান লক্ষ্যসমূহ হতে পারে- অজ্ঞাত বিষয়কে দৃশ্যমান করা, অবিন্যস্ত বিষয়কে বিন্যাস করা, বিক্ষিপ্ত বিষয়কে একত্রিত করা, অপূর্ণাঙ্গকে পূর্ণাঙ্গ করা, মিশ্রিত বিষয়কে সুবিন্যস্ত করা, অস্পষ্ট বিষয়কে সুস্পষ্ট করা, সংক্ষিপ্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, দীর্ঘ বিষয়ের সংক্ষেপন ও পরিমার্জন, ভুল বিষয়ের অপনোদন ইত্যাদি।^{১৭} সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে অজানা বিষয় খুঁজে বের করাই গবেষণার প্রধানতম লক্ষ্য। নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের আবিষ্কারই হচ্ছে গবেষণা। গবেষণার নিমিত্তে সংগৃহীত উপাত্তগুলো পুনঃ পুনঃ বিশ্লেষণ করে স্বীয় জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা এর সত্যায়ন করা এবং সেই সত্যের ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব চিন্তাধারা ও মন্তব্যসহ বিষয়টি পাঠকবর্গের সামনে উপস্থাপন করা গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।^{১৮} গবেষণার জন্য যথাসম্ভব প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কোন গবেষকের গবেষণালব্ধ ফলাফল অন্য কারও দ্বারা পুনরায় বিবৃত হলে তা গবেষণা হিসেবে স্বীকৃত হবে না।^{১৯} তবে নির্দিষ্ট বিষয়ে পূর্বের গবেষণা অপূর্ণাঙ্গ হলে পরবর্তী গবেষণায় পূর্বের বিষয়ে পর্যালোচনাসহ নতুন বিষয় সংযোজন করা যেতে পারে। গবেষণার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। সে অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস ও বিশ্লেষণ গবেষণার অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। গবেষণার ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচন প্রাথমিক ও অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এ সম্পর্কে ড. ‘আবদুল মুন’জিম খাফাজী ও ড. ‘আবদুল ‘আযীয শারায়ফ বলেন,^{২০}

اختيار موضوع البحث مشكلة من مشكلات أو هو العقدة الأولى التي تقف أمام الباحث فإذا ما استطاع حل هذه العقدة تفتحت أمامه الطرق وذلك الصعاب

‘বিষয় নির্বাচন একটি কঠিন সমস্যা ও গবেষকের সামনে প্রথম প্রতিবন্ধক। গবেষক তা সমাধান করতে পারলে তার জন্য সামনের সকল রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং দূর্গম পথ সহজে অতিক্রম করতে পারে।’

উৎসাবলী ও রেফারেন্সকে ‘আরবীতে المراجع والمصادر বলা হয়। গবেষণার উৎস হলো এমন একটি ভিত্তি যা গবেষণার প্রাথমিক প্রতিটি তথ্য সরবরাহ করতে সাহায্য করে। উৎস ব্যতীত গবেষণা গঠন ও প্রবৃদ্ধি সম্পন্ন হয় না। গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা ও মতামত সেখান থেকে গ্রহণ করা হয়।^{২১} তথ্যসূত্রকে ‘আরবীতে هوامش এবং ইংরেজীতে Footnotes ও Endnotes বলা হয়ে থাকে। প্রত্যেক পৃষ্ঠার নীচে প্রদত্ত উৎসাবলীকে Footnotes বলে। আর অধ্যায়, পরিচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদের শেষে বিধৃত হলে তাকে Endnotes বলা হয়।^{২২}

গবেষণার বিষয়কে কয়েকটি অধ্যায়ে বিন্যাস করতে হয়। ‘আরবীতে অধ্যায়কে باب অথবা فصل এবং ইংরেজীতে Chapter বলা হয়। পূর্ণ গবেষণা কর্মটিকে কয়েকটি অধ্যায় এবং উপ-অধ্যায়ে যৌক্তিকভাবে বিভক্ত করে নিতে হয়। অধ্যায়গুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যার ক্ষেত্রে সমন্বয় থাকা বাঞ্ছনীয়। কোন অধ্যায়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা দশ এবং কোন অধ্যায়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা একশত এমন হওয়া উচিত নয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি অধ্যায় বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।^{২৩} প্রয়োজনে ‘অধ্যায়’কে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যেতে পারে। গ্রন্থপঞ্জীকে ‘আরবীতে قائمة المصادر والمراجع এবং ইংরেজীতে Bibliography বলা হয়।

সার্বিকভাবে বলতে গেলে ‘গবেষণা’ এমন একটি ব্যাপক অনুষঙ্গ যা প্রবন্ধের মত ছোট পরিসরে এর সার্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই অতি সংক্ষেপে এর একটি প্রাথমিক ধারণা এখানে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। আর এ ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা অত্র গবেষণাকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই এ বিষয়ে নতিদীর্ঘ আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

গবেষণার ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

এই সুন্দর পৃথিবীর সব কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। মহান আল্লাহ বলেন^{১৬} - هُوَ الَّذِي خَلَقَ “তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন।” আল্লাহর দেয়া এসব নি‘আমত অনুসন্ধান করে তাঁর দেয়া নির্দেশানুযায়ী ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশাবলী অনুসরণে অহী নাযিলের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত বহু গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। চিন্তা-ভাবনা, ‘ইলম তথা গবেষণা সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দিক নির্দেশনা সম্বলিত কুরআনে প্রায় ৮০০ (আটশত) টি আয়াত রয়েছে।^{১৭} মহান আল্লাহ তা‘আলা খিলাফতের মহান মর্যাদা দিয়ে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদের উপর এ পৃথিবীর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেছেন। আর এ নিমিত্তে তিনি মানব সৃষ্টির প্রাক্কালে জ্ঞানের জগতে শ্রেষ্ঠত্বের কারণে ফিরিশতামণ্ডলীকে নির্দেশ প্রদান করেন আদম (আ.) কে সিজদা করতে। সেখান থেকেই জ্ঞান-গবেষণার শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বিশ্ববাসীকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আদম (আ.) থেকে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূলকে আসমানী কিতাব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা অহীর জ্ঞান দিয়ে মানব জাতিকে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করেছেন এবং জ্ঞান-গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে সঠিক পথে টিকে থাকার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা মহানবী (স.) কে হিদায়েতের বাণী দিয়ে বিশ্ববাসীর নিকটে প্রেরণ করেন। তিনি নিজে উম্মী (নিরক্ষর) হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানময় কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং নিজেকে মু‘আল্লিম হিসেবে দাবী করেছেন।^{১৮} তিনি আল্লাহ তা‘আলার বাণীসমূহ মানুষের কাছে পরিপূর্ণরূপে পৌঁছে দেয়ার পর বিদায় হজ্জের ভাষণে মুসলিম উম্মাহকে দুটি বিষয় আঁকড়ে ধরার উদাত্ত আহ্বান জানান। যেমন-

عن مالك بن أنس - رحمه الله بَلَّغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمُ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ ، وَسُنَّةَ رَسُولِهِ . أَخْرَجَهُ الْمُوطَأُ .^{১৯}

“মালিক ইবন আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, আমি তোমাদের নিকট দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা দৃঢ়তার সাথে আকড়ে ধর তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব তথা আল কুরআন, অপরটি তাঁর রাসূলের সুন্নাহ তথা আল-হাদীস।” এ কারণে সাহাবায় কিরাম ও পরবর্তী মুসলমানগণ সঠিক পথে টিকে থাকার জন্য কুরআন ও হাদীস গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। কুরআন ও সুন্নাহকে কেন্দ্র করে মুসলিম গবেষকদের গবেষণা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তাঁরা বিশ্ববাসীকে ধীরে ধীরে আবিষ্কার ও উন্ময়নের মহাসড়কে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হন। তাঁরা জ্ঞান গবেষণায় বিশ্ববাসীর সামনে পথ প্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ফলে কর্ডোভা, বুখারা, সমরকন্দ, বাগদাদ, কুফা, বসরা, লেবানন প্রভৃতি স্থানে স্থাপিত হয় পৃথিবীর সর্বাধুনিক গবেষণাগার ও বিজ্ঞান চর্চাকেন্দ্র। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর চতুর্দিক থেকে চিন্তাশীল মানুষেরা এসব কেন্দ্রে আগমন করে জ্ঞান গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। জ্ঞানচর্চার এ ধারায় জন্ম হয় আল-কিন্দী (মৃ. ৮৭৩ খ্রি.), আল-ইয়াকুবী (মৃ. ৮৯৭ খ্রি.), ইবনু জারীর আত-তাবারী (মৃ. ৯২৩ খ্রি.), ইবনু সীনা (মৃ. ১০৩৬ খ্রি.), খতীব আল-বাগদাদী (মৃ. ১০৭২ খ্রি.), ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী (মৃ. ১১১১ খ্রি.), ইবনুল জাওয়ী (মৃ. ১২০১ খ্রি.), ইবনু তাইমিয়া (মৃ. ১৩২৮ খ্রি.), ইবনু খালদুন (মৃ. ১৪০৬ খ্রি.) প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণের।

আল-কুরআনের আলোকে গবেষণা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানব জাতির পথ প্রদর্শনকারী ও সকল জ্ঞানের মৌলিক উৎস হিসেবে বিবেচিত। আল-কুরআনে মহাবিশ্ব, আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত সকলকিছু, মানবদেহ ও মানবসত্তা, মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া সর্বোপরি আল-কুরআনে বর্ণিত সকল তথ্য-উপাত্ত ও সুবিশাল সৃষ্টিজগত সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনার জন্য অসংখ্য তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রে আল-কুরআনে تفكر (সুক্ষচিন্তা), تدبر (গভীর অনুসন্ধান), تعقل (বিবেকসম্মত উপলব্ধি), تفكر (পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুধাবন) ইত্যাদি শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। আল-কুরআনের বহু জায়গায় চিন্তা ও অনুভূতিশক্তির প্রয়োগ, সৃষ্টিজগত নিয়ে গবেষণা, অনুধাবন, বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন ও চর্চার মাধ্যমে সাহাবায় কিরাম (রা.) ও পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে আরব অনারব নির্বিশেষে জ্ঞান গবেষণায় আত্মনিয়োগ করার প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এই নব চেতনার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে তরঙ্গমালার সৃষ্টি হয় তা পরবর্তী বিশ্ব-পরিস্থিতির পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। আধুনিক বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষতার মূলে রয়েছে আল-কুরআনের পথ-নির্দেশনা। যা বর্তমান যুগের আবিষ্কারসমূহের ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত। আল-কুরআনের বহু জায়গায় গবেষণার জন্য সরাসরি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন গবেষণার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَالٌ^{২০}

‘তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? নাকি তাদের হৃদয় তালাবদ্ধ করা হয়েছে?’।

আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বতসহ আল্লাহর বিশাল সৃষ্টিরাজী নিয়ে গভীর অনুসন্ধান করার জন্য আল-কুরআনের বহু জায়গায় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে-

وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ^{২১}

‘তারা কি নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করেনা? আকাশমণ্ডলী, যমীন ও উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।’ অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ^{২২}

‘নিশ্চয় আকাশসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির মাঝে এবং দিন ও রাত্রির আবর্তনে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।’

অত্র আয়াতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাত্রির আবর্তনের মাঝে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে। ঠিক পরের আয়াতে জ্ঞানীদের পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে যে, তারাই সত্যিকারের জ্ঞানী; যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্বরণে সময় অতিবাহিত করে, তাঁর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গবেষণা করে এবং তাঁর সৃষ্টির যথার্থতার ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদান করে। জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ^{২৩}

‘নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিনের আবর্তনে, মানুষের প্রয়োজনীয় ও উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগরে চলমান জলযানসমূহে, বৃষ্টিধারায়, যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেন অতঃপর তার দ্বারা মৃত যমীনকে পুনর্জীবন দান করেন এবং নিজের এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পৃথিবীতে সব রকমের প্রাণী ছড়িয়ে দেন, আর বায়ুপ্রবাহে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।’ আল-কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যসমূহের মাঝে অন্যতম হচ্ছে গবেষণা। কুরআন হচ্ছে মানুষের সার্বিক জীবনের সবচেয়ে সুন্দর পথ-নির্দেশনা। সেই নির্দেশনা অনুযায়ী মানুষ কিভাবে তার জীবন পরিচালনা করবে তা অনুধাবনের জন্য কুরআনের আয়াতসমূহ গবেষণার সরাসরি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ۝^{২৪}

‘আপনার প্রতি বরকতময় কুরআন নাযিল করেছে, যেন তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গবেষণা করে।’ যারা সত্যিকারের জ্ঞানী তারা আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মাঝে আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন খুঁজে পায় এবং সদা-সর্বদা আল্লাহর স্বরণে প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করে। ইরশাদ হচ্ছে-

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ جُنُودِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝^{২৫}

‘নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাত্রির আবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে গবেষণা করে এবং বলে, হে প্রভু! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করোনি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।’

আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করার নির্দেশ প্রদান করে বলেন-

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝^{২৬}

“তারা কি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? এ সম্পর্কেও ভেবে দেখে না যে, তাদের নির্ধারিত সময় অতি নিকটবর্তী। সুতরাং এরপর তারা আর কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করবে।”

মহান আল্লাহ বিজ্ঞ ও গবেষকদের সাধারণ জনগণের উপর প্রাধান্য দান করেছেন এবং কোন বিষয়ে কারো অজ্ঞতা থাকলে বিজ্ঞজ্ঞদের নিকট থেকে তা জেনে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন-

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝^{২৭}

‘আমি আপনার পূর্বে এমন মানুষদেরকে প্রেরণ করেছি, যাঁদের নিকট আমি ওহী প্রেরণ করেছি। অতএব যদি তোমরা না জান তবে যারা বিজ্ঞ তাদেরকে জিজ্ঞেস কর।’

কোন বিষয়ে কোন সংবাদ পৌঁছলে তার সত্যতা যাচাই-বাছাই করার জন্য ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। কেননা প্রেরিত সংবাদে বাস্তবতা নিরূপণ না করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্তের জন্য লজ্জিত হতে হয়। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۝^{২৮}

‘হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের নিকট কোন ফাসেক সংবাদ নিয়ে আসে তবে তা যাচাই-বাছাই কর। যেন এমন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করে বসবে, অতঃপর তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।’

উপরোক্ত আয়াতে প্রেরিত সংবাদের সত্যতা নিরূপণ করতে বলা হয়েছে। আর এর জন্য প্রয়োজন পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান যা গবেষণার অন্যতম অনুষঙ্গ।

শরীয়তে সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কেননা সাক্ষীর মাধ্যমেই যে কোন ঘটনার প্রকৃত বাস্তবতা উদ্ঘাটন করা যায়। যেমন-ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের জন্য সাক্ষীর উপস্থিতি অনস্বীকার্য। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ^{২৯}

‘আর তাদের (ব্যভিচারের) শাস্তি দেয়ার সময় যেন মু’মিনদের একটি দল উপস্থিত থাকে।’

একইভাবে কোন সত্যী সাক্ষী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ দিতে হলে চারজন সাক্ষী হাযির করার কথা বলা হয়েছে; অন্যথায় তাকে আশি বেত্রাঘাত মারার এবং তার সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ না করার কথা আল-কুরআনে বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا^{৩০}

‘আর যারা সত্যী-সাক্ষী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ আনয়ন করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী হাযির না করে, তাদেরকে আশি বেত্রাঘাত করো এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করোনা।’

বিয়ের ক্ষেত্রে সাক্ষীকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এছাড়া যেকোন ফৌজদারী অপরাধের শাস্তি প্রয়োগের আগে ঘটনার সত্যতা নিরূপণের জন্য শরীয়তে সাক্ষীর সাক্ষ্যকে অপরিহার্য গণ্য করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সত্যতা যাচাইয়ের পন্থাই হচ্ছে গবেষণা। অতএব যেকোন বিষয়ের বাস্তবতা বের করে আনার ক্ষেত্রে গবেষণার কোন বিকল্প নেই।

এছাড়াও আল-কুরআনে এমন অসংখ্য আয়াত নাযিল করা হয়েছে, যা দ্বারা গবেষণার ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মাণ হয়।

আল-হাদীসের আলোকে গবেষণা

আল-কুরআনের পাশাপাশি আল-হাদীসেও গবেষণার অনেক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। রাসূল (স.) থেকে বর্ণিত এমন অসংখ্য হাদীস রয়েছে, যেখানে সৃষ্টিজগত ও ইসলামি শরী‘আর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করার উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করা যেতে পারে। ইরশাদ হচ্ছে-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ اخْتَلَمَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي النَّيِّمِ؟ قَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ. فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخْبَرَ بِذَلِكَ قَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ.^{৩১}

‘জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আমরা এক সফরে বের হয়েছিলাম। হঠাৎ আমাদের এক সাথীর মাথায় একটি পাথর এসে আঘাত করলো, ফলে তার মাথা রক্তাক্ত হয়ে গেলো। অতঃপর তার স্বপ্নদোষ হলো। তখন সে তার সাথীকে জিজ্ঞেস করলো, আমার জন্য তায়াম্মুম করার অনুমতি আছে? তখন তার সাথীরা বললো, না! আমরা তো তোমার জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি দেখি না। কেননা তুমি পানি ব্যবহারে

সক্ষম। অতঃপর তিনি গোসল করলেন এবং এর ফলে মারা গেলেন। (জাবের রা. বলেন) এই ঘটনার পর আমরা রাসূল (স.) এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে এই বিষয়টি অবহিত করলাম। সব শুনে তিনি বললেন- তোমরা তাকে হত্যা করেছ। আল্লাহ তাদেরকেও হত্যা করুন (যারা অহেতুক অন্যকে হত্যার দিকে ঠেলে দেয়)। যে ব্যাপারে তাদের জ্ঞান নেই সে ব্যাপারে তারা কেন জিজ্ঞাসা করেনি? কেননা অজ্ঞতার আরোগ্য হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা। আর ঐ অবস্থায় লোকটির জন্য এটা উচিত ছিল যে, সে তায়াম্মুম করবে।”

অত্র হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে সে বিষয়ে অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করা কিংবা বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করা জরুরী। এমতাবস্থায় অনুসন্ধান বা গবেষণা ছাড়া অজ্ঞতা বশতঃ কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া মোটেই উচিত নয়, কেননা এতে করে অন্যের বিপদে নিপতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضَىٰ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ. قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ.^{৩৭}

“রাসূল (স.) যখন মু‘আয বিন জাবালকে ইয়ামানের বিচারক বানিয়ে পাঠানোর ইচ্ছে করলেন, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তোমার নিকট কোনো বিচারের দায়িত্ব আসে, সেক্ষেত্রে তুমি কি করবে? মু‘আয বিন জাবাল বললেন, কুরআনের বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করবো। রাসূল (স.) বললেন, যদি কুরআনে সে ব্যাপারে কোনো বিধান না পাও সেক্ষেত্রে কি করবে? মু‘আয (রা.) বলেন- তখন রাসূল (স.) এর সুন্নাহ অনুসারে ফায়সালা করবো। তখন রাসূল (স.) বললেন- যদি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহতেও সে ব্যাপারে কোনো বিধান না পাও সেক্ষেত্রে কি করবে? তখন মু‘আয বললেন- সেক্ষেত্রে আমি আমার নিজস্ব চিন্তাধারার আলোকে গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দিবো। মু‘আযের এ কথা শুনে রাসূল (সা.) তার বুক হাত রাখলেন এবং বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে আল্লাহর রাসূল যে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সম্ভ্রষ্ট তা গ্রহণ করার তাওফিক দিয়েছেন।”

উক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, যদি কোনো বিষয় সরাসরি আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (স.) এর হাদীসে পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে নিজস্ব চিন্তাধারার আলোকে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। ইসলামি শরী‘আতের চারটি মৌলিক উৎসের মাঝে কুরআন ও সুন্নাহর পরে ইজমা ও কিয়াসকে স্থান দেওয়া হয়েছে। শরী‘আতের এ দুটি মূলনীতির সারকথা হচ্ছে গবেষণা। অন্য হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَدَارَسُ الْعِلْمُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ إِخْيَانِهَا.^{৩৮}

“আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাতের এক অংশ জ্ঞান গবেষণায় আত্মনিয়োগ করা সারারাত জেগে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।” উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করার চেয়েও জ্ঞান গবেষণায় আত্মনিয়োগ করাকে বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছে। আরেক হাদীসে বর্ণিত আছে-

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي لَأَجْزَى اللَّيْلِ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ، فُتِلْتُ أَنَا ، وَتِلْتُ أَقْوَمُ ، وَتِلْتُ أَتَذَكَّرُ أَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাত্রিকে তিনটি ভাগে ভাগ করি, এক অংশ ঘুমাই, আরেক অংশে দাঁড়িয়ে ইবাদত করি এবং অপর অংশে রাসূল (স.) এর হাদীস নিয়ে গবেষণা করি।”

এ হাদীসেও গবেষণার গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

রাসূল (স.) এর সাহাবীগণের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। রাসূল (স.) তাঁদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার ব্যাপারে নির্দেশও প্রদান করেন। রাসূল (স.) এর এই নির্দেশ পালনার্থে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখায় দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁদের এ দক্ষতার মূল্যায়ন করে রাসূল (স.) নিজেই বলেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرْحَمُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَبِئَاءُ عُثْمَانُ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدٌ وَأَقْرَبُهُمْ أَبِي وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذٌ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.^{৩৫}

“আমার উম্মতের মাঝে সর্বাধিক দয়ালু ব্যক্তি হলেন আবু বকর (রা.), আল্লাহর নির্দেশ পালনের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর হলেন ‘উমার (রা.), তাদের মাঝে সবচেয়ে লাজুক হলেন উসমান (রা.), আল্লাহর কিতাবের সর্বশ্রেষ্ঠ তেলাওয়াতকারী হলেন উবাই ইবনু কা’ব (রা.), ফারাসেয় বিষয়ে সর্বাধিক বিশেষজ্ঞ য়ায়েদ ইবন সাবিত (রা.), হালাল-হারাম সম্পর্কে অধিক অবগত মু’আয ইবনু জাবাল (রা.)। প্রত্যেক উম্মতের মাঝে একজন আমানতদার থাকেন, আর এই উম্মতের আমানতদার হচ্ছেন আবু ‘উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.)।”
এ সকল বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, ইসলামী শরী‘আতের দ্বিতীয় উৎস আল-হাদীসেও গবেষণার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার

গবেষণা মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। মানব জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব অপরিসীম। গবেষণায় অগ্রগামী জাতি সর্বক্ষেত্রে উন্নত এবং জীবনের নানা দিক বিবেচনায় তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ। ইসলাম এই গবেষণার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। গবেষণা ইসলামী জীবনাদর্শের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হওয়ায় সূচিত হয়েছে রাসূল (স.) এর জীবদ্দশায় তাফসীর ও উসূলে তাফসীরের অসংখ্য অনুসৃত নীতি, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহর মাঝে তাফসীর চর্চার ক্রমধারাকে বেগবান করেছে। যুগে যুগে সূচিত হয়েছে হাদীস চর্চার ব্যাপক কার্যক্রম। পৃথিবীতে কুরআন ও হাদীস নিয়ে এত ব্যাপক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে, যার ফলে এ দু’টি স্বতন্ত্র অভিজ্ঞান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। গবেষণার ব্যাপারে ইসলামের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুসলমানেরা একসময় জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করে গোটা বিশ্বকে আলোর পথ প্রদর্শন করেছে এবং বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাসহ সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর তথ্য ও তত্ত্ব-উপাত্ত নিয়ে অসংখ্য গবেষণা এগিয়ে যাচ্ছে বর্তমান দুনিয়ায়। আজকের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার মূলে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা। কিন্তু মুসলমানেরা আজ এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ায় তাদের জীবনে সামগ্রিক অধঃপতন ও লাঞ্ছনা আপতিত হয়েছে। তাই হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাওয়ার জন্য মুসলমানদের আবারো যথার্থভাবে জ্ঞান গবেষণায় আত্মনিয়োগ করা উচিত।

তথ্যনির্দেশ

- ১ সূরা আল-আলাক, আয়াত: ১।
- ২ বাংলা একাডেমী কর্তৃক সম্পাদিত ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ৬ষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩৪৩; নাসির উদ্দীন আহমেদ ও আ. ক. ম. মাহবুবজ্জামান সম্পাদিত, সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণা : সংজ্ঞা, নকশা, পদ্ধতি ও প্রকারভেদ (ঢাকা: বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১২; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মো. হাছিনুর রহমান, ইসলামী গবেষণা পদ্ধতি (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ২১-২২।
- ৩ Mohammad Ali and others, *Bangla Academy Bengali-English Dictionary* (Dhaka: Bangla Academy, Twenty Seventh Reprint, 2010), p. 163.
- ৪ ড. ফরীদ আল-আনসারী, *আবজাদিয়াতুল বাহাছ ফিল 'উলুমিশ-শার'ঈয়াহ্* (দারুল বায়দা: মাতবা'আতুন-নাজাহ আল-জাদীদাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৪।
- ৫ ড. ইয়াহইয়া ওহায়ব আল-জাব্বুরী, *মানহাজুল বাহাছ ওয়া তাহকীকিন্ নুসুস* (বৈরুত: দারুল গারবিল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২২।
- ৬ 'আবদুর রহমান, আদওয়া'উন 'আলাল-বাহাছ ওয়াল-মাসাদির (রিয়াদ: দারুল-মা'আরিফ আস-স'উদিয়াহ্, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ২৭; *মানাহিজুল-বাহাছ ফীত-তারবিয়াহ্ ওয়া 'ইলমিন নাফস*, 'আরবী অনুবাদ: মুহাম্মাদ নাবীল নাওফিল ও সুলায়মান আল-খিদরী (কায়রো: মাকতাবাতুল-আনজালু আল-মিসরিয়্যাহ্, ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ৯।
- ৭ Francis Rummel, *An Introduction to Research Procedure* (New York: Harper and Row, 1904), p. 9.
- ৮ *Ibid.*
- ৯ জামালুদ্দীন আল-কাসেমী, *কাওয়া'ইদুত-তাহদীস* (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ্, ১৪০৬ হি./১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৩৮।
- ১০ জগমোহন মুখোপাধ্যায়, *গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১১-১২।
- ১১ জিনাত জামান, *শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল* (ঢাকা: এডমুড লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৪০।
- ১২ ড. 'আবদুল মুন্'ঈম খাফাজী ও ড. 'আবদুল আযীয শারারফ, *কাইফা তাকতুবুল বাহাছ* (কায়রো: মাকতাবাহ আল-আনজালুল মিসরিয়্যাহ্, তাবি), পৃ. ১০।
- ১৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।
- ১৪ Turabian, *A Manual for Writers of term papers, Theses And Dissertations* (London: The University of Chicago, 15th edition, 1987), p. 121.
- ১৫ ড. 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আশ-শারীফ, *মানাহিজুল-বাহাছিল 'ইলমী দালীলুত-তালিবি ফী কিতাবাতিল আবহাছ ওয়ার-রাসাই'লিল 'ইলমিয়্যাহ্* (কায়রো: 'উসামী লিন্-নাশর ওয়াত-তাওযী', ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১৮০।
- ১৬ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৯।
- ১৭ ড. ইউসুফ ইয়াকুব আস-সুলতান, *আল-ইসলাম ওয়া তাম্বীয়াতুল 'ইলম ওয়াল বাহাছিল 'ইলমি*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।
- ১৮ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ আবু আব্দুল্লাহ আল-কাযবীনি, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, তাবি.), পৃ. ৮৩, হাদীস নং- ২২৯।
- ১৯ মাজদুদ্দীন আবু সা'আদাত আল-মুবারাক বিন মুহাম্মদ আল-জামরি ইবনুল আসির, *জামিউল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: মাকতাবাতুল হালওয়ানি, তাবি.), পৃ. ২৭৭, হাদীস নং- ৬৪।
- ২০ সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ২৪।
- ২১ সূরা আর-রুম, আয়াত: ৮।
- ২২ সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯০।
- ২৩ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৪।

- ২৪ সূরা ছোয়াদ, আয়াত: ২৯।
- ২৫ সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮৯-১৯০।
- ২৬ সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৮৫।
- ২৭ সূরাহ আল-আশিয়া, আয়াত: ৭।
- ২৮ সূরাহ আল-হুজুরাত, আয়াত: ৬।
- ২৯ সূরাহ আন-নূর, আয়াত: ২।
- ৩০ সূরাহ আন-নূর, আয়াত: ৪।
- ৩১ জামিউল উসূল ফি আহাদীসির রাসূল, ৭ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৩, হাদীস নং- ৫২৯৬।
- ৩২ সুলাইমান ইবনুল আশআছ আবু দাউদ আস সিজিস্তানি আল-আযদি, সুনানু আবি দাউদ, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, তাবি.), পৃ. ৩২৭, হাদীস নং- ৩৫৯৫।
- ৩৩ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন আল-ফযল বিন বাহরাম আদ-দারেমী আত-তামিমি, সুনানুদ দারিমী, ১ম খণ্ড (মিশর: ওয়ারাতুল আওকাফ আল মিসরিয়্যাহ, তাবি.), পৃ. ২৯৮, হাদীস নং- ২৭০।
- ৩৪ তদেব।
- ৩৫ আবু বকর আহমদ বিন আল হুসাইন বিন আল বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা ওয়া ফি যায়লিহিল জাওহারিন নাকিয়্যাহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড (হায়দারাবাদ: মাজলিসু দাইরাতুল মা'আরিফ আন-নিযামিয়্যাহ, ১৩৪৪ হি.), পৃ. ২১০, হাদীস

আহমাদ শাওকীর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য: একটি পর্যালোচনা

ড. মো: সাজিদুল হক*

[**Abstract:** Ahmad Shawqi is the most famous poet in Arab world who made a great effort to introduce dramatic poetry in modern Arabic literature through his literary works. Actually this branch of poetry has flourished and achieved much popularity among the Arab people for his memorable contribution. As a result he is considered as a pioneer of dramatic poetry in Arabic literature. He wrote a total of six dramatic poems, five of which are historical and one social. *Masrau Cleopatra*, *Qambyses* and *Ali Bey Al-Kabir* are written on Egyptian historical subjects, both *Majnun Laila* and *Antara* deal with ancient Arab themes, *As-Settu Huda* is written on a contemporary Egyptian social phenomenon. Shawqi wrote these historical dramatic poems during the last four years of his life (1928-32). The main object of his historical dramatic poetry is sacrifice for the country and contribution to the development of the nation. Actually Shawqi used historical characters and stories in his dramatic poetry to inspire the people especially Egyptian people towards patriotism and awareness about responsibility. Finally his historical dramatic poetry played a major role in the Egyptian independence movement and national renaissance. The aim of this article is to review the historical dramatic poetry of Ahmad Shawqi and try to evaluate it in the light of the comments of literary critics.]

ভূমিকা

নাট্যকাব্য আধুনিক আরবী সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশক থেকে আরবী সাহিত্যে নাট্যকাব্যের চর্চা লক্ষ্য করা যায়। আরবী নাট্যকাব্যের বিকাশে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, তিনি হলেন মিসরের প্রথিতযশা কবি আহমাদ শাওকী। তাঁকে আরবী নাট্যকাব্যের অগ্রদূত ও জনক বলে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি আরবী কাব্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করার পর জীবনের শেষ দিনগুলোতে এসে নাট্যকাব্যের চর্চায় অগ্রহী হয়ে উঠেন। মূলত আরবী সাহিত্যে নাট্যকাব্যের তেমন চর্চা না থাকায় তিনি আরবী কাব্য সাহিত্যে নাট্যকাব্যের ধারা সংযোজন করেন। তাঁর অধিকাংশ নাট্যকাব্যগুলো ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত। তিনি তাঁর নাট্যকাব্যে ঐতিহাসিক বিভিন্ন চরিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে অবহেলিত মিসরীয় জাতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে তাঁর নাট্যকাব্য মিসরীয়

* সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং মিসরের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। তাঁর নাট্যকাব্য পর্যালোচনা করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তিনি নাট্যকাব্য রচনায় ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাসমূহের বর্ণনার ক্ষেত্রে অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে কবি আহমাদ শাওকীর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য পর্যালোচনা করা হবে এবং সাহিত্য সমালোচকদের মন্তব্যের আলোকে সেগুলোকে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে।

কবি আহমাদ শাওকীর পরিচয়

কবি আহমাদ শাওকী খেদীভ ইসমাঈল পাশার^১ শাসনামলে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে মিসরের কায়রো শহরের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।^২ কবির জন্ম পরম্পরা পিতার দিক দিয়ে কুদী ও মাতার দিক দিয়ে তুর্কী বংশে মিলিত হয়েছে।^৩ তাঁর দাদা কুদী, দাদী ককেশিয়ান, নানা তুর্কী এবং নানী গ্রীক বংশীয় ছিলেন।^৪ তিনি মাতৃস্নেহ বেশী দিন লাভ করতে পারেননি, জন্মের মাত্র তিন বছর পর তাঁর মাতা মৃত্যুবরণ করেন।^৫ এরপর তাঁর মাতামহ তাঁকে দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যিনি তৎকালীন সময়ে ইসমাঈল পাশার রাজপ্রাসাদের পরিচারিকা ছিলেন। ফলে কবি রাজপ্রাসাদের আনন্দমুখর পরিবেশে বেড়ে উঠেন।^৬

শাওকী অল্প বয়সে মজ্জবে ভর্তি হন, এরপর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। মাত্র পনের বছর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে পিতার নির্দেশনায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে আইন কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু অর্থনৈতিক অভাবের কারণে আইন বিষয়ে লেখা পড়া করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠে।^৭ ফলে তিনি দ্রুত চাকুরী লাভের আশায় সেখানকার অনুবাদ বিভাগে দুই বছর অধ্যয়ন করে ডিগ্রী লাভ করেন। অনুবাদ বিভাগে অধ্যয়নকালে আরবী সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক শায়খ মুহাম্মাদ বসয়ুনীর সাথে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। এসময় তাঁর মধ্যে প্রগাঢ় কাব্যানুরাগ সৃষ্টি হয় এবং তখন থেকেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করেন।^৮ ডিগ্রী অর্জনের পর খেদীভ প্রাসাদে কর্মসংস্থান হলে সরকারী অর্থায়নে তিনি আইন বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের লক্ষ্যে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স গমন করেন এবং ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে লেখাপড়া শেষে মিসরে ফিরে এসে রাজপ্রাসাদে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর জীবনের বিশ বছরের অধিক সময় রাজপ্রাসাদের সেবায় নিয়োজিত থাকেন।^৯

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কবিকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেয়। ফলে কবি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে যুদ্ধ সমাপ্তি পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বছর স্পেনে কাটান। এই সময়ে তাঁর মধ্যে জন্মভূমি মিসরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়, তাঁর মধ্যে তীব্রভাবে দেশপ্রেম জেগে উঠে। ফলে তিনি মিসরের সৌন্দর্য্য ও ইতিহাস-ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে বহু কবিতা রচনা করেন। যুদ্ধ সমাপ্তির পর দেশে ফিরে এসে মিসরের রাজনৈতিক অবস্থায় বিরাট পরিবর্তন দেখতে পেয়ে তিনি রাজপ্রাসাদের পরিবর্তে জনগণের কাতারে शामिल হন এবং জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা ও তাদের জাতীয় সমস্যাবলী কবিতায় তুলে ধরেন।^{১০} ফলে অতি অল্প সময়ে তাঁর খ্যাতি মিসরসহ আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *শাওকীয়াত* এর প্রথম মুদ্রণ শেষ হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা দেখা দেয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণ উপলক্ষে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কায়রোর শাহী অপেরা হাউজে এক বিরাট সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মিসরসহ আরব বিশ্বের প্রায় সকল দেশের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এ সভায় সর্ব সম্মত ভাবে তাঁকে আমীরুশ শূ‘আরা (*The Prince of Poets*) খিতাবে ভূষিত করেন।^{১১} এটি আরবী কাব্য জগতে তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি।

কবি আহমাদ শাওকী এ মহান খিতাবে ভূষিত হওয়ার পর থেকে আরো নতুন উদ্যোগে কাব্যচর্চা শুরু করেন। তিনি পাশ্চাত্যের কাব্যরীতির আদলে নতুন কাব্যপ্রাসাদ নির্মাণের প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এ

প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি আরবী কাব্যজ্ঞানে নাট্যকাব্য সংযোজন করেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি এ নতুন ধারার দিকে একান্তভাবে মনোনিবেশ করেন। অবশেষে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর মিসরে কবি আহমাদ শাওকী ইন্তিকাল করেন।^{১২} তাঁর মৃত্যুতে মিসরসহ গোটা আরব জগতে শোকের ছায়া পড়ে যায় এবং বিভিন্ন আরব কবি তাঁর শোকগাথা রচনা করেন।

আহমাদ শাওকীর নাট্যকাব্য রচনার প্রেক্ষাপট

কবি আহমাদ শাওকী আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের লক্ষ্যে ফ্রান্স গমন করেন। তৎকালীন সময়ে ফ্রান্সে নাট্যকাব্য ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। থিয়েটারগুলোতে বড় বড় কবি ও নাট্যকারদের নাট্যকাব্য মঞ্চস্থ করা হতো। তিনি সেখানেই প্রথম নাট্যকাব্য সম্পর্কে অবহিত হন, এবং নাট্যকাব্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন।^{১৩} শাওকী তৎকালীন দুই বিখ্যাত ফরাসী কবি ও নাট্যকার পিয়ের কর্নিল (Pierre Corneille) ও জীন রাসীন (Jean Racine) দ্বারা ধীরে ধীরে প্রভাবিত হতে থাকেন।^{১৪} শাওকীর নাট্যকাব্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠার আরেকটি অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে যে, তৎকালীন শেলী, ভ্যারন, হুগো এর ন্যায় পাশ্চাত্যের প্রসিদ্ধ নাট্যকারগণ গদ্যের উপর কাব্য প্রাধান্য দিয়ে নাট্যকাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।^{১৫} তাঁদের এ খ্যাতি লাভের বিষয়টি কবি আহমাদ শাওকীকে নাট্যকাব্যের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। ফলে তিনিও নাট্যকাব্য রচনায় এগিয়ে আসেন। তিনি সর্ব প্রথম *আলী বেক আল কাবীর* নামক নাট্যকাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। প্রথম নাট্যকাব্য হিসেবে এর মধ্যে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিলে তা অপ্রকাশিত থেকে যায়। অবশেষে জীবনের শেষ বছরগুলোতে তিনি পুনরায় নাট্যকাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ সময়ে তিনি পরিপূর্ণ প্রস্তুতিসহ আত্মনিয়োগ করেন।^{১৬} নাট্যকাব্য রচনার কারণে প্রথম দিকে তিনি কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হলেও পরবর্তীতে যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেন।

আহমাদ শাওকীর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য রচনার তাৎপর্য

আহমাদ শাওকীর নাট্যকাব্য মূলত দুটি ধারায় রচিত হয়েছে। একটি হলো ঐতিহাসিক ধারা, অপরটি হলো সমসাময়িক চলমান ধারা। তবে তাঁর নাট্যকাব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি সমসাময়িক চলমান ধারার চেয়ে ঐতিহাসিক ধারার প্রতি বেশী আগ্রহী ছিলেন। কেননা তিনি তাঁর ছয়টি নাট্যকাব্যের মধ্যে পাঁচটি ঐতিহাসিক বিষয়কে কেন্দ্র করে রচনা করেন এবং মাত্র একটি নাট্যকাব্য সমসাময়িক চলমান বিষয়কে নিয়ে রচনা করেন। তাঁর ছয়টি নাট্যকাব্যের মধ্যে তিনটি মিসরের ইতিহাসকে নিয়ে রচিত, দুটি প্রাচীন আরবের ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত, একটি মিসরের সমকালীন সামাজিক বিষয়কে নিয়ে রচিত। *মাসরা* উ *কিলিউবাতরা* ও *কামবীয* নাট্যকাব্যদ্বয়ে শাওকী প্রাচীন মিসরের ইতিহাস আলোচনা করেন, *আলী বেক আল কাবীর* নাট্যকাব্যটিতে মিসরের মধ্যযুগীয় ইতিহাস তথা তুর্কি শাসনামলের ইতিহাস আলোচনা করেন। *মাজনুন লায়লা* ও *‘আনতারা* নাট্যকাব্যদ্বয়ে প্রাচীন আরবের ইতিহাস উপস্থাপন করেন। *আস্ সিদ্দু হুদা* নাট্যকাব্যটিতে শাওকী সমকালীন মিসরীয় সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন।^{১৭}

শাওকী তাঁর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যগুলোর মাধ্যমে যে বিষয়টির প্রতি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করেন, তা হলো মিসরের স্বাধীনতা অর্জন ও জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে মিসরীয়দের সচেতন করে তোলা। মিসরের ইতিহাস দ্বারা তিনি মিসরীয় জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগ ও দেশের গৌরব রক্ষা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। অপরদিকে তিনি প্রাচীন আরব ইতিহাসের মাধ্যমে মিসরীয় জনগণের মনে দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়ে জাগরণ সৃষ্টির চেষ্টা করেন।^{১৮}

আহমাদ শাওকীর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য

কবি আহমাদ শাওকী আরবী কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে সর্ব প্রথম সফলভাবে নাট্যকাব্য রচনা করেন। যদিও তাঁর পূর্বে বেশ কয়েকজন আরব কবি নাট্যকাব্য নিয়ে চর্চা করেন, কিন্তু সেগুলো নানা কারণে তেমন সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তিনিই মূলত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আরবী কাব্য জগতের এই নতুন শাখাটির সমৃদ্ধি সাধন করেন। বলা হয়ে থাকে, আরবী নাট্যকাব্য তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি।^{১৯} তাঁর প্রথম নাট্যকাব্য *মাসরা'উ কিলিউবাতরা* প্রকাশিত হয় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে, দ্বিতীয় নাট্যকাব্য *মাজনুন লায়লা* ও তৃতীয় নাট্যকাব্য *কামবীয* উভয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে, চতুর্থ নাট্যকাব্য *আনতারা* ও পঞ্চম নাট্যকাব্য *আলী বেক আল কাবীর* প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে, একই বছরের শেষ দিকে প্রকাশিত হয় ষষ্ঠ নাট্যকাব্য *আস্ সিদ্দু হুদা*।^{২০} তাঁর রচিত নাট্যকাব্যের মধ্যে প্রথম পাঁচটি ঐতিহাসিক ও শেষ নাট্যকাব্যটি সামাজিক। নিম্নে তাঁর রচিত পাঁচটি ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যের আলোচনা তুলে ধরা হলো:

মাসরা'উ কিলিউবাতরা (مصرع كليوباترا)

মাসরা'উ কিলিউবাতরা কবি আহমাদ শাওকীর অন্যতম একটি নাট্যকাব্য। মিসরীয় ইতিহাসের একজন প্রভাবশালী সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী রাজকন্যা ক্লিওপেট্রা। তার জীবনালেখ্যকে উপজীব্য করে অসংখ্য কাহিনী, কবিতা, নাটক এবং উপন্যাস রচিত হয়েছে। একটি পরিসংখ্যান মতে কেবল ফ্রান্সেই পনেরটি নাটক রচিত হয়। ইংরেজীতে প্রায় ছয়টি, ইতালি ভাষায় চারটি। এছাড়া বিশ্বের আরও অন্যান্য ভাষায় এই কাহিনীকে অবলম্বন করে নাটক রচিত হয়েছে।^{২১} কবি আহমাদ শাওকীর মাসরা'উ কিলিউবাতরা নাটকটি এই ধারাবাহিকতারই একটি অংশ এবং এ জাতীয় সাহিত্যে আরবী ভাষার মুখপাত্র। এটি একটি বিয়োগান্ত নাট্যকাব্য। তাঁর রচিত এই নাট্যকাব্যটি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম একটি স্বার্থক নাট্যকাব্য হিসেবে আরবী সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে। ইংরেজী সাহিত্যের বিশিষ্ট নাট্যকার উইলিয়াম শেকসপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬ খ্রি.) তাঁর অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা (Antony & Cleopatra) নাটকে যে ধারা অবলম্বন করেন কবি শাওকী তাঁর নাট্যকাব্যেও সেই ধারা অবলম্বনের চেষ্টা করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩০ অব্দের দিকে আলেকজান্দ্রিয়া এবং তার বিভিন্ন উপকণ্ঠে সংঘটিত ঘটনাবলী অবলম্বনে এটি রচিত হয়। এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল রোমান সেনাপতি অ্যান্টনি ও মিসরীয় সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার প্রেম এবং তাঁদের মর্যাস্তিক পরিণতি।

পিতার মৃত্যুর পর ক্লিওপেট্রা সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁর এক ভাই তাঁর নিকট থেকে সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেয়। জুলিয়াস সিজার ক্লিওপেট্রার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে এবং পিতার সাম্রাজ্য লাভে তাঁর পথ সুগম করে। সিজারের মৃত্যুর পর রোমান সেনাপতি অ্যান্টনিকে সেখানে পাঠানো হয়। অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রার প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়লে রোমানরা বিষয়টিকে ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনা। ফলে পরবর্তী সেনাপতি অক্টোভিয়াকে তার বিরুদ্ধে পাঠানো হয়। অক্টোভিয়া তার নৌ-বহর নিয়ে অ্যান্টনির মুকাবিলায় এগিয়ে আসে।^{২২} এদিকে ক্লিওপেট্রা ও অ্যান্টনি একত্রিত হয়ে তাদের নৌ-বহরগুলো নিয়ে অক্টোভিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার আকতিউম সমুদ্র উপকূলে তাদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ক্লিওপেট্রা ও অ্যান্টনি তাদের নৌ-বহর নিয়ে পলায়ন করে। আলেকজান্দ্রিয়ার সন্নিকটে তাদের আরও একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেখানেও অ্যান্টনি অক্টোভিয়ার কাছে খুব অসহায় হয়ে পড়ে। উপায় না পেয়ে ক্লিওপেট্রা তার রূপ-ঐশ্বর্য দিয়ে অক্টোভিয়াকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থ হলে রাজপ্রাসাদে আত্মগোপন করেন। চারিদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে তিনি মারা গেছেন। এ খবর শুনে অ্যান্টনি আত্মহত্যা করে। অ্যান্টনির ক্ষত-বিক্ষত দেহ ক্লিওপেট্রার কাছে নিয়ে আসলে তাঁর কোলে অ্যান্টনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

করে। এদিকে অক্টোভিয়া রাজপ্রাসাদ দখল করলে ক্লিওপেট্রা উপলব্ধি করেন যে, বিজয়ী রোমান সম্রাট তাঁকে হত্যা করবে অথবা লক্ষিত করবে। শত্রুর হাতে নিহত হওয়া অথবা রোমানদের মাঝে কলংক নিয়ে বেঁচে থাকা দুটো বিষয়কেই তিনি অপছন্দ করেন। তাই তিনি স্বেচ্ছায় পূর্বের সংগ্রহকৃত বিষাক্ত সাপ নিজের বুকের সামনে ধরেন এবং তার দংশনে মারা যান।^{২৩} এভাবেই কাহিনীটির যবনিকাপাত হয়।

শাওকী তাঁর নাট্যকাব্যটি চারটি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে সমাপ্ত করেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদ একটি আরেকটির সাথে সম্পৃক্ত। নাট্যকাব্যটি রচনার ক্ষেত্রে তিনি তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন, প্রথমটি ঐতিহাসিক বিষয়বলী, দ্বিতীয়টি শেকসপিয়রের অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা (Antony & Cleopatra) নাটক, তৃতীয়টি জাতীয়তাবাদী অনুভূতি।^{২৪} শাওকী তাঁর এই নাট্যকাব্যটিতে ইতিহাসের ধারা সংরক্ষণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। তবে চরিত্র চিত্রায়নে কোন কোন ক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। নাট্য শিল্পের বিচারে এটি কবির একটি অনবদ্য উপহার। কবিতার ছন্দে ঘটনার ধারাবাহিকতা, ভাব-কল্পনার সুন্দর বিন্যাস এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলোর অনুপম চিত্রায়নের জন্য এটি অতুলনীয়।^{২৫}

মাজনুন লায়লা (مجنون ليلى)

মাজনুন লায়লা আহমাদ শাওকীর রচিত দ্বিতীয় নাট্যকাব্য। তবে খাঁটি আরবীয় উপাখ্যানকে অবলম্বন করে রচিত এটি আরবী সাহিত্যের প্রথম নাটক। এটি রচিত হয় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। *কিতাবুল আগানী* নামক গ্রন্থে মাজনুনকে উপলক্ষ করে যে কাহিনী বিধৃত হয়েছে, কবি সে কাহিনীকে অনেকটা নাট্যরূপ দিয়েছেন। নাট্যকাব্যটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো লায়লার জন্য মাজনুনের প্রেম, মনোবিকারত্ব এবং পরিণতিতে মর্মান্তিক মৃত্যু।

বলা হয়ে থাকে এটি উমাইয়া যুগের একটি বিখ্যাত প্রেম কাহিনী। কায়েস নামক এক তরুণ কবির সাথে চাচাত বোন লায়লা আল আমিরীর ছোট বেলা থেকেই সম্পর্ক গড়ে উঠে। পথে প্রান্তরে এক সাথে ঘুরে বেড়ানো, একসাথে ছাগল চরানো ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের প্রেম গভীর হতে থাকে। কায়েস তাকে উপলক্ষ করে অনেক কবিতা রচনা করে, যেগুলো এলাকার লোকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি লায়লার পিতার কানে আসলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং তাঁর কাছে কায়েসের বিবাহ প্রস্তাব পাঠালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। উপরন্তু তাকে লায়লার সাথে দেখা সাক্ষাত ও কথাবার্তা বলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কেননা তৎকালীন আরব সমাজে প্রেমগাথা রচয়িতাদের সাথে মেয়েদের বিয়ে দেয়া অতি দূষণীয় বিষয় ছিল। পরবর্তীতে লায়লার পিতা ওয়ারদ আস সাকাফী নামক অপর এক তরুণের সাথে মেয়ের বিয়ে দেন। তখন কায়েসের জীবনে কষ্টের আঁধার নেমে আসে, অবিরতভাবে চোখের পানি ঝরতে থাকে। সে মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কখনো পশু-পাখীর মত আচরণ করে, কখনো সে নিজের পরনের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, আবার মাঝে মাঝে কবিতা বলে। এদিকে নিজের প্রিয় মানুষটিকে না পাওয়ার বেদনায় কিছুদিন পর লায়লা অসুস্থ হয়ে মারা যায়। প্রেমিকার এমন অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর শোকে কাতর হয়ে অবশেষে মাজনুনও মৃত্যুবরণ করে। এভাবে নাট্যকাব্যটির ধারাবাহিকতা শেষ হয়।

নাট্যকাব্যটি দীর্ঘ অবয়বের অধিকারী, যা পাঁচটি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। তাঁর এ নাট্যকাব্যটি একটি মৌলিক রচনা। মাসরা'উ কিলিওবাতরা নাট্যকাব্যে ইউরোপীয় প্রভাব যেমনটি লক্ষ্য করা যায়, এ নাট্যকাব্যটিতে তেমন পরিলক্ষিত হয়না। বিষয়বস্তুর দিক থেকে নাট্যকাব্যটি বিয়োগান্ত নাট্যকাব্যের অন্তর্ভুক্ত। এর কাহিনীর উৎপত্তি নজদের মরু অঞ্চলে, পরবর্তীতে এটি নজদ, ইয়াসরিব এবং তায়েফের গ্রাম থেকে

গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। কবি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে নাট্যকাব্যের কাহিনীটি উপস্থাপন করেন। তিনি মিসরের বাদশাহ ফারুককে এটি উপহার দেন। পরবর্তীতে কায়রো শহরে সর্বপ্রথম এই নাট্যকাব্যটি মঞ্চায়িত হয়।^{২৬}

কামবীয (قمبیز)

কামবীয নাট্যকাব্যটি আহমাদ শাওকীর প্রসিদ্ধ একটি নাট্যকাব্য। পারস্যের একটি বিখ্যাত কাহিনী অবলম্বন করে কবি আহমাদ শাওকী ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কামবীয নাট্যকাব্যটি রচনা করেন। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে পারস্যের সম্রাট ছিলেন কামবীয। তিনি মিসর আক্রমণ করে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালান। ঐতিহাসিকগণ পারসিকদের মিসর আক্রমণের অনেকগুলো কারণ বিশ্লেষণ করেন, যেগুলোর মধ্যে মিসরীয় রাজকন্যা নিফরীতের বিবাহের বিষয়টি অন্যতম। কামবীয ও নিফরীতের সে কাহিনীটিই আলোচ্য নাট্যকাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

পারস্য সম্রাট কামবীয মিসরের সম্রাট আমাযীসের কন্যা নিফরীতকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান, কিন্তু নিফরীত ভীনদেশে বিয়ে করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। কামবীযের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিণতি উপলব্ধি করে মিসরের পূর্ববর্তী সম্রাট আবারিয়াসের কন্যা নিতিয়াতাস নিফরীত নাম ধারণ করে নিজেকে কামবীযের স্ত্রী হিসাবে সোপর্দ করেন। পরবর্তীতে কানীস নামে মিসরীয় সেনাবাহিনীর এক গ্রীক সেনাপতি এই বিয়ের গোপন রহস্য কামবীযের নিকট ফাঁস করে দিলে কামবীয অগ্নিশর্মা হয়ে মিসর আক্রমণ করেন। তখন আমাযীসের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর পুত্র বাসামাতীক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কামবীয মিসর জয় করে বাসামাতীককে শাস্তি প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি শহর-বন্দরসহ বিভিন্ন এলাকায় বীভৎস ধ্বংসযজ্ঞ চালান। তিনি সেই বিশ্বাসঘাতক গ্রীক সেনাপতিকেও হত্যা করেন। অবশেষে নিফরীত কামবীযের হাত থেকে মুক্তির কোন উপায় দেখতে না পেয়ে আত্মহত্যা করে। এতে কামবীয আরো বীভৎস হয়ে উঠেন। তিনি মিসরীয় গোদেবতা আবীসকে হত্যা করেন। ফলে এক পর্যায়ে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং আত্মহত্যা করেন। এভাবেই নাট্যকাব্যটির যবনিকাপাত হয়।^{২৭}

আলোচ্য নাট্যকাব্যটি আহমাদ শাওকীর বিয়োগান্ত নাট্যকাব্যের অন্যতম একটি নাট্যকাব্য, যা তিনটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। নাট্যকাব্যটিতে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে কবি মিসরীয় জনগণের মনে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন।^{২৮} বিশেষত দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নিতিয়াতাস এর আত্মত্যাগের বিষয়টি তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও স্পষ্ট করে উপস্থাপন করেন। চরিত্র উপস্থাপনের পাশাপাশি নাট্যকাব্যটিতে তিনি প্রাচীন পারস্য ও মিসরের নানা ইতিহাস তুলে ধরেন। কামবীয একটি ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য হলেও সেখানে বেশ কিছু কাল্পনিক চরিত্র ও বিষয়বলী সংযুক্ত করার ফলে শাওকী সাহিত্যিক মহলে সমালোচনার শিকার হন। নাট্যকাব্যটিতে চরিত্র ও ঘটনার আধিক্যের কারণে কবিতা ও ছন্দের ধারা কিছুটা ব্যাহত হয়। মূলত নাট্যকাব্যটিতে তাঁকে কবির ভূমিকার চেয়ে নাট্যকারের ভূমিকায় বেশী দেখা যায়।^{২৯}

আলী বেক আল কাবীর (علي بك الكبير)

আলী বেক আল কাবীর দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের উপর রচিত আহমাদ শাওকীর বিখ্যাত নাট্যকাব্য। কবি ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় ফরাসী নাট্যকাব্যের প্রভাবে এ নাট্যকাব্যটির রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। নাট্যকাব্যটি রচনার পর তিনি খেদিভ তাওফীক এর নিকট তা উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন। নাট্যকাব্যটির কিছু ভ্রুটি-বিচ্যুতি খেদিভের দৃষ্টি গোচর হওয়ায় সেগুলো সংশোধনের পরামর্শ প্রদান করে শাওকীর নিকট ফেরত পাঠানো হয়। সে সময় অসুস্থতাসহ নানাবিধ ব্যস্ততার কারণে তিনি তা অপ্রকাশিত

রেখে দেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে পরিমার্জিত করে এটিকে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করেন। মিসরের মধ্যযুগের ঐতিহাসিক বিষয়কে কেন্দ্র করে কবি নাট্যকাব্যটি রচনা করেন। এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, উসমানী সাম্রাজ্য থেকে মিসরের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আলী বেগের প্রচেষ্টা ও তাঁর বিরুদ্ধে জামাতা মুহাম্মাদ আবুয যাহাবের বিদ্রোহ। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মিসরের ফুসতাত, সালিহিয়া, ‘উকা প্রভৃতি অঞ্চলে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয় তারই আলোকে এই নাট্যকাব্যটি রচিত হয়।^{৩০}

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আলী বেগ মিসরের মামলুক সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তৎকালীন উসমানীয় সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁকে মিসরের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি উচ্চাবিলাসী হওয়ায় দায়িত্ব প্রাপ্তির কিছুদিন পরেই মিসরকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা প্রদান করেন এবং পার্শ্ববর্তী বেশ কিছু এলাকা দখল করেন। মিসরকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার পথে আলী বেগের আন্দোলন প্রায় সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। কিন্তু শেষ পর্যায়ে উসমানীয়রা তাঁর জামাতা মুহাম্মাদ আবুয যাহাব এবং তাঁর ব্যক্তিগত সেবক মুরাদ বেগের হাতে মিসরের ক্ষমতা প্রদানের আশ্বাস দিলে সে আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অবশেষে সালিহিয়ার যুদ্ধে তারা বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে আলী বেগ ও তাঁর বাহিনীকে পরাজিত করে এবং তাঁকে হত্যা করে।^{৩১} নাট্যকাব্যটিতে ঐতিহাসিক ঘটনা বিন্যাসের পাশাপাশি আলী বেগের স্ত্রীর সাথে মুরাদ বেগের প্রেম কাহিনীও আলোচনা করা হয়।^{৩২}

আলী বেক *আল কাবীর* আহমাদ শাওকীর একটি বিয়োগান্ত নাট্যকাব্য। চরিত্রের উপস্থিতি কিছুটা সংকোচিত করে নাট্যকাব্যটিকে তিনটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত করা হয়।^{৩৩} শাওকী তাঁর এ নাট্যকাব্যে চমৎকার রচনাইশলী উপস্থাপন করেন এবং নাট্যকাব্যটি নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বার্থকতার পরিচয় দেন।^{৩৪} পাশাপাশি তিনি সাবলীল, সহজবোধ্য ভাষার মাধ্যমে তা পাঠকের নিকট হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে সক্ষম হন। মিসরের ইতিহাস বর্ণনাসহ তিনি তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলী আলোচনা করেন। তবে তিনি মিসরের স্বাধীনতা আন্দোলনে আলী বেগ এর অবদানের বিষয়টি সবচেয়ে বেশী ফুটিয়ে তুলার চেষ্টা করেন। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের সংলাপের সাথে সাথে সুর ও ছন্দের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।^{৩৫} একটি স্বার্থক নাট্যকাব্য হিসেবে নাট্যকাব্যটি মিসরে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

‘আনতারার (عنتره)

‘*আনতারার* কবি আহমাদ শাওকীর সর্বশেষ ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি নাট্যকাব্যটি রচনা করেন, তবে তাঁর মৃত্যুর পর এটি প্রকাশিত হয়। আরব্য উপাখ্যান অবলম্বন করে রচিত এটি তাঁর দ্বিতীয় নাট্যকাব্য। তিনি মূল গল্পটি কিতাবুল আগানীসহ সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে এর নাট্যরূপ দিয়েছেন।^{৩৬} নাট্যকাব্যটির মূল বিষয় হলো, ‘আনতারার ও তার চাচাত বোন ‘উবলার প্রেম কাহিনী।

‘আনতারার ছিল একজন কৃষ্ণকায় সাহসী তরুণ। সে জীবনে সাহসিকতা ও বীরত্বের অনেক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বাল্যকাল থেকে একসাথে ঘুরাঘুরি ও চলাচলের কারণে তাদের মাঝে ভালবাসার সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায়। সে ‘উবলাকে প্রচণ্ডভাবে ভালবাসতে শুরু করে, এমনকি এক পর্যায়ে তাকে পাওয়ার জন্য সে তার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। ‘উবলার পিতা তার বীরত্বের স্বীকৃতি দিলেও কৃষ্ণকায়তার কারণে তার সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে এবং সখর আল আমিরীর সাথে তার মেয়ের বিয়ে ঠিক করে। সখরের সাথে বিয়ে সম্পাদনের পর ‘উবলাকে তার শ্বশুরালয়ে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে তার পিতা একটি অশ্বারোহী দল নিয়ে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে ‘আনতারার উক্ত কাফেলাকে আক্রমণ করে ‘উবলাকে ছিনিয়ে নিয়ে

সখর আল আমিরীর কাছে ‘উবলার পরিবর্তে আবাস গোত্রের নাজিয়া নামী এক মহিলাকে পাঠিয়ে দেয়। নাজিয়া অনেক আগে থেকে সখরকে খুব ভালবাসত। ‘উবলা নাজিয়াকে তার চাদর এবং ঘোমটা প্রদান করে। সখর প্রথমে ‘উবলার ঘোমটা পড়া নাজিয়াকে চিনতে পারেনা, কিন্তু পরে যখন সব ঘটনা প্রকাশ পেয়ে যায় তখন উভয়েই সন্তুষ্ট হয়। ‘আনতারা তার প্রেমিকা ‘উবলাকে এবং নাজিয়া তার প্রেমাস্পদ সখরকে বিয়ে করে।^{৩৭} এভাবে নাট্যকাব্যটির শেষ দৃশ্য সমাপ্ত হয়।

নাট্যকাব্যটি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। নাট্যকাব্যটি মিলনাত্মক হলেও সেখানে বেশ কিছু ট্রাজেডি ও কমেডি দৃশ্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যা পাঠকের আকর্ষণ বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। কবি নাট্যকাব্যটিতে চরিত্র উপস্থাপনের পাশাপাশি পারিবারিক রীতি নীতি ও সামাজিকতার উপর প্রেমের বিজয়কে ফুটিয়ে তুলার চেষ্টা করেন। নাট্যকীয়তার বিচারে আলোচ্য নাট্যকাব্যটি একটি স্বার্থক নাট্যকাব্য হিসেবে সাহিত্য সমালোচকদের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়।^{৩৮} বিশিষ্ট সাহিত্যিক গুরু গানিম নাট্যকাব্যটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। মিসরের সর্বসাধারণের নিকট জনপ্রিয়তা অর্জন করায় নাট্যকাব্যটি একাধিকবার মিসরের নাট্যমঞ্চে মঞ্চায়িত হওয়ায় সুযোগ লাভ করে।

আহমাদ শাওকীর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যের মূল্যায়ন

আহমাদ শাওকীর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য আরবী সাহিত্যের এক অনন্য সৃষ্টি। খলীল ইয়াযিজীর মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে নাট্যকাব্যের প্রকাশ ঘটলেও আহমাদ শাওকীর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যের মাধ্যমে তা বিকাশ লাভ করে এবং আরব বিশ্বে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে শাওকীর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যগুলো ক্লাসিক্যাল ধারার অন্তর্ভুক্ত।^{৩৯} শাওকী তাঁর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যগুলো তিনটি ধারায় রচনা করেন। প্রথম ধারায় তিনি নাট্যকাব্যের বিভিন্ন চরিত্র ও স্থানের পরিচিতি তুলে ধরেন। দ্বিতীয় ধারায় তিনি নাট্যকাব্যের মূল বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তৃতীয় ধারায় তিনি পরিণতি বিষয়ে আলোচনা করেন। ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য রচনার ক্ষেত্রে ফরাসী নাট্যকার দ্বারা প্রভাবিত হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব ধারা ও রচনামূল্যে ব্যবহার করেন। এর মাধ্যমে তাঁর নাট্যকাব্যে এক অনন্য স্বকীয়তা ও মাদুর্যতা সৃষ্টি হয়।

শাওকীর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যসমূহ পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নাট্যধারার চেয়ে কাব্যধারার প্রতি বেশী যত্নবান ছিলেন। অনেক সমালোচক মনে করেন, শাওকী ইতিহাসের বর্ণনার প্রতি সচেতনতা ও গুরুত্ব প্রদানের কারণে নাটকের বিষয়বলী তাঁর এ সব রচনায় কিছুটা উপেক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে আস্ সিদ্দু হুদা নাট্যকাব্যটি সমকালীন সামাজিক বিষয়ের উপর রচিত হওয়ায় শাওকী নাট্যকাব্যের উভয় ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হন। নাট্যকাব্যটি একটি স্বার্থক নাট্যকাব্য হওয়ায় তিনি সমালোচকদের প্রশংসাও লাভ করেন।^{৪০}

শাওকীর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যে একটি বিশেষ বিষয় লক্ষ্য করা যায়, আর তা হলো অভিজাত্য। তিনি তাঁর এসব নাট্যকাব্যে বিভিন্ন রাজা-বাদশাহসহ শাসকগোষ্ঠীর জীবন ও কর্মের বিবরণ তুলে ধরেন। যেমন *মাসরা’উ কিলিউবাতরা* নাট্যকাব্যে মিসরের রাণী ক্লিওপেট্রার জীবন ও প্রেম কাহিনী আলোচনা করেন। *কামবীয* নাট্যকাব্যে পারস্যের রাজা কামবীয ও মিসরের রাজকন্যা নিফরীতের জীবন-ইতিহাস উল্লেখ করেন। *আলী বেক আল কাবীর* নাট্যকাব্যে মিসরের শাসক আলী বেগের ক্ষমতা গ্রহণ ও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ইতিহাস বর্ণনা করেন।^{৪১} শাওকীর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যে সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মানুষের আলোচনা তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায়না। মূলত তৎকালীন ফরাসী নাট্যকাব্যগুলো অভিজাত শ্রেণীকে নিয়ে রচিত হওয়ায় তাঁর নাট্যকাব্যে এর প্রভাব প্রতিফলিত হয়।^{৪২}

শাওকীর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যগুলো ইতিহাস নির্ভর হলেও পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক ধারা তাঁর নাট্যকাব্যে দেখতে পাওয়া যায়না, বরং শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ও অবস্থার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কাল্পনিক বিষয়াবলীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।^{৪৭} যেমন আলী বেক আল কাবীর নাট্যকাব্যে আলী বেগের স্ত্রীর সাথে মুরাদ বেগের প্রেম কাহিনীর বিষয়টি কাল্পনিক। ইতিহাসের পাতায় এ জাতীয় কোন তথ্যের বিবরণ উল্লেখ নেই। আলী বেক আল কাবীর নাট্যকাব্য ছাড়াও অন্যান্য নাট্যকাব্যসমূহে তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা বিন্যাসের পাশাপাশি কাল্পনিক চিত্র অংকন করেন। কোন কোন সাহিত্য সমালোচক তাঁর নাট্যকাব্যে বর্ণিত ইতিহাসের ধারা বিবরণের ক্ষেত্রে সমালোচনা করেন। বিশেষকরে প্রসিদ্ধ মিসরীয় সাহিত্যিক আব্বাস মাহমূদ আল আক্বাদ কামবীয নাট্যকাব্যটিতে বর্ণিত ইতিহাসের ব্যাপারে শাওকীর ব্যাপক সমালোচনা করেন।^{৪৮}

শাওকীর নাট্যকাব্য পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর প্রথম পর্যায়ের নাট্যকাব্যগুলো যে পরিমাণ সমালোচনার শিকার হয়েছে পরবর্তী নাট্যকাব্যগুলোর ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি। মূলত আরবী সাহিত্যে নাট্যকাব্যের নতুন সংযোজন হওয়ায় এবং এ ক্ষেত্রে শাওকীর পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় এমনটি ঘটেছে বলে অনেক সাহিত্যিক মনে করেন। তবে এ কথা সত্য যে, তাঁর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য আধুনিক আরবী সাহিত্যের মানকে বহু গুণে বৃদ্ধি করেছে। তাঁর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যে আলোচিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র মিসরীয় সমাজে আত্মমর্যাদাবোধ, মহানুভবতা, পৌরষত্ব ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলীর বিকাশে যথেষ্ট অবদান রাখে। শুধু তাই নয়, তৎকালীন মিসরের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে বেগবান করতে তাঁর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার

আহমাদ শাওকী আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও তাঁকে একজন সফল নাট্যকার হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। আরবী নাট্যকাব্যের বিকাশে তাঁর ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যগুলো অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, নাট্যকাব্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি যেমন পাশ্চাত্যের সুকুমার শিল্প দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, ঠিক তেমনি ক্লাসিকাল আরবীরীতিতেও সংরক্ষণ করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যসমূহে যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে তা হলো আত্মসম্মত, আত্মত্যাগ, মহত্ব, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও দায়বদ্ধতা। তিনি দক্ষতার সাথে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে সেগুলো পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর রচিত ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যগুলো শুধু আরবী সাহিত্যকেই প্রভাবিত করেনি, বরং মিসরের স্বাধীনতা আন্দোলনেও ব্যাপক প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়। আধুনিক যুগে আরবী নাট্যকাব্য চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্যকর্ম একটি উজ্জ্বল মাইল ফলক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

তথ্যনির্দেশ

^১ খেদিভ ইসমাঈল পাশা: ইসমাঈল পাশা ছিলেন ইবরাহীম পাশার তিন পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় এবং মুহাম্মাদ আলী পাশার নাতি। তিনি কায়রোর মুসাফিরখানা প্রাসাদে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইসমাঈল পাশা ছিলেন মিসর ও সুদানের খেদিভ এবং মুহাম্মাদ আলী রাজবংশের পঞ্চম শাসক। ১৮৬৩ থেকে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। তিনি তাঁর দাদা মুহাম্মাদ আলী পাশার মত উচ্চাভিলাষী ছিলেন এবং তাঁর শাসনামলে মিসর ও সুদানে অনেক আধুনিকায়ন করা হয়। ইসমাঈল পাশা ১৮৭৯ সালে রেসিনায় নির্বাসনে যান এবং ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। পরবর্তীতে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ কর্তৃক আমন্ত্রণে তিনি ইস্তাম্বুলের এমিরগান প্রাসাদে ফিরে আসেন এবং জীবনের বাকীটা সময় এখানে অতিবাহিত করেন। ১৮৯৫ সালে তাঁকে কায়রোতে দাফন করা হয়।

দ্রষ্টব্য: https://bn.wikipedia.org/wiki/ইসমাঈল_পাশা (গ্গ ইন তারিখ: ২০-০২-২০১৯)

- ২ আহমাদ আল হাশিমী, *জাওয়াহিরুল আদাব*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: মুআসসাততু তারীখিল 'আরাবী, প্রথম সংস্করণ, তা: বি:), পৃ. ২৫৫; 'উমর ফাররুখ, *আহমাদ শাওকী আমীরুশ শু'আরা ফিল 'আসরিল হাদীস* (বৈরুত: মাকতাবাতু মায়মুনাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫০ খ্রি.), পৃ. ৫।
- ৩ বুতরুস আল বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল জীল, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২৭৩।
- ৪ আহমাদ কবিশ, *তারীখুশ শি'রিল 'আরাবী আল হাদীস* (বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৭১ খ্রি.), পৃ. ৭৪।
- ৫ খায়রুদ্দীন আয যিরিকলী, *আল আ'লাম*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইলম লিলমালয়ীন, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৩৬; 'উমর রিয়া কাহালা, *মু'জামুল মুয়াত্তাফীন*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: মুয়াসসাতু রিসালাহ, সং: বি:, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৫৩।
- ৬ বুতরুস আল বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩; আহমাদ কবিশ, *তারীখুশ শি'রিল 'আরাবী আল হাদীস*, পৃ. ৭৪।
- ৭ ড. আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (চট্টগ্রাম: আল আকিব প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৬৬-১৬৭; আহমাদ ইসকানদারী ও অন্যান্য, *আল মুফাসসাল ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরুত: ইহুইয়াউল 'উলুম, সং: বি:, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৫৭০।
- ৮ ড. শাওকী দ্বায়ফ, *শাওকী শা'য়িরুল 'আসরিল হাদীস* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৫৩ খ্রি.), পৃ. ১৩।
- ৯ ইউসুফ 'আতা তুরায়ফী, *আমীরুশ শু'আরা আহমাদ শাওকী: হায়াতুহা ওয়া শি'রুহ* ('আম্মান: আল আহলিয়া, প্রথম সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১২।
- ১০ হান্না আল ফাখুরী, *আল জামি' ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী: আল আদাবুল হাদীস* (বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৪৩৮-৪৩৯; ড. আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৯।
- ১১ 'উমর ফাররুখ, *আহমাদ শাওকী আমীরুশ শু'আরা ফিল 'আসরিল হাদীস*, পৃ. ৭; আহমাদ আল ইসকানদারী ও অন্যান্য, *আল মুফাসসাল ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী*, পৃ. ৫৭১; হান্না আল ফাখুরী, *আল জামি' ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী: আল আদাবুল হাদীস*, পৃ. ৪৩৯।
- ১২ মুহাম্মাদ ইউসুফ কোকেন, *আ'লামুন নাসর ওয়াশ্ শি'র ফিল 'আসরিল 'আরাবী আল হাদীস*, ১ম খণ্ড (মাদ্রাজ: হাফিয়া হাউস, সং: বি:, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ২৮০।
- ১৩ ড. মুহাম্মাদ মানদুর, *মাসরাহিয়াতু শাওকী* (কায়রো: নাহযাতু মিসর, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭০ খ্রি.), পৃ. ৫৩।
- ১৪ তদেব, পৃ. ৫৪।
- ১৫ 'উমর আদ দাসূফী, *আল মাসরাহিয়াতু: নাশআতুহা ওয়া তারীখুহা ওয়া উসুলুহা* (কায়রো: দারুল ফিকর আল 'আরাবী, সং: বি:, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৫১-৫২।
- ১৬ ড. শাওকী দ্বায়ফ, *শাওকী শা'য়িরুল 'আসরিল হাদীস*, পৃ. ২১৫।
- ১৭ ড. আব্দুল মাজীদ আল ছর, *আহমাদ শাওকী আমীরুশ শু'আরা ওয়া নিগামিল লিহান ওয়াল গিনা* (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ২১৫।
- ১৮ ড. মুহাম্মাদ মানদুর, *মাসরাহিয়াতু শাওকী*, পৃ. ৫৪।
- ১৯ বুতরুস আল বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৬।
- ২০ হান্না আল ফাখুরী, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরুত: মাকতাবাতুল বুলাসিয়াহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ৯৯৭।
- ২১ ড. আহমাদ হাযকাল, *আল আদাবুল কাসাসী ওয়াল মাসরাহী ফী মিসর* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, সং: বি:, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৩০৮।

- ২২ তদেব, পৃ. ৩০৭।
- ২৩ তদানীন্তন রাজকীয় প্রথা হিসেবে বিষধর এক বিশেষ ধরনের সাপের ছোবলে ক্রিওপেট্রা আত্মহত্যা করেন (অ্যাস্প্‌ নামের এই সাপ হয় মাত্র কয়েক ইঞ্চি লম্বা, অথচ তাদের বিষ মারাত্মক। ডুমুরের বুড়িতে করে বিশেষ ব্যবস্থায় সাপ 'টি আনা হয়)। সে সময়ে মিসরে মনে করা হতো সাপের কামড়ে মারা যাওয়া মানুষ অমরত্ব লাভ করে। তাই ক্রিওপেট্রা সে পথ বেছে নেন।
দ্রষ্টব্য: <https://bn.wikipedia.org/wiki/ক্রিওপেট্রা> (লগ ইন তারিখ: ২২-০৩-২০১৯)
- ২৪ ইউসুফ 'আতা তুরায়ফী, আমীরুশ শ'আরা আহমাদ শাওকী: হায়াতুহু ওয়া শি'রুহু, পৃ. ৫৬।
- ২৫ বুতরুস আল বুস্তানী, উদাবাউল 'আরাব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭-৩২৭।
- ২৬ ড. আহমাদ হাযকাল, আল আদাবুল কাসাসী ওয়াল মাসরাহী ফী মিসর, পৃ. ৩২৭-৩৩৭।
- ২৭ মুহাম্মাদ ইউসুফ কোকেন, আ'লামুন নাসর ওয়াশ'শি'র ফিল 'আসরিল 'আরাবী আল হাদীস, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮; বুতরুস আল বুস্তানী, উদাবাউল 'আরাব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৭-৩৪০।
- ২৮ ড. শাওকী দ্বায়ফ, শাওকী শা'য়িরুল 'আসরিল হাদীস, পৃ. ২০২।
- ২৯ তদেব, পৃ. ২১৪।
- ৩০ হান্না আল ফাখুরী, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, পৃ. ১০০৭।
- ৩১ ড. আব্দুল মাজীদ আল হুর, আহমাদ শাওকী আমীরুশ শ'আরা ওয়া নিগামিল লিহান ওয়াল গিনা, পৃ. ১৮৮।
- ৩২ 'উমার আদ দাসুফী, আল মাসরাহিয়াতু: নাশআতুহা ওয়া তারীখুহা ওয়া উসুলুহা, পৃ. ৪৪; ড. মুহাম্মাদ ইউসুফ নাজম, আল মাসরাহিয়াতু ফিল আদাবিল 'আরাবী আল হাদীস (বৈরুত: দারু সাদির, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩০২-৩০৯।
- ৩৩ ড. শাওকী দ্বায়ফ, শাওকী শা'য়িরুল 'আসরিল হাদীস, পৃ. ২৫১।
- ৩৪ তদেব।
- ৩৫ তদেব, পৃ. ২২৪।
- ৩৬ তদেব, পৃ. ২৪৭।
- ৩৭ বুতরুস আল বুস্তানী, উদাবাউল 'আরাব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৪-৩৪৬; ড. আহমাদ হাযকাল, আল আদাবুল কাসাসী ওয়াল মাসরাহী ফী মিসর, পৃ. ৩৩৭-৩৪৬।
- ৩৮ ড. শাওকী দ্বায়ফ, শাওকী শা'য়িরুল 'আসরিল হাদীস, পৃ. ২৪৭।
- ৩৯ ড. মোহাম্মাদ সালিহ শানতী, আল আদাবুল 'আরাবী আল হাদীস (হায়েল-সৌদী 'আরব: দারুল আন্দালুস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২৬৯।
- ৪০ ড. শাওকী দ্বায়ফ, শাওকী শা'য়িরুল 'আসরিল হাদীস, পৃ. ১৭৫।
- ৪১ তদেব, পৃ. ১৭৫।
- ৪২ ড. নাবীল রাগিব, দালীলুন নাকিদিল আদাবী (কায়রো: দারুল গারীব, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ২০৪।
- ৪৩ ড. মোহাম্মাদ সালিহ শানতী, আল আদাবুল 'আরাবী আল হাদীস, পৃ. ২৬৯।
- ৪৪ ড. মুহাম্মাদ মানদুর, মাসরাহিয়াতু শাওকী, পৃ. ৭৬-৭৯।

ফী যিলালিল কুরআনের ভূমিকায় সাইয়েদ কুতুবের চিন্তা ও দর্শন

ড. মো: আতোয়ার রহমান*

Abstract: Sayyid Qutb shahid was born in Egypt in 1906 at the village of Musa. He was one of the most original independent muslim thinkers of his time. Sayyid Qutb was a literary figure a poet, a Novelist, a lecturer, a political thinker and an intellectual. He was very prolific and produced a number of published and unpublished works. Fi-Zilalil Quran is the largest and most important of them. This tafsir is Qutb's interpretation of the holy Quran as experienced by him. Qutb picked up several themes of the holy Quran in the introduction of the Fi Zilalil Quran. He said the life in the shade of Quran is a blessing of Allah. They know only who tastes it. He Looked from the above to the ignorance that is rippling in the earth, and to the concerns of its small and meager people. He felt the beautiful harmony between the human movement and the movement of this universe created by Allah. He also saw the confusion experienced by humanity in deviating from the Sunan cosmic and the clash between the corrupt teachings of evil. Which Allah has broken it. This paper aims at throwing light on the philosophy and thinking of Sayyid Qutb's introduction of his tafshir.

ভূমিকা

তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন শহীদ সাইয়েদ কুতুব (রহ.) এর দীর্ঘদিনের সাধনা ও গবেষণার ফসল। তিনি তাফসীর প্রণেতা ও বহু প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। যার প্রতিফলন দেখা যায় তার তাফসীরের মধ্যে। তিনি কুরআনের ছায়াতলে জীবন যাপন করেছেন, কিন্তু আত্মাহারা হয়ে পড়েননি বরং তিনি প্রবেশ করেছেন মহাশুভ পবিত্র কুরআনের অনেক গভীরে। মহাজ্ঞানীর সেই মহাশুভের একেবারে গভীরে তিনি পেয়ে গেলেন পবিত্র কুরআনের আসল স্বাদ, মানব-দানব, বিশ্ব প্রকৃতি সৃষ্টির আসল কথা। তিনি জানতে পারলেন মানুষের সাথে মহান রবের সম্পর্ক, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত জীবন-দর্শন এবং উপলব্ধি করেছেন জাহিলী জীবন দর্শন। সাইয়েদ কুতুব (রহ.) কুরআনের দর্শন ও জাহিলী জীবনদর্শন নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করে সুগভীর সত্য উপলব্ধির মাধ্যমে এক অনিন্দ্য সুন্দর তাফসীর রচনা করেন। এই কিতাবে একদিকে মানুষের জীবন যাত্রার রীতিনীতিসহ সমস্ত দিক যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, বালাগাত, দর্শনসহ বিভিন্ন দিকের আলোচনা যেন তিনি এক বিশাল সমুদ্র একটি বিন্দুর মাঝে প্রবেশ করিয়েছেন আমরা তার তাফসীর ফী যিলালিল কুরআনের ভূমিকায় এ মহান সত্যের সন্ধান পাই।

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

সাইয়েদ কুতুবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শহীদ সাইয়েদ কুতুব একজন মিশরীয় ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বিখ্যাত সংগঠক। শহীদ সাইয়েদ কুতুব বিংশ শতাব্দির কালজয়ী প্রতিভার নাম তার মূলনাম সাইয়েদ, কুতুব তার বংশীয় উপাধি। তার পরিচয় দিতে গিয়ে ড. আব্দুল ফাতাহ বলেন:

هو سيد قطب إبراهيم حسين شاذلى، ولد في قرية موشة إحدى قري 'محافظة أسيوط في مصر، وكانت ولادته في ٩ أكتوبر عام ١٩٠٦م^১

বর্ণিত আছে তার ষষ্ঠ পূর্ব পুরুষ ফকীর আব্দুল্লাহ ভারত থেকে পবিত্র মক্কা শরীফে হজ্জ পালনের জন্য গমন করেন এবং মিসরে চলে যান এবং মিসরের সুন্দর দৃশ্য ও পরিবেশ দেখে শেষপর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন।^২

তিনি ১৯০৬ সালের ৯ অক্টোবর মিসরের আসইউত জেলার মূশা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।^৩ পিতার নাম ইবরাহীম কুতুব। তিনি চাষাবাদ করতেন। মাতার নাম ফাতিমা হুসাইন উসমান। তারা দুই ভাই এবং তিন বোন। অপর ভাইয়ের নাম মুহাম্মাদ কুতুব। আর বোনেরা হলেন, হামিদা কুতুব ও আমিনা কুতুব এবং নাফিসা কুতুব।^৪

সাইয়েদ কুতুবের শিক্ষাজীবন শুরু হয় গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মায়ের ইচ্ছা অনুসারে তিনি শৈশবেই কুরআন শরীফ হেফজ করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষে তিনি কায়রোর তাজহিযিয়াহ্ দারুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯২৯ সালে ঐ মাদরাসার শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কায়রোর বিখ্যাত মাদরাসা দারুল উলূমে ভর্তি হন। সেখান হতে ১৯৩৩ সালে কৃতিত্বের সাথে বি.এ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং একই মাদরাসায় অধ্যাপনা কাজে নিযুক্ত হন।^৫ কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্কুল ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন। মিসরে ওই পদটিকে অত্যন্ত সম্মানজনক বিবেচনা করা হয়। এর মধ্যে তিনি আমেরিকা সফর করেন।^৬

দেশে ফিরে তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমীন দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি যাচাই করতে শুরু করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি এই দলের সদস্য হয়ে যান এবং ক’দিন বাদেই দলের তথ্য ও প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ শেষে মিসরকে স্বাধীনতাদানের ওয়াদা করে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইখওয়ান ব্রিটিশের মিসর ত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে তাদের জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেড়ে যায়। মাত্র দু’বছর সময়ের মধ্যে এ দলের সক্রিয় কর্মী সংখ্যা পঁচিশ লাখে পৌঁছে। সাধারণ সদস্য, সমর্থক ও সহানুভূতিশীলদের সংখ্যা ছিল কর্মী সংখ্যার কয়েকগুণ বেশি। ব্রিটিশ ও স্বৈরাচারী মিসর সরকার ইখওয়ানের জনপ্রিয়তা দেখে ভীত হয়ে পড়ে এবং এ দলের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।^৭

১৯৫১ সালের জুলাই মাসে মিসরে সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। সে বছরই ইখওয়ান পুনরায় বহাল হয়ে যায়। হাসানুল হোদায়বী দলের মুরশিদুল আম নির্বাচিত হন। দলের আদর্শ ও আন্দোলনের সম্প্রসারণ বিভাগ তার পরিচালনায় অগ্রসর হতে থাকে। পরিপূর্ণরূপে নিজেকে আন্দোলনের কাজে উৎসর্গ করেন তিনি।^৮

শ্রেফতার

১৯৫৪ সালে ইখওয়ান পরিচালিত সাময়িকী ‘ইখওয়ানুল মুসলিমীন’ এর সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।^৯ ছ’মাস পরই কর্ণেল নাসের সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়। কারণ ঐ বছর মিসর সরকার ব্রিটিশদের সাথে নতুন করে যে চুক্তিপত্র করে, পত্রিকাটি তার সমালোচনা করে। পত্রিকা বন্ধ করে দেয়ার পর নাসের সরকার এ দলের উপর নির্যাতন শুরু করে। একটি বানোয়াট হত্যামামলার অভিযোগে ইখওয়ানুল মুসলিমীন দলকে বেআইনি

ঘোষণা করে দলের নেতাদের গ্রেফতার করা তে থাকে। গ্রেফতারকৃত ইখওয়ান নেতাদের মধ্যে সাইয়েদ কুতুবও ছিলেন। তাকে মিসরের বিভিন্ন জেলে রাখা হয়। গ্রেফতারের সময় তিনি ভীষণভাবে জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। সামরিক অফিসার তাকে সে অবস্থায় গ্রেফতার করে। ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি ইরাকের প্রেসিডেন্ট আব্দুস সালাম আরিফ মিসর যান। তিনি সাইয়েদ কুতুবের মুক্তির সুপারিশ করায় কর্ণেল নাসের তাকে মুক্তি দিয়ে বাসভবনে অন্তরীণ করেন।^{১০} পরে তাকে আবারো গ্রেপ্তার করা হয়।

শাহাদাতবরণ

১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে সাইয়েদ কুতুব ও তার দু'জন সাথীকে সামরিক ট্রাইবুনালের পক্ষ থেকে মৃত্যুদণ্ডদেশ শুনানো হয়। ২৮ আগস্ট ১৯৬৬ সালে সাইয়েদ কুতুব ও তার দু'জন সাথীকে ফাঁসির সেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৯ আগস্ট ভোরে তাদের ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। ফজরের আযানের সাথে সাথেই তাদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। সারা বিশ্বে অগণিত মানুষকে কাঁদিয়ে সাইয়েদ কুতুব পৌঁছে গেলেন তার পরম প্রিয় প্রভুর সান্নিধ্যে।^{১১}

সমৃদ্ধ সাহিত্যভাণ্ডার

তিনি চলে গেলেন। পেছনে রেখে গেলেন এক বিরাট সাহিত্যসম্ভার। তার বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে একাধিক উপন্যাস ও বেশ কয়েকটি শিশু সাহিত্যসহ প্রায় বিশখানা গ্রন্থ। তন্মধ্যে তার অবিস্মরণীয় ও কালজয়ী গ্রন্থ তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন। এটি তাঁর অনবদ্য অবদান। তার এসব গ্রন্থাবলী ইসলামী প্রিয় জন মানুষের কাছে পথনির্দেশিকা ও অনুপ্রেরণার অনন্ত উৎস হয়ে থাকবে।^{১২}

ফী যিলালিল কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসেবে এ যাবত যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে আল্লামা শহীদ সাইয়েদ কুতুব (রহ.) প্রণীত “ফী যিলালিল কুরআন” সে সবার অন্যতম। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে তিনি তার এ অনবদ্য তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেছেন।^{১৩} কুরআনের পারার সংখ্যা সাথে সামঞ্জস্য রেখে রচনাটিকে ৩০ খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। তাফসীর গ্রন্থের তালিকায় এটি তাফসীর বির রায়হলেও তিনি এটিকে কেবল বর্ণনার মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। প্রথমত কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা, দ্বিতীয়ত কুরআনের ব্যাখ্যা রাসূল (সা.) এর হাদীস দ্বারা পেশ করেছেন। পাশাপাশি প্রায় প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যাতে তিনি সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফদের আমলের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এক সুরার সাথে পরবর্তী সুরার সম্পর্ক এবং একটি আয়াতের সাথে পূর্বাপর আয়াতের মাঝের যোগসূত্রকে তিনি চমকপ্রদভাবে উপস্থাপন করেছেন। যা অনেক তাফসীর গ্রন্থেই বিরল।

ফী জিলালিল কুরআনের ভূমিকায় সাইয়েদ কুতুবের চিন্তা-দর্শন

কুরআনের ছায়াতলে মানবজীবন

আল কুরআন মানবজাতির জন্য একটি বড় নিয়ামত। একটি ঐশী গ্রন্থ। এর ছায়াতলে যে বিচরণ করেছে, সেই খুঁজে পেয়েছে সঠিক পথের দিশা। আর বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারীরা কুরআনের পরশ থেকে নিজেকে কেবল আড়ালেই রাখেনি বরং নিজেদের অনিবার্য ধ্বংস ডেকে এনেছে। কুরআনের ছায়া প্রতিটি মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ। স্বয়ং কুরআন নিজের পরিচয় দিচ্ছে,

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ^{১৪}

আর আমি (আল্লাহ) অবতীর্ণ করি এমন কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও রহমতস্বরূপ। কুরআনের মর্মবাণীর স্বাদ ঐ ব্যক্তিই আশ্বাদন করতে পারবে যে এটির গভীরে গিয়েছে। ঈমানের মৃদু বাতাস যার হৃদয়ে নাড়া দিয়েছে, সেই উপলব্ধি করতে পেরেছে কুরআনের প্রকৃত তৃপ্তি। এটি নিছক একটি গ্রন্থ নয়, যার পঠন ও পাঠনই কেবল লক্ষ্য। এর বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি দুনিয়াবী সকল গ্রন্থ থেকে আলাদা। এর সামগ্রিকতা স্বয়ং কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ^{১৫}

অর্থাৎ, সৃষ্টিকুলের সকল সমস্যার সমাধান এবং মুসলমানদের জন্য আলোকবর্তিকা, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ আমি তোমার উপর এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি।

আ'ল কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

كتاب الله في نبأ من قبلكم و خبر ما بعدكم , من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم^{১৬}

পবিত্র কুরআন আল্লাহর কিতাব। যাতে আছে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের বিবরণ ও পরবর্তী প্রজন্মের সংবাদ। আর যে কুরআনের প্রতি আহ্বান করবে, তাকে পরিচালিত করা হবে সঠিক পথে। মহানবী (সা.) এর জীবন ছিল এ কিতাবের বাস্তব নমুনা। আল কুরআনের ব্যবহারিক রূপ। আম্মাজান আয়েশা (রা.) এর নিকট রাসূল (সা.) এর আখলাক ও চরিত্রমাধুরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, তাঁর আখলাক ও চরিত্রমাধুরী ছিল আল কুরআন।^{১৭}

এ গ্রন্থ মানবজাতিকে সকল প্রকার গোমরাহী ও ভ্রান্তি থেকে হেফাযত করে। হেদায়েতের রাজপথে বান্দাকে এগিয়ে দেয়াই তার কাজ। যে পথে চলে বান্দা পৌঁছে যাবে তার রবের সান্নিধ্যে। রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা এগুলোকে আঁকড়ে ধরবে, কিছুতেই বিভ্রান্ত হবে না। এক. আল্লাহর কিতাব। দুই. আমার সুল্লাত।^{১৮}

মানবজাতির প্রকৃত সম্মানের কারণ হলো আল কুরআন

মানুষকে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন ভাবে সম্মানিত করেছেন, শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীর উপর। ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا^{১৯}

আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদের উত্তম রিজক দান করেছি এবং যাদের আমি সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে আকৃতি ও গঠনে সৃষ্টি করেছে এটিও মানবজাতির অনেক বড় সম্মান। কুরআন মাজীদ এটিও ভিন্ন করে বর্ণনা করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি অবশ্যই মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি।^{২০} আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি বস্তুকেই তার সর্বোচ্চ সৌন্দর্য দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, তিনি (আল্লাহ) তাঁর সকল কিছু সৃজন করেছেন উত্তমরূপে এবং কাঁদা মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।^{২১} কিন্তু মানবজাতি পেয়েছে ভিন্ন সম্মান। মানব সৃষ্টিতে রাব্বুল ইজ্জত তাকে অধিক সম্মানে সম্মানিত করেছে। এটি তাঁর অন্যতম অনুগ্রহ। প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা এবং স্বভাবজাত বক্রতা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাকে যে সম্মান দান করেছেন, এটি ইঙ্গিত প্রদান করে যে, এসবের পরেও অস্তিত্বের মাঝে মানুষের একটি ভিন্ন

সম্মান রয়েছে, যা আল্লাহ তায়ালা কেবল মানুষকে দান করেছে।^{২২} বরং এ সম্মান প্রদানের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের এ সম্মান ছাড়িয়ে যেতে পারে আল্লাহ তায়ালা অন্যতম সৃষ্টি ফেরেশতার সম্মান ও মর্যাদাকেও। মে'রাজের ঘটনা এর প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। যেখানে জিবরীল আমীন (আ.) নির্দিষ্ট একস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন আর মানব নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাকেও ছাড়িয়ে আরো উচ্চ মাকামে আসীন হয়েছেন।^{২৩}

মানুষকে প্রদত্ত এ সম্মানের পিছনে লুকিয়ে আছে মূলত আল-কুরআনুল কারীম। এটি কেবল মানবজাতিকেই দেওয়া হয়েছে। মানুষের চেয়ে আকৃতি ও গঠনে বৃহৎ ও শক্তিশালী হচ্ছে পাহাড়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করতে চাইলে, সে অস্বীকৃতি জানায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَوْ أَنزَلْنَاهَا عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأُمُثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ^{২৪}

যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য যাতে তারা চিন্তা করে। এই কুরআনের যে ওয়ন ও ভারত্ব আছে, তাতে পাহাড় স্থির থাকতে না পারলেও মানুষ স্থির থাকতে পারবে বিধায় আল্লাহ তায়ালা এই কুরআন মানুষের উপর অবতীর্ণ করেছেন। এটি যেমনিভাবে কঠিন দায়িত্বভার সমানভাবে এটি মানবজাতির জন্য পরম সম্মানও বটে।^{২৫}

এটিই সকল সৃষ্টির উপর মানুষকে প্রাধান্য দেওয়ার পিছনে প্রধান কারণ। এটিই সেই সম্মানের কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত ফেরেশতাদের মাঝে ঘোষণা করেছেন মানবসম্মানের বিষয়টি। যেখানে উর্ধ্ববাসী ফেরেশতার মাটির তৈরী আদম (আ.) কে সেজদা করেছে। সুতরাং মানুষ যেন তার সম্মানের জায়গাটি বুঝে নেয়, চিনে নেয় তার নিজেকে আর তার উপর অর্পিত আমানতকে যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করতে উদ্যমি হয়, যা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল যমীন, আকাশমণ্ডলী এবং বিশালকায় পর্বতসমূহ।^{২৬}

সুতরাং মানবজাতির প্রতিটি সদস্য বৈষয়িক যতই উন্নতি করুক না কেন, কুরআনের সাথে সম্পর্ক ব্যতিরেকে সর্বময় চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

জাহিলীদের বাৎসল্যপনা ও কুরআনের আহ্বান

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন দুনিয়াতে আগমন করেন, তখন গোটা দুনিয়া আচ্ছন্ন ছিল বর্বরতা ও মূর্থতায়। সভ্যতা ও ভদ্রতার পরিবর্তে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল অসভ্যতা ও অশ্লীলতা। ছিল না অধিকার আদায়ের কোনো অঙ্গিকার। সবাই নিজেকে নিয়েই ভাবতে পছন্দ করত। এ সব ছাপিয়ে গোত্রপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে রূপ নিয়েছিল তখনকার প্রেক্ষাপট। অতি ক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের মাঝে লেগে যেত মারামারি, রূপ নিতো যুদ্ধের। যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা নিয়ে যেখানের বিচার করা হতো না। ক্ষমতাই তাদের একমাত্র চাওয়া। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ধর্মকে ছেড়ে মূর্তপূজক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। আর পৌত্তলিকতায় ছেয়ে গেয়েছিল গোটা বিশ্ব।

সাইয়েদ কুতুব বর্তমান যুগের জাহিলিয়াতকে নিজের মতো করে চিত্রায়ন করেছে। দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যাতে জাহিলিয়াতের আসল চিত্র ইতিহাস অনুসন্ধিসু পাঠকদের জন্য স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেন, যেন আমি মর্ত্যলোক থেকে উপরে উঠে গেছি, আর ঐ উপর থেকে আমি নিচের পৃথিবীর দিকে আমার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি, আর অবলোকন করছি জাহেলিয়াত যেন এক প্রলংকারী ও সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে সমগ্র দুনিয়ার উপর ছেয়ে গেছে। আর এই জাহেলিয়াতে মাতোয়ারা মানুষগুলো যেন নিজ নিজ অন্ধকারে আবেষ্টনীতে আটকা

পড়ে আছে এবং এমন এক গভীর খাঁদের ভেতর চাপা পড়ে আছে যে, তাদের কর্ণকুহরে এই আসমানী ডাক পৌছাতে পারছে না। সমগ্র মানবতা যেন পাগলের ন্যায় নেশাগ্রস্ত হয়ে জাহেলিয়াতে ডুবে আছে এবং জাহেলিয়াতের কর্মতৎপরতায় তারা আনন্দে আত্মহারা, যেমন শিশুরা তাদের ছোট ছোট খেলনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।^{২৭}

এই দৃশ্য দেখে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি এবং ভাবতে থাকি, কুরআনের উপস্থাপিত পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন ও জীবনাদর্শ দেখেও মানবতা কেন জাহেলিয়াতের এই দুর্গন্ধময় স্থানের দিকে ধাবিত হচ্ছে? এই অধঃপতনের দিক তারা কেন নিমজ্জিত হচ্ছে এবং অন্ধকারের আবেষ্টনীতে তারা কেন ঘুরপাক খাচ্ছে, যেখানে কুরআন তাদের পরিচ্ছন্ন জীবনের দাওয়াত দিচ্ছে, জীবনের উচ্চতর স্থানের দিকে বারবার ডাক দিচ্ছে, চিৎকার করে তাদের ডাকছে, ‘এসো, হে মানবতা! আমি তোমাদের অন্ধকারের অতল থেকে বের করে আলোকজ্জ্বল পরিবেশে নিয়ে আসি।’

মানুষের জীবনাচার ও আল্লাহর বিধানের মাঝে সামঞ্জস্য

কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াত ও রাসূল (সা.) এর অগণিত হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, মানুষের পালনার্থে যত বিধান ও আহকাম আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন তার সবই মানুষের কল্যানার্থে। এখানে স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা কোনো লাভ বা ক্ষতির হিসেব নেই। এ কথাও চিরায়ত সত্য যে, আদেশকৃত প্রতিটি বিধানই মানুষকে প্রদত্ত স্বভাব ও রুচির সাথে পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল। সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে আচার আচরণ শিখিয়েছেন, এ বিধানগুলো তারই পরিপূরক। আল্লাহ তায়ালা বলেন, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ তোমাদের পক্ষে যা সহজ তিনি (আল্লাহ) তাই চান ও তোমাদের পক্ষে যা কষ্টকর তা তিনি চান না।^{২৮}

সাইয়েদ কুতুব শহীদ কুরআনের ছায়াতলে জীবন যাপন করে অনুধাবন করেছেন, যে, আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতির জন্য যে জীবনাদর্শ দিয়েছেন, তার সাথে এই পৃথিবীর একটি মিল রয়েছে। তিনি খুঁজে পেয়েছেন মানব জীবন কাঠামো ও জীবন বিধান যেন একই ধরায় চলছে, এই বিশ্বকে যেন মানব জাতির জন্য তৈরী করা হয়েছে, তাই সার্বজনীন নিয়ম নীতির সাথে মানব জাতির এত মিল তিনি খুঁজে পেয়েছেন। যেমন সাইয়েদ কুতুব বলেন-

وعشت في ظلال القرآن أحسن التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريد الله وحركة السنن الكونية-^{২৯}

সাইয়েদ কুতুব শহীদ বলেন কুরআনের ছায়াতলে জীবন যাপন করে আমি বুঝতে পারলাম যে এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি সাধারণ কোনো ঘটনা নয় এবং হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাও নয় বরং এখানে অত্যন্ত বিচক্ষণ একজন পরিচালক রয়েছে যিনি প্রতিটি মহূর্তে বিশ্বকে পরিচালনা করেছেন এবং অবলোকন করেছেন।

তিনি এমন নয় যে এই বিশ্বকে অন্ধ ও বধির কোনো স্রষ্টার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন বরং সবকিছুর পিছনে রয়েছে মহান আল্লাহর ইচ্ছা শক্তি এবং কার্যকর ভূমিকা, ফলে একদিকে সমুদ্রের বিশাল বড়বড় তিমি বা জানোয়ার জাতির খাবারসহ কোনো সমস্যা হয় না, তেমনিভাবে অতিক্ষুদ্র প্রাণীটিরও কোনো সমস্যা দেখা দেয় না।

অদৃশ্যমান বিশ্ব দৃশ্যমান বিশ্বের চেয়ে ব্যাপক

আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা প্রধানত দু’ভাগে বিভক্ত। এক প্রকার যা দৃশ্যমান। আমাদের দৃষ্টিতে যেগুলো ধরা পড়ে। এগুলোই কেবল শেষ নয়। আমাদের দৃষ্টির বাইরে রয়ে গেছে আরেকটি অদৃশ্যমান জগত। যার প্রতি বিশ্বাস থাকলেও আমরা চর্ম চক্ষুতে দেখতে পাইনা। এটিকে অদৃশ্যমান জগত বলে। এ কথা

বলার অপেক্ষা রাখেনা, আমরা যা দেখতে পাই তা অদৃশ্যমান জগতের কিঞ্চিৎ মাত্র। এ বিশ্ব চরাচরে আল্লাহ তায়ালা যত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন তার বড় অংশই আমাদের দৃষ্টির বাইরে।

সাইয়েদ কুতুব বলেন, কুরআন অধ্যয়নকালে আমি এ কথাটা খুব ভালো করে জেনে নিয়েছি যে, এই বিশ্বজগতের ব্যাপকতা অসীম এবং অদৃশ্যমান বিশ্ব এই দৃশ্যমান বিশ্বের চেয়ে অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত।^{৩০}

মৃত্যুই জীবনযাত্রার শেষ নয় বরং যাত্রার সূচনা

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ^{৩১}

কিভাবে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছো? অথচ তোমরা নিজেই ছিলে, পরে তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে নিজেই করবেন, পরে আবার জীবন্ত করবেন, অবশেষে তোমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রতিগমন করতে হবে।

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের চারপাশে বিদ্যমান নিজেই পদার্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। তারপর তিনি তোমাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। তাহলে যে সত্তার কাছ থেকে জীবন লাভ করা হয়, তাঁকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়? অতপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন। সম্ভবত এ বিষয়ে কোনো বিতর্ক বা সংশয় দেখা দিবে না। কেননা প্রাণীকুল প্রতি মুহূর্তে এ সত্য প্রত্যক্ষ করে থাকে। মৃত্যু নিজেই তাদের ঘাড়ের চেপে বসে। কোনো বিতর্ক বা সংশয়ের তোয়াক্কাই করে না। অতপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন। এই বিষয়টা নিয়েই অস্বীকারকারীদের যত প্রশ্ন এবং যত সন্দেহ ও বিতর্ক। এ যুগের অনেক বিকৃত বিবেক ও সহস্রাধিক বছর পুরানো প্রাচীন জাহেলিয়াতের কাছে আত্মসমর্পিত লোকেরা এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। অথচ প্রথমবারের জীবন লাভের ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে এ নিয়ে বিস্ময়ের আর কোনো অবকাশ থাকে না, এটাকে মিথ্যা ভাবারও কোনো সুযোগ থাকেনা।

‘অতপর তোমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।’ অর্থাৎ ঠিক যেমন তোমাদের অস্তিত্বের সূচনা হয়েছিল, সেভাবেই তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে। পৃথিবীতে যেভাবে তোমাদের প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল, সেভাবেই তোমরা আবার পুনরুজ্জীবিত হবে। আল্লাহরই ইচ্ছায় তোমরা যেমন মৃত্যুর জগত থেকে জীবনের জগতে স্থানান্তরিত হয়েছিলে, ঠিক তেমনি তাঁরই ইচ্ছায় তোমরা তাঁর কাছে ফিরে যেতে বাধ্য হবে, যাতে তোমাদের উপর তাঁর ফায়সালা কার্যকর হয়, তিনি তোমাদের বিচার করতে পারেন।^{৩২}

এই একটি মাত্র ক্ষুদ্র আয়াতে মানবজাতির সমগ্র জীবনের খাতা খোলা ও বন্ধ করা হয়েছে। একটি মাত্র বাক্যে মানবজাতিকে স্রষ্টার মুঠোর মধ্যে সমর্পণ করা হয়েছে। প্রথমবারে তিনি তাকে মৃত্যুর অসারতা থেকে বের করে নিয়ে আসেন। অতপর তাকে প্রথমবারের মত মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করেন। তারপর তাকে পুনরায় জীবিত করেন, অতপর চূড়ান্ত পর্যায়ে তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় - ঠিক যেমন শুরুতে তিনি জীবনের সূচনা করেন। এর ভেতর দিয়ে চेतনায় তাঁর গভীর ও কার্যকর প্রভাব পড়ে।

এ ছাড়াও কুরআনে অসংখ্য আয়াতে পুনরুত্থানের বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। যাতে এ কথা দিবালোকের ন্যায় পরিস্ফুটিত হয়ে যায়, মৃত্যুই শেষ নয়। এটি সৃষ্টি হতে জান্নাত অথবা জাহান্নামে পৌঁছার আগ পর্যন্ত দীর্ঘ পথের একটি ধাপ মাত্র। আসল জীবনের পথে পা বাড়ানো মাত্র। যেখান থেকে সে পূর্বের জীবনের বাস্তবতা বুঝতে শুরু করবে। হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারে বিষয়টি বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সাইয়েদ কুতুব কুরআনের মর্ম অনুধাবন করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তিনি বলেন, মানবীয় জীবন এই বৈষয়িক দুনিয়ার রাস্তা ধরে আখেরাতের অসীম ব্যাপকতার দিকে ধাবিত হয়। মৃত্যু কোনো শুরুর শেষ নয়, বরং তা হচ্ছে, এক অন্তিম যাত্রার সূচনা মাত্র। দুনিয়া ও আখেরাতের দীর্ঘ দূরত্বের উপর বিস্তৃত হয়ে আছে মানুষের এই জীবন। এই জীবনে যা কিছুই করুক না কেন, শুধু সেটুকুই নয়, আরো অনেক কিছুই তার জন্যে রয়েছে। কোনো মানুষ এই দুনিয়ায় স্থায়ী কর্মকাণ্ডের দণ্ড থেকে বাঁচতে পারলেও সেখানে তার মুক্তি নেই। কারণ সেখানে কোনো জুলুম নেই, কিছুর অভাব নেই, কোনো ত্রুটি বিদ্যুতি নেই।^{৩৩}

আল্লাহ প্রদত্ত মানব পরিচিতিই প্রকৃত সম্মান

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সম্মানিত করেছেন, শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন প্রতিটি সৃষ্টির উপর। মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়াও অন্যদের থেকে ভিন্ন। মানুষকে প্রদত্ত এ সম্মানের আলোচনা বিভিন্নভাবে হতে পারে।

(ক) মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া।

এটি অন্যান্য সকল সৃষ্টি থেকে ভিন্ন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে শুকনো ঠনঠনে ছাঁচে ঢালা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা ভিতর রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَإِذَا سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ^{৩৪}

যখন আমি তাকে সুঠান করবো এবং তাতে আমার রুহ সঞ্চার করবো, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদা করবে। মানবজাতির অলৌকিক সৃষ্টি এবং এর অন্যতম বিশেষত্বের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে কুরআন মাজীদে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। এগুলোর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ নিঃসন্দেহে সাদৃশ্যপূর্ণ। শুধু বিষয়বস্তু হতে অজুহাত খাড়া করে কেউ যেন সরে না পড়তে পারে, এজন্যই উপর্যুক্ত বিষয়টি কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে পুনঃপুনঃভাবে বর্ণিত হয়েছে। রুহ ফুঁকে দেওয়ার বিষয়টি অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান হলেও সে কর্মটি সরাসরি আল্লাহ তায়ালা দিকে সম্বোধন করা হয়নি। এটি মানবজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের অন্যতম উদাহরণ।^{৩৫}

আল্লাহ তায়ালা যেহেতু মানবজাতিকে মর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত করেছেন এবং নিজস্ব রুহ দিয়ে তার মধ্যে জীবন দান করেছেন তাই এই আল্লাহকেন্দ্রিক বিশ্বাসই মানবজাতিকে একত্রিত করে রাখার মাধ্যম হিসেবে নির্ধারিত হবে। এই বিশ্বাসই হচ্ছে মুমিনের দেশ, মুমিনের জাতি ও মুমিনের খানদান। এই কারণেই এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে মুমিন যে কোনো সময়ই একই প্ল্যাটফরমে একত্রিত হতে পারে। মানুষ কোনো জন্তু-জানোয়ারের দল নয় যে, তাদের একস্থানে করার জন্যে ঘাস কিংবা চারণভূমির ব্যবস্থা করতে হবে, বরং বিশ্বাসই তাদের মূল ভিত্তি।^{৩৬}

(খ) মানুষকে প্রতিনিধি বা খলীফা বানিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ।

মানবসৃষ্টির অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, তাকে দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি করে প্রেরণ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ^{৩৭}

আর যখন তোমার রব ফেরেশতাগণকে বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো, তারা বলল, আপনি কি যমীনে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে, তারা সেখানে বিবাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে? আর

আমরাই তো আপনার প্রশংসা গুণগান করছি এবং আপনারই পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি যা পরিজ্ঞাত আছি তা তোমরা অবগত নও। ফেরেশতাদের যখন এ যখন এ ধারণা হয়েছিল যে, এমন এক সৃষ্টি, যারা মানুষের মাঝে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এবং রক্তপাতকারী পর্যন্ত হবে, আমাদের মতো অনুগত বর্তমান থাকতে তাদেরকে খলীফা বানানোর প্রয়োজন কী? এতে তাদের আপত্তি ছিলনা মোটেই বরং এটা ছিল জানার জন্য তাদের একটা জিজ্ঞাসা মাত্র। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে তাৎক্ষণিক একটি সংক্ষেপ জবাব দিয়েছেন। এবং মানুষকে দুনিয়াতে প্রতিনিধি বানিয়ে প্রেরণ করতএর বাস্তব উত্তর দিয়েছেন, যাতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ফেরেশতাকুলের মাঝে কোনো সংশয় না থাকে। এরপর আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.) কে প্রতিটি জিনিসের নাম ও জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন; কারণ, জ্ঞানের এ পরিপূর্ণতা ছাড়া খেলাফত এবং দুনিয়ায় শাসন-কর্তৃত্ব সম্ভব নয়। অতঃপর ফেরেশতাদেরকে বললেন এসব বস্তুর গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করো। কিন্তু তারা অক্ষমতা স্বীকার করলো।^{৩৮}

(গ) প্রতিটি বস্তুকে মানব সেবায় নিয়োজিত করেছেন

মানুষকে আল্লাহ খুব দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। স্বয়ং কুরআন বলছে, আর মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।^{৩৯} কিন্তু এই দুর্বল মানুষের উপর আল্লাহ তায়ালা অন্যতম অনুগ্রহ হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা তার বড় বড় সৃষ্টিকে তার অধীনস্ত করে দিয়েছেন।

পৃথিবীর সকল সৃষ্টি, সকল সম্পদকে মানুষের নিয়ন্ত্রনাধীন করে দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে-

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^{৪০}

তিনি তোমাদের জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছুই তাঁর পক্ষ হতে। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শনাবলী।

বস্তুত সৃষ্টিজগতের সব কিছু তাঁর কাছ থেকেই এসেছে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা ও পরিচালক। তিনিই সব কিছুকে অনুগত করে দেন অথবা পরাক্রান্ত করে দেন। আর ক্ষুদ্র সৃষ্টি মানুষকে আল্লাহ তায়ালা প্রাকৃতিক রহস্যের কিছুটা জানবার যোগ্যতা দিয়েছেন। এই সৃষ্টি জগতের কিছু শক্তিকে মানুষের অনুগত করে দেন। আবার কিছু শক্তিকে তার আয়ত্তের বাইরে রাখেন। উভয় অবস্থায়ই তার জন্যে এবং তার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ। এর মধ্যে চিন্তাশীল মানুষের জন্যে শিক্ষা রয়েছে।^{৪১}

উপসর্গ ও উপকরণের উপর কার্যসম্পাদন নির্ভরশীল নয়

সাইয়েদ কুতুব শহীদ ফী যিলালিল কুরআনের ভূমিকায় বলতে চেয়েছেন যে মানুষের নিকটে যে সমস্ত উপসর্গ ও উপকরণ রয়েছে সেগুলি শুধুমাত্র কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, ক্ষেত্র দেখেই মানুষ অনেক সময় ফলাফলের সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলে কিন্তু বাস্তবে তা হয় না যেমন- মেঘ দেখলেই বৃষ্টি হবে এমন ধারণা সঠিক নয় বরং এ সব কিছু নির্ভর করছে মহা আল্লাহর খেয়াল খুশি এবং তাঁর ইচ্ছা শক্তির উপর। যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে-

لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً-^{৪২}

তাই যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী তারা উপকরণ ব্যবহার করেন, এজন্য যে আল্লাহ তা ব্যবহার করতে আদেশ করেছেন।

বিশ্বচরাচর সম্পর্কে মানুষের ধারণা

মানুষ বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে কখন কারাপ ধারণা করে না এবং নিজেদের ভূমিকাকে কখনই ছোট করেও দেখে না, নিজেকে অবমূল্যায়নও করে না সেটি ব্যক্তি হিসাবেই হোক আর সমাজের একটি অংশ হিসেবেই হোক। মানুষ কল্পনার মাধ্যমে অনেক উপরে উঠে না আবার চতুষ্পদ জন্তুর মতও বিচরণ করে না বরং মধ্যম পস্থা অবলম্বন করে।

সাইয়েদ কুতুব আরো বলেন মানবতা আল্লাহর এমন একটি সৃষ্টি যা মানুষ্য সৃষ্ট কোনো বিধানের কারণে নষ্ট হয়ে যাবে, বা কোনো কলমের খোঁচায় নিঃশেষ হবে, এমন নয় কারণ বিশ্বচরাচরের প্রধান সৃষ্টিই হলো মানুষ।^{৪৩}

এই মানুষ তার যোগ্যতার মাধ্যমে আল্লাহর বিধানকে শক্ত করে ধারণ করে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে পারে। যা অন্য কোনো ভাবে সম্ভব নয়।

মানবরচিত দর্শন ও ইসলামী দর্শন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ তাঁর তাফসীরের ভূমিকাতে বলতে চেয়েছেন যে মানব রচিত দর্শন দিয়ে মানুষ যান্ত্রিকভাবে তাড়াহুড়া করে সকল কিছু সমাধান করতে চান, ফলে পৃথিবীতে নেমে আসে যতসব হত্যা খুন গুম, হাফাকার বয়ে যায় রক্তের বন্যা, ফলে সামাজিক যে অবকাঠামো তাও হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত, ফলে নেমে আসে সব ধরনের অশান্তি।

অপরদিকে ইসলামী দর্শন সম্পূর্ণরূপে স্বভাব ধর্মের সাথে মিলে যায়, সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতির সাথে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই, বরং ইসলাম সেগুলিকে ধ্বংস না করে আস্থা ও সহনশীলতার সাথে সেগুলোকে ইসলামী রূপ দান করে। এজন্য তারা হতাশ হয় না বরং আল্লাহর ওয়াদা ও রহমতের উপরে নির্ভরশীল হয়ে তাদের দায়িত্ব তারা চালিয়ে যায় সেই চেষ্টা প্রচেষ্টা কোনো নির্দিষ্ট যুগের বা কালের জন্য নয় বরং তা সুদূর প্রসারী ও সুবিস্তৃত, ইসলামের ধারণা হলো একটি বৃক্ষের ন্যায় যেমন একটি বীজ থেকে ক্রমান্বয়ে বড় হতে থাকে শেষ পর্যন্ত বিশাল একটি বৃক্ষ রূপান্তরিত হয় এবং শাখা প্রশাখাগুলি বিস্তার লাভ করে। তেমনিভাবে ইসলামও অংকুরিত হয়ে ধীরে ধীরে দিগন্ত প্রসারিত হয় এবং বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে তাদের কোনো হতাশা নেই, নেই কোনো অপ্রাপ্তি।^{৪৪}

পৃথিবীর মূল কাঠামো হলো হক

বিশ্বচরাচরে মূল কথাই হলো হক, আমরা যে দিকেই তাকাই না কেন সেখানেই হক এর নিদর্শন পাওয়া যায়, হক কখনও যদি তার সীমানা থেকে সরে দাড়ায় তবে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অথবা হক কখন যদি তার কামনা বাসনার অনুসরণ করে তবে আসমান ও জমিনসমূহে বিশৃংখলা দেখা দিত, এবং এর মাঝে যা রয়েছে সেগুলিও তছনছ হয়ে যেত, তাই সাইয়েদ কুতুব শহীদেদের দর্শন হলো হক সব সময় বিজয়ী, হক এর বিজয় হবেই আর বাতিলের বিনাশও অবধারিত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও তার পরিপন্থী মনে হয়, কিন্তু এর শেষ পরিনতি হলো হক এক সময় সুস্পষ্ট হয়ে বিকশিত হবেই। যেমন এরশাদ হচ্ছে-

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق-^{৪৫}

বরং আমি হক দ্বারা বাতিলের উপরে আঘাত হানি ফলে হক মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় তখন মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত বিধান নফল নয়

সাইয়েদ কুতুব শহীদ বলেন আল্লাহ কিতাবে বর্ণিত বিধানাবলী ঐচ্ছিক কোনো বিষয় নয় বরং সেই বিধি-বিধানগুলি পালন করার উপর নির্ভর করছে মানুষের ঈমান। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিলে সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করার অধিকার কোনো মুমিনের থাকে না। এই বিষয়টি সাধারণ কোনো বিষয় নয় বরং আকিদার মৌলিক একটি বিষয়, ইহা মানবজাতির সৌভাগ্যের অথবা দুভাগ্যের কারণ, কেননা মানবজাতির ভাগ্যের তালা মূলত আল্লাহর হাতে। তাদের উন্নয়ন, উন্নতি রোগব্যাদি থেকে আরোগ্য লাভ সব কিছুই মুক্তির চাবি আল্লাহর হাতে রয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, মানবজাতি সৃষ্টিকর্তাকে ভাগ্যের চাবি দিতে রাজী নয়। রোগীকে শ্রুষ্ঠার নিকটে নিতে তারা রাজী নয় বরং তারা মানবিক বিষয়ে এবং দৈনন্দিন জীবনে বস্ত্রনিষ্ঠ, যান্ত্রিক চালচলনে চলতে অভ্যস্ত হয়েছে, অথচ তারা চিন্তাও করে না যে সমস্ত মন্ত্র মেরামতের জন্য যে প্রকৌশলী সেই যন্ত্র তৈরী করেছেন তার কাছেই মেরামত করা সম্ভব, যদিও তারা দৈনন্দিন ব্যবহৃত যন্ত্রগুলির ক্ষেত্রে তাই করে কিন্তু মানব রূপ বিশাল এবং জটিল যন্ত্রটিও মেরামতের জন্য তারা শ্রুষ্ঠার স্মরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন সেটি তারা চিন্তাই করে না। এখানেই এ জাতীর বিপর্যয়ের মূল কারণ।^{৪৬}

মূল কথা মানুষের চিন্তা চেতনা ও তাঁর কার্যকলাপের সাথে আল্লাহর রীতি-নীতির এবং পৃথিবীতে সংঘটিত ঘটনাসমূহের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেএই সম্পর্ক নষ্ট করতে চাইবে, সে ব্যক্তি মানবতার শত্রু, সাইয়েদ কুতুব যখন তাঁর জীবনের মূল্যবান সময়গুলো কুরআনের ছায়াতলে অতিবাহিত করছিলেন তখন তিনি এই চিন্তা ও দর্শন তার সামনে ভেসে এসেছিল যা তিনি তার প্রখ্যাত তাফসীর ফী যিলালিল কুরআনের ভূমিকাতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

উপসংহার

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ সাহিত্যিক দার্শনিক সাইয়েদ কুতুব শহীদ তার দিগু জ্ঞান কোষ থেকে লিখিত পবিত্র কুরআনের আধুনিক ভাবধারায় রচিত ফী যিলালিল কুরআনের ভূমিকাতে জাহিলী জীবন দর্শন এর অসারতা এবং ইসলামী জীবন দর্শনের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন।

সাইয়েদ কুতুব মিসরের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি বিভিন্নদেশের শিক্ষা সাংস্কৃতি সহ নানান দিক সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। যা তিনি ফী যিলালিল কুরআনের ভূমিকাতে সুন্দর করে ফুটে তুলেছেন, তিনি কুরআনের ছায়াতলে জীবন যাপন সম্পর্কে বর্ণনা করেন এবং মনে করেন ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় শুধুমাত্র কোনো ধর্ম নয় বরং এতে মানব জাতির যাবতীয় বিষয়ে সঠিক ও সুন্দর দিক নির্দেশনা রয়েছে। তিনি বলেন- ইসলাম নিছক ধ্যান-ধারণা ভিত্তিক কতগুলো আনুষ্ঠানিকতার সমষ্টি নয় বরং এটি একটি বাস্তবমুখী জীবনব্যবস্থা। ভূমিকাতে তিনি একদিকে জাহিলী জীবনদর্শন অন্যদিকে ইসলামী জীবনদর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এছাড়া মানুষের সম্মান, মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব-কর্তব্য, পৃথিবীর সবই মানব সেবায় নিযুক্ত, বিশ্ব সম্পর্কে মানুষের ধারণা, পৃথিবীর মূল কাঠামোই প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, বিশ্বচরাচরে আল্লাহর ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি বিষয়গুলো সাইয়েদ কুতুব কুরআনের ছায়াতলে থেকে অনুধাবন করেছেন। যা তিনি ফী যিলালিল কুরআনের ভূমিকাতে বর্ণনা করেন।

তথ্যনির্দেশ

- ১ ড. সালাহ আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, *মাদখালু ইলা যিলালিল কুরআন* (উমান: দারুল মা'রিফ, দ্বিতীয় সংকলন: ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৯; সাইয়েদ কুতুব, *আল হায়াতু ফী যিলালিল কুরআন* (মিসর: মারকাযুল 'আলামিল আরাবী, ৪র্থ সংকলন, ২০১১ খ্রি.) পৃ. ১৩।
- ২ তদেব।
- ৩ ড. সালাহ আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, তদেব, পৃ. ১৯; *মাজাল্লাহ আল মুজতামাহ*, *আল কুয়েতীয়াহ* (কুয়েত: ৫৫১তম সংখ্যা, ৭ নভেম্বর, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ২৩।
- ৪ তদেব, পৃ. ২২।
- ৫ *আল হায়াতু ফী যিলালিল কুরআনে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।
- ৬ তদেব, পৃ. ১২।
- ৭ তদেব, পৃ. ১৩।
- ৮ ড. সালাহ আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, পৃ. ১৫।
- ৯ তদেব, পৃ. ২৮।
- ১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২।
- ১১ মুহসিন সালেহ, সাইয়েদ কুতুব যালিকাল মাজলুম (www.ajjazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/8/30/سید_قطب_ذلك_المظلوم)
- ১২ *আল হায়াতু ফী যিলালিল কুরআন*, পৃ. ১৫।
- ১৩ তদেব।
- ১৪ আল কুরআন, ১৭:৮২।
- ১৫ আল কুরআন, ১৬:৮৯।
- ১৬ আবু মুহাম্মাদ দারেমী, *সুনানে দারেমী*, খণ্ড-৪ (সৌদি আরব: দারুল মুগনী, প্রথম প্রকাশ, ১৪১২ হি: ২০০০ ইং), পৃ. ২০৯, হাদীস নং- ৩৩৭৪।
- ১৭ আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ*, খণ্ড-১১ (বৈরুত: মুআসাসাতুর রেসালাহ, প্রথম প্রকাশ, ১৪২১ হি: ২০০১ ইং), পৃ. ১৪৮, হাদীস নং- ২৪৬০১।
- ১৮ আবু আব্দুল্লাহ হাকেম, *আল মুত্তাদরাক আলাস সহীহাইন*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, প্রথম প্রকাশ, ১৪১১ হি: ১৯৯০ ইং), পৃ. ১৭১ হাদীস নং- ৩১৯।
- ১৯ আল কুরআন, ১৭:৭০।
- ২০ আল কুরআন, ৯৫:৪।
- ২১ আল কুরআন, ৩২:৪।
- ২২ সাইয়েদ কুতুব, *ফী যিলালিল কুরআন*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (কায়রো: দারুল শুরক, ১৭ সংস্করণ, ১৪১২ হি:), পৃ. ৩৯৩।
- ২৩ তদেব।
- ২৪ আল কুরআন, ৫৯:২১।
- ২৫ *ফী যিলালিল কুরআন*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬২৫।
- ২৬ প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮।
- ২৭ *ফী যিলালিল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।
- ২৮ আল কুরআন, ২:১৮৫।
- ২৯ *ফী যিলালিল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।

- ৩০ তদেব ।
- ৩১ আল কুরআন, ২:২৯ ।
- ৩২ ফকী যিলালিল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩ ।
- ৩৩ ফকী যিলালিল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২ ।
- ৩৪ আল কুরআন, ১৫:২২ ।
- ৩৫ আবুল ফিদা ইবনে কাসীর আদ দিমাশকী, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ৪র্থ খণ্ড (সৌদি আরব: দারু তায়াবা, ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি: ১৯৯৯ ইং), পৃ: ৫৩৪ ।
- ৩৬ ফকী যিলালিল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩ ।
- ৩৭ আল কুরআন, ২:৩০ ।
- ৩৮ শাব্বির আহমাদ ওসমানী, তাফসীরে ওসমানী, ১ম খণ্ড (লন্ডন: আল কোরআন একাডেমি, ১৯৯৬ ইং), পৃ: ৩০-৩১ ।
- ৩৯ আল কুরআন, ৪:২৮ ।
- ৪০ আল কুরআন, ৪৫:১৩ ।
- ৪১ ফকী যিলালিল কুরআন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২২৬ ।
- ৪২ আল কুরআন: ১:৬৫ ।
- ৪৩ ফকী যিলালিল কুরআন, ১ম খণ্ড, প্রাপ্ত, পৃ. ১৩ ।
- ৪৪ ফকী যিলালিল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪ ।
- ৪৫ আল কুরআন: ১৮:২১ ।
- ৪৬ ফকী যিলালিল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫ ।

আরবী ভাষার সৌন্দর্য : একটি পর্যালোচনা

ড. মো. মতিউর রহমান*

Abstract: Arabic is the language of the Quran. It is one of the used languages in the world. It is as old as modern. It has kept the standard of modernity from decade after decade. The Arabic language belongs to Sami or Semetic language. One of the sons of Nuh (Amls) was Sam. The language which was spoken by the descendant of Sam was called Sami language or Semetic language. Later many branches sprang from it. Arabiah, Suraniyah, Abraniah, Finikiah one some of them. Among these Arabic is the most famous. This language is very beautiful and simple. It has some distinct features and qualities. That carry its beauty. This essay focuses on various characteristics and qualities of the language and deem them on aesthetic aspects of the language.

আরবী ভাষা আল কুরআনের ভাষা। পৃথিবীর বুকে যত ভাষা প্রচলিত আছে তন্মধ্যে আরবী ভাষা অন্যতম। এ ভাষা যত প্রাচীন তত আধুনিক। যুগ যুগ ধরে আল কুরআন এ ভাষার আধুনিকতার মান ধরে রেখেছে। আরবী ভাষা প্রাচীন সামী বা সেমেটিক ভাষার অন্তর্ভুক্ত। নূহ (আঃ) এর একজন সন্তানের নাম ছিল সাম। সাম এর পরবর্তী বংশধররা যে ভাষায় কথা বলত তাকে সামী ভাষা বা সেমেটিক ভাষা বলা হত। পরবর্তীতে এ ভাষার অনেক শাখা প্রশাখা বের হয়। আরাবীয়্যাহ, সুরানীয়্যাহ, আবরানীয়্যাহ, ফিনিকীয়্যাহ ইত্যাদি। এ ভাষাগুলোর মধ্যে আরবী ভাষা অনেক প্রসিদ্ধ। আরবী ভাষা অনেক সুন্দর ও সাবলীল। এ ভাষায় বর্ণের উচ্চারণ, শব্দ গঠন, বাক্য বিন্যাস সব কিছুই অত্যন্ত নিয়মিত ও চমৎকার। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ আরবী ভাষায় কথা বলে, সাহিত্য রচনা করে। এ ভাষা আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন একটি ভাষা। তাইতো জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। আরবী ভাষার বেশকিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী রয়েছে। যা আরবী ভাষার সৌন্দর্যের বাহন। আলোচ্য প্রবন্ধে আরবী ভাষার বিবিধ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যকে আরবী ভাষার সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরে আরবী ভাষার সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা হল।

আরবী ভাষায় ই‘রাবের সৌন্দর্য

ই‘রাব আরবী ভাষার সাংকেতিক চিহ্ন। ইহা আরবী লিখন পদ্ধতির অন্যতম ভূষণ। ই‘রাব শব্দের শাব্দিক অর্থ, প্রকাশ করা বা শব্দের শেষ বর্ণের স্বরধ্বনি নিরূপণ (ব্যাক্স)।^১ পরিভাষায় ই‘রাব সম্পর্কে জুরজী যায়দান^২ বলেন,

نعني بالاعراب تغير أواخر الكلمات بتغير العوامل الداخلة عليها بالرفع والنصب والجروالسكون^৩

“ই‘রাব বলতে আমরা বুঝি কোন শব্দের পূর্বে আমলকারী অন্য কোন শব্দ আসার কারণে সে শব্দের শেষ হরফের যবর, যের, পেশ এবং সকূনে পরিবর্তন হওয়া।” পৃথিবীর বুকে যতগুলি জীবন্ত ভাষা রয়েছে তন্মধ্যে

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

আরবী অন্যতম ই‘রাব বিশিষ্ট ভাষা। ই‘রাব মূলত ভাষার প্রাচীন সভ্যতার ধারক। কেননা প্রাচীন যুগে অধিকাংশ ভাষায় ছিল ই‘রাব বিশিষ্ট। পরবর্তীতে এ ভাষাগুলো থেকে যে ভাষাসমূহ বের হয়েছে সেগুলোতে বর্তমানে ই‘রাব ব্যবহার হয় না। যেমন ইউরোপের ল্যাটিন ভাষা, ভারতের সংস্কৃত ভাষা, ইরানের ফার্সী ভাষা ইত্যাদি। কিন্তু এখন পর্যন্ত আরবী ভাষায় ই‘রাব ব্যবহার হয়ে আসছে। ই‘রাব আরবী ভাষার অলংকার। আরবী ভাষা দুভাবে লিখা হয়, হরকত দিয়ে এবং হরকত ছাড়া যাকে কোন কোন অঞ্চলে নাড়া আরবী বলা হয়। মাথার চুল যেমন সৌন্দর্যের প্রতিক, পোষাক যেমন মানুষকে সুন্দর দেখায়, ঠিক তেমনিভাবে ই‘রাব আরবী ভাষাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। তাই বলা যায় ই‘রাব আরবী ভাষার সৌন্দর্যের বাহন। উদাহরণ স্বরূপ ই‘রাব ছাড়া আরবী লিখা। যেমন-

أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسبأغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط.^৪

ই‘রাব বিশিষ্ট আরবী লিখা যেমন-^৫ “سَمِئْتُ بِمَنْحَرِ الْإِسْلَامِ” সমস্ত প্রশংসা আলাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব।”

আরবী ভাষায় ভাবের সূক্ষ্মতার সৌন্দর্য

ভাবের সূক্ষ্মতা একটি ভাষার সৌন্দর্য বহন করে। আরবী এমন একটি ভাষা যার শব্দাবলীর মাঝে ব্যাপক ভাবের সূক্ষ্মতা বিদ্যমান রয়েছে। এ ভাষায় সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ করার জন্য প্রতিটি অর্থের জন্য নির্দিষ্ট শব্দ রয়েছে। এমনকি কোন কিছুর অংশ বিশেষ বা শাখা-প্রশাখার অর্থ প্রকাশ করার জন্যও পৃথক পৃথক শব্দ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দিনের প্রতিটি মুহূর্তকে বুঝানোর জন্য পৃথক পৃথক শব্দ রয়েছে। যেমন দিনের প্রথম মুহূর্তকে আরবী ভাষায় যারুর বলা হয়। তার পরের অংশকে বায়ুগ বলা হয়। তার পরের অংশকে আয-যুহা বলা হয়। এরপর আল-গাযালা, আল-হাজিরাহ, আল-যাওয়াল, আল-‘আসর, আল-আসীল, আস-সাবুব, আল-গরুব ইত্যাদি।^৬ এ শব্দগুলি দিনের এক একটি অংশ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ শব্দগুলির মধ্য থেকে অনেক শব্দই আল-কুরআনে পাওয়া যায়। যেমন আয-যুহা শব্দ দ্বারা আল-কুরআনের একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,^৭ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ “শপথ প্রবাহের, শপথ রাতের যখন তা গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।” আল-আসর শব্দ দ্বারা আল-কুরআনের একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন^৮ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ “মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিতে আছে।” আল-গরুব শব্দটি আল-কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ^৯

“অতএব এরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্য উদয়ের পূর্বে ও অস্তমিত হওয়ার পূর্বে তুমি তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ কর।” আসীল শব্দটি আল কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,^{১০} وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا “এবং সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।” এভাবে মাথার এক একটি অংশের চুলের অর্থ প্রকাশ করার জন্য এক একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন: নাসিয়া বলা হয় মাথার সম্মুখ ভাগের চুলকে, যুয়াবা বলা হয় মাথার শেষ ভাগের চুলকে, মেয়েদের মাথার চুলকে ফার‘উ বলা হয়, আর মেয়েদের মাথার পেছনের চুলকে গাদীরাহ বলা হয়।^{১১} এভাবে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রতিটি অংশ বিশেষের অর্থ প্রকাশ করার জন্য পৃথক পৃথক শব্দ রয়েছে। এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব প্রকাশ করার জন্য পৃথক পৃথক শব্দ থাকার কারণে আরবী ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

আরবী ভাষায় অন্য ভাষার শব্দের সৌন্দর্য

আরবী ভাষার শব্দ ভাণ্ডার অনেক ব্যাপক। অন্যান্য ভাষার শব্দাবলী এ ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে এর পরিধি যেমন বিস্তৃত হয়েছে, তেমনিভাবে আরবী ভাষার সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর যে ভাষাগুলির শব্দাবলী আরবী ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে এ ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে তন্মধ্যে ফারসী, ইউনানী, ইবরানী, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষা অন্যতম। ব্যবসা-বানিজ্যের মাধ্যমে অনেক অনারব শব্দ আরবী ভাষায় প্রবেশ করেছে, বিভিন্ন জাতির কৃষ্টি-কালচার ও সাহিত্যের মাধ্যমেও অনেক অনারব শব্দ এ ভাষায় প্রবেশ করেছে, আবার অনেক ধর্মীয় পরিভাষার শব্দাবলী আরবী ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে। তবে অন্যান্য সকল ভাষার চেয়ে ফারসী ভাষার শব্দ সবচেয়ে বেশী আরবী ভাষায় প্রবেশ করেছে। যেমন: ইবরীক, যানজাবীল, দীবাজ, সুনদুস, ইয়াকূত, ফুলফুল, দারসীনী, নারজিস, ইয়াসমীন, কারানফুল, কাফূর, মিসক অম্বর ইত্যাদি।^{১২} এ শব্দগুলোর অধিকাংশই মহাশয় আল-কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। দু একটি উদাহরণ এখানে উপস্থাপন করা হলো। সুনদুস শব্দটি আল কুরআনে তিন স্থানে ব্যবহার হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ
وَاسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا^{১৩}

“এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণের চুড়ি দিয়ে এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু সিল্কের সবুজ পোশাক। তারা সেখানে থাকবে আসনে হেলান দিয়ে। কি উত্তম প্রতিদান এবং কি সুন্দর বিশ্রামস্থল!”

তিনি আরও বলেন,^{১৪} “تَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ” “তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখী হয়ে।”

আল কুরআনে আরও এক জায়গায় এসেছে,

عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا^{১৫}

“তাদের ওপর থাকবে সবুজ ও মিহি রেশমের পোশাক এবং মোটা রেশমের পোশাক, আর তাদেরকে পরিধান করানো হবে রূপার চুড়ি এবং তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়।”

যানজাবীল শব্দটি আল কুরআনে এক স্থানে ব্যবহার হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا^{১৬}

“সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে পাত্রভরা আদা-মিশ্রিত পানপাত্র।”

কাফূর শব্দটি আল কুরআনে এক স্থানে ব্যবহার হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا^{১৭}

“নিশ্চয় সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানপাত্র থেকে যার মিশ্রণ হবে কাফূর।”

ইয়াকূত শব্দটি আল কুরআনে এক স্থানে ব্যবহার হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ^{১৮}

“তারা যেন হীরা ও প্রবাল।” মিসক শব্দটি হাদীছের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন রাসূল (সা:) বলেছেন,

ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك^{১৯}

ল্যাটিন এবং ইউনানী ভাষার অনেক শব্দ আরবী ভাষায় প্রবেশ করেছে। যেমন: ফিরদাউস, কিসতাস, বিতাকাহ, কিনতার, বিতরীক, কানতারা হ ইত্যাদি।^{২০} এ শব্দগুলোর মধ্য থেকেও অনেক শব্দ আল-কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। ফিরদাউস শব্দটি আল কুরআনে দু স্থানে ব্যবহার হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا^{২১}

“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের মেহমানদারির জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস।”
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,^{২২}

“যারা ফিরদাউসের অধিকারী হবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।” কিনতার শব্দটি আল কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا^{২৩}

“তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাহাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়া থাক, তবুও উহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিও না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা উহা গ্রহণ করিবে?” হাবশী ভাষা থেকে বেশ কিছু শব্দ আরবী ভাষায় প্রবেশ করেছে। হাবশী এবং আরবী ভাষাকে দু বোন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।^{২৪} কোন কোন আরব উলামার মতে তিনটি হাবশী শব্দ আরবীতে প্রবেশ করেছে। যেমন: কাফলীন, মিশকাত এবং হারজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনেক হাবশী ভাষার শব্দ বিশেষ করে ধর্মীয় পরিভাষা আরবীতে প্রবেশ করেছে। যেমন: মিনবার, নিফাক^{২৫}, ইত্যাদি। এ শব্দগুলো আল-কুরআন এবং হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। মিশকাত শব্দটি আল কুরআনে ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْلِ نَوَافٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ^{২৬}

“আল্লাহ আসমান ও যমীনের নূর। তাঁর নূরের উপমা একটি তাকের মতই। তাতে রয়েছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি রয়েছে একটি চিমনির মধ্যে। চিমনিটি উজ্জ্বল তারকার মতই। প্রদীপটি বরকতময় যাইতুন গাছের তেল দ্বারা জ্বালানো হয়।” মিনবার শব্দটি হাদীছের মাঝে ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন,

عن عقبية بن عامر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي^{২৭}

“উকবা ইবন আমের (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে মসজিদে নববীর মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, তোমরা শত্রুদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর। জেনে রেখো, প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা। শোন, প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা। শোন! প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা।”

নিফাক শব্দটি হাদীছে এসেছে। রাসূল (সা.) বলেন,

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو و لم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق^{২৮}

“আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কখনো জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি এবং মনে মনে তার আকাঙ্ক্ষা পোষণও না করে মারা যায়, সে মুনাফেকী চরিত্রের উপর মৃত্যুবরণ করল।”

ইবরানী ভাষা থেকেও অনেক শব্দ বিশেষ করে ধর্মীয় পরিভাষা আরবী ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন: হাজ্জ, কাহিন, আশুরা ইত্যাদি।^{২৬} এ শব্দগুলোও আল-কুরআন এবং হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। হাজ্জ শব্দটি আল কুরআনে এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ^{২৭}

“এবং মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা দাও; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং কৃশকায় উটে চড়ে দূর পথ পাড়ি দিয়ে।”

কাহিন শব্দটি আল কুরআনে এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,^{২৮} “এবং কোন গণকের কথাও নয়। তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ কর।” আশুরা শব্দটি হাদীছে এসেছে। রাসূল (সা.) বলেন,

عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله^{২৯}

“আবু কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আশুরার রোযা আমি আশা করি আল্লাহর নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের গুনাহের কাফফারা হিসেবে গণ্য হবে।”

অনুরূপভাবে সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ আরবী ভাষায় প্রবেশ করেছে। সংস্কৃত ভাষা আরব উপমহাদেশের একটি অন্যতম ভাষা। ভারতীয়রা আরব দেশ হয়ে মিসর, সিরিয়া, মরোক্কসহ অন্যান্য পশ্চিমা দেশে ব্যবসার জন্য গমন করতো। তাছাড়াও হজ্জের জন্য ভারতীয়দের মক্কা-মদীনায় গমন করার ফলে সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ আরবী ভাষায় প্রবেশ করেছে। যেমন: সুবছন, বাহাউন, যিয়াউন^{৩০} ইত্যাদি। এ শব্দ গুলোর মধ্য থেকে কোন কোনটি আল-কুরআনে ব্যবহার হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ^{৩১}

“তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চন্দ্রকে আলোময় এবং তার জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং হিসাব। আল্লাহ এগুলো অবশ্যই যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।” এভাবে অনেক প্রাচীন এবং মৌলিক ভাষার শব্দ আরবী ভাষায় অনুপ্রবেশ ঘটে আরবী ভাষার যেমন পরিধি ব্যাপক হয়েছে তেমন সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ শব্দগুলোর অনেকটাই আল কুরআন এবং হাদীছে ব্যবহার হয়েছে।

ই‘জায় শব্দের সৌন্দর্য

ই‘জায় আরবী ভাষার সৌন্দর্যের একটি অন্যতম পদ্ধতি। অন্যান্য ভাষায় ই‘জায় এর ব্যবহার আছে, তবে আরবরা এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী দক্ষ। ই‘জায়ের মাধ্যমেই আরবী ভাষায় ইস্তি‘আরাহ, মাজায়, কিনায়াহ ইত্যাদি অভিনব পদ্ধতি ব্যবহার হয়ে থাকে। আরবী ভাষায় অনেক ই‘জায় শব্দের ব্যবহার ঘটেছে। ই‘জায় শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এ ভাষার সৌন্দর্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রত্যেকটি ভাষায় ই‘জায় শব্দের

ব্যবহার হয়, তবে আরবী ভাষায় এর ব্যবহার অনেক বেশী। আল-কুরআন, হাদীছ, ফিকহ, আমছাল, গদ্য, পদ্য ইত্যাদির মাঝে মাজায়, কিনায়া, ইস্তি‘আরা ইত্যাদি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আরবী ভাষায় ই‘জায় শব্দের ব্যবহার উপলব্ধি করা যায়। আল কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ^{৩৫} وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ “আর থেকে যাবে শুধু মহামহিম ও মহানুভব তোমার রবের চেহারা।” উল্লিখিত আয়াতে ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু আয়াতংশের ওয়াজহু শব্দটি আল্লাহর পূর্ণ সত্তার রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কেননা রব এর পূর্ণ সত্তা ছাড়া শুধু ওয়াজহু বাকী থাকা সম্ভব নয়। অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় একে মাজায় বলা হয়। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

المجاز المرسل ويبقى وجه ربك أى ذاته المقدسة وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل.^{৩৬}

“মجاز মরসল এবং বাক্যে মাজায় রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর পবিত্র সত্তা। আর একে অংশ উল্লেখ করে পূর্ণ বস্তুর অর্থ বুঝানোর পদ্ধতিতে মাজা করা বুঝায়।”

এখানে মাজায় শব্দ ব্যবহার করে বাক্যের মাঝে ই‘জায়ের সৌন্দর্য প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন, ^{৩৭} هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُزِيلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ “তিনিই তোমাদের তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য রিয়ক পাঠান। আর যে আল্লাহ অভিমুখী সেই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।” এ আয়াতে উল্লিখিত রিয়ক শব্দ দ্বারা মাতার বুঝানো হয়েছে। যা মূলত রিয়কের কারণ।^{৩৮} তাই এ আয়াতে রিয়ক শব্দটি মাজায় অর্থে ব্যবহার হয়ে ই‘জায়ের সৌন্দর্য প্রকাশ করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ^{৩৯} وَاللَّجُمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ “আর তারকা ও গাছ-পালা সিজদা করে।” এ আয়াতে ইয়াসজুদান শব্দটি ইস্তি‘আরা এর অলংকার প্রকাশ করেছে। শারী‘আতের পরিভাষায় সিজদা বলতে যা বুঝায়, নাজম এবং শাজার এর পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। তাই এ আয়াতে ইয়াসজুদান শব্দটি ইস্তি‘আরা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে ই‘জায় এর সৌন্দর্য প্রকাশ করেছে। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

الرَّكَتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ^{৪০}

“আলিফ-লাম-রা; এই কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন, পরাক্রমশালী সর্ব প্রশংসিতের পথের দিকে।” আয়াতে যুলুমাত বলে কুফর এবং ভ্রষ্টতা আর নূর বলে হিদায়াত ও ঈমান বুঝানো হয়েছে। তাই আয়াতে ইস্তি‘আরার ব্যবহার করে ই‘জায়ের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ^{৪১}

“সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ।” এ আয়াতে রাফাহ শব্দ দ্বারা স্ত্রী সম্বোধন করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই এখানে কিনায়া এর সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ شِئْتُمْ^{৪২}

“তোমাদের স্ত্রী তোমাদের ফসলক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের ফসলক্ষেত্রে গমন কর, যেভাবে চাও।” এ আয়াতে হারহ শব্দ দ্বারা স্ত্রীর সঙ্গে মিলা-মিশা করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই এখানে কিনায়ার সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে। এভাবে আল-কুরআন, হাদীছ এবং অন্যান্য আরবী বাক্যে শব্দের মাঝে মাজায়, ইস্তি‘আরা,

কিনায়া ইত্যাদি অর্থ ব্যবহার করে ই*জাযের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যার মাধ্যমে আরবী ভাষার সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে।

আরবী ভাষায় ঈজায় এর সৌন্দর্য

আরবী ভাষায় অনেক ঈজায় শব্দের ব্যবহার হয়েছে। এর মাধ্যমে মূলত আরবী ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ঈজায় শব্দের শাব্দিক অর্থ সংক্ষিপ্তকরণ, সংক্ষেপণ, সংক্ষেপ।^{৪৩} পরিভাষায়, স্পষ্টভাবে স্বল্প শব্দ দিয়ে বেশী অর্থ প্রকাশ করাকে ঈজায় বলা হয়।^{৪৪} আল্লাহ তা'আলা বলেন, ^{৪৫} وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ “আর হে বিবেকসম্পন্নগণ, কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।” এ আয়াতে ফিল কিছাছে হায়াতুন অংশটি বাক্য সংক্ষিপ্ত করে বিশদ অর্থ প্রকাশ করার একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। এ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ফিল কিছাছে হায়াতুন বাক্যটি মাত্র দুটি শব্দ দ্বারা গঠিত। তবে এর মর্মার্থ অনেক ব্যাপক। কেননা যখন একজন হত্যাকারীকে শাস্তিরূপে কিসাস স্বরূপ হত্যা করা হবে, তখন কারো অন্তরে হত্যার প্রবণতা জাহত হলেও শাস্তির ভয়ে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। এভাবে একটি কিসাসের মাধ্যমে অসংখ্য প্রাণ হত্যা থেকে বেঁচে যাবে। রাসূল (সা.) বলেছেন,

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاث مراراً قالوا يا رسول الله لمن ؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم^{৪৬}

“আবু হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সা.) বলেছেন, দ্বীন হল নসীহত। তিনি এটা তিনবার বললেন। অতঃপর তাঁরা জিজ্ঞাস করলেন, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিমদের নেতৃত্বে অধিষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য এবং সকল মুসলিমদের জন্য।” এ হাদীছে মাত্র দুটি শব্দ রয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। এভাবে কুরআন, হাদীছ এবং অন্যান্য আরবী বাক্যে স্বল্প শব্দ ব্যবহার করে বেশী অর্থ প্রকাশ করে আরবী ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। কেননা আরবী প্রবাদ বাক্যে বলা হয়েছে,

^{৪৭} “স্বল্প শব্দে অর্থপূর্ণ বাক্যই সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ বাক্য।” خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ

আরবী ভাষায় একটি অর্থের একাধিক শব্দের সৌন্দর্য

আরবী এমন একটি সুন্দর ভাষা যার একটি অর্থ প্রকাশ করার জন্য অনেক শব্দ পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে আরবী ভাষার সৌন্দর্য কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে। আরবী ভাষায় একাধিক শব্দ দ্বারা একটি অর্থ প্রকাশ করাকে মূতারাদিফাত বলা হয়। যেমন বছর অর্থ প্রকাশ করার জন্য আরবী ভাষায় ২৪টি শব্দ রয়েছে। আল-কুরআনে বছর অর্থে বেশ কয়েকটি শব্দ পাওয়া যায়। যেমন সানাহ শব্দ দ্বারা বছর অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْزَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْزَخٍ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ^{৪৮}

“আর তুমি তাদেরকে পাবে জীবনের প্রতি সর্বাধিক লোভী মানুষরূপে। এমনকি তাদের থেকেও যারা শিরক করেছে। তাদের একজন কামনা করে, যদি হাজার বছর জীবন দেয়া হত! অথচ দীর্ঘজীবী হলেই তা তাকে আযাব থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারবে না। আর তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।” আম শব্দ দ্বারা বছর অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِثَّةَ عَامٍ^{৪৯}

“অথবা সে ব্যক্তির মত, যে কোন জনপদ অতিক্রম করছিল, যা তার ছাদের উপর বিধ্বস্ত ছিল। সে বলল, আল্লাহ একে কিভাবে জীবিত করবেন, মরে যাওয়ার পর? অতঃপর আল্লাহ তাকে এক’শ বছর মৃত রাখলেন।” হাওল শব্দ দ্বারা বছর বুঝানো হয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ^{৫০}

“আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু’বছর দুধ পান করাবে।” নূর বা আলো অর্থ প্রকাশ করার জন্য আরবী ভাষায় ২১টি শব্দ রয়েছে। আল-কুরআনে আলো অর্থে কয়েকটি শব্দ পাওয়া যায়। যেমন নূর শব্দ দ্বারা আলো বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^{৫১}

“যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের বন্ধু, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফুরী করে, তাদের অভিভাবক হল তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।”

যিয়া শব্দ দ্বারা আলো অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْجِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ^{৫২}

“তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চন্দ্রকে আলোময় এবং তার জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং হিসাব। আল্লাহ এগুলো অবশ্যই যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।” অনুরূপভাবে আরবী ভাষায় সূর্য বুঝানোর জন্য ২৯টি, কুপ অর্থ প্রকাশ করার জন্য ১৮৮টি, পানি অর্থে ১৭০টি, সিংহ বুঝানোর জন্য ৩৫০টি, উটের জন্য ১০০টি এবং উটনী অর্থ প্রকাশ করার জন্য আরবীতে ২৫৫টি শব্দ রয়েছে।^{৫৩} এভাবে আরবী ভাষায় আরও অনেক একক শব্দ পাওয়া যাবে যার অর্থ প্রকাশ করার জন্য একাধিক শব্দ পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে মূলত আরবী ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

আরবী ভাষায় একটি শব্দের দুটি বিপরীত অর্থের সৌন্দর্য

আরবী এমন একটি ভাষা যার মধ্যে একটি শব্দ ব্যবহার করে দুটি বিপরীত অর্থ প্রকাশ করা হয়। এটা আরবী ভাষার সৌন্দর্যের বাহক। যেমন কা’আদ শব্দ ব্যবহার করে কিয়াম দাঁড়ানো এবং জুলূস বসা দুটি বিপরীত অর্থ প্রকাশ করা হয়। নাযাহ শব্দ ব্যবহার করে আতশ পিপাসা এবং রায়উন সিক্ত উভয় অর্থ প্রকাশ করা হয়। যা’ব শব্দ দ্বারা সুযুলাহ প্রবাহ বা ধারা এবং জুমূদ জমাট বা স্থবিরতা দুটি বিপরীত অর্থ প্রকাশ করা হয়। আফাদ শব্দের অর্থ ইসরা’ জোরে এবং ইবতা আস্তে উভয় বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। আবাব আকওয়া শব্দ ইফতিকার দরিদ্র হওয়া এবং ইস্তিগ্গা ধনী হওয়া উভয় অর্থ প্রকাশ করে। এভাবে আরবী ভাষায় কয়েক শত শব্দ পাওয়া যায় যে শব্দগুলো ব্যবহার করে দুটি বিপরীত অর্থ প্রকাশ করা হয়।^{৫৪} এর মধ্য দিয়ে আরবী ভাষার সৌন্দর্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আরবী ভাষায় একটি শব্দের একাধিক অর্থের সৌন্দর্য

আরবী ভাষায় যেমন একটি অর্থের জন্য একাধিক শব্দ পাওয়া যায়, তেমনিভাবে একটি শব্দের জন্যও একাধিক অর্থ পাওয়া যায়। এর দ্বারাও আরবী ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আরবী ভাষায় দুই শতের অধিক শব্দ তিনটি অর্থ নির্দেশ করে। এমনিভাবে অনেক শব্দ আছে যা চারটি অর্থ বহন করে। আবার কিছু শব্দ আছে যা পাঁচটি অর্থ বহন করে। এভাবে আরবী ভাষায় এমন কিছু শব্দ পাওয়া যায়, যা একটি শব্দই অনেক অর্থ প্রকাশ করে থাকে। যেমন হামীম শব্দটি বহু অর্থ প্রকাশ করে। খাল শব্দটি ২৭টি অর্থ প্রকাশ করে। আজুয শব্দটি ৬০টি অর্থ প্রকাশ করে। আয়নুন শব্দটি ৩৫টি অর্থ প্রকাশ করে। এ শব্দগুলোর অনেকটায় একাধিক অর্থ আল-কুরআনে পাওয়া যায়। যেমন আয়নুন শব্দটি আল-কুরআনে ঝর্ণা অর্থে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ^{৫৫}“فَمَّا عَيْنُ جَارِيَةٍ” “সেখানে থাকবে প্রবহমান ঝর্ণাধারা।”

এখানে আবার আয়নুন শব্দটি চক্ষু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ
مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ^{৫৬}

“নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে দু'টি দলের মধ্যে, যারা পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল। একটি দল লড়াই করছিল আল্লাহর পথে এবং অপর দলটি কাফির, তারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদেরকে ওদের দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ নিজ সাহায্য দ্বারা যাকে চান শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে রয়েছে চক্ষুস্বানদের জন্য শিক্ষা।” এভাবে একটি শব্দ দ্বারা একাধিক অর্থ প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে আরবী ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

আরবী ভাষায় অন্ত্যমিলের সৌন্দর্য

আরবী ভাষায় গদ্য, পদ্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচিত হয়েছে। তবে আরবী ভাষায় যে কবিতা রচিত হয়েছে তার অন্ত্যমিলের প্রতি লক্ষ্য করলে অপূর্ব সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায়, আরবী ভাষায় রচিত বড় বড় কবিতার প্রথম লাইনে যে অন্ত্যমিল থাকে, শেষ পর্যন্ত প্রতিটি লাইনে ঐ একই অন্ত্যমিল রক্ষা করা হয়। এ অন্ত্যমিলের কারণে কবিতাগুলো পাঠ করে খুব মজা পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে আরবী ভাষার সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়ে থাকে। যেমন ইমরুল কায়সের কবিতা

قفا نيك من ذكرى حبيب و منزل * بسقط اللوى بين الدخول فحومل ^{৫৭}

“দাঁড়াও দাখুল ও হাওমালের মধ্যবর্তী বালির টিলায় অবস্থিত আমার প্রেমিকা ও তার বাস্তুভিটার স্মরণে একটু কঁদে নিই।” এ কবিতার অধিকাংশ লাইনে লাম অক্ষর দিয়ে অন্ত্যমিল রক্ষা করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে কা'ব বিন যুহাইরের কবিতা

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول * متيم اثرها لم يفد مكبول ^{৫৮}

“সু'আদ চলে গেছে, সুতরাং আমার মন আজ শুধু অস্থির ও পীড়িতই নয় বরং প্রতি মুহূর্তে এমন বন্দী কৃতদাসের ন্যায় যার কোন মুক্তিমূল্য নেই।” এ কবিতাও লাম অক্ষর দিয়ে অন্ত্যমিল রক্ষা করা হয়েছে।

আল কুরআনের মধ্যে অনেকে আয়াতে একই অক্ষর দিয়ে অন্ত্যমিল রক্ষা করা হয়েছে। যেমন সূরা আর রহমানের অধিকাংশ আয়াতে নুন অক্ষর দিয়ে অন্ত্যমিল রক্ষা করা হয়েছে। আবার ছোট ছোট সূরায় একই অক্ষর দিয়ে সম্পূর্ণ সূরায় অন্ত্যমিল রক্ষা করা হয়েছে। যেমন সূরা ইখলাসে দাল অক্ষর দিয়ে অন্ত্যমিল রক্ষা করা হয়েছে। এভাবে অন্ত্যমিল রক্ষার মধ্য দিয়ে মূলত আরবী ভাষার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

আরবী ভাষায় ছন্দমিলের সৌন্দর্য

আরবী ভাষায় অনেক বাক্য নির্দিষ্ট ছন্দমিলের মাধ্যমে রচিত হয়। বিশেষ করে প্রাচীন যুগের অধিকাংশ আরবী কবিতাগুলো রচনার ক্ষেত্রে ছন্দমিল রক্ষা করা হয়েছে। ছন্দ বিজ্ঞানের পরিভাষায় কবিতার ছন্দকে বাহার বলা হয়। এ সম্পর্কে সাইয়েদ আহমাদ আল হাশেমী বলেছেন,

البحر هو الوزن الخاص الذى على مثاله يجرى الناظم^{৬১}

“বাহার এমন একটি নির্দিষ্ট ওয়ন যার অনুসরণে কবি তার কবিতা রচনা করে থাকে।” আরবী কবিতার ছন্দ মিলানোর জন্য কবিতার জুযগুলো কখনও পাঁচ ও সাত মাত্রার ওয়নে হয়। কখনও সাত মাত্রার ওয়নে হয়। আবার কখনও শুধুমাত্র পাঁচ মাত্রার ওয়নে হয়। البحر الطويل বা পাঁচ ও সাত মাত্রার জুয এর ওয়নে গঠিত একটি কবিতা যেমন:

ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا * ويأتيك بالاخبار من لم تزود^{৬০}

আবার البحر الوافر বা শুধু সাত মাত্রার জুয এর ওয়নে গঠিত একটি কবিতা যেমন:

جراحات السنان لها التيام * ولا يلتام ما جرح اللسان^{৬১}

আবার البحر المتدارك বা শুধু পাঁচ মাত্রার জুয এর ওয়নে গঠিত একটি কবিতা যেমন:

هذه دارهم اقفرت * ام زبور محتها الدهور^{৬২}

এভাবে ছন্দ মিলের মাধ্যমে আরবী ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

আরবী ভাষায় বাক্য পরিবর্তনের সৌন্দর্য

আরবী ভাষায় রচিত এমন কিছু বাক্য রয়েছে, যে বাক্যগুলো সোজাভাবে পড়লে যেমন দেখায়, ঠিক উল্টিয়ে বা পরিবর্তন করে পড়লেও একই রকম দেখায়। আরবী অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় একে কলব বলা হয়। কলব এর সংজ্ঞাই বলা হয়েছে।

هو ان يكون الكلام بحيث لو عكس و بدئ بحرفه الاخير الى الاول لم يتغير الكلام عما كان عليه و يجري ذلك في النثر والنظم^{৬৩}

“কোন বাক্য এমন হওয়া যে, যদি বাক্যটি উল্টিয়ে দেয়া হয় এবং বাক্যের শেষ অক্ষরকে প্রথমে এনে বাক্য শুরু করা হয়, তবুও বাক্যের কোন পরিবর্তন হবে না। এটা গদ্য এবং পদ্য উভয় ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।” এটা আরবী ভাষার সৌন্দর্যের একটি অন্যতম বাহন। যেমন আমরা আল-কুরআনে দেখি, আল্লাহ তা’আলা বলেন, وَرَبُّكَ فَكَرُّ^{৬৪} “এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।” আলোচ্য আয়াতটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আয়াতের বাক্যটি যদি উল্টিয়ে পড়া হয়, তবুও একই রকম হবে। আল্লাহ তা’আলা অন্যত্র বলেন, وَكُلُّ فِ^{৬৫} “প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে।” এ আয়াতাত্ত্বিটি যদি উল্টিয়ে পড়া হয়, তবুও একই রকম হবে। অনুরূপভাবে আরও একটি আরবী বাক্য, سرفلا كبا بك^{৬৬} এ বাক্যটি যদি উল্টিয়ে পড়া হয় তবুও একই রকম হবে। এভাবে আরবী ভাষায় আরও অনেক বাক্য পাওয়া যায়, যেগুলো সোজা পড়লে যে অর্থ পাওয়া যায়, উল্টিয়ে পড়লেও একই অর্থ প্রকাশ করে। এটা মূলত আরবী ভাষার সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ। এর মাধ্যমে আরবী ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

আরবী ভাষায় প্রবাদ বাক্যের সৌন্দর্য

আরবী এমন একটি ভাষা যার মাঝে প্রচুর পরিমাণে প্রবাদ বাক্য ব্যবহার হয়ে থাকে। আরবী ভাষায় প্রবাদ বাক্যকে সাধারণত মাছাল বলা হয়। আরবী মাছাল শব্দ বাংলায় প্রবাদ ছাড়াও অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে মাছাল বা প্রবাদ বলতে আরবী ভাষায় প্রচলিত প্রবাদসমূহকেই বুঝানো হয়েছে। মাছাল শব্দের সংজ্ঞাই বলা হয়েছে,^{৬৭} المثل ما يمثل به الشيء أي يشبهه আরবী ভাষায় মাছালকে জাতির মুখপাত্র বলা হয়। যেমন বলা হয়েছে,^{৬৮} المثل صوت الشعب “মাছাল জাতির মুখপাত্র।” প্রবাদ একটি ভাষা বা সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরবী ভাষাতেও এর গুরুত্ব অনেক বেশী। প্রবাদ বাক্য দ্বারা আরবী ভাষার সৌন্দর্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আরবী ভাষার প্রবাদ বাক্য যেমন বলতে ভালো লাগে তেমন শুনতেও শ্রুতিমধুর লাগে। আরবী ভাষায় প্রবাদ বাক্যের কিছু নমুনা এখানে তুলে ধরা হলো। যেমন: ^{৬৯} لا تجني من الشوق العنب “তুমি কাঁটাগাছ হতে আঙ্গুর আহরণ করতে পারবে না।” আরও বলা হয়, ^{৭০} الغنى غنى النفس “অস্তরের ধনীই প্রকৃত ধনী।” এছাড়াও বলা হয়, ^{৭১} اطلبوا الخير عند حسان الوجه. “যার চেহারা সুন্দর তার কাছে তোমরা মঙ্গল অব্বেষণ করো।”

এভাবে আরবী ভাষায় অনেক প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে আরবী ভাষার সামগ্রিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা কোন লিখার মধ্যে প্রবাদ বাক্য থাকলে সে লিখার সৌন্দর্য বেড়ে যায়।

উপসংহার

আল্লাহ তা‘আলা সুন্দর তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর আল্লাহ কর্তৃক অবতারিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ভাষা আরবী অনেক সুন্দর। আল কুরআনের মাধ্যমে আরবী ভাষার মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনিভাবে যুগ যুগ ধরে এর সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। একটি প্রবন্ধে আরবী ভাষার সৌন্দর্য বর্ণনা করা কঠিন। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে আরবী ভাষার উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য, কিছু উপাদান এবং এ ভাষার অন্যতম কিছু গুণাবলী বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে আরবী ভাষার সৌন্দর্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে পাঠক সমাজ আরবী ভাষার সৌন্দর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৯৮।
- ^২ জুরজী যায়দান আধুনিক আরবী সাহিত্যের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৮৬১ খ্রি. লিবারনের বিখ্যাত শহর বৈরুতে জন্ম গ্রহণ করেন। অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষা অর্জন করতে থাকেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য মিসর, সুদান ইত্যাদি অঞ্চলে গমন করেন। এভাবে তিনি আরবী ও ইংরেজী ভাষায় ব্যাপক বৃত্তপত্তি অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্যিক জীবনে তিনি অনেক পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আল আরব কাবলাল ইসলাম, তারীখু মিসরিল হাদীছ, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবীয়াহ ইত্যাদি। তিনি ১৯১৪ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। ড. হান্না আল ফাখুরী, *আল জামি ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী* (বৈরুত: দারুল জিল, তা.বি.), পৃ. ১৯১।
- ^৩ জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবীয়াহ*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: মাকতাবুল বহুছ ওয়াদ দিরাসাত ফী দারিল ফিকর, ২০০৫খ্রি.), পৃ. ৪৫।
- ^৪ ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ আল খাতীব আত তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ* (ঢাকা: ইমদাদীয়াহ লাইব্রেরী, তা. বি.), পৃ. ৩৮।
- ^৫ সূরা আল ফাতিহা : ২।

- ৬ তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবীয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬।
- ৭ সূরা আয যুহা: ১-২।
- ৮ সূরা আল আসর: ১-২।
- ৯ সূরা ক্বাফ: ৩৯।
- ১০ সূরা আল আহযাব: ৪২।
- ১১ তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবীয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬।
- ১২ তদেব, পৃ. ৩৮।
- ১৩ সূরা আল কাহাফ: ৩১।
- ১৪ সূরা আদ দুখান: ৫৩
- ১৫ সূরা আল ইনসান: ২১।
- ১৬ সূরা আল ইনসান: ১৭।
- ১৭ সূরা আল ইনসান: ৫।
- ১৮ সূরা আর রহমান: ৫৮।
- ১৯ মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ১৭৩।
- ২০ তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবীয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।
- ২১ সূরা আল কাহাফ: ১০৭।
- ২২ সূরা আল মু'মিনুন: ১১।
- ২৩ সূরা আন নিসা: ২০।
- ২৪ তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবীয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।
- ২৫ তদেব।
- ২৬ সূরা আন নূর: ৩৫।
- ২৭ মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৩৩৬।
- ২৮ আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশ'আছ, সুনানু আবী দাউদ, তাহকীক আলবানী, সহীহ (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৭ হি. ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৪৪০, হাদীছ নং- ২৫০২।
- ২৯ তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবীয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯।
- ৩০ সূরা আল হাজ্জ: ২৭।
- ৩১ সূরা আল হাক্বাহ: ৪২।
- ৩২ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ আল কাযভীনী, সুনান ইবন বাজাহ, তাহকীক আলবানী (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৯ হি. ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৩০২, হাদীছ নং- ১৭৩৮।
- ৩৩ তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবীয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০।
- ৩৪ সূরা ইউনুস: ৫
- ৩৫ সূরা আর রহমান: ২৭

- ৩৬ মুহাম্মাদ আলী আস সাব্বুনী, *সাফওয়াতুত তাফাসীর*, ৩য় খণ্ড (কায়রো: দারুস সাব্বুনী, ১ম সং, ১৪১৭হি./ ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৮৪।
- ৩৭ সূরা গাফির: ১৩
- ৩৮ আস সাইয়েদ আহমাদ আল হাশেমী, *জাওয়াহিরুল বালাগাহ* (কায়রো: মুআসসাসাতুল মুখতার, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৩৮।
- ৩৯ সূরা আর রহমান: ৬।
- ৪০ সূরা ইবরাহীম: ১।
- ৪১ সূরা আল বাকারাহ: ১৮৭।
- ৪২ সূরা আল বাকারাহ: ২২৩।
- ৪৩ আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, পৃ. ১৬০।
- ৪৪ আলী আল জারিম ও মুত্তফা আমীন, *আল বালাগাহ আল ওয়াযিহাহ* (দেওবন্দ: মাকতাবাহ থানুভী, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ২৩৮।
- ৪৫ সূরা আল বাকারাহ: ১৭৯।
- ৪৬ *সুনান আত তিরমিযী*, তাহকীক আলবানী, পৃ. ৪৪০, হাদীছ নং-১৯২৬।
- ৪৭ লুইস মালুফ, *আল মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল আ'লাম* (বায়রুত: দারুল মাশরিক, ৪০ তম সং, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৯৪৫।
- ৪৮ সূরা আল বাকারাহ: ৯৬।
- ৪৯ সূরা আল বাকারাহ: ২৫৯।
- ৫০ সূরা আল বাকারাহ: ২৩৩।
- ৫১ সূরা আল বাকারাহ: ২৫৭।
- ৫২ সূরা ইউনুস: ৫।
- ৫৩ তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবীয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭।
- ৫৪ তদেব, পৃ. ৪৮।
- ৫৫ সূরা আল গাশিয়াহ: ১২।
- ৫৬ সূরা আলে ইমরান: ১৩।
- ৫৭ ড. মুহাম্মদ আল ইসকান্দারী, দিওয়ানু ইমরাউল কায়েস (বায়রুত: দারুল কিতাব আল আরাবী, ১৪২৮ হি., ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১৫।
- ৫৮ আবু যায়েদ মুহাম্মদ ইবন আবিল খাতাব আল কারশী, আশ আরুল আরাব (বায়রুত: দারুল কিতাব আল ইলমিয়াহ, ৩য় সং, ১৪২৪ হি./ ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৩৬৫।
- ৫৯ আস সাইয়েদ আহমাদ আল হাশেমী, *মীযানুয যাহাব ফী সানা' আতি শি'রিল আরাব* (লিবানন: দারুল হিলাল, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ১০। সূত্র: মুঃ নকিবুল্লাহ, আরবী ছন্দ বিজ্ঞান, পৃ. ৭০।
- ৬০ মুঃ নকিবুল্লাহ, *আরবী ছন্দ বিজ্ঞান* (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, মার্চ ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৮৫।
- ৬১ তদেব, পৃ. ১০৮।
- ৬২ তদেব, পৃ. ১৭০।
- ৬৩ আহমাদ মুসতফা আল মারাগী, *উলুমুল বালাগাহ* (বৈরুত: আল মাকতাবাহ আল 'আসরিয়াহ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩০৫।
- ৬৪ সূরা আল মুদ্দাছির: ৩।

- ৬৫ সূরা ইয়াসীন: ৪০।
- ৬৬ উলুমুল বালাগাহ, পৃ. ৩০৫।
- ৬৭ হান্না আল ফাখুরী, আল হিকাম ওয়াল আমছাল (দারুল মা'আরিফ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৯। সূত্র: ডঃ আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, আরবী প্রবাদ সাহিত্য (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২০।
- ৬৮ আহমদ হাসান যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, উর্দু অনুবাদ (লাহোর: ১৯৬১ খ্রি.), পৃ. ৫০। সূত্র: আরবী প্রবাদ সাহিত্য, পৃ. ১৯।
- ৬৯ ইবন হাব্বান আল-বাসীত, কিতাবুল মাজরুহীন মিনাল মুহাদদিসীন, হায়দারাবাদ ১৯৭০ ৩/১৫। সূত্র: আরবী প্রবাদ সাহিত্য, পৃ. ১৯৪।
- ৭০ হাফিয ইবন 'আবদিল বার, জামি'উ বায়ানিল ইলম ওয়া ফায়লিহী, বৈরুত, ১৯৭৮, ২/২০। সূত্র: আরবী প্রবাদ সাহিত্য, পৃ. ১৯২।
- ৭১ তদেব।

বাংলাদেশে বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান : একটি পর্যালোচনা

ড. মো. আব্দুল হান্নান*

Abstract: Buddhism is an ancient religion. Siddhartho Goutoma Buddha is the founder of this religion. He was born in Nepal in 623 B.C. and died in 543 B.C. Buddhism is that which is based on his speech and instruction about world and life. He struggled life-long for the dessertion from sorrows and sufferings of man. According to him, others are no role of God for emancipation of man. Man can change his fate to a great extent through his deeds. As man's life is full of sorrows; various ceremonies help man to remove frustration temporary. For this reason Goutoma Buddha has instructed his followers to unite sometimes to keep their bond strong. So, Buddha Communities in Bangladesh are fulfilling their praiseworthy role to build up friendship in their various ceremonies through different organizations. In this article a dependable authenticity of religious festivals and ceremonies of Buddhism in Bangladesh has been presented serially.

১. ভূমিকা (Introduction)

বৌদ্ধধর্ম বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মসমূহের অন্যতম। এ ধর্মের প্রবর্তক হলেন সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ। তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, মানবতাবাদী, মনস্তত্ত্ববিদ, সমাজ সংস্কারক, বিপ্লবী ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। গৌতম বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের উপর ভিত্তি করে জগত ও জীবন সম্পর্কে যে মতবাদ গড়ে উঠেছে, তাই বৌদ্ধ ধর্ম। এটি অত্যন্ত বাস্তবদর্শী।^১ এ ধর্মে ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল, ভাগ্য ও প্রার্থনা বিশ্বাসের স্থান নেই; শুধু রয়েছে অবিরাম প্রবাহ, পরিবর্তন ও রূপান্তর। মানুষের মুক্তির জন্য ঈশ্বর বা অতি জাগতিক শক্তির কোন ভূমিকা নেই। মানুষই মানুষের ভাগ্য বিধাতা।^২ কালের বিবর্তনে গৌতম বুদ্ধের অনুসারীগণ একাধিক সম্প্রদায় কার্যত: দু'টি শাখা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথমত: বুদ্ধের শিক্ষা ও চিন্তাধারা নিয়ে হীনযান বা থেরবাদ সম্প্রদায় গঠিত হয়। দ্বিতীয়ত: বুদ্ধের চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে উদ্ভূত হয় দার্শনিক মহাযান সম্প্রদায়।^৩

বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের আগমন, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সময়কাল নিয়ে ঐতিহাসিক, গবেষক ও পণ্ডিতগণের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে বাংলাদেশে ঢাকা জেলার ধামরাই ও শাখাসর অঞ্চলে প্রাপ্ত সম্রাট অশোক প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত স্তম্ভ ও লিপি, ১৯৩১ সালে মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত মৌর্যযুগের শিলালিপি ও কাল নির্দেশক বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু ইত্যাদির বিবরণ থেকে নিশ্চিত অনুমেয় হয় যে, গৌতম বুদ্ধের

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

জীবদ্দশায় না হলেও অন্তত মৌর্যযুগে পুণ্ড্রবর্ধনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের আগমন ঘটে।^৪ পরবর্তীকালে তা সমগ্র বাংলাদেশে বিকাশ লাভ করে।

বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহারের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। বৌদ্ধরা বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় উৎসব ও সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক স্থাপনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে।^৫ আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের একটি বস্তুনিষ্ঠ তত্ত্ব উপস্থাপন করা হলো।

২. গৌতম বুদ্ধের পরিচয় (Identity of Gautama Buddha)

গৌতম বুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলার পিপরাওয়ায় মতান্তরে নেপালের তিলৌরাকোটে শাক্য রাজধানী কপিলাবস্ত্র নগরে ক্ষত্রিয় রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন।^৬ তাঁর প্রকৃত নাম সিদ্ধার্থ, পিতার নাম সিংহহনু। জন্মের সপ্তম দিবসে সিদ্ধার্থ মাতৃহারা হন এবং বিমাতা গৌতমীর নিকট প্রতিপালিত হন। তৎকালীন প্রথানুযায়ী নবজাত শিশুকে অসিত নামে এক জ্যোতিষীকে দেখানো হয় ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য। তিনি গণনা করে বলেন, রাজপুত্র হবেন সংসারত্যাগী। পুত্র স্নেহাতুর পিতা রাজপুত্রকে বাঁধবার বহু চেষ্টা করলেন। শৈশব থেকেই সিদ্ধার্থের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অভাব ছিল না। রাজকীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েও বাল্যকাল হতেই সিদ্ধার্থ চিন্তাশীল ও বৈরাগ্য ভাবাপন্ন ছিলেন। সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সগোত্রীয় গোপা বা যশোধরা নামে এক অনুপম সুন্দরী নারীর সাথে তাঁর বিবাহ দেয়া হয়।^৭ সিদ্ধার্থ কিছুদিন সংসারে আবদ্ধ হওয়ার পর মানুষের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদি দুর্গতি দেখে চরম বিচলিত হন। কিভাবে এসব দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তি পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে চিন্তায় মগ্ন হলেন। পরিশেষে গৌতমবুদ্ধ উনত্রিশ বছর বয়সে (৫৯৪ খ্রি. পূ.) এক আষাঢ়ী পূর্ণিমায় তিথির গভীর রাতে সংসারের ভালবাসা, রাজ্যসুখ, অনুপম সুন্দরী স্ত্রী, স্নেহময় সন্তান ত্যাগ করে সত্যান্বেষণে বের হয়ে পড়লেন।^৮

দীর্ঘদিন গয়ার নৈরাঞ্জনা নদীতীরে অশ্বথ বৃক্ষতলে একাগ্রচিত্তে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকার পর গৌতমবুদ্ধ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে (৫৮৮ খ্রি. পূ.) বৈশাখী পূর্ণিমা তিথির শেষ রাত্রে বোধি বা চরম জ্ঞান লাভ করেন। বুদ্ধত্ব সম্যক জ্ঞান লাভ করে তিনি জগতে ‘বুদ্ধ’ নামে খ্যাতি হন।^৯ তৎকালীন ভারতের মানুষ যাগযজ্ঞ, পশুবলি, জাতি ও বর্ণভেদ ইত্যাদি মতবাদের শিকার হয়ে এক অন্ধকারময় জীবন যাপন করত। তিনি তাদের এসব মিথ্যাচার ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করে সত্য ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করার জন্য আহ্বান করেন।^{১০} তিনি সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণের নিকট ধর্মপ্রচার করেন। এভাবে প্রায় চার যুগ ধর্মপ্রচার করার পর আশি বছর বয়সে ৫৪৩ খ্রি. পূ. অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কুশীনগরে মল্লদের শালবনে গৌতম বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।^{১১}

৩. বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান (Religious Festival and Ceremony of the Buddhist)

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস ও আনন্দ করাই মানুষের স্বভাব সুলভ আচরণ। তাই মানবজীবনে উৎসব ও অনুষ্ঠান একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ‘উৎসব’ বাংলা শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠান। পরিভাষায় পারিবারিকভাবে সীমিত এবং দশজনকে নিয়ে কৃত উভয় অনুষ্ঠানকেই উৎসব বলা হয়।^{১২} এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Festival। যার অর্থ উৎসব। পরিভাষায় সর্বসাধারণ বা বহুজনের জন্যে নির্দিষ্ট দিন, সময় বা ঋতুতে এক বা একাধিক স্থান কিংবা বিশেষ কোনো সমাজে বা সম্প্রদায়ে অনুষ্ঠেয় আনন্দজনক ক্রিয়া-কর্মই হলো উৎসব।^{১৩}

প্রত্যেক জাতি বা ধর্মীয় অনুসারীদের জীবনে উৎসব ও অনুষ্ঠানের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের জনজীবনেও উৎসব ও অনুষ্ঠান পারম্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

তাই বলা হয় যে, ‘বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ’। দেশব্যাপী যখন উৎসব হয়, তখন সমগ্র দেশ ও জাতি বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক অখণ্ড ঐক্যের অনুভূতিতে নিজের স্বার্থকতা খুঁজে পায়। বাংলাদেশের সভ্যতার এটিই সমন্বয়ী প্রতিভা ও অনন্য বৈশিষ্ট্য।^{১৪} বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে উৎসব ও অনুষ্ঠানের পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক।

৩.১ বুদ্ধ পূর্ণিমা (কা সুন লাভ্রে)

বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। এটি বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। এ তিথির দর্শন হলো— এদিন গৌতম বুদ্ধ হিমালয়ের পাদদেশস্থ তদানিন্তন (খ্রি. পূ. ৬ষ্ঠ শতকে) শাক্য রাজ্যে রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এই দিনের একই তিথিতে তিনি আর্যসত্য লাভ করে বুদ্ধত্ব অর্জন করেন। অতঃপর একই তিথিতে প্রায় ৮০ বছর বয়সে তিনি ইহকাল ত্যাগ করে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। গৌতম বুদ্ধের জীবনের এই তিন মহৎ ঘটনা একই পূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত হয়েছিল বলে এই পূর্ণিমা তিথিকে ‘বুদ্ধ পূর্ণিমা’ বলা হয়। এ পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রতিটি বিহারের উপাসক ও উপাসিকাগণ বুদ্ধপূজা, ভিক্ষুসংঘের জন্য আহাঙ্গাদির ব্যবস্থা ও দান-শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার অনুশীলন এবং ধর্মসভার আয়োজন করে। বৌদ্ধ কীর্তন, বাদ্য-বাজনাসহ ধর্ম শোভাযাত্রা ইত্যাদি বহুবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত থাকে। অনেক বৌদ্ধ বিহারে তিনদিন ব্যাপী ‘বুদ্ধ পূর্ণিমা’ অনুষ্ঠিত হয়।^{১৫}

১৯৫৬ সালে বৌদ্ধ সংঘের কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধরা একই দিনে ‘বুদ্ধ পূর্ণিমা’ উৎসব পালন করবেন। ফলে তথাগতের মৈত্রীময় আদর্শের দ্বারা উজ্জীবিত হওয়ার প্রত্যয় নিয়ে এই উৎসব পালিত হয়। শুধু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাই নয়; বরং মানবতাবাদী পুরুষের জন্মতিথি হিসেবেও সকল মানবজাতি এই উৎসব পালন করে।^{১৬}

বাংলাদেশেও এই উৎসবটি যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে পালিত হয়। ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এ দিনটি সর্ব সাধারণের জন্য সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেতা এ দিনে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে আকর্ষণীয় বার্তা প্রদান করে থাকেন। রেডিও-টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। জাতীয় সংবাদপত্র ও স্মরণিকাতে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে থাকে। ফলে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দের মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

৩.২ জ্যেষ্ঠ পূর্ণিমা (নাইয়ুন লাভ্রে)

এটি বৌদ্ধদের নিকট একটি স্মরণীয় পুণ্য তিথি হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ গৌতম বুদ্ধ এই পূর্ণিমায় শ্রাবস্তীনগরে সর্বপ্রথম ধর্ম প্রচার করেন। উক্ত পূর্ণিমায় সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র স্থবির সিংহলে পরিনির্বাণ লাভ করেন। উল্লেখ্য সম্রাট অশোক মহেন্দ্রকেই সিংহল দ্বীপে ধর্ম প্রচার করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।^{১৭}

৩.৩ আষাঢ়ী পূর্ণিমা (ওয়াছু লাভ্রে)

এটি বৌদ্ধদের অন্যতম সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই তিথির বিশেষত্ব হলো— মাতৃজঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ, ঊনত্রিশ বছর বয়সে গৃহ ত্যাগ এবং বুদ্ধত্ব লাভোত্তর বারানসীর মৃগদারে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর নিকট প্রথম ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন’ সূত্রের দেশনা, গৌতম বুদ্ধের জীবন ইতিহাসের ত্রি-পুণ্যস্মৃতিতে সমুজ্জ্বল এই আষাঢ়ী পূর্ণিমা।^{১৮}

এমনিভাবে আষাঢ়ী পূর্ণিমার আরও একটি বিশেষত্ব হলো— এ পূর্ণিমা তিথি হতে ভিক্ষু সংঘ ত্রৈমাসিক বর্ষব্রত অধিষ্ঠান শুরু করে। যার পরিসমাপ্তি ঘটে প্রবারণা পূর্ণিমা বা আশ্বিনী পূর্ণিমায়। আষাঢ়ী পূর্ণিমাকে অবলম্বন

করে গৌতম বুদ্ধের জীবনে আরও একটি অনন্য স্মৃতি বিজড়িত। তাহলো, গৌতম বুদ্ধ এই পূর্ণিমা তিথিতে তাঁর প্রয়াত মাতাকে তুষিত স্বর্গে গিয়ে ধর্মদেশনা করেছিলেন।^{১৯}

সম্রাট অশোক (খ্রি. পূ. আনু. ৩০৪-২৩২) সারানাথের পুণ্য অঙ্গণে স্তম্ভ নির্মাণ করে ‘ধর্মচক্র প্রতীক’ স্থাপন করেন। এটিকে অশোকচক্রও বলা হয়। এ চক্র ত্যাগ, মৈত্রী ও মানবতার প্রতীক। এমনকি বৌদ্ধরা আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিকে ছোট ‘ছাদাং’ও বলে থাকে।^{২০} ছাদাং বর্মী শব্দ। এর অর্থ উপোসথ বা উপবাস। এদিনে ধর্মপ্রাণ নর-নারীরা একযোগে উপোসথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশেও বৌদ্ধরা যথাযোগ্য মর্যাদায় এ উৎসব পালন করে। বুদ্ধপূজা, উপাসনা, ভিক্ষুসংঘের পিণ্ডদান, শীলগ্রহণ, ধর্মসভা, প্রদীপ পূজা এ উৎসবের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। বেতারেও নিয়মিত অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়।

৩.৪ শ্রাবণী পূর্ণিমা (ওয়া খং লাব্রে)

এটি বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা গুরুত্ব সহকারে উদযাপন করে। গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের অব্যবহিত পরেই মগধরাজ ও অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজগীরের পার্শ্ববর্তী সপ্তপর্ণী গুহায় বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন বসে। পাঁচশত বৌদ্ধভিক্ষু এই সঙ্গীতিতে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে তার নাম হয়েছে পঞ্চশত সঙ্গীতি। বুদ্ধের প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপ স্থবির এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এই সঙ্গীতিতে সর্বপ্রথম বদ্ধবচন একত্রে সংকলন করা হয়। আনন্দ, উপালী প্রমুখ ভিক্ষু এই সঙ্গীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।^{২১} উল্লিখিত কারণে শ্রাবণী পূর্ণিমা বাংলাদেশে বৌদ্ধদের নিকট তাৎপর্যপূর্ণ।

৩.৫ ভাদ্র পূর্ণিমা (তো স্লে লাব্রে)

ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিই মধু পূর্ণিমা নামে পরিচিত। এই তিথির প্রেক্ষাপট হলো এই যে, তথাগত বুদ্ধ কোশাঘীতে ভিক্ষুসংঘসহ অবস্থানকালে বিনয়ধর পছীভিক্ষু ও সূত্রধর পছীভিক্ষুর মধ্যে বিনয় সম্পর্কিত একটি বিষয় নিয়ে চরম বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে তথাগত বুদ্ধ তাঁদের বিবাদ মীমাংসা করার আশ্রয় চেষ্টা করেন। কিন্তু বিবাদ মীমাংসা না হওয়ায় গৌতম বুদ্ধ কোশাঘী ত্যাগ করে পারিলেয়্য নামক নির্জন বন-জঙ্গলে গমন করেন এবং দশম বর্ষাবাস সেখানে পালন করেন। পারিলেয়্য বনে বর্ষা যাপনকালে একটি জাতি প্রতিদিন বুদ্ধের সেবা-যত্ন করত। এমন সময় একটি বানর হাতি কর্তৃক বুদ্ধকে সেবা করতে দেখে তারও ইচ্ছা জাগে। এ ভাদ্র পূর্ণিমাতে বানর মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে গৌতম বুদ্ধকে মধু দান করলে বুদ্ধ মধু পান করেন। বানর এ দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে এক বৃক্ষ শাখা হতে অন্য বৃক্ষ শাখায় লাফাতে শুরু করে। হঠাৎ অসাবধানবশত বৃক্ষের শাখা ভেঙ্গে বানর মাটিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করে।^{২২} এ পুণ্য স্মৃতি স্মরণ করে বৌদ্ধরা ভাদ্র পূর্ণিমা বা মধু পূর্ণিমা উদযাপন করে। এ দিনটি উপলক্ষে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় বুদ্ধ পূজা, সীবলী পূজা, শীল গ্রহণ, সংঘ দান, মধু ও ভেষজ দান, বাতি প্রজ্জ্বলন, ভিক্ষু সংঘকে পিণ্ডদানসহ নানা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে।

৩.৬ আশ্বিনী পূর্ণিমা (সিজান জোয়াই লাব্রে)

আশ্বিনী পূর্ণিমাকে প্রবারণা পূর্ণিমাও বলা হয়। বৌদ্ধ ধর্মে এ উৎসব দু’ইটি কারণে স্মরণীয়। প্রথমত: এই পূর্ণিমায় ভিক্ষুদের বর্ষাবাসব্রত সমাপ্ত হয়। দ্বিতীয়ত: এ দিন থেকে ভিক্ষু সংঘের সদস্যগণ সদ্‌ধর্ম প্রচার করার জন্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েন।^{২৩} একদা গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ‘চরখ চারিকং বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় অনায়হিতায় সুখায় দেবমনুস্সানং’^{২৪} অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ তোমরা বহুজনের হিত ও মঙ্গলের জন্য চারিদিকে বিচরণ কর। দেবগণ ও মনুষ্যগণের মঙ্গলের জন্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়। সুতরাং ধর্মপ্রচারের দিবস হিসেবে এ দিনটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র।

প্রবারণার তান্ত্রিক ব্যাখ্যায় ড. সুকোমল বড়ুয়া বলেন, ‘প্রবারণা’ শব্দের সরলীকৃত অর্থ হলো- প্রকৃষ্টরূপে বরণ করা। অর্থাৎ ভিক্ষুসংঘ তিন মাস যাবৎ বর্ষাবাস অধিষ্ঠানকালে যে ধর্ম-দর্শন চর্চা করেছেন, সেই ধর্মের আলোকে ভালকে বরণ এবং মন্দকে বর্জন করার আদর্শই প্রবারণা। সাধারণত প্রবারণা দিবসে ভিক্ষুসংঘ ‘ভিক্ষু সীমায়’ বসে নিজ দোষ-গুণ গুরুর নিকট প্রজ্ঞাপ্ত করেন এবং দোষ হলে প্রায়শ্চিত্ত করেন। এটিই প্রবারণা উৎসবের বিশেষ তাৎপর্য।^{২৫}

এ দিনে বৌদ্ধরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-জামা কাপড় পরিধান করেন। একে অপরের বাড়ি যান, পরস্পরে আলিঙ্গন ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বিহারে সমবেত হয়ে মৃত লোকের পারলৌকিক সদগতির জন্য ভিক্ষুগণকে পিণ্ডদান করা হয় এবং প্রবীণদের খাওয়ানো হয়।

৩.৭ কার্তিকী পূর্ণিমা (তা চৌঙ বুঙ লাভ্রে)

এ মাসে গৌতম বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য সারিপুত্র অমাবস্যায়া ও মহামৌদগল্যায়ন ইহকাল ত্যাগ করেন। তাঁদের স্মরণে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা দুই দিন শোক পালন করে। পাশাপাশি ভিক্ষুসংঘকে দান-দক্ষিণা প্রদান করা হয়।^{২৬}

৩.৮ পৌষ পূর্ণিমা (প্রাচো লাভ্রে)

পৌষ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের নিকট অতি পুত-পবিত্র। দ্বীপ বংশ নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, এ পূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধ ধর্মপ্রচার করার জন্য সিংহল দ্বীপে গমন করেছিলেন। এই কারণে এ পূর্ণিমা বাংলাদেশে বৌদ্ধ অনুসারীদের নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ।^{২৭}

৩.৯ মাঘী পূর্ণিমা (তাবো চৌয়ে লাভ্রে)

মাঘী পূর্ণিমাকে আয়ু সংস্কারের তিথিও বলা হয়। এ তিথিতে গৌতম বুদ্ধ স্বীয় আয়ু সংস্কার বিসর্জন বা মহাপরিনির্বাণ ঘোষণা করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধের এরূপ সংকল্প গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ভূকম্পন শুরু হয়। ভিক্ষু সংঘ এর কারণ জানতে চাইলে বুদ্ধ বলেন, তাঁর পরিনির্বাণের সংকল্পের কারণেই এরূপ ঘটনা ঘটেছে অর্থাৎ তথাগতের জন্ম, মৃত্যু ও বুদ্ধত্ব লাভকালে জগত এভাবে প্রকম্পিত হয়।^{২৮}

বুদ্ধের পরিনির্বাণের কথা শুনে উপস্থিত ভিক্ষুগণ বিষণ্ণ ও শোকাভিভূত হলে বুদ্ধ তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী। এজন্য দুঃখ করা অনুচিত। তোমরা সংকল্পবদ্ধ ও দৃঢ়চিত্ত হয়ে ধর্মচর্চা ও অনুশীলন কর, তবেই জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর সংসার উত্তীর্ণ হয়ে দুঃখকে জয় করতে পারবে। এ দিবসটির আরও একটি শিক্ষণীয় বিষয় হলো, মানবজাতি যদি আধ্যাত্মিক সাধনায় পূর্ণতা লাভ করে, তাহলে নিজের জীবন-মৃত্যুকেও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।^{২৯}

বাংলাদেশের বৌদ্ধরা যথাযথ মর্যাদায় এ তিথি পালন করেন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্মাদি অনুসরণ করেন। উল্লেখ্য, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় এ পূর্ণিমা উপলক্ষে এক বিস্তীর্ণ জায়গায় বাঁশের ঘেরা দিয়ে আঁকা-বাঁকা করে দুমুখী, তিনমুখী, চারমুখী রাস্তা তরি করে একটি ব্যুহচক্র তৈরি করা হয়। এই চক্রের মধ্যখানে রাখা হয় বুদ্ধমূর্তি। এই চক্রের মধ্যে একবার চুকলে যেমন লক্ষ্যস্থানে যাওয়া কঠিন আবার বের হয়ে আসাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যে ব্যক্তি বুদ্ধমূর্তির নিকট পৌছাতে সক্ষম হয় সে ফুল দিয়ে এবং প্রদীপ জ্বেলে বুদ্ধ পূজা করে। ব্যুহবক্র একটি গোলক ধাঁধা ছাড়া আর কিছু নয় এবং এই মায়াময় পৃথিবীর একটি প্রতীক। ব্যুহচক্রের ভেতর প্রবেশ করে যেমন অনেকে পথ হারিয়ে ফেলে তেমনি মানুষ সংসারে প্রবেশ করলে ক্রমশ মিথ্যা মায়াজালে জড়িয়ে পড়ে। এ উপলক্ষে বৌদ্ধবিহারকে ফুল, লতা-পাতা দিয়ে সাজানো হয়।^{৩০}

৩.১০ ফাল্গুনী পূর্ণিমা (তা বৌঙ লাভে)

ফাল্গুনী পূর্ণিমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। গৌতম বুদ্ধের স্মরণে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় এ উৎসব পালন করা হয়। জটিক পাঠে জানা যায় যে, তথাগত বুদ্ধত্ব লাভের এক বছর পর স্বীয় জন্মভূমি-কপিলাবস্ততে আগমন করেছিলেন। সময়টা ছিল ফাল্গুনী পূর্ণিমা। তাঁর আগমানে জন্মস্থান কপিলাবস্ততে আনন্দের বাতাস বইতে থাকে। এ সময় পুত্র বাহুল তাঁর (পিতা) নিকট পিতৃধন প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ বাহুলকে দীক্ষিত করে পিতৃধন প্রদান করেন। উল্লেখ্য, এ সময় বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আনন্দওশ্রামণ্য (বৌদ্ধ সন্ন্যাস ধর্ম) ধর্মে দীক্ষিত হন।^{৩১}

এ উৎসবকে বৌদ্ধবলম্বীরা জ্ঞাতি সম্মিলনের তিথিও বলে। এ দিবসে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেন।

৩.১১ চৈত্র সংক্রান্তি

চৈত্র মাসের শেষ দিন বিষুব সংক্রান্তি হিসেবে এ উৎসবটি পালিত হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দুই দিন পূর্বে থেকে ‘জাক’ দেয়া হয়। জাক বা জাগ শব্দটি জাগরণী শব্দ থেকে এসেছে বলে ধর্মতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন। কেয়া ফুল, বিষকাতালী নামক লাউ গাছ, নিম পাতা ইত্যাদি শুকনো খড়ের সাথে মিলিয়ে স্তপাকারে, গানের সাহায্যে পোড়ানোর নাম ‘জাক’ দেয়া অনুষ্ঠান। শেষ রাত্রে ও সন্ধ্যায় জাক দেয়া হয়।^{৩২}

চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে বৌদ্ধরা নিজ নিজ বাড়িঘর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করেন। প্রতিটি বৌদ্ধ ঘরের দরজায় বিউ ফুলের মালা, নিমপাতা ও মামপাতা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। বিহারে গিয়ে দান-দক্ষিণা দিয়ে প্রার্থনা করা হয়। যাতে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বিগত মাস, বছরে দোষ-ত্রুটি করে থাকলে তা যেন ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়। এ দিনে পারস্পরিক মিলন, শুভেচ্ছা ও ভাব বিনিময় হয়। ফলে এক অনাবিল আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।^{৩৩}

৩.১২ নববর্ষ

নববর্ষ বাঙালির শাস্বত উৎসব। বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় এ উৎসবকে জাতীয় ও ধর্মীয় দিক থেকে বিবেচনা করে থাকেন। এ দিন বৌদ্ধরা পূজা-অর্ঘ্য নিয়ে বিহারে যান। দান-ধর্ম ও পুণ্য কর্মাদির মাধ্যমে নববর্ষকে স্বাগত জানায়। তারা নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করেন। সমবয়সী ছেলে-মেয়েরা পরস্পরের মধ্যে হাত ও গলা মিলিয়ে ভাবের আদান-প্রদান করে। ফলে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, ঐক্য ও সহানুভূতির মনোভাব গড়ে উঠে।^{৩৪}

নববর্ষের দিনে বৌদ্ধরা পরপারগত পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান করেন। বাড়ির উঠানের এক কোণে চার-পাঁচ ফুট উঁচু মঞ্চ তৈরি করে তথায় দুপুর বারোটোর পূর্বে অন্ন, ব্যঞ্জন, ফলমূল ইত্যাদি থালায় সাজিয়ে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। এ অনুষ্ঠানে গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও আমন্ত্রণ করা হয়। এ সময়ে নানা ধরনের সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।^{৩৫} তাই নববর্ষের এহেন তাৎপর্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষ্যে এভাবেই প্রকাশ পেয়েছে—

‘এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ,

তাপস, নিঃশ্বাস বায়ে,

মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে

বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।’^{৩৬}

৩.১৩ কঠিন চীবরদান

কঠিন চীবর দান বাংলাদেশে বৌদ্ধদের জন্য এক পরম পবিত্র ও সর্বোচ্চ দানোৎসব। পৃথিবীর সর্ববিধদান বস্তুর মধ্যে এই চীবর দানের ফল সর্বোত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট, অতুলনীয় ও অপ্রেময়। আশ্বিনীপূর্ণিমা থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত এক মাসব্যাপী কঠিন চীবরদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে।

‘চীবর’ অর্থ ভিক্ষুসংঘের শরীরে আস্তীর্ণ করার উপযোগী করে বিনয় বিধি অনুসারে তৈরি পরিধেয় পোশাককে বুঝায়। আর ‘দান’ অর্থ সশ্রদ্ধ চিত্তে দায়ক-দায়িকা কর্তৃক ভিক্ষুসংঘকে প্রদান করা। তাই ত্রিপিটকে এর পাঁচটি বিশেষত্ব কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কঠিন চীবর দানকালে দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সূতাকাটা, কাপড় বোনা, কাপড় কাটা, সেলাই করা, রং করা, ধোয়া, শুকানো ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পন্ন করে দান করতে হয় বলেই এটিকে কঠিন চীবর বলা হয়। এছাড়া কঠিন চীবর দানকারী এই জন্মে ও জন্ম পরস্পরকালে পাঁচটি ফল লাভ করে। আবার কঠিন চীবর লাভী ভিক্ষুও পাঁচটি ফলের অধিকারী হয়। অন্যান্য দান বছরে শতবার করা গেলেও কঠিন চীবর দান নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত করা যায় না।^{৭৭}

তথাগত গৌতম বুদ্ধের সময়কাল থেকেই কঠিন চীবরদান প্রচলিত আছে। বিনয় পিটকে বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধ বলেছেন, হে ভিক্ষুগণ! যারা বর্ষাবাস করেছে, সে সমস্ত ভিক্ষুদের কঠিন আস্তরণ করার অনুজ্ঞা করছি। এই নির্দেশের পর থেকেই কঠিন চীবর দানের প্রবর্তন করা হয়। উল্লেখ্য, প্রতিবছর একবারই এই অনুষ্ঠান হয়। যে বিহারে ভিক্ষু বর্ষাবাস যাপন করেন, সে বিহারেই কঠিন চীবর দান হতে পারে। একই বিহারে দুইবার চীবর দান হতে পারে না। তাছাড়া অন্যান্য স্থানে চীবর দানানুষ্ঠান শাস্ত্র সম্মত নয়।^{৭৮}

অতএব, কঠিন চীবর দানের ফল অপ্রেময় ও অতুলনীয়। এটি অনন্য অসাধারণ। তবে দানের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা, একাত্মতা ও চিত্তের পরিশুদ্ধি একান্ত আবশ্যিক। এগুলো ছাড়া চীবর দানের সার্থকতা বা ফল লাভ হয় না।^{৭৯} তাই গৌতম বুদ্ধের ভাষায়,

তস্মাহি জানমানেন কঠিনস্স গুণং বহুং
দাতব্বং কঠিনং দানং ভবিস্সতি মপ্পফলস্তীতি।

অর্থাৎ কঠিন চীবর দানের বহুবিধ গুণকথা জেনে প্রত্যেকের পক্ষে জীবনে অন্তত একবার হলেও শ্রদ্ধার সাথে একটি কঠিন চীবর দান করা উচিত। এছাড়াও এই দানের ফলে একাধিক পঞ্চবিধ দোষও দূরীভূত হয় এবং দানগ্রহীতা ভিক্ষুর বিশুদ্ধ জীবনযাপনেও এটি সহায়তা করে।^{৮০}

৩.১৪ কল্পতরু উৎসব

বৌদ্ধধর্মতত্ত্ব মতে, সভার নির্বাণ লাভ না হওয়া পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যু চক্রের গতিধারায় তাকে ঘুরতে হয়। এই ঘূর্ণন পথে সত্তা যেন চেতনাসম্পন্ন থাকেন। সৎ গতি পরিক্রমায় রত থাকেন, চিত্ত সচেতনতা রক্ষা করতে সক্ষম হন, চিত্ত চ্যুতি বা চিত্তে বিভ্রান্তি না ঘটে, চিত্ত যেন একটি অবলম্বনের মাধ্যমে সাধনারত থাকে এবং সাধন বস্তুর প্রতিটি অঙ্গকে নিয়ে সমাধিতে থাকে। সেই চেতনাকেই কল্পতরু পূজা করা হয়।^{৮১}

বাংলাদেশে সাধারণত আশ্বিন-কার্তিক মাসে কল্পতরু উৎসব পালন করা হয়। এটি মানুষের অভিষ্ট ফলদায়ক স্বর্গবৃক্ষ। এর নিকট পার্থিব কিছু বস্তু পাওয়া যায় বলেও বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন। তারা একটি দেবী নির্মাণ করে মাঝখানে চারাগাছ বা গাছের শাখা রোপন করেন। গাছের শাখায় ভক্ত নর-নারীরা বিভিন্ন সামগ্রী বেঁধে দেয় এবং ঈঙ্গিত ফল লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। বিভিন্ন রকম আলোকসজ্জা করে তারা আনন্দ করেন।^{৮২}

৩.১৫ উপসম্পাদা

এটি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বৌদ্ধদের মধ্যে দীক্ষা আবশ্যিক। তাই পুরুষেরা জীবনে একবার প্রব্রজিত হন। মেয়েদের দীক্ষা নেই। অনেকে আবার সারা জীবনের জন্যে প্রব্রজিত হন। ভিক্ষু সংঘে পুত্রদানকে বৌদ্ধরা সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণময় কাজ বলে মনে করেন। এজন্য উপসম্পাদা দান অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ অনুষ্ঠানে ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান করা হয়। আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ানো হয়। অনুষ্ঠানে বুদ্ধকীর্তন ও ব্যাণ্ড বাজানো হয়।^{৪৩}

৩.১৬ পরিবাস (ওয়াইক/ওয়াই-আই)

পরিবাস (ওয়াইক) বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটি পবিত্র বিনয়কর্ম। ভিক্ষুরা লঘু অপরাধে দণ্ডিত হলে, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আদিতে, মধ্যে ও শেষে সংঘের প্রয়োজন। আর এ অপরাধের নাম সংগাদিসেস। ওয়াইকে কমপক্ষে কুড়িজন ভিক্ষুর উপস্থিতি আবশ্যিক এবং প্রত্যেক ভিক্ষুর জন্য একটি করে কক্ষ নির্দিষ্ট থাকে। এই অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার সাধারণত গৃহীরা বহন করে। বিহার প্রাঙ্গনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তিনদিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। বাংলাদেশের কিছু কিছু জায়গায় পরিবাস (ওয়াইক) অনুষ্ঠান পরিদৃষ্ট হয়। কারণ এটি খুবই ব্যয়বহুল।^{৪৪}

৩.১৭ অষ্ট পরীক্ষার দান

এটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ভিক্ষুদের ত্রিচীবর, ভিক্ষাপাণ্ড, ক্ষুর, সূচকতা, কটি-বন্ধনী ও জল-ঢাকনী এই আট প্রকার সামগ্রী দান করাকে অষ্ট পরীক্ষার দান বলা হয়। দাতাদের সামর্থ অনুযায়ী আত্মীয়দের পানাহার করানো হয়। এ সময় সকলে আনন্দ-উল্লাস করেন।^{৪৫}

৩.১৮ জাত কর্ম

এটি বৌদ্ধদের গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। বৌদ্ধ গৃহে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে উলুধ্বনি দেয়া হয় এবং প্রসূতির গৃহে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। প্রসবের দিন থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত প্রসূতি অশুচি অব্যাহত থাকে। নবজাতকের নাভি স্থলিত না হওয়া পর্যন্ত প্রসূতি বৌদ্ধ বিহার ও অন্যান্য স্থানে প্রবেশ করতে পারে না। সাত দিন পর নবজাতকের মাথার চুল কামানো হয়। সে দিন এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিক্ষুসংঘকে দান দক্ষিণা প্রদান করা হয়।^{৪৬} এ অনুষ্ঠান ছাড়াও সাধ ভিক্ষণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ, কর্মচ্ছেদ অনুষ্ঠানগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়।

৩.১৯ নীল-পূজা (চাঙগ্রোং পুয়ে)

এটি বৌদ্ধদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এ উৎসবকে কেউ কেউ ‘পানি খেলা’ বা ‘জলকেলি’ বলে। চৈত্র মাসের শেষদিন অর্থাৎ এপ্রিল মাসের তেরো তারিখ থেকে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যুবক-যুবতীরা বালতি ভরতি পানি নিয়ে রাস্তায় বের হয়। একজন অন্যজনকে পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দেয়। এপ্রিল মাসে খুব গরম অনুভূত হয়। স্বাভাবিকভাবেই একজন অন্যজনকে পানি ছিটিয়ে স্বাগত জানায়। পানি নিক্ষেপ করা প্রীতি, শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্বের প্রতীক। সাধারণত অবিবাহিত ছেলে-মেয়েরা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। মাতা-পিতা, শিক্ষক ও গুরুজনকে যুবক-যুবতীরা প্রণাম করে। বৃদ্ধ ও প্রবীণ ব্যক্তির এ উৎসবে অংশগ্রহণ করেন না।^{৪৭} বাংলাদেশের বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় এ উৎসব ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। যুবক-যুবতীরা এ সময় এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে বেড়ায় এবং নাচ-গান, আনন্দ-উল্লাস করে।

৩.২০ গুরুবরণ উৎসব (চেরা কাণ্ড পুয়ে)

নীলপূজার কিছুদিন পর গুরুবরণ উৎসব উদযাপিত হয়। এ উৎসবের বিশেষত্ব হলো ভূর ভোজন ও ধর্মসভা। প্রায় বেলা এক ঘটিকার সময় নির্ধারিত মঞ্চে গুরুকে সকলে বরণ করে। সংঘ নায়ক বেদির মত একটি উচ্চাসনে

উপবেশন করেন। আসন গ্রহণ করার পর সকলে পঞ্চশীল গ্রহণ করে গুরুকে প্রণাম করেন। বন্দনার শেষে সংঘ নায়ক উপস্থিত দায়ক-দায়িকার উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন। বক্তব্য শেষে ধর্মসভা আরম্ভ হয়। সভা হতে ঘণ্টা বাজানো অব্যাহত থাকে। বিকাল বেলা নৌকা-বাইক ও ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।^{৪৮}

৩.২১ নবান্ন উৎসব (কা উ চাই পুয়ে)

নবান্ন উৎসব বৌদ্ধদের অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। এ উৎসবে নতুন ধানের চাউল দিয়ে নানা ধরনের পায়েস-পিঠা তৈরি করে আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ানো হয়। এ উৎসবের মাধ্যমে তারা পারস্পরিক ভালবাসা, আনন্দ-উল্লাস ভাগাভাগি করে নেন।^{৪৯}

৩.২২ মূর্তি-ভাসান উৎসব (ছিম্ফঙ্ ফারা পুজো পুয়ে)

মূর্তি-ভাসান অন্যান্য উৎসবের মতই গুরুত্বপূর্ণ। এ উৎসব সাধারণত আশ্বিনী পূর্ণিমায় উদযাপন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে নদীতে দুইটি নৌকা পাশাপাশি বেঁধে তার উপর প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়। একটি বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করে সকলে বিভিন্ন উপাচার দিয়ে পূজা করে। প্ল্যাটফর্মটি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। যে গ্রামে প্ল্যাটফর্মটি পৌঁছে সেই গ্রামের নর-নারী সকলে এসে বুদ্ধকে প্রণাম করে। এভাবে প্ল্যাটফর্মটি সমস্ত বৌদ্ধগ্রামে ঘোড়ানো হয়। পরে বুদ্ধমূর্তিটি উঠিয়ে নিয়ে প্ল্যাটফর্মটি নদীতে ভেসে দেয়া হয়। এ উৎসবটি একাধারে তিন বছর করা প্রয়োজন।^{৫০} বাংলাদেশে পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় এ উৎসব পরিদৃষ্ট হয়।

৩.২৩ চিমি পুজ বোয়ে

বিভিন্ন রোগ-ব্যাদি থেকে অব্যাহতি ও আত্মীয়-স্বজনদের মঙ্গলের জন্য বৌদ্ধ বিহারে বাতি জ্বালিয়ে বুদ্ধকে পূজা করা হয়। এই প্রক্রিয়া ‘চিমি পুজ বোয়ে’ উৎসব নামে পরিচিত। সাধারণত অষ্টমী ও পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব পালন করা হয়। আবার কেউ কেউ আত্মীয়-স্বজনদের কল্যাণের জন্য কবুতর ও মাছ ছেড়ে দেয়।^{৫১}

৩.২৪ মাথা ধোয় (চাইড্রে সো পুয়ে)

অপশক্তি, অপদেবতা ও ভূত-প্রেতের, সকল প্রকার কুদৃষ্টি ও প্রভাব থেকে পরিবারের দুর্ভাগ্য এড়ানোর জন্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন কোন পরিবার এ অনুষ্ঠান পালন করে। এ অনুষ্ঠানে সাধারণত পিতা-মাতা বা কোনো অভিভাবক ছেলে মেয়েদের মাথা ধুয়ে দেয়। নীল পূজার পরেই এ অনুষ্ঠান পালন করা হয়।^{৫২}

৩.২৫ রিগনার

কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বৌদ্ধ সম্প্রদায় ‘রিগনার’ নামক একটি অনুষ্ঠান পালন করেন। বিভিন্ন উপাচার নিয়ে সংক্রামক ব্যাদির দেবীকে এ সময় পূজা করা হয়। চার টুকরো সাদা কাপড়ে মন্ত্র লিখে খুঁটিতে বেঁধে মহল্লার এক কোণে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। এ সময় মহল্লার সঙ্গে বাহিরের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখা হয়। মহল্লার অধিবাসীগণ এ সময় নিরামিষ খায় ও পঞ্চশীল পালন করে।^{৫৩}

৩.২৬ চুম বেলে

পরিবারের সকলের কল্যাণের জন্য ‘চুম বেলে’ নামক পূজার আয়োজন করা হয়। বছরে একবারই শুধু এ পূজা করা হয়। এ পূজায় ভিক্ষুর-উপস্থিতির কোন প্রয়োজন নেই। পূজা করা হয় একবারে ঘরোয়া পরিবেশে।^{৫৪}

পূজার উপাচার হলো একটি নারিকেল, একটি রূপার টাকা, ৫/৭টি গাছের পাতা, কতকগুলো বাঁশের টুকরো, বাড়িতে তৈরি পিঠা এবং কিছু সুতা। এ সমস্ত উপাদানগুলো একটি প্লেটে রেখে ঘরের একটি কক্ষে গৃহ স্বামী বা গৃহকত্রী কর্তৃক মন্ত্র পড়ে দেবীর নিকট পরিবারের সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করেন। পূজা শেষে সুতাগুলো ছেলে-মেয়ের হাতে বেঁধে দেন এবং পিঠাগুলো সকলকে খাওয়ানো হয়।^{৫৫}

৪. উপসংহার (Conclusion)

গৌতমবুদ্ধের বাণী ও উপদেশের উপর ভিত্তি করে জগত ও জীবন সম্পর্কে যে গঠনমূলক ও সৃজনশীল চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে- তাই বৌদ্ধ ধর্ম। এ ধর্মে উৎসব ও অনুষ্ঠানে বাহুল্য নেই, তথাপি যা কিছু উৎসব আনন্দ দৃশ্যমান হয়, তা সম্পূর্ণটাই স্বয়ং বুদ্ধ ও তাঁর বুদ্ধত্ব লাভকে কেন্দ্র করে। গৌতমবুদ্ধ তাঁর অনুসারীদেরকে একতাবদ্ধভাবে এবং নিজেদের মধ্যকার পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় রাখার জন্য মাঝে মাঝেই একত্রিত হতে উপদেশ দিয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। আর এ উৎসব ও অনুষ্ঠান যে কোন জাতির সৃষ্টির চৈতন্যপ্রবাহ, জীবনের স্পন্দন, পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ঐক্যের মিলন ঘটায়। তাই সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা হয় যে, উৎসব ও অনুষ্ঠান হলো সমাজ সংহতির প্রতীক। বাংলাদেশের বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকাসমূহে যুগ যুগ ধরে বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়ে আসছে। আগামী দিনে বৌদ্ধ সমাজকে পরিশুদ্ধ ও আলোকিত করতে এ উৎসব ও অনুষ্ঠানাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ. ৬
- ^২ Kedar Nath Tiwari, *Comparative Religion* (Delhi: Motilal Banarasisidass, 1992), pp. 45-49
- ^৩ Arabci J. Baham, *The World's Living Religions* (New Delhi: Peari Offeset Press, 1977), pp. 105-120; *The World Book Encyclopedia*, Vol-2 (USA: The World Book Encyclopedia Inc, 1988), p. 679
- ^৪ ভিক্ষু সীনাথানন্দ, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ২৭
- ^৫ প্রণব কুমার বড়ুয়া, *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭), পৃ. ১১৪-১২০
- ^৬ Encyclopedia Britannica, Vol-15 (Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc., 1959), p. 263; তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদ, এ .সি বাকেট এর মতে, গৌতমবুদ্ধ খ্রি.পূ. ৫৬০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দ্রষ্টব্য: A.C. Bouquet, *Comparative Religion* (London: Penguin Books Ltd., 1964), p. 154
- ^৭ Richard Ince, *A Dictionary of Religion and Religions* (New Delhi: Cosmo Publications, 2004), pp. 50-51
- ^৮ Ganga Somany, *World Religions* (Calcutta: O.M. Somany Charity Trust, 1995), pp. 67-68
- ^৯ *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
- ^{১০} Kedar Nath Tiwari, *Ibid*, pp. 43-45; Sahib Kaur, *A Comparative Study of Religions* (New Delhi: Bedi Art Prints, 2013), p. 34
- ^{১১} *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
- ^{১২} খান্দকার রিয়াজুল হক, *বাংলাদেশের উৎসব* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৯
- ^{১৩} তদেব; A Day Commemorating Some Religious events, Cf. Richard Ince, *Ibid*, p. 204; a day or period of the year when people stop working to celebrate a special event, often a religious one. Cf. *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 2015), p. 566

- ^{১৪} খোন্দকার রিয়াজুল হক, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৯-১০
- ^{১৫} সুকোমল বড়ুয়া ও সুমনকান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিট পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. ১৬২; Ganga Somany, *Ibid*, p. 84
- ^{১৬} কাদের মাহমুদ, *বৌদ্ধত্ব পরিচয়* (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১৭), পৃ. ১৮৮; খোন্দকার রিয়াজুল হক, *তদেব*, পৃ. ২৫-২৬
- ^{১৭} আবদুল মাবুদ খান, *পটুয়াখালী বরগুনা জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৬), পৃ. ৭৭
- ^{১৮} সুকোমল বড়ুয়া, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৬৩
- ^{১৯} আবদুল মাবুদ খান, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৭৭; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *যার যা ধর্ম* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪), পৃ. ৬৭
- ^{২০} কাদের মাহমুদ, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৮৯
- ^{২১} আবদুল মাবুদ খান, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৭৭
- ^{২২} *তদেব*; কাদের মাহমুদ, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৯০
- ^{২৩} ড. মোহাম্মদ আখতার হোসেন, *বাংলাদেশের উৎসব* (ঢাকা: সুচয়নী পাবলিশার্স, ২০১৪ বাং), পৃ. ১৪০
- ^{২৪} বিনয় পিটক, *মহাবগগ*
- ^{২৫} সুকোমল বড়ুয়া, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৬৩; thebuddhisttimes.com/buddhist_festivals_bangladesh/
- ^{২৬} আবদুল মাবুদ খান, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৭৮
- ^{২৭} আব্দুল মাবুদ খান, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৭৮
- ^{২৮} ড. মো. শাজাহান কবির, *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি* (ঢাকা: দিক দিগন্ত, ২০০৯), পৃ. ২২১; শিমুল বড়ুয়া, *বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি* (চট্টগ্রাম: অমিতাভ প্রকাশন, ২০১৫), পৃ. ১২৭
- ^{২৯} সুকোমল বড়ুয়া, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৬৪
- ^{৩০} কাদের মাহমুদ, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৯২; আবদুল মাবুদ খান, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৭৮
- ^{৩১} মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২২৮; আবদুল মাবুদ খান, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৭৮; thebuddhisttimes.com/buddhist_festivals_bangladesh/
- ^{৩২} কাদের মাহমুদ, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৯৩
- ^{৩৩} সুকোমল বড়ুয়া, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৬৪; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৫৩
- ^{৩৪} খোন্দকার রিয়াজুল হক, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৩৪-৩৮; সুকোমল বড়ুয়া, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৬৫
- ^{৩৫} কাদের মাহমুদ, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৯৪
- ^{৩৬} খোন্দকার রিয়াজুল হক, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৩৭
- ^{৩৭} সুকোমল বড়ুয়া, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৬৫-১৬৮

- ৩৮ কাদের মাহমুদ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৯৪
- ৩৯ সুকোমল বড়ুয়া, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৭৩
- ৪০ তদেব
- ৪১ আবদুল মাবুদ খান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮১; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১০৯
- ৪২ কাদের মাহমুদ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৯৫
- ৪৩ তদেব
- ৪৪ আবদুল মাবুদ খান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮০
- ৪৫ কাদের মাহমুদ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৯৬
- ৪৬ তদেব
- ৪৭ আবদুল মাবুদ খান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮০-৮১; Han, Ba: "The Evolution of Burmes Dramatic Performances and Festivals Occassion", *Journal of the Burma Research Socieity*, Vol. XLIX, Part-I, June, 1996, p. 12
- ৪৮ আব্দুল মাবুদ খান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮০-৮১
- ৪৯ তদেব, বা সিন মাতবর, বয়স-৫৭ কুয়াকাটা, লতাচাপলি ইউনিয়ন, সাক্ষাৎকার: ১৮-১০-১৯৯৭
- ৫০ আব্দুল মাবুদ খান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮২; সো লং সে, বয়স-৫৭: পক্ষীয়াপাড়া, মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন, সাক্ষাৎকার: ২৩-১০-১৯৭৯
- ৫১ আব্দুল মাবুদ খান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮২
- ৫২ তদেব
- ৫৩ তদেব
- ৫৪ তদেব
- ৫৫ তদেব

হজ্জের বিধানাবলী: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান*

Abstract: [A theoretical analysis Hajj is the 5th pillar of Islam. It's an obligatory form of worship in Islam. The literal meaning of hajj are aspiring, determining, meeting or undertaking a holy journey purposely to a particular area. According to Islamic perception, the holy pilgrimage involves being present on Arafah on the 9th of Zilhajj, putting on ehram (cleansing ritual and wearing the prescribed attire) and accomplishing tawaf (circling in a counterclockwise direction) around the holy kaba inclusive of other actions. Hajj was confirmed as obligatory on the 9th of Hijri. It is mandatory for those who are wise, matured, independent and financially able. Hajj is mandatory for once in a lifetime. It is not for multiple times. However, if a person takes an oath on performing it, only then it becomes wajib (religious duty) for him. For performing the holy pilgrimage, putting on ehram, staying on Arafah, Mina, Mudadifah, reciting talbia, offering qurbani, kaba tawaf, safa-marwa sai are mandatory. It has been attempted to provide a clear discussion about hajj rituals in the article discussed.]

ভূমিকা

হজ্জ ইসলামের বুনিয়াদী বিধান। পঞ্চম স্তম্ভের অন্যতম। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) ছাড়াও পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের সময়েও হজ্জের প্রচলন ছিল। কোন্ সময় থেকে হজ্জের প্রবর্তন হয়েছে এ সম্পর্কে আল-কুর'আনুল কারীমে সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে এতটুকু জানা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময়ে হজ্জের প্রচলন শুরু হয়। যদিও কা'বা গৃহ আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্ধারিত সর্বপ্রথম গৃহ। আল-কুর'আনুল কারীমে কা'বা গৃহকে বায়তুল আতীক (পুরাতন গৃহ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ) সর্বপ্রথম এই কা'বা গৃহ নির্মাণ করেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর নুবুওয়াত লাভের পূর্বেও কা'বা ঘরকেন্দ্রিক আরবদের ধর্মীয় উৎসব হতো। প্রতি বছর তারা কা'বা গৃহ যিয়ারত করতো। তারা এখানে মিলিত হয়ে নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের গুণকীর্তন, বীরত্বগাঁথা বর্ণনায় লিপ্ত হতো। মানত দেবীর পূজা করত, উলংগ হয়ে কা'বা যিয়ারত করত। এভাবে অনেক অপকর্মে জড়িয়ে পড়ত। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) সকল প্রকার দেবদেবী কা'বা গৃহ থেকে অপসারণ করেন। নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় সকল জাহেলী রসুম। রাসূলুল্লাহ (সা) সে বছর 'উমরা পালন করেন। নবম হিজরীতে হজ্জ ফরয হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন কারণে হজ্জ পালন করতে পারেননি। সে বছর আবু বকর (রা)-কে হজ্জ প্রেরণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) দশম (১০ম) হিজরীতে হজ্জের নেতৃত্ব প্রদান করেন। এটিই বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত। হজ্জ প্রথম ফরয হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর যিলহজ্জ মাসে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। হজ্জের মূল অনুষ্ঠানগুলো ৮ যিলহজ্জ থেকে ১৩ যিলহজ্জের মধ্যেই

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

সম্পন্ন করা হয়। ইসলাম প্রতিটি বিষয়ের কিছু নিয়ম-কানুন ও বিধানসমূহের শিক্ষা দিয়েছে। অনুরূপভাবে হজ্জেরও বেশ কিছুসংখ্যক বিধানাবলী রয়েছে। এগুলো সঠিকভাবে পালন করলে এর একমাত্র প্রতিদান হবে জান্নাত। হজ্জের বিধানাবলী সম্পর্কে জানা আমাদের প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয়। কারণ বিপুল নিয়ম ব্যতীত যদি কেউ হজ্জ পালন করে তার হজ্জ নষ্ট বা ফাসিদ হয়ে যাবে। তাই হজ্জের সঠিক বিধানাবলী জানার জন্য আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করার চেষ্টা করেছি। আশা করি প্রবন্ধটি দ্বারা প্রত্যেক মুসলমান হজ্জের বিধানাবলী সম্পর্কে কিছুটা হলেও জ্ঞাত হবেন ও উপকার লাভ করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হজ্জের সকল বিধানাবলী মেনে সঠিক নিয়মানুসারে হজ্জ পালন করার তাওফীক দান করুন।

হজ্জের পরিচয়

হজ্জ শব্দটির 'হা' বর্ণে যবর, যের ও পেশ এ তিনটি হারকাত সহকারে পড়া যায়। 'হা' বর্ণে 'যবর' যোগে পড়লে অর্থ হবে 'ইচ্ছা করা, হজ্জ সম্পাদন করা'।^১ 'যের' যোগে পড়লে বিশেষ্যের অর্থ হবে 'একটি কর্মের নাম বিশেষ'। 'পেশ' যোগে পড়লে অর্থ হবে 'দলীল'।^২ হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ রাগিব আল-ইস্পাহানী (র) বলেন, ^৩ 'الْحَجُّ وَالْحُجَّةُ، فَالْحَجُّ مَصْدَرٌ وَالْحُجَّةُ اسْمٌ' - 'আল-হাজ্জু ওয়াল-হিজ্জু ফাল-হাজ্জু শব্দটি মাসদার, ওয়াল-হিজ্জু যের হলে ইস্ম হবে।'

হজ্জ শব্দের অভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা, সংকল্প করা, সাক্ষাৎ করা বা কোনো স্থানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গমন করা।^৪ ইব্ন মানযূর আল-ইফরীকী (৬৩০-৭১১ হি.) বলেন,

الْحَجُّ: الْقَصْدُ. حَجَّ إِلَيْنَا فَلَأَنْ أَيْ قَدِمَ، وَحَجَّهْ يَحْجُجُهُ حَجًّا : قَصَدَهُ، وَحَجَّجْتُ فَلَأَنْ.

- 'হজ্জ শব্দের অর্থ সংকল্প করা। যেমন বলা হয়, حَجَّ إِلَيْنَا فَلَأَنْ 'অমুক ব্যক্তি আমাদের নিকট হজ্জ করল' অর্থাৎ আগমন করল। হাজ্জাহু ইয়াহুজ্জুহু হাজ্জান অর্থাৎ যে বস্তুর সংকল্প করল, হাজাজতু ফুলানান অর্থাৎ আমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম।'

শরী'আতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজের দ্বারা তাযীমের জন্য বায়তুল-হারামের যিয়ারতের প্রতি সংকল্প পোষণ করাকে হজ্জ বলে। বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র) (মৃত ৮৫৫ হি.) বলেন,

الْحَجُّ قَصْدٌ إِلَى زِيَارَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ بِأَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ

- 'নির্দিষ্ট কতিপয় কার্যাবলীর মাধ্যমে সম্মান জ্ঞাপনার্থে হারাম গৃহের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সংকল্প করাকে হজ্জ বলে।'

ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হি.) বলেন,

الْحَجُّ وَفِي الشَّرْعِ الْقَصْدُ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ بِأَعْمَالٍ مَخْصُوصَةٍ

- 'পরিভাষায় হজ্জ বলা হয়, নির্দিষ্ট কিছু আমলের মাধ্যমে হারাম গৃহের উদ্দেশ্যে গমনেচ্ছাকে।'

'আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মাহমূদ আল-হানাতী (র) (মৃত ৭১০ হি.) বলেন,

زِيَارَةُ مَكَانٍ مَخْصُوصٍ فِي زَمَانٍ مَخْصُوصٍ بِعَمَلٍ مَخْصُوصٍ.

- 'নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত কাজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থানের যিয়ারত করাকে হজ্জ বলা হয়।'

এ সংজ্ঞার ব্যাখ্যায় ইবন আবদেদীন আশ্-শামী (র) বলেন,

شَرْعًا (زِيَارَةُ) أَيُّ طَوَافٍ وَوُقُوفٍ (مَكَانٍ مَخْصُوصٍ) أَيُّ الْكَعْبَةِ وَعَرَفَةَ (فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ) فِي الطَّوَافِ مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ إِلَى آخِرِ الْعُمْرِ وَفِي الْوُقُوفِ مِنْ زَوَالِ شَمْسِ عَرَفَةَ لِفَجْرِ النَّحْرِ (بِفِعْلِ مَخْصُوصٍ) بِأَنْ يَكُونَ مُحَرَّمًا بِنِيَّةِ الْحَجِّ.

-‘শরী’ আতের পরিভাষায় হজ্জ হচ্ছে (নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে) অর্থাৎ হজ্জের নিয়্যাতে ইহ্রাম বেঁধে (নির্দিষ্ট সময়ে) কুরবানীর দিন ফজরে তাওয়াফ করা, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর থেকে কুরবানীর দিন ফজর পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করা (নির্দিষ্ট স্থানের যিয়ারত করা) অর্থাৎ কাবা শরীফ তাওয়াফ ও আরাফাতে অবস্থান করা।’

The World book Encyclopedia তে বলা হয়েছে, ‘Hajj is a holy Pilgrimage to Mecca, the holy city of the Islamic Religion. The Kaaba the most sacred shrine of Islam, is in Mecca and the chief goal of the pilgrimage.’^{১০}

-‘হজ্জ হলো ইসলাম ধর্মের পবিত্র শহর মক্কার দিকে তীর্থযাত্রা করা। কাবা ইসলামের সর্বাধিক পবিত্র ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং তীর্থযাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য।’

এক কথায় হজ্জের নিয়্যাতে নির্দিষ্ট স্থান থেকে ইহ্রাম বেঁধে আল্লাহর বিধান পালনার্থে কাবা শরীফের তাওয়াফ, আরাফাতের ময়দানে অবস্থান ও অন্যান্য মাসনূন কার্যাবলী নির্দিষ্ট নিয়মে সম্পাদন করলেই হজ্জের কাজ শেষ হয়ে যায় না; বরং বিনয় ও নম্রতার মধ্যে নিমগ্ন থেকে মহান স্রষ্টার দরবারে ইবরাহীম (আ)-এর চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেকে সোপর্দ করার মাধ্যমেই হজ্জ পালন করতে হয়।

হজ্জ ফরয হওয়ার সময়

হজ্জ কোন হিজরীতে ফরয হয় এ বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশ আলিমের মতে ষষ্ঠ হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়েছিল।^{১১} ইমাম কুরতুবী (র)-এর মতে পঞ্চম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়।^{১২} কারও কারও মতে সপ্তম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়।^{১৩} কতিপয়ের মতে অষ্টম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়।^{১৪} আবার কারও কারও মতে নবম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়।^{১৫} ইবনুল-হুমাম (র) (মৃত ৬৭১ হি.) বলেন, ‘হজ্জ ফরয হয় সপ্তম অথবা পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ হিজরীতে’।^{১৬}

ইবনুল-কাইয়ুম আল-জাওয়যিয়াহ্ (র) বলেন, ^{১৭} وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ‘আল্লাহর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্ হজ্জ করা ঐ লোকদের উপর ফরয যাদের সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে।’ এ আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে হজ্জ ফরয হয়। আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় নবম হিজরীর শেষ দিকে। অতএব নবম হিজরীর শেষভাগে হজ্জ ফরয হয়, এটি বিশুদ্ধ মত। এ আয়াত অবতীর্ণের পরে দশম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ আদায় করেন, এটি ‘বিদায় হজ্জ’ নামে পরিচিত। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হওয়া সম্পর্কিত অভিমতগুলো সম্পর্কে ইবনুল-কাইয়ুম (র) বলেন, এ মতগুলোর কোনটির সমর্থনে কোন দলীল নেই।

কাযী ইয়ায ও কুরতুবী (র)-এর মতে, নবম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়। ইবনুল-আবেদীন (র) অত্যন্ত জোরালোভাবে এ অভিমতকে সমর্থন করেন। এমনকি তিনি বলেন, যারা নবম হিজরীর পূর্বে হজ্জ ফরয হবার অভিমত পোষণ করেন, তাঁদের অনুকূলে কোন দলীল নেই।

একদল আলিমের মতে, ‘দশম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়েছে।’ এ অভিমত পোষণকারীদের ব্যাপারে ইমাম তাহাভী (র) বলেন, ‘এ অভিমত বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।’^{১৮}

৬ষ্ঠ হিজরী সালে হজ্জ ফরয হবার অভিমতকে জমহুর আলিমগণ গ্রহণ করেছেন। কারণ আল-কুর’আনে বর্ণিত হয়েছে, ^{১৯} ‘وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ’ - ‘তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ‘উমরাহ্ পূর্ণ কর।’ আর এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ৬ষ্ঠ হিজরীতে।^{২০} আয়াতটি গঠনরীতি সম্পর্কে আলকামা, মাসরুক ও ইবরাহীম আন-নাখঈ (র) প্রমুখ তাবি’ঈ বলেন, ^{২১} ‘أَتِمُّوا’-এর স্থলে এখানে হবে أَفِئُّوا। ইবন জারীর আত-তাবারী (র) বিশুদ্ধ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। এটি ৬ষ্ঠ হিজরীতে হজ্জ ফরয হবার অভিমতকে সমর্থন করে।^{২২}

হজ্জের সময়

হজ্জের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। এর বাইরে হজ্জ আদায় করা জায়েয নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলেন, ^{২৩} ‘الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ’ - ‘হজ্জের মাসসমূহ সুবিদিত।’ এ আয়াতের ব্যাখ্যা মুহাম্মাদ ইবন ইসাম’ঈল আল-বুখারী (র) বলেন,

قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.^{২৪}

-‘ইবন ‘উমার (রা) বলেন, ‘হজ্জের মাসসমূহ হচ্ছে শাওয়াল, যিল’কাদ এবং যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন।’ তাফসীরে মায়হারীতে বর্ণিত আছে, হজ্জের মাস শাওয়াল থেকে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে এর পূর্বে ইহ্রাম বাঁধা জায়েয নয়। কোনো কোনো ইমামের মতে শাওয়ালের পূর্বে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলে হজ্জ আদায়ই হবে না। ইমাম আযম আবু হানীফাহ্ (র)-এর মতে অবশ্য হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু মাকরুহ হবে।^{২৫}

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত সাতটি। মুসলমান, জ্ঞানবান, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন, আর্থিক সচ্ছলতা, হজ্জ সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা ও হজ্জের সময় হওয়া এমন প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর হজ্জ ফরয।^{২৬} সেগুলো নিম্নরূপ,

১. হজ্জ ফরয হওয়ার প্রথম শর্ত মুসলমান হওয়া। অমুসলমান বা কাফিরের উপর হজ্জ ফরয নয়। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ.^{২৭}

-‘মুশরিকরা অপবিত্র; অতএব এই বছর পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে।’

২. জ্ঞানবান ব্যক্তির ওপর হজ্জ ফরয। সুতরাং পাগলের ওপর হজ্জ ফরয নয়।

৩. বালিগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। অপ্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারীর উপর হজ্জ ফরয নয়। তবে যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু হজ্জ করে তাহলে তার হজ্জ আদায় হবে। কিন্তু ফরযিয়াত আদায় হবে না। প্রাপ্ত বয়স্ক হলে পুনরায় তাকে হজ্জ আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,

إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فِيهِ لُهُ حَجَّةٌ حَتَّى يَغْفَلَ، فَإِذَا عَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى.^{২৮}

-‘যদি কোনো শিশু বালিগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বে হজ্জ করে, তাহলে তার হজ্জ হয়ে যাবে। অতঃপর যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যাবে, তখন পুনরায় তাকে হজ্জ করতে হবে।’

৪. আযাদ বা স্বাধীন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয। গোলাম বা দাস-দাসীর ওপর হজ্জ ফরয নয়। ইব্ন ‘আব্বাস (রা) বলেন,

أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى.^{২৮}

–‘কোনো দাস যদি হজ্জ করে এবং মুক্ত হয়, তাহলে তাকে আরেকটি হজ্জ করতে হবে।’

৫. হজ্জ পালনে দৈহিক ক্ষমতা ও আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয। হজ্জ গমনে ও হজ্জ পালন শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা থাকা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.^{২৯}

–‘মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, তাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহে হজ্জ করা অবশ্যই কর্তব্য।’

৬. হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য এর ইল্ম থাকা আবশ্যিক। যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে তার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করছে। এরূপ ব্যক্তির হজ্জ ফরয হওয়ার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকুক অথবা না থাকুক উভয় অবস্থায় তার উপর হজ্জ ফরয হবে।
৭. হজ্জের সময় হওয়া। হজ্জের মাস হলো শাওয়াল, যিলকদ এবং যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন।^{৩০} হজ্জের সময় আসার আগেই যদি কারও মধ্যে হজ্জের শর্তাবলী পাওয়া যায় তবে তার উপর হজ্জ ফরয হবে না। সুতরাং কেউ যদি হজ্জের মৌসুম আসার পূর্বে যাবতীয় টাকা কোনো কাজে খরচ করে ফেলে তার উপর হজ্জ ফরয হবে না। কিন্তু টাকা না থাকলে আর হজ্জ করতে হবে না। এ মনোভাব নিয়ে টাকা খরচ করে ফেলা মাকরুহ।^{৩১}

হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত থাকা আবশ্যিক। যথা: শারীরিক সুস্থতা, রাস্তা নিরাপদ হওয়া, কারাবন্দী না হওয়া, মহিলাদের জন্য স্বামী বা অন্য কোন মাহরাম পুরুষ সাথে থাকা, মহিলাদের ‘ইন্দত পালনের অবস্থা হতে মুক্ত হওয়া। শেষোক্ত দুটি শর্ত মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য।^{৩২}

১. শারীরিকভাবে সুস্থ হওয়া আবশ্যিক। অসুস্থ ও পীড়িত, বিকৃত মস্তিষ্ক, পক্ষাঘাতগ্রস্থ অথবা খোঁড়া বা অন্ধ ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয নয়।
২. হজ্জ যাত্রা পথ নিরাপদ হওয়া। অর্থাৎ হজ্জ গমনে কোনোরূপ বাধা বিপত্তি অথবা প্রতিবন্ধকতা না থাকা। প্রতিবন্ধকতার উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যেমন, রাষ্ট্রীয় সরকার হজ্জ পালনের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে কোটা নির্ধারিত করে দিল এবং অনুমতিপ্রাপ্তদের তালিকায় তার নাম না থাকলে অথবা হজ্জ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রয়েছে; কিন্তু সে এর বিনিময়ে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো না। এরূপ ক্ষেত্রে হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হবে না।
৩. কারাবন্দী না হওয়া। যদি কেউ কারাবন্দী থাকে অথবা শাসনকর্তা যদি কাউকে হজ্জ আদায় করার ব্যাপারে বাঁধা প্রদান করে তবে তার উপর হজ্জ ওয়াজিব নয়।
৪. মহিলাদের জন্য স্বামী বা অন্য কোনো মাহরাম পুরুষ সাথে থাকা আবশ্যিক। যদি কোনো মহিলার স্বামী না থাকে অথবা স্বামী থাকলেও সে যদি স্ত্রীর সাথে হজ্জ যেতে রাজী না হয়, এমনিভাবে তার যদি কোনো মাহরাম ব্যক্তিও না থাকে অথবা মাহরাম পুরুষ আছে কিন্তু ঐ মহিলার সাথে হজ্জ যেতে রাজী না হয় তবে উক্ত মহিলার উপর হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

৫. মহিলাদের ‘ইদত পালনের অবস্থা হতে মুক্ত হওয়া। মহিলাদের উপর হজ্জ আদায় করা তখনই ওয়াজিব হবে যখন তারা ‘ইদত পালনের অবস্থা হতে মুক্ত থাকবে। এ ‘ইদত স্বামীর মৃত্যুর কারণে হোক অথবা তালাকের কারণে হোক না কেন।’^{৩৩}

হজ্জ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ

হজ্জ আদায় বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ হলো, ইহ্রাম বাঁধা, নির্দিষ্ট সময় হওয়া, নির্দিষ্ট স্থানে হজ্জের কাজ সম্পন্ন করা, ভালো মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা থাকা, মুসলমান হওয়া, কোনো ওয়র না থাকলে হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা, স্ত্রী সহবাস না করা, ইহ্রাম বাঁধার পর আরাফাতে অবস্থান করা।^{৩৪}

১. মুসলমান হওয়া। প্রত্যেক আমল বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত হলো ইসলাম।
২. ইহ্রাম বাঁধা। বিনা ইহ্রামে হজ্জ আদায় করা হলে তা বিশুদ্ধ হবে না।
৩. নির্দিষ্ট সময়ে হজ্জ করা। অর্থাৎ হজ্জের নির্ধারিত মাসে হজ্জের কাজসমূহ আদায় করা।
৪. হজ্জের প্রত্যেকটি কাজ নির্দিষ্ট স্থানে সম্পন্ন করা। অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান, তাওয়াফ-মসজিদে হারামে তাওয়াফ, হারামের সীমানার মধ্যে কুরবানী করা এবং মিনায় কংকর নিক্ষেপ করা। সুতরাং কেউ যদি হজ্জের কোনো রুক্ন বা ওয়াজিব অথবা সুন্নাত শরী‘আত কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে আদায় না করে অন্যত্র আদায় করে তবে তার হজ্জ বিশুদ্ধ হবে না।
৫. ভালো মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা থাকা।
৬. জ্ঞানবান হওয়া। পাগলের উপর হজ্জ ফরয নয়।
৭. হজ্জের যাবতীয় কাজ চাই তা শর্ত অথবা রুক্ন অথবা ওয়াজিব যাই হোক না কেন তা নিজেই আদায় করা। অবশ্য ওয়রবশত কোনো কোনো কাজ অন্যকে দিয়ে করানো বৈধ।
৮. ইহ্রাম বাঁধার পর আরাফাতের ময়দানে অবস্থান পর্ব সমাপ্ত করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস না করা।
৯. যে বছর ইহ্রাম বাঁধবে ঐ বছরই হজ্জ সম্পন্ন করা।

কোন ব্যক্তির উপর এবং কখন হজ্জ ফরয হয়

যখন কোনো ব্যক্তি উপরিউক্ত শর্তাবলী পূরণ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হবেন তখন তার উপর তাৎক্ষণিকভাবে হজ্জ পালন করা ফরয। ইমাম আবু হানীফাহ (র), ইমাম মালিক (র) এবং ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথেই সামর্থবান ব্যক্তির ওপর হজ্জ আদায় করা ফরয।^{৩৫} হজ্জ আদায়ে বিলম্ব করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرَضُ الْمَرِيضُ وَتَصِلُ الصَّلَاةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ.^{৩৬}

‘যে ব্যক্তি হজ্জ করার সংকল্প করেছে সে যেন তা অবিলম্বে আদায় করে। কারণ মানুষ কখনো অসুস্থ হয়ে পড়ে, কখনো তার প্রয়োজনীয় জিনিস বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কখনো অপরিহার্য কোন প্রয়োজন তার সামনে এসে যায়।’

ইমাম শাফিঈ (র), মুহাম্মাদ (র), ছাওরী (র) ও আওয়া‘ঈ (র) প্রমুখের মতে হজ্জ ফরয হলে তাৎক্ষণিকভাবে আদায় না করে বিলম্বে করা গুনাহের কাজ। বস্তুত হজ্জ ফরয হবার পর প্রথম সুযোগেই পালন না করে বরং বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত উহাকে বিলম্বিত করা প্রকৃতই অতি নিন্দনীয় কার্য; কারণ কখন কার মৃত্যু হবে তা কেউ বলতে পারে না। যদি হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তাবলী কারও পক্ষে পালন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মাত্র এক বছরও অতিবাহিত হয় এবং সে সময়ের মধ্যে হজ্জ পালন না করে যদি সে মারা

যায় অথবা চির রুগ্ন হয়ে পড়ে, তবে সে ব্যক্তি একটি ফরয হজ্জ পালন তরক করার কারণে গুনাহ্গার হবে।^{৩৭}

হজ্জ ফরয হওয়ার পর কোনো ব্যক্তি যদি তা আদায় করার পূর্বে মারা যায় তবে তার পক্ষ থেকে উক্ত হজ্জ আদায়ের ব্যবস্থা করা ওয়ারিশগণের ওপর ওয়াজিব হয়ে যাবে।^{৩৮}

হজ্জ ফরয হওয়ার দলীল

হজ্জ একটি ফরয ইবাদত। এর ফরয হওয়া কুর'আন, সুন্নাহ ও ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ.^{৩৯}

-‘মানুষের মধ্যে যারা মক্কা পর্যন্ত যেতে সক্ষম, আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাবা গৃহের হজ্জ করা তাদের অবশ্য কর্তব্য। কেউ এটিকে প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।’

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيَنَّ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.^{৪০}

-‘এবং মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা করে দাও। তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উল্লসমূহের পিঠে, তারা আসবে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।’

হজ্জ ফরয হওয়া সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এ হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর হজ্জ ফরয। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন,

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلْتُ عَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَكِنَّا اسْتَطَعْتُمْ.^{৪১}

-‘হে লোকজন! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। অতএব তোমরা হজ্জ করো’। এক ব্যক্তি বলল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রতি বছর?’ তিনি নীরব থাকলেন। সে তিনবার এ কথা জিজ্ঞাসা করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ‘আমি ‘হ্যাঁ’ বললে তা (প্রতি বছরের জন্য) বাধ্যতামূলক হয়ে যেত। অথচ (তা পালনে) তোমরা সক্ষম হতে না।’

ইবন ‘উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.^{৪২}

-‘ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য দান, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখা।’

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

أَعْبُوا رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ وَأَذُوا أَمْوَالَكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ.^{৪৩}

-‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমাদের মালের যাকাত আদায় করবে তাহলেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।’

হজ্জ ফরয হওয়ার ব্যাপারে উম্মাতের মধ্যে ইজমা’ সংঘটিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আল-কাসানী (র) বলেন,

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَلَا يُلْزَمُ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى فُرْيَضَتِهِ.^{৪৪}

-‘হজ্জ ফরয হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহের ইজমা’ তথা ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে।’

হজ্জের ফরয

হজ্জের ফরয তিনটি। যথা,

১. ইহ্রাম বাঁধার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে হজ্জের নিয়্যাত করা। ইসলামী শরী‘আতে হজ্জের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয হলো মীকাত থেকে ইহ্রাম বাঁধা।
২. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাত ময়দানে অবস্থান (উকূফ) করা। যিলহজ্জের নয় তারিখে সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোনো সময়ে সামান্য মুহূর্তের জন্য হলেও আরাফাত ময়দানে উকূফ তথা অবস্থান করা হজ্জের ফরযের অন্তর্ভুক্ত।^{৪৫}
৩. তাওয়াফে যিয়ারত। ১০ যিলহজ্জের ভোর থেকে ১২ যিলহজ্জ পর্যন্ত যে কোনো দিন কা‘বা শরীফ তাওয়াফ করা।^{৪৬}

এই তিনটি ফরযের কোনো একটি যদি ছুটে যায় বা বাদ পড়ে তাহলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। কোনো কিছু দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ করাও সম্ভব হবে না। এজন্য পরবর্তী বছরে এরূপ ব্যক্তির ওপর হজ্জের কাযা আদায় করা ফরয হয়ে যাবে।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

১. মুযদালিফায় অবস্থান করা। হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হলো কুরবানীর দিন রাত থেকে ফজর পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা।
২. রমী বা শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করা। ১০ যিলহজ্জ মিনায় জামারায় আকাবায় (বড় জামরায়) ৭টি কংকর নিক্ষেপ করা। ১১, ১২ তারিখে ২১টি করে কংকর নিক্ষেপ করা। ১৩ তারিখ মিনায় অবস্থান করলে উক্ত দিনে ২১টি কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব।
৩. মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাঁটা। রমী করার পর মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করা।
৪. সাফা মারওয়ার মধ্যে সাতবার সা‘ঈ বা প্রদক্ষিণ করা।
৫. কিরান বা তামাভূ‘ হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তির জন্য শোকর আদায় স্বরূপ কুরবানী করা।
৬. মক্কার বাইরের লোকদের জন্য তাওয়াফে সদর বা বিদায়ী তাওয়াফ করা।^{৪৭}

এগুলোর কোনো একটি ছুটে গেলে হজ্জ আদায় হয়ে যাবে তবে দম দিতে হবে। অর্থাৎ কাফ্ফারা স্বরূপ কুরবানী দিতে হবে। এছাড়া হজ্জের অন্যান্য কার্যাবলীসমূহ সুন্নাত, মুস্তাহাব বা হজ্জের আদব পর্যায়ে মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে।

হজ্জের সুন্নাতসমূহ

হজ্জ আদায়কালে ফরয ও ওয়াজিবের ন্যায় কিছু সুন্নাত বিষয়ও রয়েছে। যা পালন করা প্রত্যেক হজ্জ পালনকারীর জন্য প্রয়োজনীয়। নিচে সেগুলো বর্ণনা করা হলো,

১. মক্কার বাহির থেকে আগমনকারী হাজীদের তাওয়াফে কুদূম (আগমনি তাওয়াফ) করা, যা তামাত্তু' হজ্জকারীদের জন্য 'উমরা হিসেবে গণ্য হবে।
২. তাওয়াফে কুদূমে রমল করা।
৩. ইমামের জন্য তিন স্থানে খোতবা প্রদান করা। ৭ যিলহজ্জ মক্কা, ৯ যিলহজ্জ আরাফাতে ও ১১ যিলহজ্জ মিনায়।
৪. ৮ যিলহজ্জ দিবাগত রাত মিনায় অবস্থান করা।
৫. ৯ যিলহজ্জ সকাল বেলা আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।
৬. আরাফাতে গোসল করা।
৭. আরাফাতের ময়দান থেকে ইমামের রওয়ানা হওয়ার পরে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।
৮. মুযদালিফায় রাত যাপন করা ও কুরবানীর দিনগুলোর রাতে মিনায় অবস্থান করা।
৯. তিন জামরাতে কংকর নিক্ষেপের সময় তারতীব-ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।
১০. মিনা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনকালে 'মুহাস্সাব' নামক স্থানে অল্প সময়ের জন্য হলেও যাত্রা বিরতি করা।^{৪৮}

হজ্জ-এর প্রকারভেদ

হজ্জ তিন প্রকার। যথা: আল-ইফরাদ, আত্-তামাত্তু' ও আল-কিরান।

১. আল-ইফরাদ (الإفراد): ইফরাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ একাকী কাজ করা। পরিভাষায় হজ্জের মাসে মীকাত হতে শুধু মাত্র হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে হজ্জের কার্য সামাধান করাকে হজ্জে ইফরাদ বলে।^{৪৯}
২. আত্-তামাত্তু' (التَّمَتُّع): তামাত্তু' শব্দের আভিধানিক অর্থ উপকৃত হওয়া বা উপভোগ করা। পরিভাষায় মীকাত থেকে প্রথমে 'উমরার নিয়্যাত করে 'উমরার কাজ সমাপ্ত করা। অতঃপর হালাল হওয়ার পর পুনরায় যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখে হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে হজ্জের কাজ করাকে হজ্জে তামাত্তু' বলে।^{৫০}
৩. আল-কিরান (القران): কিরান শব্দের আভিধানিক অর্থ একত্রিত করা। পরিভাষায় মীকাত হতে হজ্জ ও 'উমরা উভয়ের জন্য ইহ্রাম বেঁধে মাঝখানে হালাল হওয়া ব্যতীত উভয় কাজ সামাধা করাকে হজ্জে কিরান বলে।^{৫১}

হজ্জে কিরান সর্বোত্তম। কেননা এতে এক ইহ্রামে দীর্ঘদিন থাকতে হয় বলে কষ্ট বেশি হয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিদায় হজ্জ কিরান হজ্জই ছিল। কিন্তু আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে হজ্জ করার জন্য গমন করি তারা হজ্জে তামাত্তু' করে থাকি। কারণ আমরা একাধিকবার 'উমরা পালন করি। আর এ জন্য ইহ্রাম খোলার প্রয়োজন হয়।

হজ্জের কার্যাবলী

হজ্জ একটি স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমধর্মী ইবাদত। হজ্জ আদায়ের জন্য ব্যক্তিকে কতিপয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হয়। হজ্জের কার্যাবলীসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

ইহ্রাম বাঁধা

ইহ্রাম অর্থ নিষিদ্ধ করা, কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা, নিষিদ্ধ মাসে প্রবেশ করা ইত্যাদি। পরিভাষায় ইহ্রাম হলো হজ্জের নিয়্যাতে নির্দিষ্ট কাপড় পরিধান করা।^{৫২} অন্যভাবে বলা যায়, হাজী যখন ইহ্রাম বেঁধে হজ্জ অথবা ‘উমরা অথবা উভয়টি আদায় করার নিয়্যাতে তালবিয়া পড়ে তখন তার উপর কতিপয় হালাল এবং মুবাহ্ কাজও ইহ্রামের কারণে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এজন্যই একে ইহ্রাম বলা হয়। ইহ্রাম অবস্থায় হাজীগণ যে চাদর ব্যবহার করে একেও রূপক অর্থে ইহ্রাম বলে। যিনি ইহ্রাম বাঁধেন তাকে মুহর্রিম বলা হয়।

ইহ্রামের উদ্দেশ্য হলো হজ্জের নিয়্যাতে নির্দিষ্ট স্থান থেকে এক ধরনের বিশেষ পোশাক (সেলাই বিহীন লুঙ্গী ও চাদর) পরে নগ্ন মস্তকে সুগন্ধি অলংকার ইত্যাদি না পরে, স্ত্রী সঙ্কোচ ও কামভেজনার বশবর্তী না হয়ে, পার্থিবতাকে পরাভূত করে একাত্ম চিন্তে নিজেকে আল্লাহর দাসে পরিণত করে, ‘লাক্বাইক’ ধ্বনি দিয়ে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া।^{৫৩}

ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করা সুন্নাত। যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন,^{৫৪} أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِأَهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. ‘তিনি নবী (সা)-কে ইহ্রাম বাঁধার উদ্দেশ্যে (সেলাই করা) পোশাক খুলে ফেলতে ও গোসল করতে দেখেছেন।’ ইহ্রাম পরার পূর্বে শরীরে ও দাঁড়িতে সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত।

গোসল, উযু ও সুগন্ধি ব্যবহার করার পর পুরুষরা একখণ্ড সেলাইবিহীন সাদা কাপড় তহব্ব্ব হিসেবে এবং একখণ্ড অনুরূপ কাপড় চাদর হিসেবে পরিধান করবে। ইব্ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘নবী (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ চুল আঁচড়িয়ে, তেল মেখে, লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করে (হজ্জের উদ্দেশ্যে) মদীনা থেকে রওয়ানা দিতেন। তিনি কোনো প্রকার লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করতে নিষেধ করেননি। তবে শরীরে চামড়া রঞ্জিত হয়ে যেতে পারে এরূপ জাফরানী রংয়ের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। ইব্ন ‘উমার (রা) বলেন,

أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْحَرَمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيَّاتِ، وَلَا الْبِرَّانِسَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَبَسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الرُّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرُسُ، وَلَا تُتَّقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامَ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازِينَ.^{৫৫}

‘এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে ইহ্রাম অবস্থায় কোন্ ধরনের পোশাক পরিধান করার নির্দেশ দেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, জামা, পায়জামা, টুপি, পাগড়ী ও মোজা পরিধান করবে না। তবে কারো জুতা না থাকলে সে চামড়ার মোজা পরিধান করবে যা পায়ের গোছার নিচে থাকে। সে জাফরান রং এ রঞ্জিত কোনো পোশাক পরতে পারবে না। ইহ্রামধারী মহিলারা মুখ ঢাকবে না এবং হাতে মোজা পরিধান করবে না।’

মহিলারা যে কোনো ধরনের শালীন পোশাকে ইহ্রাম বাঁধতে পারবে। তবে কোনো পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণকারী কোনো রঙ্গিন বা সৌন্দর্য খচিত পোশাক পরতে পারবে না। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

الْمُحْرَمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ , أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلَا تَتَبَرَّعُ , وَلَا تَلْتَمِسُ وَتُسَدِّلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا
إِنْ شَاءَتْ.^{৫৬}

মুহরিম মহিলা ইচ্ছামত কাপড় পরিধান করতে পারে। তবে ওয়ারস ও জাফরান রং মিশ্রিত কাপড়, বোরকা, নেকাব পরিধান করবে না। তবে (পর পুরুষের সামনে) যে কোনো কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখবে।’ এক্ষেত্রে তারা অলঙ্কার, সাজ-সজ্জা প্রকাশ করবে না, হাত মোজা পরিধান করবে না, নিকাব দিবে না।’^{৫৭}

তালবিয়া পাঠ করা

হজ্জ পালনকালে তালবিয়া পাঠ করা হজ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। তালবিয়া দ্বারা হজ্জের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা উপলব্ধি বুঝা যায়। তালবিয়া হাজীদের হৃদয়-বীণায় ঈমানের সুমধুর বাৎকার তোলে, গোটা দেহে ছড়িয়ে দেয় রহানিয়াতের প্রবাহ। হজ্জের প্রতিটি রুকন আদায়ের জন্য কাফন সদৃশ শ্বেত শুভ্র ভূষণে ধুলি ধুসরিত ও বিবর্ণ মলিন বদনে হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ও উচ্ছাস নিয়ে একজন হাজী তার কণ্ঠে উচ্চারণ করেন,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.^{৫৮}

‘হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাযির হয়েছি, হাযির হয়েছি, হাযির হয়েছি। তোমার কোনো শরীক (অংশীদার) নেই। আমি তোমার দরবারে হাযির হয়েছি। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, নিয়ামতরাজি ও একচ্ছত্র রাজত্ব-কর্তৃত্ব তোমারই। তোমার কোনো শরীক নেই।’

ইবন ‘উমার (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) তালবিয়ার শেষে যোগ করতেন,

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.^{৫৯}

‘আমি হাযির, আমি হাযির, আমি ভাগ্যবান, সকল কল্যাণ তোমার হাতে। আমি হাযির, সব আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমার প্রতি। আমলও তোমার (সম্ভষ্টির) জন্য।’

তালবিয়া সশব্দে পড়তে হবে (তবে মহিলারা আন্তে আন্তে আওয়ায বিহীন পড়বে)। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

أَتَانِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِيَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ أَوْ قَالَ: بِالتَّلْبِيَةِ.^{৬০}

‘জিবরীল (আ) আমার নিকট এসে বলেন যে, আমি যেন আমার সাহাবীদেরকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের নির্দেশ দেই।’

ইহ্রাম বাঁধার সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ শুরু করে ১০ যিলহজ্জ জামরাতুল আকাবায় (প্রথম জামরায়) কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করতে হবে। ইবন ‘আব্বাস (রা) বলেন, ফাদল ইবন ‘আব্বাস (রা) বলেছেন,

كُنْتُ رَدَفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَلَمَّا رَمَى قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.^{৬১}

‘আমি একই জম্বুয়ানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে বসা ছিলাম। আমি তাঁকে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত অবিরত তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি কংকর নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত অবিরত তালবিয়া পাঠ করেন।’

তালবিয়ার শব্দগুলো রণ-সংগীতের মতো। রণ-সংগীতের দ্বারা যোদ্ধাগণ যেমন উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেন; হাজীগণও তদ্রূপ তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। আল্লাহর সমীপে নিজেকে নিবেদন করতে এবং তার আজ্ঞাবহ গোলাম হিসাবে তারই হুকুম পালনার্থে নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে অবস্থানে উদ্ভূত হন।^{৬২}

মক্কা থেকে মিনায়^{৬৩} গমন করা

৮ যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর হাজীগণ সকলেই মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবেন। হজ্জে তামাভু' আদায়কারীগণ মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়ার পূর্বে ইহ্রাম বেঁধে নিবেন। কিন্তু কিরান হজ্জ আদায়কারীকে নতুনভাবে ইহ্রাম বাঁধতে হবে না। মিনায় পৌঁছে সেখানে রাত যাপন করতে হবে। এরপর ফজর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে। এ দিনের ফজরের নামায ইসফার তথা আকাশ কিছুটা পরিষ্কার হওয়ার পর আদায় করা মুস্তাহাব। ৮ যিলহজ্জ দিবাগত রাতে মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত। মিনা ব্যতীত অন্য কোথাও রাত যাপন করা সুন্নাতের পরিপন্থী।^{৬৪}

আরাফার ময়দানে অবস্থান

মক্কার একটি স্থানের নাম আরাফাত। মুহাম্মাদ আশ-শাওকানী (র) বলেন, 'আরাফাত ঐ ভূখণ্ডের নাম যাকে **مَوْقِفُ** বা অবস্থানের স্থান বলা হয়।' ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্যরা বলেন, 'আরাফাত হলো মক্কার নিকটবর্তী একটি পাহাড়, এটি হাজীগণের অবস্থানস্থল, যা মক্কা থেকে বার মাইল বা বিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।'^{৬৫}

আরাফার ময়দানে উকুফ^{৬৬} বা অবস্থান হজ্জের অন্যতম রুক্ন বা বিধান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,^{৬৭} **الْحُجُّ عَرَفَةُ** - 'হজ্জ হলো আরাফাত।' ধীরস্থিরতার সাথে সকল আদব রক্ষা করে আরাফা ময়দানে অবস্থান করা বাঞ্ছনীয়। জীবনের সকল পাপ-পঙ্কিলতার কথা স্মরণ করে রাক্বুল আলামীনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সেখানে মাসনূন দু'আ পাঠ করা উত্তম। এ ময়দানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মুনাজাত কবুল করে থাকেন।^{৬৮}

মিনার সীমার মধ্যে ফজরের নামায পড়ে তালবিয়া ও তাকবীর পড়তে পড়তে আরাফার ময়দানে রওয়ানা দিতে হবে। কিন্তু বর্তমানে হাজীদের সংখ্যাধিক্য ও যানজটের কারণে হাজীগণ মিনা থেকে রাত থাকতেই যাত্রা শুরু করেন। ৯ যিলহজ্জ দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে হয়। আনাস (রা) বলেন,

عَدُّوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ مَنِيٍّ، إِلَى عَرَفَةَ، فَمِنَّا مَنْ يَكْبُرُ، وَمِنَّا مَنْ يُهْلُ، فَلَمْ يَعْْبْ هَذَا عَلَى هَذَا، وَلَا هَذَا عَلَى هَذَا وَرُبَّمَا قَالَ: هُوَلَاءِ عَلَى هُوَلَاءِ، وَلَا هُوَلَاءِ عَلَى هُوَلَاءِ.^{৬৯}

- 'আমরা এই দিন (৯ যিলহজ্জ) ভোরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মিনা থেকে আরাফায় রওয়ানা হলাম। আমাদের কতক তাকবীর ধ্বনি করেন এবং কতক তালবিয়া পাঠ করেন। এজন্য তাদের কেউ একে অপরকে দোষারোপ করেননি।'

আরাফার ময়দানের নির্ধারিত তাঁবুতে পৌঁছে উযু-গোসল করে দু'আ, দুরূদ, আল-কুর'আন তিলাওয়াত, যিক্রের নিয়োজিত হওয়া সুন্নাত তরীকাহ। কারণ আরাফার ময়দান দু'আ কবুলের স্থান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرْفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَذْنُو، ثُمَّ يَبْأِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، وَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟^{৯০}

-‘এমন কোনো দিন নেই যে দিন, মহামহিম আল্লাহ্ আরাফার দিন অপেক্ষা অধিক সংখ্যক নিজ বান্দাদের দোষখ থেকে মুক্তিদান করেন। মহামহিম আল্লাহ্ (বান্দাদের) অধিক নিকটবর্তী হন, অতঃপর ফেরেশতাদের নিকট গৌরব প্রকাশ করে বলেন, এরা কী চায়?’

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আরাফাতের দিনের দু‘আই উত্তম দু‘আ। আমি ও আমার পূর্বের নবীগণ যা বলেছে তাই উত্তম দু‘আ। দু‘আটি এই,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.^{৯১}

-‘আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নাই, রাজত্ব-কর্তৃত্ব তাঁরই এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।’

আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরাফাতের দিন আরাফাতে অবস্থানকালে দুপুরের পর বেশি পরিমাণে নিম্নোক্ত দু‘আ পড়তেন,

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، وَإِلَيْكَ مَآبِي، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَاسَةِ الصُّدُورِ وَشَتَاتِ الْأُمْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَجِيءُ بِهِ الرَّيْحُ.^{৯২}

-‘হে আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা তোমার যেভাবে তুমি বলেছ এবং আমরা যা বর্ণনা করি তার চেয়েও অধিক উত্তম। হে আল্লাহ্! আমার নামায, আমার ইবাদত (হজ্জ ও কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মৃত্যু তোমার জন্য। অবশেষে তোমার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন এবং আমার স্বত্ব তোমার মালিকানাভুক্ত। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আযাব, অন্তরের কুচিন্তা ও কাজ-কর্মের অস্থিরতা থেকে। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই বায়ু বাহিত অনিষ্ট থেকেও।’

- خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرْفَةَ.^{৯৩} আল্লাহ্ (সা) বলেন, ‘শ্রেষ্ঠ দু‘আ হলো আরাফার দিবসের দু‘আ।’ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করে তাওবা-ইস্তিগফার, যিক্র, তাসবীহ-তাহলীলসহ আল্লাহ্র নিকটে হৃদয়-মন ঢেলে দু‘আ করাটাই হলো উত্তম কাজ। এ দিবসে আল্লাহ্র নিকট দুহাত তুলে দীর্ঘক্ষণ মুনাজাত করা উত্তম।

আরাফার ময়দানে যুহর ও আসর নামায একসাথে আদায়

যুহর ও আসরের নামায এক আযানে দুই ইকামতে যুহরের প্রথম ওয়ায্তে দুই রাকআত করে দুই ওয়ায্তের নামায কসর করে চার রাকআত নামায আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বিদায় হজ্জে এই নিয়মেই আরাফার ময়দানে দুই ওয়ায্তের নামায আদায় করেছিলেন। এটি সফরের কসরের নামায নয়; বরং হজ্জ সংশ্লিষ্ট কসরের নামায এবং এটি এই নিয়মেই পড়া সূনাত। হাদীসে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي الصَّلَاةَ لَوْفَتِهَا إِلَّا بِجُمُعٍ وَعَرَفَاتٍ.^{৯৪}

-‘আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরাফাত ও মুযদালিফা ব্যতীত নামাযকে তার ওয়ায্তের মধ্যে পড়তেন।’

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে,

حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَجَّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.^{৭৫}

‘অবশেষে যুহরের নামাযের ওয়াক্ত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) সকাল সকাল অগ্রসর হয়ে যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়েন।’

সমগ্র আরাফার ময়দানই অবস্থানস্থল। রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জে আরাফার ‘নামিরা’ নামক মাঠে অবস্থান করেছিলেন। বর্তমানে এখানে ‘মসজিদ নামিরা’ নামে একটি বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। সম্ভব হলে এখানে অবস্থান করা উচিত।

আরাফার ময়দানে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত দু’আ-দুরূদ, তাওবা-ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) ইত্যাদিতে মশগুল থাকতে হবে। সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে আরাফার ময়দান থেকে ধীর-স্থিরভাবে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতে হবে। রাস্তায় চলার সময় তাকবীর, তাহলীল, তালবিয়া ও অন্যান্য দু’আ-দুরূদ পাঠ করা অব্যাহত রাখতে হবে। যদি ভিড়ের কারণে সূর্যাস্ত এবং ইমামের রওয়ানা করার পরও কেউ আরাফার ময়দানে বিলম্ব করে তাহলে এতে কোনো ক্ষতি নেই। পায়ে হেঁটে আরাফা থেকে মুযদালিফায় গমন করা মুস্তাহাব।

আরাফার ময়দানে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের অবস্থান ও একই ইমামের অনুসরণ করার দৃশ্য হাশরের ময়দানে সকলের উপস্থিতি হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এতে ব্যক্তি নিজের মনকে আল্লাহর প্রতি নিমগ্ন ও সম্পূর্ণ বিনম্র রেখে করুণা প্রাপ্ত লোকদের দলভুক্ত হয়ে পুনরুত্থান দিবসের দিন পরিত্রাণ পাওয়ার দৃঢ় আশা করে। কারণ সকল লৌকিকতা ও পার্থিবতা পরিহার করে তাদের দৃষ্টি তখন শুধু আল্লাহর রহমতের অন্বেষণে আকাশের দিকে নিবদ্ধ থাকে। আল্লাহর সমুপস্থিতি অর্জন তথা জান্নাত লাভের যোগ্য হওয়ার এক মহান প্রয়াস চালানো হয় এখানে। এজন্য আরাফাতের ময়দানের গুরুত্ব এত অধিক।

হজ্জের মওসুমে আরাফার ময়দানে এ অবস্থান নানা দিক দিয়ে অনেক কল্যাণ ও উপকারিতা বয়ে আনে। আরাফাতের ময়দানে সকল হাজীর ৯ যিলহজ্জ অবস্থান করা বাধ্যতামূলক, তথায় ইমামুল হারামাইনের নেতৃত্বে যুহর ও আসরের নামায এক সাথে আদায় করা; বার্ষিক সম্মেলনে মুসলিম বিশ্বের প্রধান নেতার ঐতিহাসিক ভাষণ শ্রবণ, স্রষ্টার দাস হিসেবে নিবেদিত হয়ে তার ক্ষমা, অনুকম্পা, অনুগ্রহ প্রার্থনা প্রকৃত অর্থে হজ্জকে বিশ্ব মুসলমানের বার্ষিক সম্মেলনে পরিণত করে। ফলে শয়তান ও খোদাদ্রোহী শক্তি অতীব দুর্বল হয়ে পড়ে। বিপরীত দিকে মুসলমানগণ আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহের জন্য অধিক যোগ্য হয়ে যায়। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিদায় হজ্জে ঘটেছিল। যার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় আদি পিতা আদম (আ) ও ইবরাহীম (আ)-এর জীবনেও। ‘আইশা (রা) বর্ণনা করেন, ‘আরাফার দিনের চেয়ে অন্য কোনো দিন আল্লাহ তাঁর এত অধিক সংখ্যক বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন না।’

মুযদালিফায়^{৭৬} অবস্থান

আরাফাত ময়দান থেকে রওয়ানা দিয়ে মুযদালিফায় না পৌঁছা পর্যন্ত হাজীগণ মাগরিব ও এশার নামায আদায় করবেন না। মুযদালিফায় পৌঁছে এক ইকামতে প্রথমে মাগরিবের নামায তিন রাকআত পড়তে হবে, অতঃপর এশার নামায দুই রাকআত আদায় করতে হবে। মুযদালিফায় এই দুই নামায একসাথে পড়া ওয়াজিব। নামায আদায় করার পর এখানে সুবহে সাদিক পর্যন্ত অবস্থান করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। মুযদালিফায় অবস্থানকালে দু’আ, দুরূদ, যিক্র-আযকার, কুরআন তিলাওয়াত ও নফল নামায আদায় করা মুস্তাহাব। এটিও দু’আ কবুলের স্থান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا أَقْسَمْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ.^{৭৭}

-‘তোমরা আরাফা থেকে মাশআরুল হারামের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে আল্লাহর যিক্র করো। তিনি যেভাবে তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে আল্লাহর যিক্র করো।’

মুযদালিফায় উকুফ তথা অবস্থান করা ওয়াজিব। সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময় হলো মুযদালিফায় অবস্থানের সময়। এ সময়ে এখানে উপস্থিত না থাকলে ‘দম’ দিতে হবে। তবে ওয়র থাকলে ভিন্ন কথা। সমগ্র মুযদালিফাই অবস্থান করার উপযুক্ত স্থান। তবে মুহাস্সার নামক উপত্যকা ব্যতীত। জাবের ইব্ন মুত’ঈম (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন,^{৭৮} -

‘সমগ্র মুযদালিফাই অবস্থানের যোগ্য স্থান। তবে মুহাস্সার থেকে দ্রুত পার হয়ে যাও।’

মুযদালিফায় অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম ‘মাশআরুল হারাম’। এটি বকরতম স্থান হওয়ায় এখানে অবস্থান করা উত্তম। আলী (রা) বর্ণনা করেছেন,

فَلَمَّا أَصْبَحَ يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَّفَ عَلَى فُزَحٍ فَقَالَ: هَذَا فُزَحٌ وَهُوَ الْمُؤَقِفُ، وَجَمَعَ كُلُّهَا مُؤَقِفٌ.

-‘যখন কুযাহু^{৭৯} নবী (সা)-এর ভোর হলো, তখন তিনি কুযাহু থেকে এলেন এবং সেখানে অবস্থান করলেন। তিনি বললেন, ‘সমগ্র কুযাহু অবস্থানের যোগ্য এবং সমগ্র কুযাহু অবস্থানের যোগ্য।’

অন্ধকার ফর্সা হলে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে এবং হাজীগণ পশ্চিমধ্যে তালবিয়া, তাক্বীর ও দু’আ-দুরুদ পড়তে থাকবেন।

কংকর সংগ্রহ

মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায আদায় করার পর সেখান থেকে বুট, সিম বা খেজুরের বিচির ন্যায় ৪৯টি বা ৭০টি কংকর সংগ্রহ করা মুস্তাহাব। ইব্ন ‘উমার (রা) মুযদালিফা থেকে কংকর সংগ্রহ করতেন। সা’ঈদ ইব্ন যুবার (র) অনুকরণ করতেন এবং বলতেন, মুযদালিফা থেকেই এগুলো সংগ্রহ করা হতো। ইব্ন ‘আব্বাস (রা) বলেন,

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: هَاتِ، الْقُطْ لِي. فَلَقَطْتُ لَهُ حَصِيَّاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمَّا وَضَعْنَهُنَّ فِي يَدِهِ، قَالَ: بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعُلُوُّ فِي الدِّينِ.^{৮০}

-‘রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, ‘আমাকে দাও, আমার জন্য পাথর কুড়াও।’ তখন আমি তার জন্য শিমের বিচির মতো ছোট ছোট পাথর কুড়িয়ে আনলাম। পাথরগুলো যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে দিলাম, তখন তিনি বললেন, এ রকম ছোট পাথরই তো চাই। সাবধান, তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে।’

বর্তমানে সৌদী সরকার কর্তৃক পুরো মুযদালিফায় কালো পাথর ছোট ছোট আকারে ভেঙ্গে বিছিয়ে রাখা হয়। যাতে হাজীগণকে কষ্ট করে পাথর খোঁজার জন্য সময় নষ্ট করতে না হয়। ১০ মিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পর সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে হাজীগণ অত্যন্ত শান্তভাবে ও গাভীর সাথে মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে।

কংকর নিষ্ক্ষেপ

১০ যিলহজ্জ থেকে ১২ যিলহজ্জ পর্যন্ত তিন দিন মিনায় শয়তানকে উদ্দেশ্য করে রমী^{৮১} বা কংকর নিষ্ক্ষেপ করতে হয়। হজ্জের আবশ্যকীয় বিধানাবলীর মধ্যে এটি অন্যতম। এটি পরিত্যাগ করলে দম প্রদান করা ওয়াজিব হবে।^{৮২} জাবের (রা) বলেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: لِنَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَذْرِي لَعَلِّي لَا أُحْجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ.^{৮৩}

-‘আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি নিজের উটের ওপর বসে ইয়াওমুন নাহরে (১০ যিলহজ্জ তারিখ) কংকর নিষ্ক্ষেপ করেছেন এবং বলেছেন, ‘তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের ইবাদতের পদ্ধতি শিখে নাও। কেননা আমি জানি না, এই হজ্জের পর আমি আর হজ্জ করতে পারব কি না।’ মিনায় প্রবেশের পর প্রথমে কংকর নিষ্ক্ষেপ করা মুস্তাহাব। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি শাহাদাত অঙ্গুলির তৃতীয় পিঠে স্থাপন করে বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের উপর কংকর রেখে তা নিষ্ক্ষেপ করা মুস্তাহাব।^{৮৪} জাবের (রা) বলেন,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَرْمِيَ الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ^{৮৫}

-‘রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জে আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন আঙ্গুল দিয়ে ছোড়া যায় এমন ছোট ছোট কংকর নিষ্ক্ষেপ করি।’

ক্ষুদ্র আকৃতির কংকর বা নুড়ি পাথর নিষ্ক্ষেপ করা মুস্তাহাব। বড় আকারের পাথর নিষ্ক্ষেপ করলে অধিকাংশ আলিমের মতে, ‘ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে, তবে মাকরুহ হবে।’ নবী (সা) বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا يَفْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَأَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.^{৮৬}

-‘হে জনগণ! তোমরা বড় কংকর নিষ্ক্ষেপ করে একে অপরকে হত্যা করো না। আর তোমরা যখন কংকর নিষ্ক্ষেপ করবে, তখন অবশ্যই ছোট ছোট কংকর নিষ্ক্ষেপ করবে।’

জামরায়^{৮৭} কংকর নিষ্ক্ষেপ করা মুসলিম মিল্লাতের স্মৃতিবাহী নিদর্শন। ১০ যিলহজ্জ সূর্যোদয় থেকে দুপুর পর্যন্ত কংকর নিষ্ক্ষেপ করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দিনে দুপুরের পূর্বেই কংকর নিষ্ক্ষেপ করেছেন। ইব্ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদের নিকট গিয়ে বললেন,

لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.^{৮৮}

-‘সূর্যোদয়ের পর ব্যতীত জামরায় কংকর নিষ্ক্ষেপ করো না।’

তবে ওয়র বশত দিনের শেষভাগ বা সন্ধ্যা পর্যন্ত কংকর নিষ্ক্ষেপ করা বৈধ। ইব্ন ‘আব্দুল বার (র) বলেন, ‘আলিমগণের মতে, যে ব্যক্তি ১০ যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে কংকর নিষ্ক্ষেপ করবে, তার কংকর নিষ্ক্ষেপ বৈধ হবে। অবশ্য এটি মুস্তাহাব নয়।’ ইব্ন ‘আব্বাস (রা) বলেছেন, মিনায় ১০ যিলহজ্জ তারিখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হতো। এক ব্যক্তি বললো, ‘আমি সন্ধ্যার পর কংকর নিষ্ক্ষেপ করেছি। তিনি বললেন, لَا حَرَجَ - ‘কোনো ক্ষতি নেই।’^{৮৯}

যদি কোনো ওয়রের কারণে দিনের বেলা কংকর নিষ্ক্ষেপ করা সম্ভব না হয়, তখন রাতেও কংকর নিষ্ক্ষেপ করা বৈধ। মালিক (র) নাফে’ (র) থেকে বর্ণনা করেন। ইব্ন ‘উমার (রা)-এর স্ত্রী সুফিয়ান এক মেয়ের

মুযদালিফায় নেফাস শুরু হলো। ফলে সেই মেয়ে ও সুফিয়া মুযদালিফায় থেকে গেলেন এবং ১০ যিলহজ্জের সূর্যাস্তের পর মিনায় পৌঁছলেন। ইব্ন ‘উমার (রা) তাদেরকে আদেশ দিলেন কংকর নিষ্ক্ষেপ করতে। তিনি তাদেরকে কোনো কাফ্ফারা দিতে বলেননি। তবে ওয়র না থাকলে বিলম্বিত করা মাকরুহ। রাতে নিষ্ক্ষেপ করলে হানাতী, শাফিঈ ও মালিকী মাযহাবের রিওয়াযাত অনুযায়ী দম দেয়া লাগবে না।^{৯০}

১. জামরায়ে উলা (প্রথম জামরা অথবা জামরায়ে আকাবা। এটি মিনায় প্রবেশের পর সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয়)।

২. জামরাতুল উস্তা (মধ্যবর্তী জামরা। এটি প্রথমটির পরে ১১’৬৭ মিটার দূরে অবস্থিত)।

৩. জামরাতুস সুগরা (এটি দ্বিতীয়টি থেকে ১৫’৬০ মিটার দূরে অবস্থিত)।

উপর্যুক্ত তিনটি জামরার মধ্যে প্রথম দিন ১০ যিলহজ্জ শুধুমাত্র জামরায়ে উলায় (জামরাতুল আকাবা অথবা জামরাতুল কুবরা) ৭টি কংকর নিষ্ক্ষেপ করতে হবে। কংকর নিষ্ক্ষেপ করার সাথে সাথেই তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে। কংকর নিষ্ক্ষেপের সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বলে প্রতিটি কংকর নিষ্ক্ষেপ করবেন। কংকর নিষ্ক্ষেপের সময় নিম্ন ভূমিতে এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যেন মিনা ডান দিকে আর কা’বা বাম দিকে থাকে। এরপর তাকবীর বলে এক একটি কংকর নিষ্ক্ষেপ করতে হবে। এ সময় নিম্নের দু’আটি পড়া উত্তম।

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضَى لِلرَّحْمَانِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَسَعْيًا مَشْكُورًا.^{৯১}

তাকবীরের পরিবর্তে সুবহানাল্লাহু অথবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইত্যাদি বলাও জাযিয। এ দিন জামরাতুল উস্তা এবং জামরাতুস সুগরায় কংকর নিষ্ক্ষেপ করবে না।

জাবের ইব্ন ‘আদিল্লাহু (রা) বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رِاحَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.^{৯২}

-‘আমি রাসূলুল্লাহু (সা)-কে ১০ যিলহজ্জ তারিখে দ্বি-প্রহরের সময় তাঁর বাহনের উপর সাওয়ার অবস্থায় কংকর নিষ্ক্ষেপ করতে দেখেছি। আর ১০ যিলহজ্জের পরে তিনি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর কংকর নিষ্ক্ষেপ করতেন।’

কংকর নিষ্ক্ষেপের পর কেবলামুখি হয়ে অবস্থান করা, আল্লাহর নিকট দু’আ করা, আল্লাহর প্রশংসা করা এবং নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, দেশের জন্য এবং সকল মু’মিন ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাওয়া মুস্তাহাব। ইব্ন মাস’উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا انْتَهَى إِلَى الْجُمُرَةِ الْكُبْرَى، جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى الْجُمُرَةَ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.^{৯৩}

-‘তিনি (ইব্ন মাস’উদ) যখন জামরাতুল কুবরা শেষ করতেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহকে তাঁর বাম দিকে, মিনাকে তাঁর ডানদিকে রেখে সাতটি কংকর নিষ্ক্ষেপ করতেন। অতঃপর তিনি বলতেন, যার উপর সূরা আল-বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহু (সা)] তিনি এরূপে কংকর নিষ্ক্ষেপ করতেন।’

কংকর নিষ্ক্ষেপের পর কুরবানী করবে। অতঃপর মাথার চুল মুগুন করবে অথবা ছোট করবে। এরপর হারাম শরীফে তাওয়াফে করতে হবে। এ তাওয়াফে রমল করতে হবে না, ইদতিবাও করতে হবে না। তাওয়াফ শেষে সাফা-মারওয়া সা’ঈ করতে হবে। তাওয়াফ ও সা’ঈ শেষে মিনায় প্রত্যাবর্তন করে ১২ যিলহজ্জ পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে।

১১ যিলহজ্জ জামরায় গমন করে প্রথম জামরা (জামরায় উলা), দ্বিতীয় জামরা (জামরায় উসতা) ও তৃতীয় জামরায় (জামরায় আকাবা) ৭টি করে দ্বিতীয় দিনে ৭x৩= ২১টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।

১২ যিলহজ্জ অনুরূপভাবে জামরায় গমন করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জামরায় ৭x৩= ২১টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। প্রথম দিন ৭টি, দ্বিতীয় দিন ২১টি ও তৃতীয় দিন ২১টি সর্বমোট ৪৯টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন কংকর নিক্ষেপের উত্তম সময় হলো সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। ইবন আব্বাস (রা) বলেন,^{৯৪} - **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمَارَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ**। ‘রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্য হেলে পড়ার সময় অথবা তার পরে কংকর নিক্ষেপ করেছেন।’ কংকর নিক্ষেপকে কেউ যদি রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করে, তবে তা মাকরুহ। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ‘তৃতীয় দিন সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করার অনুমতি আছে।’ ইবন ‘আব্বাস (রা) বলেন,^{৯৫} **إِذَا انْفَخَ النَّهَارُ مِنْ** - **يَوْمِ النَّفَرِ الْآخِرِ، حُلُّ الرِّمِيِّ، وَالصَّدْرِ**। থেকে বিদায় হওয়া জায়েয।’

১২ যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করে সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করে মক্কা মুআযযমায় চলে আসা বৈধ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى.^{৯৬}

-‘তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে (১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্জ) আল্লাহকে স্মরণ করো। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে (১১+১২ যিলহজ্জ) আসে তবে তার কোনো পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে (১৩ যিলহজ্জ) তবে তারও কোনো পাপ নেই। এটা তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে।’ যদি কেউ ১৩ যিলহজ্জ মিনায় অবস্থান করে তাহলে পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে তিনটি জামরায় ৭টি করে ২১টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। এই হিসাবে সর্বমোট ৭০টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। এরপর মিনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে আসতে হবে।

হাদী বা কুরবানীর মাস‘আলা

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে হাজীগণ কুরবানী বা দমে শোকর আদায়ের নিয়্যাতে যে সব পশু হারামে নিজেদের সাথে নিয়ে যান শরী‘আতের পরিভাষায় এগুলোকে ‘হাদী’ বলা হয়। আস-সাইয়্যিদ সাবিক (র) বলেন,^{৯৭} **الهدى هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقرباً إلى الله عز وجل**। উদ্দেশ্যে কুরবানির জন্য হারামে হাদিয়ান্বরূপ যে পশু পৌছানো হয়, তাকে আল-হাদয়ু বা হাদী বলা হয়।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى.^{৯৮}

-‘উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন বানিয়েছি। এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো অবস্থায় তাদের উপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। তারপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায়, তখন তোমরা তা থেকে কিছু নিজেরা খাও এবং কিছু খাওয়াও

দরিদ্রজনকে এবং যে অভাবগ্রস্থ ব্যক্তি চায় তাকেও খাওয়াও। আমি এভাবেই এই পশুগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি যেন তোমরা শোক্র করো। আল্লাহ্র কাছে এগুলোর গোশ্বতও পৌঁছে না, রক্তও পৌঁছে না। তাঁর নিকটে পৌঁছে শুধু তোমার তাকওয়া।’

উট, গরু, ছাগল, দুধা ও ভেড়া হাদী হিসাবে গণ্য হয়। অন্য কোনো প্রকারের পশু হাদী হিসাবে গণ্য হবে না। এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হলো উট, এরপর গরু, এরপর ছাগল। কেননা উট আকারে সবচেয়ে বড় হওয়ায় তা দরিদ্রদের জন্য অধিকতর লাভজনক। অনুরূপভাবে ছাগল ও ভেড়ার চেয়ে গরু বেশি লাভজনক। এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি উটে সাত ভাগের এক ভাগ, গরুর সাত ভাগের এক ভাগ ও ছাগল এক ব্যক্তির জন্য হাদী হিসাবে কুরবানী করা যায়।

হারাম শরীফের উদ্দেশ্যে উক্ত তিন প্রকারের মধ্য থেকে যে কোনো পশু হাদীয়া পাঠানো যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) একশটি উট নফল হাদীয়া হিসেবে কুরবানী করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। ন্যূনতম পক্ষ একজনের পক্ষ থেকে যে হাদীয়া পাঠানো যায় তা হচ্ছে একটি ছাগল, একটি উটের সাত ভাগের একভাগ কিংবা একটি গরুর সাত ভাগের এক ভাগ। কেননা উট বা গরু সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী দেয়া যায়। জাবির (রা) বলেছেন,

حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَرَّنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. ১৯৯

‘আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে হজ্জ করেছিলাম। তখন আমরা সাতজনের পক্ষ থেকে উট এবং সাতজনের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেছিলাম।’

যে সব পশু কুরবানী করা জায়েয সেগুলো হাদী হিসাবে নিয়ে যাওয়াও জায়েয। আর যে সব পশুর কুরবানী জায়েয নেই তা হাদী হিসাবে নিয়ে যাওয়াও জায়েয নেই। জানাবাতের অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করলে অথবা আরাফায় উকূফের পরে তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে অথবা স্ত্রী সহবাস করলে এই দুই ক্ষেত্রে উট বা গরু দিয়ে দম আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ছাগল বা দুধা দিয়ে দম আদায় হবে না, অন্যান্য ক্ষেত্রে ছাগল বা দুধা দিয়ে দম আদায় করা যাবে। আস্-সাইয়িদ সাবিক (র) বলেন,

ولا تجب البدنة إلا إذا طاف للزيارة جنباً، أو حائضاً، أو نفساء، أو جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق، أو نذر بدنة أو جزوراً، ومن لم يحد بدنة فعليه أن يشتري سبع شياه. ২০০

‘একমাত্র বীর্যপাতজনিত অপবিত্রতাসহ বা হায়েয ও নেফাসসহ তাওয়াফে যিয়ারত করলে, আরাফাতে অবস্থানের পর ও চুল কামানোর পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে অথবা উট কুরবানীর মানত করলেই উট হাদীয়া পাঠানো ওয়াজিব হবে। উট না পাওয়া গেলে সাতটি ছাগল হাদী দিতে হবে।’

ইবন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বলল,

إِنَّ عَلِيَّ بَدَنَةً، وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا، وَلَا أَجِدُهَا، فَأَشْتَرِيهَا فَأَمْرُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَ، سَبْعَ شِيَاهٍ، فَيَذِيحُهَا. ২০১

‘আমার একটি উট কুরবানীর দায় রয়েছে। উট কেনার ক্ষমতাও আমার রয়েছে। কিন্তু কেনার জন্য উট পাচ্ছি না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে আদেশ দিলেন যেন সাতটি ছাগল কিনে কুরবানী দেয়।’

সাধারণত আল্লাহর নামে যিলহজ্জের ১০, ১১ ও ১২ তারিখে শরী‘আত অনুমোদিত জন্ত যবেহ করাকেই কুরবানী বলে। কুরবানীর ইতিহাস সুপ্রাচীন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ٥٥

-‘আমি প্রত্যেক উন্মাতের জন্য কুরবানীর প্রথা অব্যাহত রেখেছি, যাতে তারা আমার দেয়া চতুষ্পদ জন্তুর উপর আমার নাম নেয়।’

হাদী বা কুরবানীর পশু চাই ওয়াজিব হোক বা নফল হোক, হারাম শরীফের বাইরে কোথাও যবাই করা যাবে না। হারাম শরীফের যে কোনো স্থানে যবাই করা যাবে। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

وَكُلُّ مَنِي مَنَحَرٍّ، وَكُلُّ الْمَزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ. ٥٠٩

–‘সমগ্র মিনা কুরবানীর স্থান এবং সমগ্র মুয়দালিফা অবস্থানের স্থান। মক্কার সকল অলি-গলি ও পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথ এবং চলাচলের পথও কুরবানীর স্থান।’

কুরবানীর পশুর গোশত থেকে খাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.^{٥٠٨}

-‘তা থেকে তোমরা খাও এবং দুস্থ দরিদ্রকে খাওয়াও।’

এ আদেশ স্পষ্টই ওয়াজিব ও নফল উভয় প্রকারের কুরবানীকেই অস্বর্ভুক্ত করে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তামাত্ত্ব ও কিরান হজ্জের কুরবানীর গোশ্ত খাওয়া জায়েয। এছাড়া অন্য কোনো ধরনের কুরবানীর গোশ্ত খাওয়া কুরবানী দাতার জন্য বৈধ নয়।

সরকারী ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী ও দম আদায় করাও জায়েয আছে। তবে কুরবানীর আগে ও পরে যেহেতু আরো অন্যান্য আমল রয়েছে এবং এসব আমলের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যেহেতু ওয়াজিব। তাই কখন কুরবানী করা হবে সে সময়টি জেনে নেওয়া খুবই জরুরী। অন্যথায় আমলের ধারাবাহিকতার জন্য নিজ দায়িত্বে তা আদায় করাই উত্তম।

মাথার চুল মুণ্ডন করা বা ছাঁটা

কুরবানী সমাপ্ত করার পর হাজীগণ মাথার চুল মুণ্ডন করবেন অথবা ছাঁটিয়ে খাটো করে নিবেন। এ বিধান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِالْحَقِّ لِنُدْخُلَ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ. ٥٥

–‘অবশ্যই আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্নটি যথাযথভাবে সত্যে পরিণত করে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহ চাহে তো নিরাপদে, তোমাদের মাথা মুগ্ধ করে এবং চুল ছেঁটে নির্ভয়ে মসজিদুল হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে।’

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُخَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُخَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُخَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُخَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، قَالَ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ: وَالْمُقَصِّرِينَ. ١٥٦

-‘আব্দুল্লাহ ইব্ন ‘উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ‘আল্লাহ মাথা মুগুনকারীদের উপর রহমত করেন।’ লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! যারা চুল কেটেছে, তাদের উপরও?’ রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ‘আল্লাহ মাথা মুগুনকারীদের উপর রহমত করেন।’ লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! যারা চুল কেটেছে, তাদের উপরও?’ তিনি বললেন, আল্লাহ মাথা মুগুনকারীদের উপর রহমত করেন। লোকেরা পুনরায় বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! যারা চুল কেটেছে, তাদের উপরও?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, যারা চুল কেটেছে, তাদের উপরও আল্লাহ রহমত করেন।’^{১০৭}

মাথা মুগুন হলো ময়লা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর। পক্ষান্তরে চুল ছাঁটার মধ্যে কিছুটা দ্রুতি রয়েছে। সুতরাং তা (ছাঁটার তুলনায় মুগুন করা) উযর তুলনায় গোসলের সদৃশ হলো। হলকের ক্ষেত্রে মাথার চার ভাগের এক ভাগই যথেষ্ট হবে।^{১০৮}

চুল ছাঁটার নিয়ম হলো চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুল পরিমাণ ছেটে ফেলা। এরপর তার জন্য স্ত্রী সহবাস ছাড়া সব কিছু হালাল হয়ে যায়। ইমাম মালিক (র) বলেন, ‘তবে খুশবু ছাড়া। কেননা তা সহবাসের প্রতি আকর্ষণকারী।’ হানাফীদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বানী,^{১০৯} حَلَّ لَهٗ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّسَاءَ. ‘স্ত্রী সহবাস ছাড়া আর সব কিছু তার জন্য হালাল হয়ে গেছে।’

মাথা মুগুন বা চুল ছাঁটার সময় ১০ যিলহজ্জের সুবহে সাদিকের পর থেকে শুরু হয় এবং ১২ যিলহজ্জের সূর্যাস্ত পর্যন্ত বহাল থাকে। উক্ত সময়ের মধ্যে হলক বা কসর করা ওয়াজিব। জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পরে এবং যার উপর কুরবানী ওয়াজিব সে কুরবানীর পরে হলক বা কসর সম্পাদন করবে। অন্যথায় দম ওয়াজিব হবে। আইয়্যামে নহরের প্রথম দিনে হলক বা কসর সম্পাদন করা উত্তম।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন, কুরবানী করার পর মাথা মুগুন করবে অথবা চুল ছাঁটবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,^{১১০} ‘আমাদের আজকের দিনে প্রথম কাজ হলো রামী করা, তারপর কুরবানী করা, তারপর মাথা মুগুন করা।’

এছাড়া মাথা মুগুন করা হলো হালাল হওয়ার (অর্থাৎ ইহ্রাম থেকে মুক্ত হওয়ার) অন্যতম উপায়। তদপ যবেহ করাও একটি উপায়। তাইতো অবরুদ্ধ ব্যক্তি ‘যাব্হ’-এর মাধ্যমে হালাল হয়ে যায়। সুতরাং কংকর নিক্ষেপকে উভয়ের উপর অগ্রবর্তী করা হবে। আর মাথা মুগুন করা হলো ইহ্রামের নিষিদ্ধ কার্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কুরবানীকে তার উপর অগ্রবর্তী করা হবে। মহিলারা কেবলমাত্র চুল খাটো করবে। রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাদের মাথা মুগুন করতে নিষেধ করেছেন।^{১১১} চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুল ছোট করতে হবে। ইব্ন ‘আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْخُلُقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ.^{১১২}

-‘স্ত্রী লোকদের জন্য মস্তক মুগুনের প্রয়োজন নেই, বরং তারা চুল (এক আঙ্গুল পরিমাণ চুল) কর্তন করবে।’

কা’বা গৃহ তাওয়াফ করা

কা’বা গৃহের হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে সেখান থেকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে চতুর্পার্শ্বে সাতবার প্রদক্ষিণ করার নামই তাওয়াফ। এটি হজ্জের অন্যতম বিধান। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.^{৪৬}

-‘সেই সময়কে স্মরণ কর যখন কা’বা গৃহকে মানবজাতির মিলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তা স্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়বার স্থানকেই নামাযের স্থান রূপে গ্রহণ কর এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম।’

আরাফা, মিনা ও মুযদালিফায় অবস্থান, মিনায় কংকর নিক্ষেপ এবং মাথা মুগুন বা চুল ছাঁটার পর মক্কায় এসে কা’বা গৃহ তাওয়াফ করাকে তাওয়াফে ইফাযা বা তাওয়াফে যিয়ারত বলা হয়। এটি হজ্জের অন্যতম রুকন তথা অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোনো হাজী যদি এটি করতে ব্যর্থ হয়। তার হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,^{১১০} ‘وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ’- ‘তারা যেন প্রাচীন গৃহটি তাওয়াফ করে।’ এ তাওয়াফকে তাওয়াফে ইফাযাহ্ বলা হয়।^{১১১} ইবন কাছীর (র) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ করেছেন যে, যখন তিনি ঈদের দিন মিনাতে আসতেন, তখন প্রথম জামরায় সাতটি পাথর নিক্ষেপ করতেন। এরপর কুরবানী করতেন, এরপর মাথা মুগুন করতেন। শেষে আল্লাহর ঘর কা’বা তাওয়াফ করতেন।’^{১১২}

তাওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে নামাযের মতো দুহাত উঁচু করে ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ ও ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বলবে। ভিড়ের কারণে হাজরে আসওয়াদ চুমু দেয়া বা স্পর্শ করা সম্ভবপর না হলে ইশারা করার মাধ্যমে তাওয়াফ শুরু করতে হবে। প্রত্যেক চক্রের সময় হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে পুনরায় ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ বলে হাত উত্তোলন করে হাতে চুমু দিয়ে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে হবে। ইবন ‘আব্বাস (রা) বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجَرِ: وَاللَّهِ لَيُبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يُنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّهِ.^{১১৩}

-‘রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর কসম! কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে উঠাবেন, তখন তার দুটি চোখ থাকবে, যা দ্বারা তা দেখবে এবং তার একটি জিহ্বা হবে, যা দ্বারা তা কথা বলবে এবং যে তাকে ঈমানের সাথে চুম্বন করেছে তার জন্য সাক্ষ্য দিবে।’

ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, ‘এজন্য নির্দিষ্টভাবে নিয়্যাত করা জরুরী।’ ইমাম আবু হানীফা, শাফি‘ঈ ও মালিক (র)-এর মতে, ‘হজ্জের নিয়্যাতই এর ওপর বলবৎ থাকবে। হাজীর পক্ষ থেকে এটি বিশুদ্ধ ও যথেষ্ট হবে-যদিও সে সুনির্দিষ্টভাবে এই তাওয়াফের নিয়্যাত না করে।’ অধিকাংশ আলিমের মতে, ‘এর সাতটি চক্র সব কটিই ফরয ও রুকন।’ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে,^{১১৪} ‘أَنَّ رُكْنَ الْحَجِّ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْوَاطٍ لَوْ تَرَكَهَا’- ‘সাতটি থেকে চারটি চক্র হজ্জের রুকন। এ চারটি বাদ দিলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে।

অবশিষ্ট তিন চক্র রুকন নয়; কিন্তু ওয়াজিব।’ কেউ এই তিনটি বা তার কোনো একটি তরক করলে বা বাদ দিলে সে ওয়াজিব তরককারী হবে। তার হজ্জ বাতিল হবে না। তবে তাকে দম দিতে হবে।’

এই তাওয়াফের ফযীলত অপরিসীম। ‘আব্দুল্লাহ্ ইবন ‘উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ، كَانَ كَعَتَقِ رَقَبَةٍ.^{১১৫}

-‘যে ব্যক্তি কা’বা গৃহ তাওয়াফ করল এবং দুই রাকআত নামায আদায় করল, সে একজন গোলাম আযাদ করল।’ অপর বর্ণনায় আছে,^{১১৬} ‘مَنْ طَافَ سَبْعًا، فَهُوَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ’- ‘যে ব্যক্তি সাতটি তাওয়াফ করল, সে যেন একটি দাস মুক্ত করল।’

অপর হাদীসে আছে,^{১২০} ‘যে ব্যক্তি তাওয়াফের সময় যতবার পা উঠাবে বা নামাবে, ততবার আল্লাহ্ একটি গুনাহ ক্ষমা করবেন।’ ইব্ন ‘আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,^{১২১} مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ. ‘যে ব্যক্তি পঞ্চাশ বার বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে সে তার মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে।’ তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করলে তার সকল গুনাহ্ ঝরে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,^{১২২} إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا. ‘এই কোণদ্বয় স্পর্শ করলে সকল গুনাহ্ ঝরে যায়।’

তাওয়াফের সময়

ইমাম শাফি‘ঈ ও আহমদ (র)-এর মতে, ‘এই তাওয়াফের সময় শুরু হয় ১০ যিলহজ্জ দিবাগত মধ্য রাত থেকে এবং এর শেষ সময় নির্ধারিত নেই। তবে এই তাওয়াফ না করা পর্যন্ত সহবাস হালাল হবে না। আইয়ামে তাশরীক থেকে একে বিলম্বিত করলে কোনো দম ওয়াজিব হবে না। তবে মাকরুহ হবে; ১০ যিলহজ্জের পূর্বাহ্ন এ তাওয়াফের জন্য সর্বোত্তম সময়। ইমাম আবু হানীফা (র) ও মালেক (র)-এর মতে, ‘১০ যিলহজ্জের ফজর থেকেই এর সময় শুরু হয়। কিন্তু এর শেষ সময় নিয়ে মতভেদ রয়েছে।’ আবু হানীফা (র)-এর মতে, ‘কুরবানির দিনগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো দিন এটি সম্পন্ন করা ওয়াজিব। এ দিনগুলোর পরে করলে দম দিতে হবে।’ মালেক (র)-এর মতে, ‘আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত একে বিলম্বিত করাতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে ত্বরান্বিত করা উত্তম। এর সময় যিলহজ্জ মাসের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপরও যদি কোনো ব্যক্তির আরো বিলম্বিত হয়, তবে দম দিতে হবে; কিন্তু হজ্জ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা সমগ্র যিলহজ্জ মাস তার মতে হজ্জের মাস।’^{১২৩}

মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকআত নামায

কা‘বা গৃহ তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকআত নামায পড়তে হবে। অবশ্য ভিড়ের কারণে অনেক সময় মাকামে ইবরাহীমের বরাবর নামায পড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন একটু দূরে সরে গিয়ে মসজিদুল হারামের সুবিধাজনক যে কোনো স্থানে এই নামায পড়লেও হবে। আলিমগণের কেউ কেউ এ নামাযকে ওয়াজিব বলেছেন। আবার কারো কারো মতে তা নফল। ‘আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন ‘উমর (রা) বলেছেন,

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.^{১২৪}

-‘রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায এলেন এবং সাতবার কা‘বার তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকআত নামায আদায় করলেন এবং সাফার দিকে বের হলেন। আর বললেন, ‘তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।’

এই নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পড়া উত্তম। জাবের ইব্ন ‘আব্দিল্লাহ্ (রা) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَى إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ قَرَأَ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة: ১২৫] فَصَلُّوا رُكْعَتَيْنِ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ عَادَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا. ১২৫

-‘রাসূলুল্লাহ্ মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে তিলাওয়াত করলেন, এবং দুই রাকআত নামায আদায় করেন। তিনি সূরা ফাতিহা, সূরা কাফিরুন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করেন। পরে আবার হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তাকে চুম্বন করেন। তারপর সাফা পাহাড়ের দিকে যান।’

যম্যম^{১২৬}-এর পানি পান

মাকামে ইবরাহীমে দুই রাকআত নামায শেষ করে যম্যমের পানি পান করা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যম্যমের পানি পান করার পর বললেন, ১২৭, ‘إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامٌ طُعِمَ وَشَفَاءٌ سُقِيَ.’ এটি বরকতময়, তৃপ্তিদায়ক ও রোগ নিরাময়কারী।’ জিবরাঈল (আ) মি‘রাজের রাতে এই পানি দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হৃদয় ধুয়ে দিয়েছিলেন। ইবন ‘আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ১২৮, ‘خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ’ পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম পানি হচ্ছে যম্যমের পানি। এতে রয়েছে খাদ্যের স্বাদ ও রোগ নিরাময়।’ মুজাহিদ (র) বলেন, ‘যম্যমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয় সে উদ্দেশ্যে সফল হয়। আপনি যদি রোগ থেকে আরোগ্য লাভের নিয়্যাতে তা পান করেন, তাহলে আল্লাহ্ আপনার পানি থেকে আরোগ্য দান করবেন। তৃষ্ণায় আপনি তা পান করলে তিনি আপনার পিপাসা নিবারণ করবেন। ক্ষুধায় আপনি তা পান করলে আল্লাহ্ আপনার ক্ষুধা নিবারণ করবেন। এটি হলো জিবরাঈল (আ)-এর পায়ের গোড়ালির আঘাতে উৎসারিত পানি এবং ইসমাঈল (আ)-এর তৃষ্ণা নিবারণকারী পানীয়।’ ১২৯, ‘مَاءٌ زَمْزَمٌ، لِمَا شَرِبَ لَهُ’-যম্যমের পানি জাবের ইবন ‘আদিল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ১৩০, ‘مَاءٌ زَمْزَمٌ، لِمَا شَرِبَ لَهُ’-যম্যমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে তা পূর্ণ হবে।’

যম্যমের পানি পানের নিয়ম

যম্যমের পানি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে এক নিঃশ্বাসে পান করা এবং পেট পুরে পান করা সুন্নাত। পান করার পর ‘আল-হামদুলিল্লাহ্’ বলতে হবে। ইবন ‘আব্বাস (রা) বলেন, ১৩১, ‘سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمٍ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.’ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যম্যমের পানি পেশ করলাম। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন।’ আবু মুলায়কা (র) বলেন, এক ব্যক্তি ইবন ‘আব্বাস (রা)-এর নিকট আগমন করলে, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোথা থেকে এলে?’ সে বলল, ‘যম্যমের পানি পান করে এলাম।’ তিনি বললেন, ‘যেভাবে যম্যমের পানি পান করা উচিত, সেভাবে পান করেছ তো?’ সে বলল, ‘কীভাবে?’ তিনি বললেন, ‘যখন যম্যমের পানি পান করতে চাইবে, তখন কিবলামুখী হবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিন নিঃশ্বাসে পেট ভরে পান করবে। তারপর আল্লাহর প্রশংসা করবে।’ কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ، إِنَّهُمْ لَا يَصْطَلُّونَ، مِنْ زَمْزَمٍ. ১৩২

-‘আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, তারা যম্যম থেকে পেট ভরে পানি পান করে না।’ ইবন ‘আব্বাস (রা) যম্যমের পানি পান করার সময় নিম্নোক্ত দু’আ পড়তেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.^{১৩০}

-‘হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি উপকারী জ্ঞানের, পর্যাপ্ত রিযিকের এবং যাবতীয় রোগ থেকে আরোগ্য লাভের।’

ইবনুল কাইয়্যেম (র) (মৃত ৭৫১ হি.) বলেন,

سَيِّدُ الْمِيَاهِ وَأَشْرَفُهَا وَأَجْلَهَا قَدْرًا وَأَحَبُّهَا إِلَى النَّفْسِ وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا.^{১৩১}

-‘যম্মের পানি হচ্ছে পানির সরদার। এটি যেমন সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পানি, তেমনি তা মানুষের নিকট প্রিয়তর। এটি মানুষের নিকট সবচেয়ে মূল্যবান পানি।’

যম্মের পানি বহন করা উপহার প্রদান

রাসূলুল্লাহ (সা) হজ্জ ও ‘উমরা পালনকারীকে শুধু যম্মের পানি পান করার কথাই বলেননি; বরং এ পানি বহন করে নিয়ে আসা ও উপহার হিসেবে প্রদান করার কথাও বলেছেন। এই পানি বহু মূল্যবান ও রোগ নিরাময়কারী। তাই এই পানি সবচেয়ে মূল্যবান উপহার। হাজী সাহেবদের এর চেয়ে উত্তম উপহার আর কিছু নেই। ‘আইশা (রা) বলেন,

أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءٍ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُهُ.^{১৩২}

-‘তিনি (মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে) সাথে করে যম্মের পানি নিয়ে আসতেন। তিনি অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)ও সাথে করে যম্মের পানি আনতেন।’

সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা‘ঈ

সা‘ঈ শব্দের অর্থ দৌড়ানো। হজ্জ পালনকালে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যখানে বিশেষ পদ্ধতিতে সাতবার দৌড়ানোকে সা‘ঈ বলে। সাফা-মারওয়া পাহাড়ে সা‘ঈ করা সম্পর্কে আলিমগণের পক্ষ থেকে তিনটি মতামত পাওয়া যায়।

এক. সাহাবীগণের মধ্যে ইবন ‘উমর, জাবের ও ‘আইশা (রা) এবং ইমাম মালিক, শাফি‘ঈ (র) ও ইমাম আহমদ (র)-এর একটি মত অনুযায়ী সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা‘ঈ করা হজ্জের একটি রুক্ন তথা ফরয। কোনে হাজী এটি বাদ দিলে তার হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং কোনো কুরবানি বা দম দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ হবে না। এ মতের পক্ষে তাঁরা আল্লাহ তা‘আলার বাণী দলীল হিসেবে পেশ করেন,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا.^{১৩৩}

-‘নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ কা‘বা গৃহের হজ্জ অথবা ‘উমরা সম্পন্ন করে, এই দুটির মধ্যে সা‘ঈ করলে তার কোনো পাপ নেই।’

‘আইশা (রা) বলেছেন,^{১৩৪} قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوْفَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرَكَ الطَّوْفَ -‘রাসূলুল্লাহ (সা) সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে তাওয়াফ চালু করেছেন। কাজেই সাফা ও মারওয়ার মাঝের তাওয়াফ (সা‘ঈ) বর্জন করার অধিকার কারো নেই।’

‘আইশা (রা) থেকে অপর হাদীসে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,^{১৩৫} مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ -‘সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করবে না, আল্লাহ তার হজ্জ পূর্ণ করবেন না।’

উপর্যুক্ত হাদীস দুটি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হজ্জ ও ‘উমরা উভয়টিতেই বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফের সাথে সাথে সাফা ও মারওয়া সা’ঈ করা উভয়ের রুকন তথা অবিচ্ছেদ্য অংশ তথা অপরিহার্য কর্তব্য বা ফরয।

দুই. ইব্ন ‘আব্বাস (রা), আনাস (রা), ইব্ন যুবায়ের (রা), ইব্ন সিরীন (রা) ও ইমাম আহমাদ (রা)-এর একটি বর্ণনা অনুযায়ী সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সা’ঈ করা সুন্নাত। যদিও এটি সুন্নাত কিন্তু এটি তরক করলে কোনো ফিদইয়া বা কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব হবে না। তারা দলীল হিসেবে আল-কুর’আনের নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করেন,

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا.^{১৫৯}

‘এই দুটির (সাফা ও মারওয়া) মধ্যে সা’ঈ করলে তার কোনো পাপ নেই।’

কোনো কাজের কর্তাকে এ কথা বলা যে, ‘এই কাজ করলে আপত্তি নেই’ প্রমাণ করে যে, ঐ কাজ ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয়। সুতরাং এ দ্বারা কাজটি ‘মুবাহ’ অর্থাৎ করা ও বর্জন করা সমান। করলেও গুনাহ নেই, না করলেও গুনাহ নেই। তবে ‘সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন’ এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাজটি সুন্নাত। যেহেতু এটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ইবাদত, যা বায়তুল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তাই কংকর নিক্ষেপের ন্যায় এটি রুকনে পরিণত হয়নি।

তিন. ইমাম আবু হানীফা (রা), সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রা) ও হাসান (রা)-এর মতে ‘এটি ওয়াজিব, রুকন বা ফরয নয়। এটি তরক করলে হজ্জ বা ‘উমরা বাতিল হবে না। তবে তরক করলে ‘দম’ অর্থাৎ একটি ছাগল কুরবানী করতে হবে। ইব্ন কুদামাহ্ (রা) এ মতটিকে অগ্রগণ্য করেছেন। তিনি বলেন,

وَهُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ دَلِيلَ مَنْ أَوْجَبَهُ ذَلِكَ عَلَى مُطْلَقِ الْوُجُوبِ، لَا عَلَى كَوْنِهِ لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ.^{১৬০}

‘এটি অগ্রগণ্য। কেননা যিনি এটিকে ওয়াজিব বলে রায় দিয়েছেন, তার প্রদর্শিত প্রমাণ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, এটি শর্তযুক্ত ওয়াজিব। এমন ওয়াজিব নয় যে, এটি বাদ দিলে মূল দায়িত্ব পালিত হবে না।’

সাফা ও মারওয়া সা’ঈ করার নিয়ম

সাফা পাহাড় থেকে সা’ঈ শুরু করতে হয়। সাফার নিকটবর্তী হয়ে আল-কুর’আনুল কারীমের আয়াত পড়তে হবে,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا.^{১৬১}

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফা পাহাড়ের কাছাকাছি পৌছে উক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন। এরপর সাফা পাহাড়ে উঠে কা’বার দিকে দৃষ্টিপাত করে ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলে উভয় হাত উপরের দিকে কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে হবে। অতঃপর নিম্নোক্ত দু’আটি তিনবার পড়তে হবে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.^{১৬২}

‘আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নাই, রাজত্ব ও কর্তৃত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই। তিনি একক, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাভূত করেছেন।’

এরপর দূরুদ শরীফ পাঠ করে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে নিজের জন্য এবং সকল মু'মিন-মুসলমানের জন্য আল্লাহর নিকট মুনাজাত করতে হবে। এটিও দু'আ কবুলের স্থান। এছাড়াও যে কোনো দু'আ করাও বৈধ। এ স্থানে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'আ করতে হয়। এরপর যিক্র, দু'আ ও কুর'আন তিলাওয়াত করতে করতে স্বাভাবিক গতিতে পায়ে হেঁটে হেঁটে মারওয়ার দিকে সা'ঈ করতে হবে। একটু সামনে গেলে বাতনুল মাসীল (দুই সবুজ পিলারের মধ্যবর্তী স্থান) কিছুটা দৌড়ের ভঙ্গিতে অতিক্রম করতে হবে (মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে হাঁটবেন)। এরপর স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছবেন। মারওয়ায় পৌঁছলে এক সা'ঈ সম্পন্ন হয়ে যাবে। সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে এই দু'আটি পাঠ করবেন, رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ - 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো ও দয়া করো এবং আমাকে সর্বাপেক্ষা সঠিক পথে চালাও।' এছাড়া অন্য একটি দু'আও বর্ণিত আছে, رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ - 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো ও দয়া করো। তুমি পরম সম্মানিত ও মহৎ।'^{১৪০}

উপর্যুক্ত তাওয়াফ ও সা'ঈ হজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ তাওয়াফ ৮ যিলহজ্জের পূর্বে করলে আরাফাত, মিনা, মুযদালিফা, জামরায় কংকর নিষ্ক্ষেপের পর ১০ থেকে ১২ যিলহজ্জের মধ্যে শুধু কা'বা গৃহের তাওয়াফ করলে হজ্জ সম্পন্ন হয়ে যাবে। যারা পূর্বে তাওয়াফ করেননি তাদের জন্য ১০ থেকে ১২ যিলহজ্জের মধ্যে তাওয়াফ ও সা'ঈ করা আবশ্যকীয়। এর সাথে সাথে হজ্জের সকল কার্যাবলী সমাপ্ত হয়ে যাবে।

বিদায়ী তাওয়াফ

যে সব হজ্জ যাত্রী হজ্জের পূর্বেই মদীনায় গমন করেছেন অথবা পরে মদীনায় গমন করে সেখান থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন তাদের সকলকে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْفِرُونَ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.^{১৪১}

- 'লোকেরা (হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমনের পর তার হুকুম আহুকাম সমাপনান্তে তাওয়াফে যিয়ারতের পর) প্রত্যাবর্তন করত। তখন নবী (সা) বলেন, তোমাদের কেউ যেন শেষবারের মতো বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করে (মক্কা থেকে) বিদায় গ্রহণ না করে।'

'আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجْتُ مَعَهُ تَغْنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفَرِ الْآخِرِ فَتَزَلَ الْمُخَصَّبُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ بَشَّارٍ قِصَّةَ بَغْنِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، قَالَتْ: ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرٍ فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَارْتَحَلَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَطَافَ بِهِ جِئْنَ خَرَجَ، ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ.^{১৪২}

- 'আমি নবী (সা)-এর সাথে যিলহজ্জের তের তারিখে রওয়ানা হই। অতঃপর তিনি আল-মুহাস্সাব নামক স্থানে অবতরণ করেন। অতঃপর আমি আমার 'উমরা সম্পন্ন করে তার নিকট শেষ রাতে আগমন করি। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে গমনের জন্য প্রস্তুত হতে ঘোষণা দেন এবং তারা মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। অতঃপর তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে বায়তুল্লাহ গমন করেন এবং মদীনার দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। পরে তিনি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন।'

বিদায়ী তাওয়াফের পর সাফা ও মারওয়া সা'ঈ করতে হবে না। তাওয়াফ শেষে দুই রাক'আত নামায পড়তে হবে, পেট ভরে যমযমের পানি পান করবেন এবং বিদায় বেলায় কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহ তা'আলার নিকট মন খুলে দু'আ করবেন। যেন আল্লাহ শেষ বিচারের দিন এ হজ্জের বদৌলতে ক্ষমা করেন।

উপসংহার

ইসলামের কোনো বিধানই অনুষ্ঠান সর্বস্ব নয়; বরং ইসলামের বড় থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিটি বিধানের পশ্চাতে আল্লাহ তা'আলা অভিপ্রেত নিগুঢ় তত্ত্ব ও প্রভুত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। হজ্জ ইসলামের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এটি বুনিয়াদী ইবাদতের মধ্যে অন্যতম। হিজরতের নবম বর্ষে হজ্জ ফরয হয়। বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক, আযাদ মুসলিম ব্যক্তি যদি যাতায়াতের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হন এমন ব্যক্তির ওপর হজ্জ করা ফরয। হজ্জ মুসলমানগণের মহাসম্মেলন। পৃথিবীর ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম। হজ্জ হাজারো জাতি, বর্ণ, উচ্চ, নীচ, ভাষা-ভাষির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এক আল্লাহর রজ্জুতে মজবুত করে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় বেঁধে দেয়। যা মানব জাতির জন্য থেকে ইতিহাস হয়ে আছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত ইতিহাস হয়ে থাকবে। মুসলিম জাতির জন্য এ ইবাদতটি আল্লাহ তা'আলার নিজ দায়িত্বে যুগ যুগ ধরে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ করে রেখেছেন। তাই আজও প্রতিবছর হজ্জের সময় অতীতের মতো একই সুরে মক্কার আকাশ-বাতাস ও মরুভূমির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সেই একই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। প্রবন্ধটিতে হজ্জের বিধানাবলীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দলীল ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে হজ্জের পরিচয়, ফরয হওয়ার সন, সময়, ফরয হওয়ার শর্তসমূহ, ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ এবং বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ। কোন্ ব্যক্তির উপর কখন হজ্জ ফরয হয়, হজ্জ ফরয হওয়ার দলীল, প্রকারভেদ, ফরয, ওয়াজিবসমূহ, ইহ্রাম বাঁধা, তালবিয়া পাঠ করা, কা'বা গৃহের তাওয়াফ, মক্কা থেকে মিনায় গমন, আরাফা ময়দানে অবস্থান, মুযদালিফায় অবস্থান, কংকর সংগ্রহ ও নিক্ষেপ, হাদী বা কুরবানীর মাস'আলা, মাখার মুণ্ডন করা বা চুল ছাঁটা, কা'বা গৃহ তাওয়াফ করা, মাকামে ইবরাহীমের পিছনে নামায আদায় করা, যমযমের পানি পান, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা এবং বিদায়ী তাওয়াফ সম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-ফায়উমী, *আল-মিসবাহুল-মুনীর*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১২১; ড. মুহাম্মাদ রাওয়াস ও ড. হামিদ সাদিক, *মু'জামু লুগাতিল-ফুকাহা* (পাকিস্তান: ইদারাতুল কুর'আন, তা. বি.), পৃ. ১৭৪; ড. ইবরাহীম আনাস ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল-ওয়াসীত* (দিল্লী: কুতুব খানাহ হুসাইনিয়াহ, তা. বি.), পৃ. ১৫৬; Thomas Patrick Hughes, *Dictionary Of Islam* (Delhi: Rupa & Co, Fourth Ipression, 1999), P. 155.
- ^২ মুহাম্মাদ ইবন ই'য়াকুব আল-ফীরযাবাদী, *আল-কামুসুল মুহীত*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১৮২; মুহাম্মাদ ইবন 'আলী 'আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী (র) বলেন,

الْحَجُّ هُوَ بَفَتْحِ الْهَاءِ وَكَسْرِهَا لَفْعٌ : الْقَصْدُ إِلَى مُعْظَمِ لَا مُطْلَقُ الْقَصْدِ كَمَا ظَنَّهُ بَعْضُهُمْ.

- 'আল-হজ্জ শব্দটির 'হা' বর্ণে যবর ও যের যোগে পঠিত হয়। আভিধানিক অর্থ সম্মানিত কোনো স্থানের দিকে গমনের সংকল্প করা। সাধারণ কোন সংকল্প নয়, যেমন কেউ কেউ মনে করেন।'

দ্র. মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আলী ‘আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী, *দুররুল-মুখতার* (দিল্লী: নোওল কিশোর, তা. বি.), পৃ. ৯৩; যায়নুদ্দীন ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন নুজায়ম (র) বলেন,

الْحَجُّ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ : يَفْتَحُ الْحَاءِ وَكَسْرُهَا، وَيَهْمَا قَرِئَ فِي التَّنْزِيلِ الْقَصْدُ إِلَى مُعْظَمٍ لَا مُطْلَقُ الْقَصْدِ كَمَا ظَنَّهُ الشَّارِحُ وَجَعَلَهُ كَالْتَّيَمِّمْ.

দ্র. আল-বাহরর-রাইক ফী শারহি কানযুদ-দাকাইক, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়াইত-তুরাখিল ‘আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ৪৮১।

৩ হুসায়ন ইব্ন রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুর’আন* (মিসর: আল-মাকতাবাহ আত-তাওফীকিয়াহ, তা. বি.), পৃ. ১১৫।

৪ *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল-কুর’আন*, পৃ. ১১৫; মুহাম্মাদ ইবনুল-হাসান আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, ৪র্থ খণ্ড (মিসর: আল-হাজ্জ মুহাম্মাদ আফিনদী সাসী আল-মাগরাবী আত-তানসী, ১৩২৪ হি.), পৃ. ২; খলীল আহমাদ সাহরানপূরী, *বায়লুল-মাজহুদ*, ৮ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা. বি.), পৃ. ২৯৭; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল-কাদীর*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা. বি.), পৃ. ৪০৫; ইব্ন হাজার আল-‘আসকালানী (র) বলেন, *الْحَجُّ فِي اللُّغَةِ الْقَصْدُ*. ‘হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা।’

দ্র. ইব্ন হাজার আল-‘আসকালানী, *ফাতহুল-বারী*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়াইত-তুরাখিল ‘আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪০২ হিজরী), পৃ. ৪০৫; খলীল আহমাদ সাহরানপূরী (র) বলেন, *كَثُرَ الْقَصْدُ إِلَى مُعْظَمٍ* - ‘মহৎ কোনো স্থানে গমনের বেশি করে ইচ্ছা করা।’ দ্র. *ফাতহুল-বারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৫; আল-আযহারী বলেন, *الْحَجُّ الْقَصْدُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى* - ‘পরপর সংকল্প করাই হজ্জ।’

দ্র. ইউসুফ বিন-নূরী, *মা’আরিফুস-সুনান*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (করাচী: আল-মাকতাবাতু নুরিয়াহ, তা. বি.), পৃ. ৩; ‘আব্দুর রহমান আল-জাযাইরী (র) বলেন, *الْحَجُّ هُوَ لَفٌّ الْقَصْدُ إِلَى مُعْظَمٍ*. ‘হজ্জের আভিধানিক অর্থ সম্মানিত কোনো স্থানে গমনের ইচ্ছা করা।’

দ্র. *কিতাবুল-ফিকহ ‘আলা মাযাহিবিল ‘আরবাবাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৪; আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-ফাইয়ুমী (র) বলেন, *الْحَجُّ الْقَصْدُ لِلشَّكْلِ* - ‘হজ্জ বা ইবাদতের ইচ্ছা করা।’

দ্র. *আল-মিসবাহুল-মুনীর*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১।

৫ ইব্ন মানযুর আল-ইফরীকী, *লিসানুল ‘আরাব*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: মু’আসসাযাতু তারীখিল আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৫২।

৬ ‘উমদাতুল-কারী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২১।

৭ *ফাতহুল-বারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৫।

৮ ‘আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মাহমূদ আল-হানাবী, *কানযুদ-দাকাইক*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়াইত-তুরাখিল ‘আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ৪৮১; ইবনুল হুমাম (র) বলেন,

هُوَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ مَعَ الْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ

দ্র. *ফাতহুল-কাদীর*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫; ড. ওয়াহাবাতুয-মুহায়লী বলেন,

قَصْدُ الْكُتْبَةِ لِأَدَاءِ أَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ، أَوْ هُوَ زِيَارَةُ مَكَانٍ مَخْصُوصٍ فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ بِفِعْلِ مَخْصُوصٍ.

দ্র. *আল-ফিকহুল-ইসলামী ওয়া আদিব্বাতুহ*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল-ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২০৬৪-২০৬৫।

^৯ ইবন 'আবেদীন আশ্-শামী, *রাদ্দুল-মুখতার*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল-ফিকর, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ৪৫৪।

^{১০} *The World book Encyclopedia*, Vol. 9 (U. S. A: 1988), P.17.

^{১১} *ফাতহুল-বারী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৩; শাক্বীর আহমাদ ওসমানী (র) বলেন,

إِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي السَّنَةِ الَّتِي فُرِضَ فِيهَا الْحَجُّ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا سَنَةُ سِتٍّ.

দ্র. *ফাতহুল-মুলহিম*, ৩য় খণ্ড (করাচী: মাকতাবাতুল-হাজ্জায, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ২০২।

^{১২} *ফাতহুল-মুলহিম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০২; ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, 'নিশ্চয়ই পঞ্চম হিজরী সালে হজ্জ ফরয হয়।'

দ্র. মা' আরিফুস্-সুনান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩; 'আল্লামা রাফি'ঈ তাঁর কিতাবুল হজ্জ গ্রন্থে এ ব্যাপারে সুদৃঢ় অভিমত পোষণ করেছেন। আল-খামীস গ্রন্থকার এ মতকে বিস্তারিত বলে অভিমত পোষণ করেছেন।

দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাতে বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৫২৬।

^{১৩} মা' আরিফুস্-সুনান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩।

^{১৪} ইমাম নববী (র) বলেন, إِنَّهُ فُرِضَ سَنَةَ تِسْعٍ.

দ্র. মা' আরিফুস্-সুনান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩।

^{১৫} আল-মাওয়ারদী (র) বলেন, إِنَّهُ فُرِضَ سَنَةَ ثَمَانٍ.

দ্র. আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস্-সুলতানিয়াহ্*, পৃ. ১০২।

^{১৬} মূল 'আরবী ভাষা, فَرِيضَةُ الْحَجِّ كَانَتْ سَنَةَ تِسْعٍ أَوْ سَنَةَ خَمْسٍ أَوْ سَنَةَ سِتٍّ.

দ্র. *ফাতহুল-কাদীর*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৪।

^{১৭} সূরা আল-ইমরান: ৩: ৯৭।

^{১৮} *ফাতহুল-মুলহিম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০২; *আওজাযুল-মাসালিক ইলা মুওয়াত্তা ইমাম মালিক*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৬।

^{১৯} সূরা আল-বাকারাহ: ২: ১৯৬।

^{২০} ইউসুফ বিন-নূরী (র) বলেন,

فُرِضَ السَّنَةُ السَّادِسَةُ مِنَ الْهَجْرَةِ وَعَلَيْهِ الْجَمْعُورُ لِأَنَّهَا نَزَلَ فِيهَا قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ).

-'ষষ্ঠ হিজতে হজ্জ ফরয হয় জমহুর আলিমগণ এ মতই পোষণ করেন। কেননা এ হিজরতেই মহান আল্লাহর বাণী (তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও 'উমরাহ সম্পন্ন কর) আয়াত অবতীর্ণ হয়'।

দ্র. মা' আরিফুস্-সুনান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩।

^{২১} মা' আরিফুস্-সুনান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩।

^{২২} সূরা আল-বাকারাহ: ২: ১৯৭।

- ২৩ সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১০।
- ২৪ কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীরে মাযহারী, ১ম খণ্ড (পাকিস্তান: মাকতাবাতুর রাশীদিয়াহ, ১৪১২ হি.), পৃ. ২৩২।
- ২৫ কিতাবুল-ফিকহ ‘আলা মাযাহিবিল ‘আরবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৫-৫৯৬; আল-বাহরুর-রাইক ফী শারহি কানযুদ-দাকাইক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮২; ফাতহুল-কাদীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১০; ইবনুল ‘আবেদীন আশ্-শামী (র) বলেন,
- شُرُوطُ الْمُجُزَّبِ وَهِيَ الَّتِي إِذَا وَجَدْتُ بِتَمَامِهَا وَجِبَ الْحَجُّ وَإِلَّا فَلَا وَهِيَ سَبْعَةٌ: الْإِسْلَامُ، وَالْعِلْمُ بِالْمُجُزَّبِ لِمَنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْطَاعَةُ وَالْوُقُوفُ أَيْ الْقُدْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَيْ فِي وَقْتِ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهِ عَلَى مَا يَأْتِي.
- ‘হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত সাতটি। যথা: মুসলমান হওয়া দারুল হারবে অবস্থান কারীর জন্য হজ্জ ফরয হওয়ার জ্ঞান থাকা, জ্ঞানবান হওয়া, বালিগ হওয়া, আযাদ হওয়া, আর্থিক দিক থেকে হজ্জ পালনে সক্ষম হওয়া, হজ্জের মাসসমূহে অর্থাৎ স্বদেশের লোকজন হজ্জের উদ্দেশ্যে যখন বের হবে সে সময়ে সক্ষম ও সামর্থ্যবান হওয়া ও হজ্জের সময় হওয়া।’
- দ্র. রাদ্দুল-মুহতার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮।
- ২৬ সূরা আত-তাওবা, ৯: ২৮।
- ২৭ আল-মুসতাদরাফ, হাদীস নং ১৭৬৯; সহীহ ইবন হিব্বান, বাবুস সাবিয়্য ইয়াহাজ্জু কাবলাল বুলগী ছুম্মা ইয়াবলুগু, হাদীস নং ৩০৫০।
- ২৮ তাবারানী, আল-মু’জামুল আওসাত, হাদীস নং ২৭৩১।
- ২৯ সূরা আলে-‘ইমরান, ৩: ৯৭।
- ৩০ ফাতহুল-কাদীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০; আল-ফিকহুল-ইসলামী ওয়া আদিয়াতুহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১২২।
- ৩১ ফাতাওয়া ও মাসাইল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৩।
- ৩২ আল-বাহরুর-রাইক ফী শারহি কানযুদ-দাকাইক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮২; ইবনুল ‘আবেদীন আশ্-শামী (র) বলেন,
- شُرُوطُ الْأَدَاءِ وَهِيَ الَّتِي إِنْ وَجَدْتُ بِتَمَامِهَا مَعَ شُرُوطِ الْمُجُزَّبِ، وَهِيَ خَمْسَةٌ: سَلَامَةُ الْبَدَنِ، وَأَمْنُ الطَّرِيقِ وَعَدَمُ الْخَبَسِ، وَالْمَحْرَمُ أَوْ الزَّوْجُ لِلْمَرْأَةِ وَعَدَمُ الْعِدَّةِ لَهَا.
- দ্র. রাদ্দুল-মুহতার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮।
- ৩৩ ফাতাওয়া ও মাসাইল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৩।
- ৩৪ আল-বাহরুর-রাইক ফী শারহি কানযুদ-দাকাইক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮২; ইবনুল ‘আবেদীন আশ্-শামী (র) বলেন,
- شَرَائِطُ صِحَّةِ الْأَدَاءِ وَهِيَ تِسْعَةٌ: الْإِسْلَامُ وَالْإِحْرَامُ، وَالزَّمَانُ، وَالْمَكَانُ، وَالْتَّيْمِيزُ، وَالْعَقْلُ وَمُبَاشَرَةُ الْأَفْعَالِ إِلَّا بِعَذْرِ وَعَدَمِ الْجَمَاعِ وَالْأَدَاءِ مِنْ عَامِ الْإِحْرَامِ.
- দ্র. রাদ্দুল-মুহতার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮।
- ৩৫ ফাতহুল-মুলহিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০২।
- ৩৬ সুলায়মান ইবন আশআশ আস্-সিজিস্তানী, সুনানু আবী দাউদ (দিমাশক: মাকতাবাতু ইবন হাজার, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), হাদীস নং ১৭৩২, পৃ. ৩৬৩; মুহাম্মাদ ইবন মাজাহ্ আল-কাযভীনি, সুনানু ইবন মাজাহ্ (দিমাশক:

মাকতাবাতু ইবন হাজার, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), হাদীস নং ২৮৮৩, পৃ. ৬৪৬; আহমাদ ইবন হাম্বল, মুসনাদু আহমাদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১৮৩৩, ১৮৩৪, ২৯৭৪, ৩৩৪০।

৩৭ ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৬-৬৩৭।

৩৮ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪৫।

৩৯ সূরা আল-ইমরান: ৩: ৯৭।

৪০ সূরা আল-হাজ্জ: ২২: ২৭।

৪১ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ মুসলিম (বৈরুত: দারু ইবন হাম্বল, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), কিতাবুল-হজ্জ, হাদীস নং ৪১২, পৃ. ৫৫৬।

৪২ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১, পৃ. ৩৫।

৪৩ 'আলাউদ্দীন আল-কাসানী, বাদাইউস-সানাঈঈ, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়াইত-তুরাখিল 'আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ২৯০।

৪৪ বাদাইউস-সানাঈঈ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯০।

৪৫ The Climax is the Procession to the plains of Arafat on the Ninth of Dhu al-Hijjah. The pilgrims gather in tents, praying and conversing from just after sunset.

Cf. *The Oxford Dictionary of Islam* (Press : Oxford University Press, 2003), P. 103.

৪৬ রাদ্দুল-মুহতার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৭।

৪৭ রাদ্দুল-মুহতার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৭; আল-ফিকহুল-ইসলামী ওয়া আদিয়াতুহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৭০।

৪৮ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২; ফাতাওয়া ও মাসাইল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৯।

৪৯ আওজায়ুল-মাসালিক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৯; ইবন হাজার আল-'আসকালানী (র) বলেন, هُوَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ وَخُدُّهُ فِي أَشْهُرِهِ - 'সকলের মতে হজ্জের মাসে শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বাঁধাকে হজ্জে ইফরাদ বলা হয়।'

দ্র. ফাতহুল-বারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৯।

৫০ ফাতহুল-কাদীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৪; আল-ফিকহুল-ইসলামী ওয়া আদিয়াতুহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৮১; ইবন হাজার আল-'আসকালানী (র) বলেন,

الْمَعْرُوفُ أَنَّهُ الْإِعْتِمَارُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ التَّحَلُّلُ مِنْ تِلْكَ الْعِمْرَةِ وَالْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ.

- 'প্রসিদ্ধ মতে তামাত্ত হলো হজ্জের মাসে 'উমরা পালন করার পর হালাল হয়ে সেই বছরে আবার হজ্জের ইহরাম বাঁধা।'

দ্র. ফাতহুল-বারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৯; আওজায়ুল-মাসালিক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০৭; মোলণা 'আলী আল-কারী (র) তার 'শারহুল-লুবাব' গ্রন্থে বলেন,

الْتَّمَعُ فِي اللَّغَةِ بِمَعْنَى التَّلَذُّ وَالْإِنْتِفَاعِ بِالشَّيْءِ وَفِي الشَّرِيعَةِ التَّرْفُقُ بِأَدَاءِ النَّسَكَيْنِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ الْمَامِ بَيْنَهُمَا الْمَامَا صَحِيحًا.

- 'তামাত্ত' শব্দের আভিধানিক অর্থ সজোগ করা, কোনো জিনিস থেকে উপকৃত হওয়া। শরী'আতের পরিভাষায় তামাত্ত হলো একই বছরে হজ্জের মাসে দুটি ইবাদত পালন করার সুযোগ গ্রহণ করা এই ইবাদত দুটির মাঝে বিশুদ্ধ পার্থক্য করা ব্যতীত।'

দ্র. আওজায়ুল-মাসালিক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০৭।

- ৫১ আল-ফিকহুল-ইসলামী ওয়া আদিয়াতুহু, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৮৩; মোল্লা 'আলী আল-কারী (র) তার 'শারহুল-লুবাব' গ্রন্থে বলেন,
وَيُؤَدِّيهِمَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ بِأَنْ يُؤَقَّعَ أَكْثَرُ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَجَمِيعِ سَعْيِهَا وَسَعْيِ الْحَجِّ فِيهَا وَلَوْ تَقَدَّمَ الْإِحْرَامُ وَبَعْضُ طَوَافِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهَا.
-হজ্জের মাসসমূহে হজ্জ ও 'উমরাহ্ দুটি আদায় করা। যেমন, 'উমরার অধিকাংশ তাওয়াফ ও সা'ঈ, হজ্জের সা'ঈ আদায় করা। যদিও বা ইহরাম ও 'উরার কিছু তাওয়াফ হজ্জের পূর্বে আদায় করা হয়।'
দ্র. আওজায়ুল-মাসালিক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬২।
- ৫২ মুহাম্মদ ইব্ন সালেহ, মাজমু ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল, ২৪শ খণ্ড (দারুল ওয়াতান, ১৪১৩ হি.), পৃ. ২৮৪।
- ৫৩ সীরাত বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৩৫৮-৩৬০।
- ৫৪ জামি'উত-তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফিল ইগতিসালি 'ইনদাল ইহরাম, হাদীস নং ৮৩০।
- ৫৫ জামি'উত-তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফিমা লা ইজু'ল লিল মুহরিম লুবসুহু, ইগতিসালি 'ইনদাল ইহরাম, হাদীস নং ৮৩৩; সহীহুল বুখারী, বাবু মা ইউনহা মিনাত-তীবী লিল-মুহরিমি ওয়াল-মুহরিমতি, হাদীস নং ১৮৩৮; সুনানু আবী দাউদ, বাবু মা ইয়ালবিসু আল-মুহরিম, হাদীস নং ১৮২৫; সুনানুন নাসাঈ, বাবুন নাহযু 'আন আন তানতাকিবু আল-মার'আতুল হারামু, হাদীস নং ২৬৭৩।
- ৫৬ আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হাদীস নং ৯০৫০।
- ৫৭ সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৮।
- ৫৮ সহীহুল বুখারী, বাবুত-তালবিয়াহ্, হাদীস নং ১৫৪৯; বাবুত-তালবীদি, হাদীস নং ৫৯১৫; সহীহ মুসলিম, বাবুত-তালবিয়াতি ওয়া সিফাতিহা ওয়া ওয়াকতিহা, হাদীস নং (১১৮৪) ১৯-২১; সুনানু আবী দাউদ, বাবু কায়ফাত-তালবিয়াহ্, হাদীস নং ১৮১২; জামি'উত-তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফিত-তালবিয়াহ্, হাদীস নং ৮২৫-২৬; সুনানুন নাসাঈ, কায়ফাত-তালবিয়াতু, হাদীস নং ২৭৪৭-২৭৫১; সুনানু ইব্ন মাজাহ্, কায়ফাত-তালবিয়াতু, হাদীস নং ২৯১৮-২৯১৯; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ২৪০৪; সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্, হাদীস নং ২৬২১, ২৬২৬, ২৭১৬।
- ৫৯ সহীহ মুসলিম, বাবুত-তালবিয়াতি ওয়া সিফাতিহা ওয়া ওয়াকতিহা, হাদীস নং (১১৮৪) ১৯-২১; সুনানু আবী দাউদ, বাবু কায়ফাত-তালবিয়াহ্, হাদীস নং ১৮১২; জামি'উত-তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফিত-তালবিয়াহ্, হাদীস নং ৮২৬; সুনানুন নাসাঈ, কায়ফাত-তালবিয়াতু, হাদীস নং ২৭৫০; সুনানু ইব্ন মাজাহ্, কায়ফাত-তালবিয়াতু, হাদীস নং ২৯১৮; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৪৪৫৭; সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্, হাদীস নং ২৬২১।
- ৬০ সুনানু আবী দাউদ, বাবু কায়ফাত-তালবিয়াহ্, হাদীস নং ১৮১৪; জামি'উত-তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফী রাফ'ইস-সাওতি বিত-তালবিয়াহ্, হাদীস নং ৮২৯; সুনানুন নাসাঈ, কায়ফাত-তালবিয়াতু, হাদীস নং ২৭৫০; সুনানু ইব্ন মাজাহ্, বাবু রাফ'ইস-সাওতি বিত-তালবিয়াহ্, হাদীস নং ২৯২২; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৬৫৬৯; সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্, হাদীস নং ৩৮০২; সুনানু দারা কুতনী, বাবুল মাওয়াকীতি, হাদীস নং ২৫০৬।
- ৬১ সুনানুন নাসাঈ, বাবু: কাত'ঈল মুহরিমিত-তালবিয়াতি ইয়া রামা জাহুরাতাল 'আকাবাতি, হাদীস নং ৩০৮০; সুনানু ইব্ন মাজাহ্, বাবু মাতা ইয়াকতা'উল হাজ্জ, আত-তালবিয়াতা, হাদীস নং ৩০৪০।
- ৬২ শাহওয়ালী ওয়ালী উলগাহ্ দেহলভী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪।
- ৬৩ মিনা: এটি মক্কা মু'আযযামা থেকে তিন মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি শহর। এখানেই হজ্জের সময় কুরবানী করা হয় এবং কংকর নিক্ষেপ করা হয়। এ স্থানটি হারামের সীমানার অন্তর্ভুক্ত।
দ্র. ফাতাওয়া ও মাসাইল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৮।
- ৬৪ ফাতাওয়া ও মাসাইল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৮।

- ৬৫ ড. ইবরাহীম আনিস ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (ইউপি: কুতুব খানা ছসায়নিয়াহ, তা. বি.), পৃ. ৫৯৫।
- ৬৬ **উকূফ:** শব্দটির অর্থ থামা বা অবস্থান করা। হজ্জের আহকাম পালনের ক্ষেত্রে 'উকূফ' অর্থ আরাফা ও মুযদালিফার বিশেষ স্থানে বিশেষ সময়ে অবস্থা করা।
 ড. ফাতাওয়া ও মাসাইল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২২।
- ৬৭ জামি'উত-তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফীমান আদরাকা আল-ইমামা বিজাম'ঈ ফাকাদ আদরাকাল হাজ্জ, হাদীস নং ৮৮৯; *সুনানুন নাসাঈ*, ফারযুল উকূফি বি'আরাফাতা, হাদীস নং ৩০১৬; *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, বাবু মান আতা 'আরাফাতা, হাদীস নং ৩০১৫।
- ৬৮ ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, আরাফাত, *আল-কুরআনুল কারীম বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), ২৭৭-২৮০।
- ৬৯ *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, বাবুল গুদুওডি মিন মিনা ইলা আরাফাত, হাদীস নং ৩০০৮।
- ৭০ *সুনানুন নাসাঈ*, মা যুকিরা ফী ইয়াউমি আরাফাতা, হাদীস ৩০০৩; *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, বাবু দু'আই বি 'আরাফাত, হাদীস নং ৩০১৪; *সহীহ মুসলিম*, বাবুন ফী ফাযলিল হাজ্জি ওয়াল 'উমরাতি, ওয়া ইয়াউমি আরাফাতা, হাদীস নং (১৩৪৮) ৪৩৬; *সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ*, হাদীস নং ২৮২৭; *আল-মু'জামুল আওসাত*, হাদীস নং ৯১৩৪; *আস-সুনানুস সাগীর লিল বায়হাকী*, হাদীস নং ১৬৭৬।
- ৭১ *জামি'উত-তিরমিযী*, বাবু ফী ফাযলি লা হাওলা ওয়া কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, হাদীস নং ৩৫৮৫।
- ৭২ *জামি'উত-তিরমিযী*, বাবু মা জা'আ ফী রাফ'ইস-সাওতি বিত্-তালবিয়াহ, হাদীস নং ৩৫২০; *সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ*, হাদীস নং ২৮৪১; *শ'আবুল ঈমান*, হাদীস ৩৫৬০।
- ৭৩ *জামি'উত-তিরমিযী*, বাবু ফী ফাযলি লা হাওলা ওয়া কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, হাদীস নং ৩৫৮৫।
- ৭৪ *সুনানুন নাসাঈ*, আল-জাম'উ বায়নায-যুহরি ওয়াল আসরি বি 'আরাফাত, হাদীস নং ৩০১০।
- ৭৫ *সুনানু আবী দাউদ*, বাবুল খুরাজি ইলা আরাফাত, হাদীস নং ১৯১৩।
- ৭৬ **মুযদালিফা:** মিনা ও আরাফাতের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত একটি ময়দান। মিনা থেকে তিন মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত। ৯ মিলহজ্জ দিবাগত রাতে হাজীগণের এ ময়দানে অবস্থান করতে হয়।
 ড. ফাতাওয়া ও মাসাইল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৯।
- ৭৭ সূরা আল-বাকারা: ২: ১৯৮।
- ৭৮ *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ১৬৭৫১; *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, বাবুল মাওকিফি বি'আরাফাতা, হাদীস নং ৩০১৬।
- ৭৯ কুযাহ মুযদালিফার একটি স্থানে নাম। জাহেলী যুগে কুরাইশরা যখন আরাফাতে অবস্থান করত না তখন এখানে অবস্থান করত। আল-জাওহারী (র)-এর মতে 'এটি মুযদালিফার একটি পাহাড়ের নাম। বহু সংখ্যক ফকীহের নিকট এটিই 'মাশ'আরুল হারাম'।
 ড. ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ফুটনোট, পৃ. ৭৪০।
- ৮০ *সুনানুন নাসাঈ*, বাবু: ইলতিকাতিল হাসা, হাদীস নং ৩০৫৭; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ৩২৪৮।
- ৮১ কংকর নিষ্কেপ করাকে রমী বলে।
- ৮২ *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২২।

- ৮৩ সহীহ মুসলিম, বাবু ইস্তিহাবি রামী জামরাতিল আকাবাতি ইয়াউমান্ নাহরি রাকবান, হাদীস নং (১২৯৭) ৩১০; সুনানু আবী দাউদ, বাবুন ফী রামীল জামারি, হাদীস নং ১৯৭০; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৫০৪১।
- ৮৪ ফাতাওয়া ও মাসাইল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২২।
- ৮৫ জামি'উত-তিরমিযী, বাবু মা জাআ আল্লাল জামারাতাতি ইউরমা বিহা মিছলু হাসাল-খাযফি, হাদীস নং ৮৯৭; সুনানু নাসাঈ, বাবু: আল-মাকানিল্লাযী ভুরমা মিনছ জামরাতুল আকাবাতি, হাদীস নং ৩০৭৫।
- ৮৬ সুনানু আবী দাউদ, বাবুন ফী রামী আল-জিমারি, হাদীস নং ১৯৬৬।
- ৮৭ মিনায় তিনটি স্থানে উঁচু স্তম্ভ নির্মিত রয়েছে। সেখানে কংকর নিক্ষেপ করা হয়। এগুলোর মধ্যে মসজিদে খায়ফের নিকটবর্তী পূর্বদিকে অবস্থিত জামরাকে 'জামরায়ে উলা' বলা হয়। এর পরবর্তীটি যা মধ্যস্থানে অবস্থিত একে 'জামরায়ে উস্তা' বলা হয়। এর পরেরটিকে 'জামরাতুল কুবর বা জামরায়ে আকাবা অথবা জামরাতুল উখরা' বলা হয়।
দ্র. ফাতাওয়া ও মাসাইল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৪।
- ৮৮ জামি'উত-তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফী তাকদীমিয-যা'ফাতি মিন জাম'ঈ বিল-লায়ল, হাদীস নং ৮৯৩।
- ৮৯ সহীছল বুখারী, বাবুয্ যাবীহি কাবলাল হালাক, হাদীস নং ১৭২৩।
- ৯০ মূল হাদীসটি এই,
لَمَّا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنَةِ أَخٍ لَصَفِيَّةٍ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ نَفَسَتْ بِالْمَرْدَلَةِ، فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةٌ. حَتَّى أَتَانَا مَنِيَّ يُعَدُّ أَنَّ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الْجُمُرَةَ حِينَ قَدِمْنَا وَلَمْ يَرِ عَلَيْهِمَا شَيْئًا.
- দ্র. আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, বাবু তাযীরির রামই আন ওয়াকতিহি হাভা ইউমসিয়া, হাদীস নং ৯৬৭১।
- ৯১ বাদাইউস সানাঈ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭।
- ৯২ সুনানু আবী দাউদ, বাবু ফী রামী আল-জিমারি, হাদীস নং ১৯৭১।
- ৯৩ পূর্বোক্ত, হাদীস নং ১৯৭৪।
- ৯৪ আল-মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং ৬৮৫৬; ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪৮।
- ৯৫ ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪৮।
- ৯৬ সূরা আল-বাকারাহ: ২ : ২০৩।
- ৯৭ ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫১।
- ৯৮ সূরা আল-হাজ্জ: ২২ : ৩৬-৩৭।
- ৯৯ সহীহ মুসলিম, বাবুল ইখতিরাক ফিল হাদই ওয়া ইজাযাইল বাকারাতি ওয়াল-বাদানাতি কুল্লি মিনহুমা আন সাব'আতি, হাদীস নং (১৩১৮) ৩৫২; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৪২২৯।
- ১০০ ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫২
- ১০১ সুনানু ইবন মাজাহ, বাবু কাম তুজবিউ মিনাল গানামি, আনিল বাদনাতি, হাদীস নং ৩১৩৬; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ২৮৩৯, ২৮৫১।
- ১০২ সূরা আল-হাজ্জ: ২২: ২৪।

- ১০৩ সুনানু আবী দাউদ, বাবুস্ সালামি বিজাম'ঈ, হাদীস নং ১৯৩৭; সুনানু ইবন মাজাহ, বাবুস্-যাবহি, হাদীস নং ৩০৪৮; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৪৪৯৮; সুনানুদ-দারেমী, বাবু আরাফাতু কুল্লিহা মাওকিফু, হাদীস নং ১৯২১।
- ১০৪ সূরা আল-হাজ্জ: ২২: ২৮।
- ১০৫ সূরা আল-ফাতহ, ৪৮: ২৭।
- ১০৬ সহীহুল বুখারী, বাবুল হালকি ওয়াত-তাকসীরি ইনদাল ইহুলালি, হাদীস নং ১৭২৭; সহীহ মুসলিম, বাবু তাফযীলিল হালকি আলাত-তাকছীরি ওয়া জাওয়াযিত-তাকছীরি, হাদীস নং (১৩১০) ৩১৭; সুনানু আবী দাউদ, বাবুল হালকি ওয়াত-তাকসীরি, হাদীস নং ১৯৭৯; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৫৫০৭, ৬২৩৪।
- ১০৭ মাথা মুণ্ডকারীদের জন্য তিনবার দু'আ করার কারণ হলো, মুড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা। এর মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে জোর দেয়া। কেননা এটি ইবাদত ও দাসত্বের পূর্ণাঙ্গ নমুনা পেশ করে এবং আল্লাহর নিকটে বিনয়ের ব্যাপারে অধিকতর বিনয় ও আন্তরিকতার প্রমাণ দেয়। পক্ষান্তরে যে চুল ছোট করে কাটে, সে নিজের জন্য কিছুটা সৌন্দর্য অবশিষ্ট রাখে। তথাপি সবার শেষে তাদের জন্য তার দু'আর কিছু অংশ বরাদ্দ করেছেন, যাতে তার উম্মতের কোনো হাজী বা 'উমরাকারী তার নেক দু'আ থেকে বঞ্চিত থেকে না যায়।
- দ্র. ফিকহুস্ সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ফটোনোট, পৃ. ৭৫৮।
- ১০৮ আলী ইবন আবী বকর আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ২৯৪।
- ১০৯ সুনানু আবী দাউদ, বাবু ফী রামীল জামার, হাদীস নং ১৯৭৮; জামি'উত-তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফিত-তায়বি ইনদাল আহ্লালি কাবলায্ যিয়ারাতি, হাদীস নং ৯১৭; সুনানুন নাসাঈ, বাবু মা ইয়াহিল্লু লিল-মুহাররামি বাদা রামীল জামারি, হাদীস নং ৩০৮৪; সুনানুদ দারা কুতনী, বাবুল মাওয়াকীত, হাদীস নং ২৬৮৬।
- ১১০ আল-হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪।
- ১১১ মূল হাদীসটি এই, عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُحْلَقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. 'আইশা (রা) বলেন, নবী (সা) মহিলাদেরকে তাদের মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।
- দ্র. জামি'উত-তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফী কারাহিয়াতিল হালকি লিন-নিসাই, হাদীস নং ৯১৪-৯১৫।
- ১১২ সুনানু আবী দাউদ, বাবুল হালকি ওয়াত-তাকছীর, হাদীস নং ১৯৮৪-১৯৮৫।
- ১১৩ সূরা আল-হাজ্জ: ২২: ২৯।
- ১১৪ মুহাম্মাদ আশ-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, ৫ম খণ্ড (দিমাশক: দারু ইবন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ. ১১০।
- ১১৫ ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম, ৫ম খণ্ড (দারু তাইয়্যিবা, ২য় সংস্করণ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৪১৮।
- ১১৬ জামি'উত-তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফিল হাজারিল আসওয়াদ, হাদীস নং ৯৬১।
- ১১৭ ফিকহুস্ সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬১।
- ১১৮ সুনানু ইবন মাজাহ, বাবু ফাযলিত-তাওয়াফ, হাদীস নং ২৯৫৬।
- ১১৯ সুনানুন নাসাঈ, বাবু যিকরুল ফাযলি ফিত-তাওয়াফি বিল-বায়তি, হাদীস নং ২৯১৯।
- ১২০ জামি'উত-তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফী ইসতিলামির রুকনায়নি, হাদীস নং ৯৫৯।
- ১২১ জামি'উত-তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফী ফাযলিত-তাওয়াফ, হাদীস নং ৮৬৬।

- ১২২ জামি'উত-তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফী ইসতিলামির রুকনায়ানি, হাদীস নং ৯৫৯; সুনানুন নাসাঈ, বাবু যিকরুল ফাযলি ফিত-তাওয়াফি বিল-বায়তি, হাদীস নং ২৯১৯।
- ১২৩ পূর্বোক্ত।
- ১২৪ সহীহুল বুখারী, বাবু মান সাব্বা রাকআতাইত্ তাওয়াফি খালফাল মাকামি, হাদীস নং ১৬২৭; সহীহ মুসলিম, বাবু মা ইয়ালযামু মান আহরামা বিল হাজ্জি, ছুম্মা কাদিমা মাক্বামা মিনাত্ তাওয়াফি ওয়াস্ সা'ঈ, হাদীস নং (১২৩৪) ১৮৯; সুনানুন নাসাঈ, আইনা ইউসাব্বা রাক'আতাইত্ তাওয়াফি, হাদীস নং ২৯৬০; সুনানু ইব্ন মাজাহ্, বাবুর রাক'আতায়ানি বা'দাত্ তাওয়াফি, হাদীস নং ২৯৫৯।
- ১২৫ সুনানুন নাসাঈ, আল-কিরআমু ফী রাক'আতাইত্ তাওয়াফি, হাদীস নং ২৯৬৩।
- ১২৬ যম্বযম: অর্থ অটেল পানি। তিবরানী ভাষায় যম্বযম অর্থ থেমে যাও, থাম্ থাম্। মরুভূমিতে দুই বছরের শিশু সন্তান ইসমাদিল (আ)-এর সীমাহীন পিপাসা মিটানোর জন্য যখন বিবি হাজেরা (আ) এদিক-ওদিক ছোট্ট ছুটি করছিলেন আর কামনা করছিলেন আল্লাহর অপার করুণা, তখন আল্লাহ তা'আলা রহমতের এ পানি উদ্গত করেন মরুভূমির শুষ্ক মাটি থেকে। রহমতের এ পানি দেখে বিবি হাজেরা (আ) একে বাঁধ দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করেন এবং তিবরানী ভাষায় বলতে থাকেন যম্বযম অর্থাৎ থাম্ থাম্। এ থেকে এটি নাম যম্বযম্ নামে পরিচিতি লাভ করে। যম্বযম্ কূপের অবস্থান মাসজিদুল হারাম তথা কা'বার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।
- ১২৭ আত-তাবরানী, আল-মু'জামুস্ সাগীর, হাদীস নং ২৯৫।
- ১২৮ আত-তাবরানী, আল-মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং ৩৯১২; আত-তাবরানী, আল-মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং ১১১৬৭।
- ১২৯ সুনানুদ দারা কুতনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৯; মুসান্নাফু 'আদ্বির রাযযাক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৮।
- ১৩০ সুনানু ইব্ন মাজাহ্, বাবুশ্ শুরবি, মিন যাম্বযাম্, হাদীস নং ৩০৬২; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৪৮৪৯।
- ১৩১ সহীহুল বুখারী, বাবু মা জাআ ফী যাম্বযাম্, হাদীস নং ১৬৩৭, বাবুশ্ শুরবি কাইমান, ৫৬১৭; সহীহ মুসলিম, বাবুন ফিশ্ শুরবি মিন যাম্বযাম্ কাইমান, হাদীস নং (২০১৭) ১১৭-১২০; সুনানুন নাসাঈ, আশ্-শারিবু মিন যাম্বযাম্ কাইমান, হাদীস নং ২৯৬৫; জামি'উত-তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফির রুখসাতি ফিশ্ শুরবি কাইমান, হাদীস নং ১৮৮২; সুনানু ইব্ন মাজাহ্, বাবুশ্ শুরবু, কাইমান, হাদীস নং ৩৪২২; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৮৩৮, ১৯০৩, ২১৮৩, ২৬০৮, ৩১৮৬, ৩৪৯৭।
- ১৩২ সুনানু ইব্ন মাজাহ্, বাবুশ্ শুরবি, মিন যাম্বযাম্, হাদীস নং ৩০৬১; সুনানু দারা কুতনী, বাবুল মাওয়াকীতু, হাদীস নং ২৭৩৬; আল-মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং ১১২৪৬; আস-সুনানুল কাবীর লিল বায়হাকী, হাদীস নং ৯৬৫৬।
- ১৩৩ সুনানু দারা কুতনী, বাবুল মাওয়াকীতু, হাদীস নং ২৭৩৮।
- ১৩৪ ইব্নুল কাইয়েম আল-জাওযিয়াহ্, যাদুল মা'আ ফী হাদই খায়রিল ইবাদ, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: মু'আসসাযাতুর রিসালাহ্, ২৭শ সংস্করণ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৩৯২।
- ১৩৫ জামি'উত-তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফিল হাজারিল আসওয়াদ, হাদীস নং ৯৬৩।
- ১৩৬ সূরা আল-বাকার: ২ : ১৫৮।
- ১৩৭ সহীহুল বুখারী, বাবু ওজুবিস্ সাফা ওয়াল মারওয়াতি, ওয়া জুঈলা মিন শাহআইরিয়াহ্, হাদীস নং ১৬৪৩; সহীহ মুসলিম, বাবু বায়ানি আন্বাস্ সা'ঈ বায়নাস্ সাফা ওয়াল মারওয়াতি রুকনুন লা ইয়াসিহুল হাজ্জু ইল্লা বিহি, হাদীস নং (১২৭৭) ২৬২।

- ১৩৮ সহীহ মুসলিম, বাবু বায়ানি আল্লাস্ সা'ঈ বায়নাস্ সাফা ওয়াল মারওয়াতি রুকনুন লা ইয়াসিহুল হাজ্জু ইল্লা বিহী, হাদীস নং (১২৭৭) ৩৬০।
- ১৩৯ সূরা আল-বাকারাহ: ২ : ১৫৮।
- ১৪০ ইব্ন কুদামাহ, আল-মুগনী, ২য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুল কাহিরা, ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ২৫২।
- ১৪১ সূরা আল-বাকারাহ: ২ : ১৫৮।
- ১৪২ সুনানু আবী দাউদ, বাবু সিফাতি হাজ্জাতিন্ নাবিয়্যে সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামা, হাদীস নং ১৯০৫; সুনানুন নাসাঈ, আয-যিকরু ওয়াদ-দু'আ 'আলাস্ সাফা, হাদীস নং ২৯৭৪-২৯৭৭; সুনানু ইব্ন মাজাহ, বাবু হাজ্জতি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাদীস নং ৩০৭৪।
- ১৪৩ ফিক্হুস্ সুন্নাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩০।
- ১৪৪ সুনানু আবী দাউদ, বাবুল ওয়াদা'ঈ, হাদীস নং ২০০২; সহীহ মুসলিম, বাবু ওজু'বি তাওয়াফিল ওয়াদা'ঈ, হাদীস নং (১৩২৭) ৩৭৯; সুনানুন নাসাঈ, আয-যিকরু ওয়াদ-দু'আ 'আলাস্ সাফা, হাদীস নং ২৯৭৪-২৯৭৭; সুনানু ইব্ন মাজাহ, বাবুল বাওয়াফিল ওয়াদা'ঈ, হাদীস নং ৩০৭০; সুনানুদ দারিমী, বাবু ফী তাওয়াফিল ওয়াদা'ঈ, হাদীস নং ১৪৭৪।
- ১৪৫ সুনানু আবী দাউদ, বাবুল ওয়াদা'ঈ, হাদীস নং ২০০৬; সহীহ ইব্ন খুয়ামাহ, হাদীস নং ২৯৯৮।

সহীহ বুখারী : পরিচিতি ও পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম*

[Abstract: The Qur'an is the main pillar of Islamic knowledge and the Hadith is the interpretation of the Qur'an. In the Islamic Shari'ah, the place of Hadith after al-Qur'an is prominent. Among the Hadiths which have been compiled for the interpretation and analysis of the Qur'an, the Hadith of Imam Bukhari is the greatest of all. Sahih Bukhari Compilation is one of the greatest contributions of Imam Bukhari (R). The memory of Imam Bukhari (R) was very intense. About six million Hadiths were memorized by him. He compiled the Sahih Bukhari for sixteen years, visiting various parts of the Muslim world. Prior to writing every Hadith in this book, he used to perform two rak'aths at the end of the bath and prayed to Allah Ta'ala about the acceptance of the Hadith. In addition, he used to observe fasting during compilation. That is why this book is recognized in the world as the most authentic book. In some narratives, it is seen that he wrote the titles of his book sitting in the grave of the Prophet (SAW) and the mosque of the Prophet (SAW). However, his recollection of receiving Hadith and his selection, seeking help from Allah Ta'ala, muraqaba, keeping the fast, the conditions and caution in receiving the Hadith, the certification and verification procedures, the vast interpretation of his Hadith book prove that the Hadith, among the books, the place of Sahih Bukhari is the foremost composed by Imam Bukhari (R). However, it cannot be said that there is no Sahih Hadith outside Sahih Bukhari. Because Imam Bukhari (R) himself said, "I have not mention that there is no Sahih Hadith anywhere other than my book. However, we have omitted many Sahih Hadiths in order to increase it." Therefore, after examining and analyzing all the Hadiths that have been incorporated in Sahih Bukhari, it can be said that the Hadiths contained in it are exactly Sahih. Apart from this, the Muslim Ummah, from the time of compilation has not raised any specific objections or allegations regarding the Hadith mentioned in Bukhari. On the other hand, the importance of Hadith after Al-Qur'an is immense in the life of the Muslim Ummah. Because, there is no substitute for Hadith to understand the Qur'an. And in that case the importance and necessity of Sahih Hadith is much greater. For this reason, as a conscious Muslim, it is important to know the significance and necessity of Sahih Bukhari, its compilation method and role, the terms of compilation, the characteristics of Sahih Bukhari and its explanatory books. Therefore, in this article, analytical discussion of all these issue is presented.]

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

ভূমিকা

আল-কুরআন ও হাদীস ইসলামী জীবন বিধানের মূল ভিত্তি। আল-কুরআনে রয়েছে ইসলামী জীবন বিধানের মৌল নীতি এবং হাদীস হচ্ছে তার খুটিনাটি বিধানের বিস্তারিত বিশ্লেষণ। আল-কুরআন ইসলামের প্রদীপ স্তম্ভ এবং হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলোর বন্যা। আল-কুরআনকে বলা যায় ইসলামের বিরাট বৃক্ষের মূল ও কাণ্ড, আর হাদীস তার শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব ও পুষ্প। শাখা-প্রশাখাহীন কাণ্ড ও মূল নিষ্ফল আবর্জনা মাত্র। আল-কুরআন যেন ইসলামের জীবন প্রাসাদের পরিকল্পিত চিত্র এবং সে অনুযায়ী নির্মিত প্রাসাদ হলো হাদীস। রাসূল (সা:)-এর নবুওয়াতী জীবনের প্রথম দিকে আল-কুরআন নাযিলের ধারা অব্যাহত থাকায় হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। পরবর্তী কালে রাসূল (সা:)-এর ইন্তেকালের পর হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। এ সময় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অভিযান দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। রাসূল (সা:)-এর সাহাবী ও মুহাদ্দিগণ হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় সফর করে হাদীসের মহামূল্যবান সম্পদ সংগ্রহ করেন। এরই সূত্র ধরে হিজরী তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম জাহানের দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত ও বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত হাদীস সমূহ যখন ‘মুসনাদ’ আকারে সংগৃহীত ও গ্রন্থাবদ্ধ হয়, তখন পরবর্তীকালের মুহাদ্দিগণ হাদীস যাচাই-বাছাই ও সংক্ষিপ্ত আকারে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্যোগী হন। এ উদ্যোগের ফলেই এ শতকের মাঝামাঝি ও শেষার্ধ্বে ছয়খানি সুবিখ্যাত সহীহ হাদীস গ্রন্থ জনসমক্ষে উপস্থাপিত হয়। এ ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষে উল্লেখযোগ্য ও সর্বাধিক বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম বুখারী সংকলিত ‘সহীহ বুখারী’। ইমাম বুখারী (র:) গ্রন্থটি সংকলনের পর সমকালীন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিগণের সন্মুখে পেশ করেন। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন ‘আলী ইবন মাদানী, আহম্মদ ইবন হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবন মুয়ীনা (র:)। তারা প্রত্যেকেই গ্রন্থটি অতি উত্তম ও বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলে স্পষ্ট ভাবে অভিমত দেন। বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা ঘোষণা করে সমকালীন আলিম ও মুহাদ্দিগণ ভূয়সী প্রশংসা করেন। হাদীসের সমস্ত আলিম এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত যে, গ্রন্থাবদ্ধ হাদীসের কিতাব সমূহের মধ্যে সর্বাধিক সহীহ হচ্ছে বুখারী ও মুসলিম। আর অধিকাংশের মতে এ দুটির মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হলো সহীহ বুখারী। এ পর্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত সর্বজনপ্রিয় উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য। **أصح الكتاب بعد كتاب الله تحت السماء صحيح البخاري** “আল্লাহ তা‘য়ালার কিতাবের পর আসমানের নীচে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ সহীহ বুখারী।”^১

সুতরাং বুখারী শরীফের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এ লক্ষ্যেই অত্র প্রবন্ধে বুখারী শরীফের পরিচিতি ও তার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিশ্লেষণ ধর্মী আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীর নামকরণ

সাধারণভাবে গ্রন্থটির নাম সহীহ বুখারী হলেও এর প্রকৃত নাম হলো:

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

“রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর যাবতীয় সুনাত ও যুদ্ধসমূহ সম্পর্কে নির্ভুল সনদ যুক্ত হাদীস সমূহের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ সংকলন।”^২

এ গ্রন্থটিকে **الجامع** নামে নামকরণের কারণ হলো, এতে বিশেষ আটটি^৩ বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। যে আটটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কোন হাদীসের গ্রন্থ প্রণীত হলে তাকে ‘আল-জামি‘ বলা

হয়ে থাকে। আর المسند বলা হয়েছে এ জন্যে যে, এতে হাদীসের যত রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে সে সবই রাসূল (সা:) থেকে মারফু^৪ সনদ^৫ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। الصحيح বলা হয় এ কারণে যে, এ গ্রন্থে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে সবগুলোর সনদই ইমাম বুখারী (র:)-এর শর্তানুযায়ী হাদীসের যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে মুক্ত। এতে বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোনরূপ দুর্বলতা নেই। গ্রন্থটিকে المختصر বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে সকল হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। স্বয়ং ইমাম বুখারী(র:) বর্ণনা করেন, “আমি ছয় লক্ষ হাদীস থেকে এ কিতাবে সংকলিত হাদীস সমূহ নির্বাচন করেছি।”^৬ তিনি আরও বলেন, “আমি এ কিতাবে শুধু বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ গ্রহণ করেছি। তবে দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে অনেক সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি।”^৭

من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এ গ্রন্থটিতে নবী করীম (সা:)-এর অবস্থাবলীর বিবরণও প্রদান করা হয়েছে।^৮ و سننه শব্দ দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ গ্রন্থটিতে রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর تفرير তথা মৌন সমর্থনও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং و أيامه শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এ গ্রন্থে সে সকল ঘটনাও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যেগুলো নবী (সা:) এর যুগে সংঘটিত হয়েছে।^৯ ড. আকরাম জিয়া আল-উমরী^{১০} ও ইবন হাজার আল-আসকালানী^{১১} (র:) সহীহ বুখারীর নাম এভাবে উল্লেখ করেছেন,^{১২} الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و سننه و أيامه অন্যদিকে ড. মুহাম্মদ ইবন আতার আল-যাহরানী সহীহ বুখারীর নাম এভাবে উল্লেখ করেছেন,^{১৩} الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و سننه و أيامه

ইমাম বুখারীর (র:) সৎক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

ইমাম বুখারী (র:) উজবেকিস্তানের অন্তর্গত বুখারাতে ১৯৪ হিজরী মোতাবেক ৮১০ খ্রী: জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরাহ ইবন বারদিয্বাহ আল-বুখারী^{১৪} আল-জু‘ফী। তাঁর পিতা ইসমাঈলও একজন বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ছিলেন। তিনি পারিবারিক পরিবেশেই ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর মাতাও বিদূষী ও মহীয়সী মহিলা ছিলেন। ইমাম বুখারী (র) শৈশবেই পিতাকে হারান, ফলে তিনি মায়ের কাছে লালিত-পালিত হন। তবে তাঁর পিতা প্রচুর ধনসম্পদ রেখে যান। ইমাম বুখারীর (র:) বাল্যকাল থেকেই শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি মাত্র ছয় বছর বয়সে কুরআন মাজীদ মুখস্ত করেন। ১০ বছর বয়স থেকেই তিনি হাদীস মুখস্ত করা শুরু করেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক এবং ওয়াকীর পাভুলিপিসমূহ মুখস্ত করে ফেলেন। ষোল বছর বয়সে তিনি মা ও বড় ভাইয়ের সাথে হজ্জে গমন করেন। হজ্জের পর তিনি মক্কাতে অবস্থান করে হিয়াজের হাদীসবিশারদগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ছোট বয়সকালে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহর রহমতে এবং মায়ের দোয়াতেই তিনি পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। ১৮ বছর বয়সে তিনি পুনরায় হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় গমন করেন। মক্কায় অবস্থান করে তিনি ইলমে হাদীসের চর্চা শুরু করেন এবং এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে এক হাজারের অধিক মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি বিভিন্ন দেশ সফর করেন এবং মক্কা-মদীনা, ইরাক, হিজাজ, সিরিয়া ও মিশর প্রভৃতি দেশে তিনি গমন করেন।^{১৫}

ইমাম বুখারী (র:) থেকে অসংখ্য মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেছেন। খতীব বাগদাদীর এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, তার থেকে প্রায় সত্তর হাজার লোক সহীহ বুখারী অধ্যয়ন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী সহ আরও অনেকে। ইমাম বুখারী তাঁর কিতাবে

কেবল সহীহ হাদীসগুলোই বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, তিনি কতকগুলো মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সহীহ হাদীস নির্ধারণ করতেন। পৈত্রিক সূত্রে তিনি প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর সকল সম্পদ ইলমের প্রচার-প্রসার ও অভাবী লোকদের অভাব মোচনে ব্যয় করেন। বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ হিসাবে তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর খেসারতও তাকে মাঝে-মধ্যে দিতে হয়েছে। ইমাম বুখারীর শেষ জীবন সুখে অতিবাহিত হয়নি। কুচক্রী কতিপয় আলেমের চক্রান্তে তিনি দেশ ত্যাগে বাধ্য হন। হাদীস চর্চায় সদা ব্যস্ত থাকলেও তিনি ইবাদত বন্দেগীতে পিছিয়ে থাকতেন না। তিনি নিয়মিত শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। তিনি ২০ টিরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। যার কতিপয় লেখা পাভুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে। আর কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।^{১৬}

তিনি ২৫৬ হিজরী মোতাবেক ৮৭০ খ্রী শতাব্দীর দিবাগত রাতে ইন্তেকাল করেন। পরদিন শনিবার যোহরের নামাযের পর খরতঙ্গে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।^{১৭}

সহীহ বুখারী সংকলনের প্রেক্ষাপট

রাসূল (সা:)-এ যুগে হাদীস সংকলনের উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। সাহাবীগণের যুগেও দেখা যায় সে সময় হাদীস সংকলনে বিশেষ কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। তবে সে যুগে দু'টি কারণে হাদীস লিপিবদ্ধ করা দোষণীয় মনে করা হত। তা ছিল নিম্নরূপ:

১. আল-কুরআন নাযিলের ধারা দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে থাকার কারণে রাসূল (সা:) আল-কুরআনের সাথে হাদীস মিশে যাওয়ার আশংকায় প্রথম দিকে হাদীস লিখতে নিষেধ করেন। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْفُرَّانِ فَلْيَمْحُطْهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ - مُتَعَدِّدًا فَلْيَنْبُؤْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "

“তোমরা আমার বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ কর না। আর যে ব্যক্তি আমার নিকট হতে আল-কুরআন ব্যতীত অন্যকিছু লিপিবদ্ধ করেছে সে যেন তা মুছে ফেলে। তোমরা আমার থেকে হাদীস বর্ণনা করতে পার, এতে কোন দোষ নেই। বর্ণনাকারী হাম্মাম বলেন, আমি মনে করি রাসূল (সা:) এ কথাও বলেছিলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন তার ঠিকানা দোজখে খুঁজে নেয়।”^{১৮}

২. সাহাবী ও প্রবীণ তাবেঈগণ অত্যাধিক স্মৃতিশক্তি ও প্রখর সংরক্ষণশক্তির অধিকারী ছিলেন। সে যুগে কিছু লিখে সংরক্ষণ করাকে স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা হিসাবে বিবেচনা করা হত। তাছাড়া সে যুগের অধিকাংশ মানুষ লিখতে জানতেন না।^{১৯} তাবিঈগণের শেষ সময়ে এবং তাবিঈ-তাবিঈগণের যুগে প্রাথমিক পর্যায়ে হাদীস সংকলনের কাজ শুরু হয়। বড় বড় মুহাদ্দিসগণ অনেকেই হাদীসকে গ্রন্থ আকারে বিন্যস্ত করতে শুরু করেন। সে গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ইমাম আবু হানিফার(র:) ^{২০}-এর ‘কিতাবুল আছার’ ইমাম মালিক(র:) ^{২১} সংকলিত ‘মুয়াত্তা’, সুফিয়ান সওয়ারী ^{২২} জামি’, ইবন আবী শাইবার ^{২৩} ‘মুসান্নাফ’, আব্দুর রায্যাকের ^{২৪} ‘মুসান্নাফ’ ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের ^{২৫} ‘মাসনাদ-ই-আহমদ। কিন্তু সে সময় পর্যন্ত হাদীসের যে সকল কিতাব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে নির্ভেজাল সহীহ হাদীস একত্রিত করার কোনরূপ শর্তারোপ করা হয়নি। বরং এতে শায ^{২৬}, মুনকার ^{২৭}, মুদাল্লাস ^{২৮}, মুয়াল্লাল ^{২৯} সহ বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা একত্রিত করা হয়েছিল। তাই এমন কিছু গ্রন্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে যেগুলোর মধ্যে কেবল সহীহ হাদীস লিপিবদ্ধ করা হবে। এ প্রয়োজন মেটানোর জন্য ইমাম বুখারীর (র:)-এর ওস্তাদ ইসহাক ইবন রাহওয়াই(র:) ^{৩০} সর্বপ্রথম ইমাম বুখারীকে (র:) উদ্বুদ্ধ করেন। এ প্রসঙ্গে হাফিয ইবন হাজার আল-আসকালানী (র:) তাঁর সনদে ইবরাহীম ইবন মা‘কাল আন-নাসাফীর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, “আবু আবাদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র:)

বলেন, আমরা ইসহাক ইবন রাহওয়াই (রঃ)-এর নিকটে ছিলাম। তখন তিনি বলেন, তোমরা যদি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সহীহ হাদীসের উপর একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব লিপিবদ্ধ করতে।”^{৩১}

শায়খের কথা ইমাম বুখারীর অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ফলে তিনি এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন, “তার এ আহবান আমার অন্তরে রেখাপাত করে এবং আমি আস-সহীহ গ্রন্থ সংকলন করতে শুরু করি।”^{৩২}

অপরদিকে ঠিক এ সময়ে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন যা তাকে এ মহান কাজে অগ্রসর হতে বিশেষভাবে প্রেরণা যোগায়। এ প্রসঙ্গে হাফিয ইবন হাজার আল-আসকালানী (রঃ) নির্ভরযোগ্য সনদের সূত্রে মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান ইবন ফারস থেকে বর্ণনা করে বলেন, “আমি ইমাম বুখারী (রঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন আমি নবী (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি, আমি যেন তাঁর সন্মুখে অবস্থানরত; আর আমার হাতে রয়েছে একটি পাখা। আমি সেটি দিয়ে তাঁর (শরীর) থেকে মশা-মাছি তাড়াছি।”^{৩৩} ইমাম বুখারী (রঃ) তার এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় কোন এক ‘তাবীরকারী’ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি তাঁর থেকে মিথ্যাকে প্রতিহত করবে।^{৩৪} ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, এটি হলো সেই ঘটনা যা আমাকে সহীহ বুখারী সংকলনে উদ্বুদ্ধ করে।^{৩৫} উপরোক্ত দুটি বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদানে বলা যায় যে, ইমাম বুখারী (রঃ)-এর ‘সহীহ বুখারী’ প্রণয়নের পিছনে দুটি ঘটনাই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। প্রথমত: তিনি তাঁর ওস্তাদ ইসহাক ইবন রাহওয়াই এর আহবান শুনে ‘সহীহ বুখারী’ সংকলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি স্বপ্নে দেখা এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শ্রবণের পর এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে ‘সহীহ বুখারী’ রচনার প্রেক্ষাপট এ দুটি ঘটনা। কিন্তু গ্রন্থটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় যে, শুধু সহীহ হাদীস সংকলন তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। বরং পরিচ্ছেদ শিরোনামে উল্লিখিত দাবীর পক্ষে দলীল উপস্থাপন করা এবং হাদীস থেকে মাসআলা চয়ন করাও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কেননা অনেক সময় তিনি শুধুমাত্র পরিচ্ছেদ শিরোনাম উল্লেখ করেছেন, তার অধীনে কোন হাদীস উল্লেখ করেন নি। উদাহরণ স্বরূপ **باب العلم قبل القول والعمل لقول الله العز وجل فاعلم أنه** তিনি একটি পরিচ্ছেদ শিরোনাম এভাবে লিখেছেন **باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من** এ পরিচ্ছেদের অধীনে ইমাম বুখারী (রঃ) নিজ সনদে কোন হাদীস বর্ণনা করেন নি। বরং অধ্যায় শিরোনামের সপক্ষে শুধুমাত্র আল-কুরআনের আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা প্রথমে ‘ইলম’ অতঃপর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর উল্লেখ করেছেন।^{৩৬} অনুরূপভাবে যাকাত অধ্যায়ে এভাবে একটি পরিচ্ছেদ শিরোনাম লিপিবদ্ধ করেছেন, **باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من** উক্ত আয়াতেই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করে দিয়েছেন।^{৩৭} পরিচ্ছেদটি প্রমাণের জন্য তিনি কোন হাদীস উল্লেখ করেন নি। বরং পরিচ্ছেদ শিরোনামে সূরাহ বাকারার ২৬৩ নং আয়াত দ্বারা এভাবে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যে, হালাল মাল সদকা করে খোটা দিলে তা কবুল করা হয় না। তখন হারাম সম্পদ দ্বারা সদকা করলে তা কবুল হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এরূপ প্রমাণ সমূহের আলোকে বলা যায়, ইমাম বুখারীর (রঃ) হাদীস একত্র করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল না: বরং ফিকহী মাসআলায় তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য মতের উপর দলীল পেশ করাও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।^{৩৮}

এছাড়া সহীহ বুখারী সংকলনের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, হাদীস থেকে মাসআলা চয়ন করা। কেননা ইমাম বুখারী (রঃ) একটি হাদীস বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। কখনও দেখা যায় একটি হাদীস ২২ স্থানে উল্লেখ করেছেন। যদি সহীহ হাদীস একত্র করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য হত, তাহলে একটি হাদীস মাত্র এক জায়গায়

উল্লেখ করেই সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যেত। যখন একটি হাদীস বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে একাধিক স্থানে উল্লেখ করেন, তখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে সে সকল মাসআলা বের করা, যে গুলোর আওতায় তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় সাহাবীর (রা:) উযুতে পা মাসেহ সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। উযুর মধ্যে কয়েকজন সাহাবী তাড়াহুড়ার কারণে পা ধৌত না করে মাসাহ করলেন। রাসূল (সা:) তাদের লক্ষ্য করে বললেন, “পায়ের গোড়ালী শুষ্ক থাকার কারণে জাহান্নামের আগুনের দুঃসংবাদ।” এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (র:) দুটি পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।

১. باب من رفع صوته بالعلم

২. باب غسل الرجل ولا يمسح قدمين

এ হাদীস থেকে তিনি দু’টি মাসআলা বের করেছেন।^{৩৯} যথা: উঁচু আওয়াজে ‘ইলমী আলোচনার বৈধতা ও উযুর মধ্যে পা মাসাহ করা বৈধ নয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ইমাম বুখারী (র:) সহীহ বুখারী সংকলনের উদ্দেশ্য সহীহ হাদীস সমূহ একত্র করার সাথে সাথে হাদীস থেকে ফিকহী মাসআলা প্রমাণের ক্ষেত্রে তার নিকট গ্রহণ যোগ্য ও পছন্দনীয় অভিমতের সপক্ষে দলীল উপস্থাপন করা।

সংকলনের সময়কাল

মুহাদিসগণের অভিমত অনুযায়ী ইমাম বুখারী (র:) ১৬ বছর ধরে সহীহ বুখারী সংকলন করেন। ইমাম বুখারী (র:) নিজেও এমনই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে কখন এ কিতাব সংকলন শুরু করেন এবং কোন সময়ে তা শেষ হয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া^{৪০} (র:)-এর মতে, ইমাম বুখারী (র:) ২১৭ হিজরীতে সহীহ বুখারী সংকলন শুরু করেন। এ সময় তার বয়স ছিল ২৩ বছর। আর ২৩৩ হিজরীতে তা সমাপ্ত করেন।^{৪১} ইমাম বুখারী (র:) এ কিতাব সংকলনের পর মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত মুহাদিস ইয়াহইয়া ইবন মা’ঈন (মৃ.২৩৩ হি:), ‘আলী ইবন আল-মাদীনী (মৃ.২৩৪ হি:) ও আহমদ ইবন হাম্বলের (মৃ.২৪১ হি:) নিকট পেশ করেন। তারা সকলেই গ্রন্থটি দেখে

যে অভিমত পেশ করেন তা এভাবে বর্ণিত হয়েছে: فاستحسنوه وشهدوا انه بالصحة “তারা একে খুবই পছন্দ করেন এবং এটাকে বিশুদ্ধ বলে সাক্ষ্য প্রদান করেন।”^{৪২}

আর ইয়াহইয়া ইবন মা’ঈন (র:) ২৩৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এ থেকেই প্রমাণিত হয় ইমাম বুখারী (র:) ২৩৩ হিজরীর পূর্বেই এ গ্রন্থটির সংকলন কাজ সমাপ্ত করেন। আর আহমদ ইবন হাম্বলের (র:) মৃত্যু হয় ২৪১ হিজরীতে। ‘আলী ইবন মাদীনী ইন্তেকাল করেন ২৩৪ হিজরীতে। এ সমস্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে ইমাম বুখারী (র:) ২৩৩ হিজরীর পূর্বেই এ গ্রন্থটির সংকলন কাজ সমাপ্ত করেন। আর যেহেতু তিনি ১৬ বছর ব্যাপী এ গ্রন্থটি সংকলন করে, তাই সমাপ্তি সময় থেকে ১৬ বছর পূর্ব পর্যন্ত হিসাব করে বলা যায় যে, গ্রন্থটি সংকলন শুরু হয় ২১৭ হিজরীতে।^{৪৩}

ইমাম বুখারীর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে ‘সহীহ বুখারী’। এটিই সহীহ হাদীস সম্বলিত সর্ব প্রথম গ্রন্থ। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, اول من صنف في الصحيح محمد وخص في الترجيح “একমাত্র সহীহ হাদীস সম্বলিত গ্রন্থ সর্ব প্রথম সংকলন করেন ইমাম মুহাম্মদ (র:) এবং এটিই বিশেষভাবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।”^{৪৪} এ সম্পর্কে ইমাম নববী (র:) (মৃ. ৬৭৬ হি:) বলেন, “সর্ব প্রথম সহীহ হাদীস সম্বলিত গ্রন্থ সংকলন করেন ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (র:) এবং এটি বিশেষভাবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।”^{৪৫}

খায়রুদ্দীন আল-যিরকলী (র:) বলেন, “তিনি প্রায় ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং তা থেকে তার সহীহ গ্রন্থে সে সকল হাদীস বাছাই করে নেন যেগুলোর বর্ণনাকারী সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামে এরূপ একটি গ্রন্থ রচনা করেন।”^{৪৬}

সহীহ বুখারী সংকলনে সতর্কতা ও প্রণয়ন পদ্ধতি

ইমাম বুখারী (র:) তার নিকট সংগৃহীত ছয় লক্ষ হাদীস চূড়ান্তভাবে যাচাই-বাছাই করে সহীহ বুখারী গ্রন্থটি সংকলন করেন। প্রতিটি হাদীস লেখার পূর্বে তিনি গোসল করে নিতেন। পরে দু’ রাকা’আত সালাত আদায় করে হাদীসটি সহীহ কিনা সে ব্যাপারে ইস্তেখারা করতেন। অতঃপর হাদীসটি তাঁর গ্রন্থে স্থান দিতেন। তিনি বলেন আমি এ কিতাব ১৬ বছরে সমাপ্ত করেছি। এতে কেবল সহীহ হাদীস একত্র করেছি। দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে আরও যে সকল হাদীস ছেড়ে দিয়েছি তা কম নয়। মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আল-ফিরাবরী (র:) বলেন, ইমাম বুখারী (র:) বলেন, “আমি সহীহ বুখারী গ্রন্থে যে সকল হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি তার পূর্বে গোসল করেছি এবং দু’ রাকা’আত সালাত আদায় করেছি।”^{৪৮}

আবু ‘আলী আল-গাসসানী (র:) ইমাম বুখারী (র:) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (ইমাম বুখারী)(র:) বলেন, আমি ছয় লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে সহীহ বুখারী গ্রন্থটি সংকলন করেছি এবং আমার ও আল্লাহ তা‘য়ালার মাঝে একে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছি।^{৪৯} হাফিয ইবন হাজার আল-আসকালানী (র:) তাঁর সূত্রে ইমাম বুখারী (র:) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি এ গ্রন্থে সহীহ ভিন্ন অন্য কোন হাদীস উল্লেখ করিনি। আর যে সকল সহীহ হাদীস আমি ছেড়ে দিয়েছি (এ গ্রন্থে উল্লেখ করিনি) তার সংখ্যা এর তুলনায় অনেক বেশী।^{৫০}

ইমাম বুখারী (র:) সহীহ বুখারী গ্রন্থ সংকলনে তাঁর জীবনের মূল্যবান ১৬ বছর সময় ব্যয় করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, *صنفت في كتابي الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتي إستخرت الله تعالى و صليت*

“আমি আমার কিতাব সহীহ বুখারী আল-মাসজিদুল হারামে অবস্থান করে লিপিবদ্ধ করেছি। আমি তাতে কোন হাদীস উল্লেখ করার পূর্বে আল্লাহ তা‘য়ালার নিকট ইস্তেখারা করেছি। অতঃপর দু’ রাকা’আত সালাত আদায় করেছি এবং এ হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি।”^{৫১}

ইমাম বুখারী (র:) তার নিজ শহরসহ বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করে সে সকল স্থানে তার হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। অথচ তার উপরোল্লিখিত বক্তব্যে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মাসজিদে হারামে অবস্থান করে তার কিতাব সংকলন করেছেন। বর্ণনাগত এ বিরোধ নিরসন কল্পে হাফিয ইবন হাজার আল-আসকালানী (র:) বলেন,

أنه ابتداءً تصنيفه و ابوابه في المسجد الحرام ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلدي وغيرها و يدل عليه قوله أنه أقام فيه ست عشرة سنة فإنه لم يحاور بمكة هذه المدة كله

“তিনি মাসজিদে হারামে বসে তার গ্রন্থ সংকলন, বিন্যাসকরণ ও পরিচ্ছেদ নির্ধারণের কাজ সূচনা করেন। এর পর তিনি তার শহর সহ বিভিন্ন শহরে গমন করে হাদীস সংগ্রহ করতেন। এর প্রমাণ হচ্ছে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য, তিনি বলেন, ১৬ বছর যাবৎ তিনি এ গ্রন্থ প্রণয়ন কাজে নিযুক্ত ছিলেন। আর এ কথা স্পষ্ট যে, এ সম্পূর্ণ সময় ব্যাপী তিনি মক্কায় অবস্থান করেননি।”^{৫২}

ইবন ‘আদী (র:) একদল মাশায়েখ থেকে বর্ণনা করেন,

إن البخارى حول تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه و سلم ومنبره و كان يصلي لكل ترجمة ركعتين -

“ইমাম বুখারী তার সহীহ বুখারীর শিরোনামসমূহ নবী করীম (সা:)—এর রওয়া এবং তাঁর মিস্বারের মাঝে অবস্থান করে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি প্রতিটি পরিচ্ছেদ শিরোনাম নির্ধারণের সময় দু’ রাকা’আত সালাত আদায় করতেন।”^{৫৩}

হাফিয ইবন হাজার আল-আসকালানী বলেন, এখানেও কোন বিরোধ সৃষ্টি হয় না। কেননা হতে পারে প্রথমে তিনি পাভুলিপি শিরোনাম লিখেছেন। এরপর রিয়াজুল জান্নাতে অবস্থানরত অবস্থায় উক্ত পাভুলিপি থেকে নকল করেছেন।^{৫৪}

সহীহ বুখারী গ্রন্থটি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট গৃহীত হয়। এ সম্পর্কে আবু যায়দ আল-মিরওয়াযী (র:) বলেন,
 كنت نائما بين الركن والمقام فرايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا أبا زيد إلي متي تدرس كتاب
 الشافعي ولا تدرس كتابي فقلت يا رسول الله؟ وما كتابك قال جامع محمد بن إسماعيل-

“আমি (কা'বার) রুকন ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে ঘুমিয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূল (সা:) কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমায় বললেন, হে আবু যায়দ! আর কতকাল তুমি শাফিঈর কিতাব অধ্যয়ন করবে? তুমি আমার গ্রন্থটি কেন অধ্যয়ন করছ না? আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! আপনার কিতাব কোনটি? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈলের ‘সহীহ বুখারী।’”^{৫৫}

ইমাম বুখারী (র:) তার পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত করে তৎকালীন প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট যাচাইয়ের জন্য পেশ করলে সকলেই এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে আবু জা'ফর আল-উকাইলী (র:) উক্তিটি প্রনিধাণযোগ্য। আবু জা'ফর আল-উকাইলী বলেন, “ইমাম বুখারী (র:) তাঁর কিতাব সহীহ বুখারী সংকলনের পর যখন ‘আলী ইবন আল-মদীনী (র:), আহমদ ইবন হাম্বল(র:), ইয়াহইয়া ইবন মা'জিন প্রমুখের নিকট পেশ করেন, তখন তারা সকলেই গ্রন্থটিকে উৎকৃষ্ট বলে স্বীকৃতি দেন। তবে তারা এর চারটি হাদীসের ব্যাপারে সমালোচনা করেন।^{৫৬} আবু জাফর আল-উকাইলী এ চারটি হাদীস সম্পর্কে বলেন, القول فيها قول البخاري و هي صحيحة “এ ব্যাপারে বুখারীর (র:) অভিমতই সঠিক এবং সেগুলো বিশুদ্ধ।”^{৫৭}

সংকলনের শর্তাবলী

যে সকল শর্তের ভিত্তিতে ইমাম বুখারী (র:) তার সহীহ গ্রন্থে হাদীস সংকলন করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শর্ত নিম্নরূপ:

১. হাদীসের সনদ মুত্তাসিল (ধারাবাহিক) হতে হবে। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (র:)-এর শায়খ থেকে শুরু করে সাহাবী পর্যন্ত বর্ণনাকারীগণের ধারাবাহিকতা ঠিক থাকতে হবে, সনদের কোথাও কোন রাবী বা বর্ণনাকারী বাদ পড়বে না।
২. বর্ণনাকারীগণ মুসলিম ও সত্যবাদী হওয়ার পাশাপাশি তাদলীস (মুদাল্লাস) মুক্ত হতে হবে।
৩. বর্ণনাকারীকে ন্যায়পরায়ণ (আদেল), সংরক্ষণকারী, স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন, জ্ঞানী এবং সঠিক ‘আকিদার অধিকারী হতে হবে।
৪. বর্ণনাকারী ও তাঁর শায়খ সময়গুণের হতে হবে এবং তাদের মধ্যে সাক্ষাত হতে হবে।^{৫৮}

সহীহ বুখারীর হাদীস সংখ্যা

ইমাম বুখারী (র:) অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরবিচ্ছিন্ন সাধনার মাধ্যমে ছয় লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে তার সহীহ বুখারী গ্রন্থটি সংকলন করেন। এ জন্য তিনি তার জীবনের মূল্যবান ১৬ বছর সময় ব্যয় করেন।^{৫৯} এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র:)-এর উক্তিটি প্রনিধাণযোগ্য। তিনি বলেন,

أخرجت هذا الكتاب من نحو ست مائة ألف حديث، وصنفته في ست عشر سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله-
 “আমি প্রায় ছয় লক্ষ হাদীস হতে এ কিতাব প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেছি। আর এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করতে ১৬ বছর সময় লেগেছে। আমি এ গ্রন্থটিকে আমার ও আল্লাহর মধ্যবর্তী ব্যাপারের জন্য অকাট্য দলীলরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি।”^{৬০}

এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ J. Robson এর সূত্রে উল্লেখ করেন, His most famous is the sahih which took him sixteen years to compile. It is said that he selected his traditions from a mass of 600000 and that he did not insert a tradition in the book.”

“তঁার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সহীহ বুখারী, যা সংকলনে ১৬ বছর সময় লেগেছিল এবং তিনি ছয় লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে গ্রন্থটি নির্বাচিত করেন। যাচাই-বাছাই ব্যতীরেকে একটি হাদীসও তিনি গ্রন্থে স্থান দেন নাই।”^{৬১}

এ হাদীস গ্রন্থটিতে কতগুলো হাদীস রয়েছে এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা বদর উদ্দীন ‘আইনী’^{৬২} (মৃ. ৮৫৫ হি:) ও ইবন আস-সালাহ^{৬৩} (মৃ. ৬৪৩ হি:) এর মতে পুনরুজ্জিসহ সহীহ বুখারীর হাদীস সংখ্যা ৭২৭৫। পুনরুজ্জি ব্যতীত হাদীস সংখ্যা হবে ৪০০০।^{৬৪}

এ প্রসঙ্গে আল্লামা নববী (র:) বলেন,

جملة ما في صحيح البخاري من الاحاديث المسندة سبعة الف و مائتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة و بحذف المكررة نحو أربعة آلاف-

“সহীহ বুখারীতে সনদ বিশিষ্ট মোট হাদীসের সংখ্যা ৭২৭৫ টি। এতে পুনরুক্ত হাদীসসমূহ অন্তর্ভুক্ত। আর পুনরুক্তিহীন হাদীসসমূহ বাদ দিলে এর সংখ্যা দাড়ায় প্রায় চার হাজার।”^{৬৫}

ইবন হাজার আল-আসকালানী বলেন, সহীহ বুখারীতে মু‘আল্লাক^{৬৬} মুতাবি^{৬৭} মাওকুফ^{৬৮} হাদীস ব্যতীত পুনরুক্তিহীন হাদীসসহ মোট হাদীসের সংখ্যা ৭৩৯৭টি। পুনরুক্তি ব্যতীত যে সকল মুত্তাসিল^{৬৯} হাদীস রয়েছে তার সংখ্যা ২৬০২। সহীহ বুখারীর কোথাও মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়নি এমন মু‘আল্লাক ও মাওকুফ^{৭০} হাদীসের সংখ্যা ১৫৯টি। সুতরাং পুনরুক্তিহীন হয়নি এমন হাদীস রয়েছে ২৭৬১টি। আর এগুলোর মধ্যে মু‘আল্লাক হাদীস রয়েছে ১৩৪১টি।^{৭১}

সহীহ বুখারীতে মুতাবি এবং বর্ণনার ভিন্নতা সম্পর্কে অবহিতকরণ কল্পে ৩টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুখারীর যে সকল হাদীস কোন সাহাবী থেকে মাওকুফ রূপে, কোন তাবি‘ঈ বা তাবি‘ঈ তাবি‘ঈন কিংবা তৎপরবর্তীদের থেকে ‘মাকতু’ রূপে বর্ণিত হয়েছে, ইবন হাজার আল-আসকালানী (র:) তার পরিসংখ্যানে সে সকল হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেননি। সুতরাং মাওকুফ ও মাকতু’^{৭২} হাদীস ব্যতীত পুনরুক্তিহীন সহীহ বুখারীতে উল্লিখিত হাদীসের সংখ্যা দাড়ায় ৯০৮২টি।^{৭৩}

সহীহ বুখারীতে উল্লিখিত হাদীসের সংখ্যা গণনায় মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতপার্থক্য হওয়ার উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হলো, ইমাম বুখারীর নিকট হতে তার বিভিন্ন ছাত্র বিভিন্ন সময়ে এ গ্রন্থটি শ্রবণ করে। তাদের নিকট সংরক্ষিত হাদীসের সংখ্যার ক্ষেত্রে কম-বেশী হওয়ার কারণে সহীহ বুখারীর হাদীসের সংখ্যা গণনায় পার্থক্য সূচিত হয়। আবদুল আযীয আল-খাওলী বলেন, ইমাম বুখারী (র:) তাঁর সহীহ গ্রন্থে মু‘আল্লাক, মাওকুফ ও মাকতু হাদীস উল্লেখ করেছেন, তবে সেগুলো তাঁর কিতাবের মূল বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং সেগুলোকে মূল বিষয়বস্তুর অনুগামী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ জন্যই এ গুলোর বর্ণনা মূল হাদীস থেকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন, যাতে উভয়ের মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।^{৭৪} এ ছাড়া এ গ্রন্থটিতে ২২টি সুলাছিয়াত^{৭৫} হাদীস রয়েছে এবং ১৬০টি অধ্যায় ও ৩৪৫০টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

সহীহ বুখারীর বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীতে যত গ্রন্থ রয়েছে তার প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আপন মহিমায় সমুজ্জল। এমনিভাবে ইমাম বুখারী বিরচিত ভূবন বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সহীহ বুখারীরও রয়েছে কতিপয় অনন্য বৈশিষ্ট্য। আর এ সকল বৈশিষ্ট্য এ গ্রন্থটিকে দান করেছে স্বতন্ত্র মর্যাদা। এ সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ যুবাইর সিদ্দিকীর উক্তি প্রনির্ধারণযোগ্য। তিনি বলেন,

Muslim world gained its respectful regard and recognized as an authority next only to the Quran.

“মুসলিম বিশ্ব সহীহ বুখারী গ্রন্থটিকে আল-কুরআনের পর সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।”^{৭৬}

নিম্নে সহীহ বুখারীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো:

১. ইমাম বুখারী (র:) বাবের (পরিচ্ছেদের) অন্তর্ভুক্ত হাদীসগুলোর মর্মার্থ ও শিক্ষার উপর ভিত্তি করে الباب ترجمه নির্ধারণ করেছেন। এ সম্পর্কে J. Robson বলেন,

The titles of the babs are meant to indicate the subject-matter and teaching of the tradition they contain.

“(সহীহ বুখারীর) বাব বা পরিচ্ছেদের শিরোনাম উহার অন্তর্গত বিষয়বস্তু ও শিক্ষার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে।”^{৭৭}

২. সহীহ বুখারীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, অধ্যায়ের শিরোনামের বক্তব্য অনুযায়ী আল-কুরআনের আয়াত সংযোজন। এর মাধ্যমে হাদীসের বক্তব্যের সাথে আল-কুরআনের আয়াত মিলিয়ে দেখার অপূর্ব সুযোগ লাভ করা যায়। উপরন্তু ইমাম বুখারী (র:) আল-কুরআনের আয়াত সংযোজন করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে আসলে আল-কুরআনে প্রতিটি বিষয়ের জ্ঞান রয়েছে কিন্তু সাধারণ মানুষ তা উপলব্ধি করতে অক্ষম। এ সম্পর্কে ড. যুবাইর সিদ্দিকী বলেন,

About the headings of the various chapters in the Sahih it has been aptly remarked that in them consists the Fiqh of al-Bukhari. These headings consists of verses from the Qur'an or the passages from traditions.

“সহীহ বুখারীর বিভিন্ন অনুচ্ছেদ শিরোনাম ইমাম বুখারীর ফিকহ জ্ঞানের প্রমাণ বহন করে। এ শিরোনামগুলো আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও ইসলামী ঐতিহ্যের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করে।”^{৭৮}

৩. সহীহ বুখারীতে সুলাসিয়াত হাদীসের সংখ্যা ২২টি। এদের মধ্যে পুনরুক্তি বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ১৬ টি। এ সুলাসিয়াত গুলো গ্রন্থটিকে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। কেননা হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে এত অধিক সংখ্যক সুলাসিয়াতের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।^{৭৯}

৪. ইমাম বুখারী (র:) বিভিন্ন অনুচ্ছেদে হাদীস থেকে ফিকহী মাসআলার সমাধান, জীবন চরিত ও আল-কুরআনের ব্যাখ্যার সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে J. Robson বলেন,

The work in the main is arranged according to the various matters of fiqh; but it also contains other material as on the beginning of on creation, on paradise and hell, on Muhammad, on Quran , commentary etc.

“এ গ্রন্থে (সহীহ বুখারী) প্রধাণত যে বিষয়গুলো বিন্যস্ত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ফিকহের বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ, এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে, সৃষ্টির প্রারম্ভিক বর্ণনা, বেহেশত এবং দোজখ, মুহাম্মদ (সা:), আল-কুরআন ও বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও টীকা ইত্যাদি।”^{৮০}

৫. ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারী গ্রন্থে হাদীস সংকলনের ব্যাপারে কঠোর শর্তারোপ করেছেন। এ গ্রন্থে কোন হাদীস অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি এ শর্তারোপ করেছেন যে, তাঁর শাযখ থেকে শুরু করে সাহাবী পর্যন্ত সকল বর্ণনাকারী যেন সিকাহ^{৮১} ও মুত্তাখিল হয়। এজন্য তিনি কোন কোন স্থানে قال

بإسناد صحيح ব্যবহার করেছেন। তবে এ ধরনের শব্দাবলী তিনি এসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন, যে সকল

স্থানে বর্ণনাকারীর বর্ণনা তার শর্তের আলোকে হয়নি। আবার কোথাও কোথাও তিনি قال فلان এর স্থলে حدثنا فلان ব্যবহার করেছেন।^{৮২}

৬. ইমাম বুখারী (র:) মাসআলার استنباط বা উদ্ভাবনকল্পে একই জাতীয় হাদীসকে বিভিন্ন অধ্যায়ে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন।^{৮৩} যেমন সহীহ বুখারীর ১৩টি স্থানে ، إِنْشَاءُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ^{৮৪} ব্যবহার করেছেন।
৭. সহীহ বুখারী গ্রন্থের সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে একটি সুসম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন এ গ্রন্থটির সূচনা করা হয়েছে، إِنْشَاءُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ، তথা নিয়্যত এর হাদীসের মাধ্যমে। কেননা নিয়্যতের উপর সকল কাজ নির্ভরশীল। আর সমাপ্তি করা হয়েছে، كتاب التوحيد তথা তাওহীদ বিষয়ক হাদীসের মাধ্যমে। কারণ তাওহীদ হচ্ছে আখিরাতের মুক্তির একমাত্র মাপকাঠি। তাওহীদ ব্যতীত সকল কাজই প্রকৃত অর্থে অর্থহীন।^{৮৫}
৮. সহীহ বুখারী গ্রন্থাবদ্ধ করার সময় কখনো লেখার কাজ স্থগিত থাকলে পুনরায় তা শুরু করার সময় তাসমিয়াহ তথা بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ দ্বারা শুরু করতেন। ফলে এ হাদীস গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে তাসমিয়াহ পরিলক্ষিত হয়।^{৮৬}
৯. এ গ্রন্থের হাদীস অধ্যয়নে পাঠকদের সুবিধার জন্য হাদীসের মধ্যে ব্যবহৃত দূর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যায় আল-কুরআনের শব্দ ও তাফসীরকারকগণের অভিমত উল্লেখ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আয়াত উল্লেখ না করে শুধু কিছু শব্দ তুলে ধরেছেন। যাতে হাদীসের মর্মার্থ সহজে অনুধাবন করা যায়।
১০. মুহাদ্দিসগণের ঐক্যমতে সমগ্র পৃথিবীতে সহীহ বুখারী সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ বলে স্বীকৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে জমহুর আলিমগণ বলেন، أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ تَحْتَ السَّمَاءِ صَحِيحُ الْبَخَارِيِّ
“আল্লাহর কিতাবের পর আকাশের নীচে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ বুখারী।”^{৮৭}
১১. সহীহ বুখারীতে মু'আল্লাক, মাওকুফ ও মাকতূ হাদীস পরিলক্ষিত হয়। তবে এগুলো গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো শুধু অনুগামী হিসেবে সাহায্যার্থে এবং ইসতিশাহদের (সহায়ক) জন্য বর্ণিত হয়েছে। আর এ কারণেই এ গুলোর বর্ণনা মূল হাদীস থেকে ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যাতে উভয়ের মাঝে পার্থক্য স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।
১২. সহীহ বুখারীতে কোন কোন স্থানে হাদীসের খন্ডায়ন^{৮৮} পরিলক্ষিত হয়। ইমাম বুখারী (র:) কেবলমাত্র সে সময়ই একটি হাদীসকে খন্ডাকারে একাধিক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেন, যখন হাদীসের মূল পাঠে দু'টি হুকম বিদ্যমান থাকে। এমতাবস্থায় তিনি একটি হুকম এক অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং যখন হাদীসটির দ্বিতীয় অংশ উল্লেখ করেন তখন সনদ পরিবর্তিত হয়, যেন সনদ আধিক্যের উপকারিতা অর্জিত হয়।^{৮৯}
১৩. এ গ্রন্থে মুতাবি' এবং রিওয়াতের ভিন্নতা সম্পর্কে অবহিতকরণ প্রসঙ্গে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সংখ্যা ৩৪৪টি।
১৪. ইমাম বুখারী (র:) তাঁর সহীহ গ্রন্থে কোন কোন স্থানে 'ইখতিসার'^{৯০} করেছেন। সহীহ বুখারীতে কেবলমাত্র সাহাবীর ঐ সকল উক্তির ক্ষেত্রে ইখতিসার করা হয়েছে, যার কতিপয় অংশ

বিধানগতভাবে মারফু’। এমতাবস্থায় তিনি মারফু’ অংশটুকু গ্রহণ করে মাওকুফ অংশটুকু ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন হুযাইল ইবন শুরাহবীলের হাদীস, «إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ»

“ইসলামের ধারক-বাহকরা সায়েবা বানায় না। জাহিলী যুগের লোকেরা সায়েবা বানাত।” হাদীসের পূর্ণ রেওয়াজটি নিম্নরূপ:

جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال إني اعتقت عبداً إلى سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثاً فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الإسلام كانوا يسيبون ولي نعمته فلك ميراثه فإن تأثمت و تخرجت تخرجت في شيء فنحن نقبله منك ونجعله في بيت المال-

উপরোক্ত হাদীসের যে অংশটুকু ইমাম বুখারী (র:) বর্ণনা করেছেন, সেটুকু অর্থের ব্যাপকতার কারণে রাসূলুল্লাহর (সা:) থেকে বর্ণিত হওয়ার দাবী রাখে। এজন্য সে অংশটুকু মারফু’ হুকম হিসাবে তিনি তাঁর সহীহ গ্রন্থে ইখতিসার করেছেন।^{৯১}

১৫. ইমাম বুখারী (র:) তাঁর সহীহ গ্রন্থে শরী’আতের নির্দেশ মালার বর্ণনা থেকে শূন্য রাখা সমীচীন মনে করেননি। তাই তিনি আপন বুদ্ধিমত্তা ও উপলব্ধির মাধ্যমে হাদীসের মতন থেকে বহু অর্থ ও তথ্য উদঘাটন করে কিতাবের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে বিভক্ত করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে তিনি আল-কুরআনের আহকাম বিশিষ্ট আয়াতসমূহ চয়ন করে সেগুলো থেকে অভিনব ইঙ্গিতসমূহ উদঘাটন করেন। আর সেগুলোর তাফসীরের প্রতি ইশারা করতে গিয়ে তিনি সঠিক পথেই বিদ্যমান থাকেন।^{৯২}

তরজমাতুল বাব-এর ব্যাখ্যা

ইমাম বুখারীর (র:)-এর ভূবনজয়ী গ্রন্থ সহীহ বুখারী শুধুমাত্র একটি হাদীস গ্রন্থই নয়। বরং এতে সন্নিবেশিত হয়েছে নানাবিধ জ্ঞানের এক বিশাল ভান্ডার। এর প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শিরোনামে গচ্ছিত রয়েছে শরী’আতের বিভিন্ন প্রকার ‘ইলম। এ গ্রন্থের পরিচ্ছেদ শিরোনামের বিশ্বজোড়া খ্যাতি রয়েছে। ইমাম বুখারী (র:) তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, সুগভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে হাদীসের মতন (মূলপাঠ) থেকে বহু সারগর্ভ বিষয়াবলী উদঘাটন করেছেন এবং সেগুলোকে বিভিন্ন বাবের (অনুচ্ছেদ) শুরুতে সন্নিবেশিত করেছেন। তাছাড়া তিনি আল-কুরআনের আহকাম (হুকম বিষয়ক) সম্বলিত কতিপয় আয়াত তরজমাতুল বাব-এর মাঝে উল্লেখ করে সেগুলোর মাধ্যমে অভিনব পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। শুধুমাত্র পরিচ্ছেদের অধীনে হাদীস বর্ণনা করাই ইমাম বুখারীর (র:) উদ্দেশ্য নয়। বরং মাসআলা উদ্ভাবন ও নির্ধারিত শিরোনামের সপক্ষে দলীল উপস্থাপন করাও ইমাম বুখারীর (র:) অন্যতম লক্ষ্য। এ কারণে তিনি অনেক স্থানে হাদীসের সনদ উল্লেখ না করে শুধু একথা বলে ক্ষ্যান্ত হয়েছেন, «فيه فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم» - “অমুক ব্যক্তি এ সম্পর্কে নবী কারীম (সা:) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।” আবার কখনও কখনও সনদ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র মতন উল্লেখ করেন। কখনও তিনি হাদীসকে মু’আল্লাক পদ্ধতিতে বর্ণনা করেন। এভাবে বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো, তিনি শিরোনাম নির্ধারণ করে যে দাবী উত্থাপন করেছেন, তার সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করা। এজন্য কোন কোন পরিচ্ছেদ শিরোনামে শুধুমাত্র একটি হাদীস আবার কোথাও আল-কুরআনের একটি মাত্র আয়াত উল্লেখ করেছেন।^{৯৩}

ইবন হাজার আল-আসকালানী সহীহ বুখারীকে হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থের উপর অগ্রাধিকার প্রদানের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

الجهة العظمى الموجبة لتقديمه وهي ما ضمنه أبوابه من التراجم التي حيرت الأفكار وادهشت العقول والأبصار وإنما بلغت هذه الرتبة وفازت بهذه الخطوة لسبب عظيم أوجب عظمها وهو ما رواه أبو أحمد بن عدي عن القدوس بن همام قال شهدت عدة مشائخ يقولون حول البخاري تراجم جامعته يعني بيضا بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين-

“সহীহ বুখারী গ্রন্থের অধিকার প্রাপ্তির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এর বাব গুলো এমন শিরোনাম অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে, যা ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনাকে ব্যাকুল করে দেয়। জ্ঞান-বুদ্ধি ও অন্তর চক্ষুকে দিশেহারা করে তোলে। আর এ শিরোনামগুলো মর্যাদার এ সুউচ্চ স্তরে উপনীত হওয়ার পিছনে একটি বৃহৎ কারণ নিহিত রয়েছে। তা হলো আবু আহমদ ইবন আদী এর বর্ণনা, এটি তিনি কুদ্দুস ইবন হাম্মাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইমাম বুখারী (র:) সম্পর্কে কতিপয় শায়খের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম। তাঁরা বলেছেন, ইমাম বুখারী (র:) তাঁর আল-জামি' গ্রন্থের পরিচ্ছেদ শিরোনাম রচনা করেছেন নবী কারীম (সা:)-এর সমাধি ও তাঁর মিম্বারের মাঝে অবস্থান করে। তিনি প্রত্যেক শিরোনাম প্রণয়নের পূর্বে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।”^{৯৪}

সহীহ বুখারী গ্রন্থটি পাঠ করলে দেখা যায় যে, এ গ্রন্থের শিরোনামে বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আর এর দ্বারাই ইমাম বুখারীর পাণ্ডিত্য ও সুক্ষদর্শিতাও প্রকাশ পেয়েছে। সকল যুগের হাদীস বিজ্ঞানী ও ফিকহবিদগণ একে ইমাম বুখারীর সুক্ষপ্রতিভার পরিচয় উল্লেখ করে বলেন, তিনি তরজমাতুল বাব সম্পর্কিত বিষয়ে আল-কুরআনের আয়াত, সাহাবী ও তাবয়ীগণের বক্তব্য এবং ফুকাহাদের অভিমত উল্লেখ করে গভীর চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা সঠিক মত উদ্ভাবন করেছেন। এ মর্মে তিনি এ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে একই রিওয়ায়াত পুনরুল্লেখ করেছেন। যেমন: হযরত বারীরা (রা:) সম্পর্কিত ঘটনাটি ২০ বার উল্লেখ করেছেন। তিনি ফিকহ বিষয়ে কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা না করে স্বীয় ফিকহী মতকে তরজমাতুল বাবে উল্লেখ করেছেন। এতেই এর গুরুত্ব ও মর্যাদা স্বীকৃত হয়।^{৯৫} নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. অনেক ক্ষেত্রে শিরোনাম ও অধীনস্ত হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। এ ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (র:)-এর উদ্দেশ্য হলো, শিরোনামের অধীনে উল্লিখিত হাদীস সম্পর্কে পাঠককে অবহিতকরণ।
২. কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হাদীসের সাথে পরিচ্ছেদ শিরোনামের বাহ্যিক কোন মিল নেই। বরং হাদীস থেকে একটি সুক্ষ বিষয় উদ্ঘাটন করে তার আলোকে তিনি শিরোনাম লিপিবদ্ধ করেছেন। এমতাবস্থায় শিরোনাম ও অধীনস্ত হাদীসের মাঝে মিল খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন: **بابُ بَدْءِ الْوُحْيِ** পরিচ্ছেদের প্রথমে তিনি নিয়তের হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ:

حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى ديار يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما جاهر إليه)

উল্লেখিত হাদীসে শিরোনামের সাথে প্রত্যক্ষভাবে মিল না থাকলেও পরোক্ষভাবে মিল রয়েছে। হাদীসটির মধ্যে **هجرة** শব্দের অর্থ, প্রস্থান বা স্থান ত্যাগ। আর হিজরতের সময় মহানবী (সা:) বাড়ী ত্যাগ করে গুহায় অবস্থান করেছিলেন। অন্যদিকে সর্বপ্রথম ওহীর সূচনা হয় গুহায়।

৩. কখনও কখনও শিরোনামে কোন বিষয়ের দাবী উত্থাপন করে তার অধীনে হাদীস উল্লেখ করে তা দ্বারা দলীল পেশ করা হয়।
৪. কখনও কখনও কোন বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা বশত: শিরোনাম লিপিবদ্ধ করা হয়। জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ এ দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকেন।
৫. কোন কোন সময়ে ইমামগণের মতভেদ পূর্ণ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন মতের সপক্ষে শিরোনাম নির্ধারণ না করে প্রশ্নের আকারে শিরোনাম উল্লেখ করেন। যেন এ বিষয়ে পাঠকের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে। ইচ্ছা করলে পাঠক যে কোন একটি মত গ্রহণ করতে পারেন।
৬. কখনও কখনও ইমাম বুখারী (র:) পরিচ্ছেদ শিরোনামকে সে বাবে উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
৭. কখনও কখনও পরিচ্ছেদ শিরোনামে হাদীসের বর্ণনাগত ভিন্নতার প্রতি ইঙ্গিত করেন। যেমন, তিনি السمرقاني থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।
তরজমাতুল বাবের সাথে তার কোন মিল নেই। কিন্তু হাদীসের অপর সনদে বর্ণিত হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে বলেই তিনি তা উল্লেখ করেছেন।
৮. ইমাম বুখারী (র:) মাঝে মাঝে একই শিরোনামের অধীনে অনেকগুলো হাদীস একত্রিত করেন। যার প্রত্যেকটি হাদীসের সাথে শিরোনামের মিল থাকা আবশ্যিক নয়। বরং হাদীসসমূহের কোন একটির সাথে মিল থাকাই যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হবে।
৯. কোন কোন ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (র:) প্রশ্নবোধক শিরোনাম নির্ধারণ করেন। যেমন তিনি বলেন,
باب هل يكون كذا او من قال كذا ؟ (এরূপ হবে কি? অথবা কে এরূপ বলেছেন?) যে সকল ক্ষেত্রে ইমাম বুখারীর নিকট দু'টি সম্ভাবনাময় বিষয়ের কোন একটি নিশ্চিত নয় সে ক্ষেত্রে তিনি এরূপ করে থাকেন।^{৯৬}
১০. কখনও কখনও ইমাম বুখারীর (র:) শিরোনাম প্রকাশ্যভাবে তেমন তাৎপর্যময় বলে মনে হয় না। তবে গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে তা অতি উপকারী বলে মনে হয়। যেমন, ইমাম বুখারী (র:) বলেন,
باب قول الرجل ما صلينا- এর ব্যাখ্যায় ইবন হাজার আল-আসকালানী বলেন (র:) বলেন, এ শিরোনাম নির্ধারণের মাধ্যমে ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো, ঐ ব্যক্তির মতকে প্রত্যাখ্যান করা যিনি এরূপ
باب قول ما صلينا- বলা অপছন্দ করেন। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারীর নির্ধারিত শিরোনাম
باب قول الرجل فانتنا الصلوة এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ ব্যক্তির মতকে খন্ডন করা যিনি এরূপ শব্দ ব্যবহার করাকে অপছন্দ করেন।^{৯৭}
১১. কোন কোন সময়ে ইমাম বুখারী (র:) তাঁর পরিচ্ছেদ শিরোনামে এমন বিশেষ অবস্থার বিবরণ প্রদান করেন, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয় না। যেমন, باب استيائك الإمام بحضرة رعيته “ইমামের তাঁর প্রজার সন্মুখে মিসওয়াক করা। এ পরিচ্ছেদ শিরোনাম নির্ধারণের উদ্দেশ্য হলো, এমন ব্যক্তির ধারণাকে খন্ডন করা, যে মনে করে মিসওয়াক করা একটি নিম্ন মানের কাজ, এটি গোপনে করাই ভদ্রতার পরিচায়ক। লোক সন্মুখে তা না করাই উচিত। ইমাম বুখারী (র:) এ পরিচ্ছেদের মাধ্যমে এ ভুল ধারণা দূরীভূত করার প্রয়াস পেয়েছেন। কেননা মিসওয়াক করা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাময় একটি কর্ম। তা কোন নিম্ন মানের কর্ম নয়। সুতরাং লোক সন্মুখে তা করা দোষণীয় নয়।

১২. কোন কোন সময় ইমাম বুখারী (র:) এমন পরিচ্ছেদ শিরোনাম লিপিবদ্ধ করেন যার মাধ্যমে তাঁর শর্তানুসারে সহীহ নয় এমন হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেন। যেমন তিনি, **باب الأمراء من قريش** শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন। এটি হযরত আলী (রা:) বর্ণিত হাদীসের **هَبْ** শব্দমালা। কিন্তু এ হাদীসটি ইমাম বুখারীর শর্তানুসারে সহীহ নয়। তিনি এ অনুচ্ছেদে **“لا يزال وال من قريش”** শাসক থাকবে সর্বদা কুরাইশ গোত্র থেকে।” এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।
১৩. কখনও কখনও ইমাম বুখারী (র:) এমন হাদীসাংশ দ্বারা শিরোনাম নির্ধারণ করেন যে হাদীস তাঁর শর্তানুসারে সহীহ নয়। এরূপ স্থানে তিনি শিরোনামের অধীনে অপর কোন হাদীস অথবা আল-কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেন। এ দ্বারা তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেন যে, এ শিরোনামের অধীনে আমার শর্তানুসারে কোন বিশুদ্ধ হাদীস আমার জানা নেই।^{৯৮}
১৪. কখনও কখনও ইমাম বুখারী (র:) ঐতিহাসিক ঘটনাবলী উল্লেখ করার জন্য পরিচ্ছেদ শিরোনাম উল্লেখ করেন। যেমন, **باب ذكر قحطان**।
১৫. কোন কোন সময় ইমাম বুখারী (র:) প্রচ্ছন্ন কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদানকল্পে শিরোনাম নির্ধারণ করেন। যেমন, **باب ترك الحائض الصوم** ঋতুকালীন সময় সালাত ও সিয়াম উভয়টি ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। সালাত ত্যাগ করার বিধান বোধগম্য। কেননা সালাতের জন্য পবিত্রতা পূর্বশর্ত, আর এ অবস্থায় মহিলাগণ অপবিত্র। কিন্তু সিয়াম ত্যাগ করার বিধানটি বোধগম্য নয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে যে, এ হুকম কেন দেওয়া হলো? সিয়াম পালনের জন্য তো পবিত্রতার শর্তারোপ করা হয়নি। ইমাম বুখারী (র:) উল্লিখিত শিরোনাম নির্ধারণ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ ক্ষেত্রে হুকমটি আনুগত্য সূচক। এতে যুক্তি প্রদর্শনের কোন সুযোগ নেই।^{৯৯}
- ইমাম বুখারীর (র:) সহীহ বুখারী সংকলনের উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, ইমাম বুখারীর (র:) মূল উদ্দেশ্য ছিল সহীহ হাদীস সংকলনের পাশাপাশি মাসআলা উদঘাটন করা। কিন্তু এ কিতাবের যে বৈশিষ্ট্যের কারণে পন্ডিতগণের নিকট এর অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা হলো, এর পরিচ্ছেদ শিরোনাম। তা না হলে যে মহাপুরুষের নিকট প্রায় ছয় লক্ষ হাদীসের বিশাল ভান্ডার সংরক্ষিত ছিল, সেখান থেকে প্রায় দশ হাজার হাদীস নির্বাচন করতে ১৬ বছর সময় লাগবে কেন? সারকথা হলো, ইমাম বুখারী (র:) এমন উচ্চমানের পরিচ্ছেদ শিরোনাম লিখে গেছেন তাঁর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কেউই তার সমকক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। যেন এ দরজা তিনি উন্মুক্ত করে আবার তিনিই বন্ধ করে দিয়েছেন।

গ্রন্থ সমালোচনা ও তার জবাব

‘হাদীস শাস্ত্রের পন্ডিতগণ সহীহ বুখারীর ১১০টি হাদীসের সমালোচনা করেছেন। তন্মধ্যে ৩২টি হাদীস এমন রয়েছে যেগুলো ইমাম মুসলিম (র:) তাঁর সহীহ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অবশিষ্ট ৭৮টি হাদীস ইমাম বুখারী (র:) এককভাবে তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ সকল সমালোচিত হাদীসের জবাব প্রদানকল্পে ইবন হাজার আল-আসকালানী (র:) তার ফাতহুল বারী গ্রন্থের ভূমিকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় সমালোচনা ও তার জবাব নিম্নরূপ:

ইমাম দারাকুতনী^{১০০} (র:) বলেন, ইমাম বুখারী (র:) ও ইমাম মুসলিম (র:) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস ইমাম যুহরী (র:) থেকে এবং তিনি হযরত আনাস (রা:) থেকে বর্ণনা করেন। হাদীসটি নিম্নরূপ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كُنَّا نَصَلِّيُ الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ»

“হযরত আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমরা ‘আসরের সালাত আদায় করার পর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কুবার দিকে যাত্রা করতেন এবং সেখানে যখন পৌছাতেন তখনও সূর্য ওপরে অবস্থান করত।”^{১০১}

এ হাদীসটির বিষয়ে ইমাম মালিক (র:)—এর সমালোচনা করা হয়। কারণ তিনি হাদীসটিকে মারফু’ বলে অভিহিত করেছেন এবং স্থানটিকে কুবা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অনেক রাবী (বর্ণনাকারী) স্থানের নাম ভিন্ন বলে অভিহিত করেছেন। তারা হলেন শু‘আয়ব ইবন আবী হামযাহ, সালিহ ইবন কায়সান, ‘আমর ইবন হারিস, ইউনুস ইবন ইয়াযিদ, মা‘মার, লাইস ইবন সা‘দ, ইবন আবী যি‘ব প্রমুখ। ইমাম নাসাঈ (র:)ও উক্ত হাদীসে ইমাম মালিক (র:)—এর সমালোচনা করেছেন। তাঁর সমালোচনাও কুবা স্থান সম্পর্কে। উল্লিখিত রাবীগণের সকলেই এখানে বলেছেন, *الى العوالي* অর্থাৎ স্থানটি কুবা নয় বরং ‘আওয়ালী বলেছেন। এ সমালোচনার জবাবে আল্লামা ইবন হাজার আল-আসকালানী বলেন,

و مثل هذا الوهم اليسير لا يلزم منه القدر في صحة الحديث لا سيما وقد اخرجنا الرواية المحفوظة

“এরূপ সামান্য ভুলের কারণে হাদীসের বিশ্বস্ততায় দোষ আরোপিত হয় না। বিশেষত: ইমাম বুখারী (র:) এবং ইমাম মুসলিম (র:) সংরক্ষিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।”^{১০২}

ইমাম দারা কুতনী (র:) বলেন, ইমাম বুখারী (র:) এবং ইমাম মুসলিম (র:) উভয়ই ‘আফ্ফান (র:) এর হাদীস তাঁদের সহীহ গ্রন্থে ওহায়ব থেকে তিনি আবু হায়্যান থেকে তিনি আবু যুর‘আহ থেকে তিনি আবু হুরায়রাহ (রা:) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি নিম্নে বর্ণিত হলো,

أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ذُلِّي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ» قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، فَلَمَّا وُلِّي، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا»

“জৈনক বেদুইন সাহাবী নবী করীম (সা:)—কে বললেন, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন, যা করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর ‘ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। ফরয নামায কয়েম করবে, নির্ধারিত যাকাত প্রদান করবে এবং রমযান মাসে সিয়াম পালন করবে। লোকটি বলল, শপথ সে সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু করব না। যখন লোকটি প্রত্যাবর্তন করতে লাগল, তখন নবী করীম (সা:) বললেন, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখে চক্ষু শীতল করতে চায় সে যেন এ লোকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে।”^{১০৩}

ইয়াহইয়া আল-কাত্তান^{১০৪} এ হাদীসটি আবু হায়্যান থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু হায়্যান তাঁর সনদের বর্ণনায় ওহায়বের খেলাফ করে হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সনদে আবু হুরায়রাহ (রা:)—এর উল্লেখ নেই। ইমাম দারা কুতনী (র:) উল্লিখিত সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে ইবন হাজার আল-‘আসকালানী (র:) বলেন, ইমাম বুখারী (র:) তাঁর সহীহ গ্রন্থে ইয়াহইয়া আল-কাত্তান এর হাদীসটি ওহায়ব এর হাদীসটির পরে উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, ওহায়ব একজন ‘হাফিযে হাদীস’^{১০৫} রাবী। আর এ কারণেই ইমাম বুখারী (র:) তাঁর রিওয়াযাতকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া তার সনদে অতিরিক্ত বর্ণনা আছে। এতদ্ব্যতীত ওহায়ব এর হাদীসের সমার্থবোধক একটি হাদীস ইমাম বুখারী (র:) ও ইমাম মুসলিম (র:) তাঁদের গ্রন্থদ্বয়ের কিতাবুল ঈমান-এ জারীরের সনদে বর্ণনা করেছেন। জারীর হাদীসটি ইসমা‘ইল ইবন ‘উরওয়াহ থেকে এবং তিনি আবু হায়্যান থেকে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি ওহায়বের হাদীসকে শক্তিশালী করে।

ইমাম দারা কুতনী বলেন, ইমাম বুখারী (র:) তার সহীহ গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবন তালহার (র:) হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবন তালহা (র:) হাদীসটি তাঁর পিতা থেকে তিনি মুস'আব ইবন সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন

رَأَى سَعْدَ أَنْ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — هَلْ تَنْصُرُونَ وَتَرْزُقُونَ إِلَّا بَضْعَافِكُمْ —

ইমাম দারাকুতনী (র:) এ হাদীসের সমালোচনা করে বলেন, হাদীসটি মুরসাল। আব্বাসী ইবন হাজার আল-আসকালানী (র:) এ সমালোচনার জবাবে বলেন, “বাহ্যত হাদীসটি مرسل হলেও মূলত সেটি موصول (মুত্তাসিল সনদযুক্ত) এবং مصعب بن سعد عن أبيه এর সনদে বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ হাদীস। ইমাম বুখারী(র:) তাঁর সহীহ বুখারীতে এরূপ অনেক বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং সেগুলোর উপর নির্ভর করেছেন। কেননা বর্ণনাকারী যদি এমন ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যার থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সুপ্রসিদ্ধ তবে তার হাদীসটি موصول হিসাবে পরিগণিত হয়।^{১০৬} ইমাম নাসাঈ(র:) তাঁর سنن গ্রন্থে এবং আবু নু'আইম مستخرج এর মাঝেও তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু নু'আইম এর الحلیة গ্রন্থেও তার থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া আবু মুহাম্মদ ইবন সা'ঈদের হাদীসের ৬ষ্ঠ খন্ডেও رأى مصعب بن سعد عن أبيه أنه رأى হাদীস বর্ণিত আছে।

হাদীস বিশারদগণ ইমাম বুখারীর(র:) সহীহ বুখারী গ্রন্থের প্রায় ৮০ জন রাবীকে (বর্ণনাকারী) ضعيف বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এ সকল রাবীর অধিকাংশই তাঁর শায়খ। তাঁদের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটেছে, তাঁদের সংস্পর্শে তিনি থেকেছেন, তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন, তাঁদের হাদীস সম্পর্কে তিনি সম্যকভাবে ওয়াকিফহাল হয়েছেন এবং তাঁদের বর্ণিত সহীহ ও য'ঈফ হাদীসের মধ্যে তিনি পার্থক্য করেছেন। কাজেই তিনি তাঁদের সম্পর্কে এবং তাঁদের অবস্থাদি সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত এবং তাঁদের বিষয়ে অধিক খবরদার।^{১০৭} ইমাম বুখারী (র:) থেকে তাঁর সহীহ বুখারী গ্রন্থটি প্রায় একলক্ষ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। তাঁদের অধিকাংশই হাদীসের ইমাম। যেমন ইমাম মুসলিম, আবু যুর'আহ^{১০৮}, তিরমিযী এবং ইবন খুযায়মাহ^{১০৯} প্রমুখ।^{১১০}

সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ

পৃথিবীতে মুসলমানদের কাছে আল-কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। আর হাদীসের জগতে ইমাম বুখারীর সহীহ বুখারী সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বিশ্বব্যাপী এ গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা ও বিস্তৃতির কারণে যুগে যুগে এর অনেক ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং আজও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। ফলে এ ব্যাখ্যা গ্রন্থের সংখ্যা হয়েছে অগণিত ও অসংখ্য। এ জন্যই অনেকেই এ গ্রন্থের রিজাল বা বর্ণনাকারীগণের উপর এবং উদ্দেশ্যাবলীর উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। কেউ কেউ আবার এ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। অন্যদিকে কেউ কেউ আবার এর দীর্ঘ ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। হাজী খলিফা তার ‘কাশফু যুনুন’ গ্রন্থে সহীহ বুখারীর ৮২টির বেশী ব্যাখ্যা গ্রন্থ রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।^{১১১} ফুয়াদ সিয়গীন তাঁর ‘তারীখুত তুরাসিল ‘আরবী’ গ্রন্থে বুখারীর ৫৬টি বিস্তারিত শরাহ গ্রন্থের এবং ৭টি সংক্ষিপ্ত শরাহ গ্রন্থের বর্ণনা দিয়েছেন।^{১১২} কেউ কেউ এ প্রেক্ষিতে অতি দীর্ঘ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ সহীহ বুখারীর সংক্ষিপ্ত শরাহ গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেছেন। নিম্নে সহীহ বুখারীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

১. ই'লামুস সুন্নান (إعلام السنن): এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবন সাবতী আল-খাত্তাবী আবু সুলাইমান (র) (মৃ. ৩০৮ হি:/৯৯৬ খৃ.)। এটি সহীহ বুখারীর সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এটি একটি উৎকৃষ্টমানের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বহুবিধ জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছে।^{১১৩}
২. কিতাবুন নাজাহ (كتاب النجاة): এটি নাজমুদ্দীন 'উমার ইবন আন-নাসাফী আল-হানাফী (র) (মৃ. ৫৩৮ হি:) কর্তৃক রচিত সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এতে হানাফী মাজহাবের আলোকে হাদীসের বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।^{১১৪}
৩. শারহুল বুখারী (شرح البخاري): সহীহ বুখারীর এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি রচনা করেন ইমাম আবুল হাসান 'আলী ইবন খালফ আল-গারবী আল-মালিকী (র)। এ শরাহ গ্রন্থে মালিকী ফিকহের বিষয়াবলী আলোচনা করা হয়েছে।^{১১৫}
৪. আত-তানকীহ লি আলফাজিল জামি'উস সহীহ (التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح): এটি সহীহ বুখারীর অন্যতম ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এটি প্রণয়ন করেন ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন বাহাদুর আয-যারাকশী (মৃ. ৭৯৪ হি:/১৩৯২ খৃ.)।^{১১৬}
৫. শাওয়াহিদুত তাওয়াহী ওয়াত তাসহীহ লি মুশকিলাতিল জামি'উস সহীহ (شواهد التوضيح والنصح لمشكلات الجامع الصحيح): এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটির প্রণেতা মুহাম্মদ ইবন আবদিল মালিক (মৃ. ৬৭২ হি:/১৩৭২ খৃ.)।^{১১৭}
৬. শারহুল জামি' (شرح الجامع): এ গ্রন্থটি রচনা করেন ইমাম কুতুবুদ্দীন 'আবদুল কারীম ইবন 'আবদিল নূর ইবন মাইসির হাবলী (র.) কিন্তু গ্রন্থকার গ্রন্থটি সমাপ্ত করার পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। তিনি এ গ্রন্থটির অর্ধেক রচনা করেছিলেন।^{১১৮}
৭. আল-কাওয়াকিবুদ দুরারী (الكواكب الدراري): এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ইবন 'আলী আল-কিরমানী(র:) (মৃ. ৭৮৬ হি:/১৩৮৪ খৃ.)। এ গ্রন্থের সূচনায় গ্রন্থকার 'ইলমুল হাদীসের ফযীলত সম্পর্কে নতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এতে ইমাম বুখারীর জীবন চরিত অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। বাক্যের শাব্দিক বিশ্লেষণ, নাহবী 'ইরাব, রাবীগণের নাম, উপাধি, জীবনালেখ্য, হাদীস সমালোচনা এবং রিজাল বিশেষজ্ঞগণের মন্তব্য ইত্যাদি বিষয় এতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে পরস্পর বিরোধী হাদীস সমূহের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে তা পরবর্তী ব্যাখ্যাকারগণের জন্য অধিক উপকারী হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে। গ্রন্থকার ৭৭৫ হিজরী সালে মক্কাহ মুকাররমায় এর প্রণয়ন কার্য সমাপ্ত করেন।^{১১৯}
৮. আল-কাওয়াকিবুদ জারী 'আলা রিয়াদিল বারী (الكوثر الجاري على رياض الباري): এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটির রচয়িতা আহমদ ইবন ইসমা'ঈল আল-কাওরানী আল-হানাফী (র:) (মৃ. ৭৯৩ হি:)। গ্রন্থের প্রথমেই রাসূল (সা:)-এর সীরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে শাব্দিক বিশ্লেষণ ও বর্ণনাকারীগণের নাম উল্লেখের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।^{১২০}
৯. মানহুল বারী বি সাবীলি ফাসীহিল বুখারী (منح الباري بسبيل فسيح البخاري): এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটির রচয়িতা ইমাম মাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব আল-ফিরকয আবাদী আশ-শিরায়ী(র:) (মৃ. ৮১৭ হি:)। এটি সহীহ বুখারীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি এমন কতিপয় বিষয় আলোচনা করেছেন, যা অন্য কেউ আলোচনা করেননি।^{১২১}

১০. ফাতহুল বারী (فتح الباري): এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি রচনা করেন হাফিয আহমদ ইবন ‘আলী ইবন হাজার আল-‘আসকালানী (র:) (মৃ. ৮৫২ হি:/১৪৪৮খৃ.)। এটি একটি উন্নতমানের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। গ্রন্থকার ৮১৩ হিজরীতে এ গ্রন্থের মুকাদ্দমাটি সম্পন্ন করেন। ৮১৭ হিজরীর সূচনা লগ্নে মূল গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু করেন এবং ৮৪২ হিজরীর রজব মাসে তা সম্পন্ন করেন। অতি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে গ্রন্থটির খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি এর খ্যাতি অন্যান্য ব্যাখ্যা গ্রন্থের খ্যাতিকে স্তান করে দেয়। এ গ্রন্থটি মিসর ও হিন্দুস্থান থেকে দুবার মুদ্রিত হয়েছে। এটি বৈরুতের ‘দারুল এহইয়ায়িত তুরাছিল ‘আরবী’ প্রকাশনা সংস্থা থেকে ১৪০২ হিজরীতে ভূমিকাসহ ১২ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বৈরুতের অন্যতম প্রকাশনা সংস্থা ‘দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ’ থেকে ১৪১০ হি:/১৯৮৯ খৃ.একটি ভূমিকাসহ এটিও ১২ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ইয়ামেনের বিশিষ্ট মুজতাহিদ আল্লামা শাওকানীকে(র:)কে কেউ সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যাপারে অনুরোধ করলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন: لا هجرة بعد الفتح “বিজয়ের পর আর কোন হিজরত নেই।” অর্থাৎ ফাতহুল বারীর পর সহীহ বুখারীর আর কোন ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রয়োজন নেই।^{১২২}
১১. ‘উমদাতুল কারী (عمدة القاري): এ ব্যাখ্যা গ্রন্থের রচয়িতা বদরুদ্দীন মাহমূদ ইবন আহমদ আল-‘আয়নী আল-হানাফী (মৃ. ৮৫৫ হি:) (র:)। আল্লামা ‘আয়নী(র:) ৮২১ হিজরীতে এ গ্রন্থটি রচনার কাজ শুরু করেন এবং ৮৪৭ হিজরীতে তা সমাপ্ত করেন। এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি সুবিস্তৃত এবং দীর্ঘ। আল্লামা আইনী ১২ খন্ডে প্রণয়ন করেন সহীহ বুখারীর প্রথম খন্ডের ব্যাখ্যা এবং ৯ খন্ডে প্রণয়ন করেন দ্বিতীয় খন্ডের ব্যাখ্যা। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে এটি একাধিক বার মুদ্রিত হয়েছে এবং বৈরুতের দারুল ফিকার থেকে মুদ্রিত হয়েছে ২৫ খন্ডে।^{১২৩}
১২. আত-তাওশীহ ‘আলাল জামি‘য়িস সহীহ (التوشيح علي الجامع الصحيح): আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী(র:) (মৃ. ৯১১ হি:/১৫০৫ খৃ.) এ গ্রন্থটি রচনা করেন। বৈরুতের ‘দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ’ থেকে এটি ৫ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।^{১২৪}
১৩. ইরশাদুস সারী (ارشاد الساري): এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি রচনা করেন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবী বকর আল-কুস্তালানী(র:) (মৃ. ৯২৩ হি:/১৫১৭ খৃ.)। গ্রন্থের শুরুতে তিনি একটি চমৎকার ভূমিকা সংযোজন করেছেন। বৈরুতের ‘দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ’ থেকে ১৪১৬ হি:/১৯৯৬খৃ. এ গ্রন্থটি ১০ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।^{১২৫}
১৪. আল-জামি‘উস সহীহিল বুখারী বি শারহিল কিরমানী (الجامع الصحيح البخاري بشرح الكرمانی): এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি আল্লামা কিরমানী(র:) রচনা করেন। এটিও বৈরুতের ‘দারুল ফিকার’ থেকে ১৪১১ হি:/১৯৯১ খৃ. ১২ খন্ডে মুদ্রিত হয়েছে।
১৫. আল-তাওযীহ লি শারহিল জামি‘য়িস সহীহ (التوضيح لشرح الجامع الصحيح): ‘উসমান ইবন ‘আলী ইবন আল-মুলাক্কিন আস-শাফি‘ঈ(র:) (মৃ. ৮০৫ হি:/১৪০৩ খৃ.) এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি বৈরুতের ‘দারুল ফিকার’ থেকে ২০ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।^{১২৬}
১৬. আল-লামি‘উস সাবীহ (اللامع الصبيح): এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি আল্লামা শামসুদ্দীন আবু ‘আদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আদ-দায়িম ইবন মুসা বরমাবী আল-শাফি‘ঈ(র:) (মৃ. ৮৩১ হি:) রচনা করেন। এটি অতি উন্নতমানের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। চার খন্ডে এটি প্রকাশিত হয়েছে।^{১২৭}
১৭. তুহফাতুল বারী বি শারহিল সহীহিল বুখারী (تحفة الباري بشرح صحيح البخاري): সহীহ বুখারীর এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি রচনা করেন যাকারিয়া ইবন মুহাম্মদ আল-আনসারী (র:) (মৃ. ৯১৬ হি:/১৫১১ খৃ.)।^{১২৮}

১৮. ফায়যুল বারী ফী শারহি গরীবিল বুখারী (فيض الباري في شرح غريب البخاري): এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি রচনা করেন আবদুর রহমান ইবন আহমাদ আল-আব্বাসী (র) (মৃ. ৯৬৩ হি:/১৫০১ খৃ.).^{১২৯}
১৯. গায়াতুত তাওযীহ (غاية التوضيح): এ গ্রন্থটি উসমান ইবন ঈসা ইবন ইবরাহীম আল-সিদ্দিকী আল-হানাফী রচনা করেন (র:) (মৃ. ১০ম হি:).^{১৩০}
২০. ফায়যুল বারী ‘আলা সহীহিল বুখারী (فيض الباري على صحيح البخاري): এ ব্যাখ্যাটি মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র:) (মৃ. ১৩৫২ হি:) এর তাকরীর, যা তার প্রিয় ছাত্র মুহাম্মদ বদরুল আলম মিরাতী (র:) ক্লাসে লিখেছিলেন। এ গ্রন্থটি ১৯৯২ সালে দিল্লির রক্বানী বুক ডিপো থেকে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।^{১৩১}
২১. কাশফুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী (كشف الباري شرح صحيح البخاري): মুফতি মোহাম্মদ ইদরীস কাসেমী কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি ১৭ বছর গবেষণা করে তিনি সম্পন্ন করেন। ১৪০৭ হি:/১৯৮৭ খৃ. ভারতের দীওবন্দ ‘আজীম বুক ডিপো’ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।^{১৩২}

উপসংহার

ইসলামী শরী‘আতে আল-কুরআনের পরই হাদীসের স্থান। আর হাদীস গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সহীহ বুখারীর স্থান সর্বোচ্চ। একজন মুসলমান হিসাবে ইসলামের পথে চলার জন্য আল-কুরআনের জ্ঞান লাভ করা যেমন জরুরী, তেমনি হাদীসের নির্দেশনা জানা বিশেষ প্রয়োজন। আর সেক্ষেত্রে সহীহ বুখারী অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ সহীহ হাদীস গ্রন্থ হিসাবে তার প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক বেশী। হাদীস বিষয়ক জ্ঞানার্জনের জন্য হাদীসের অধ্যয়ন যেমন জরুরী তেমনি হাদীসের গ্রন্থ, তার বিভিন্ন অবস্থা ও প্রকৃতি অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। অত্র প্রবন্ধে সহীহ বুখারীর বিভিন্ন বিষয়ের পরিচিতি ও পর্যালোচনা পরিবেশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি অধ্যয়ন করলে সহীহ বুখারীর নামকরণ, সংকলনের কারণ, সংকলনের সময়, হাদীস সংখ্যা, প্রণয়ন পদ্ধতি, শর্তাবলী, সমালোচনা, বৈশিষ্ট্য ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ বিষয়ক সম্যক জ্ঞান লাভ করা যাবে। যা হাদীসের জ্ঞানের সহায়ক হিসাবে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করবে। হাদীসের জ্ঞানের যত প্রচার ও প্রসার ঘটবে মানুষ ততই আল-কুরআন ও ইসলামী জ্ঞানে অভিজ্ঞ হতে পারবে এবং তা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়নের ফলে মানুষ সুখ-শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করতে পারবে।

তথ্যনির্দেশ

১. ইবন হাজার আল-আসকালানী, ফাত্খুল বারী. মুকাদ্দমাহ (বৈরুত : দারু এহইয়ায়িল কুতুবিল ‘আরাবী, ১৪০২ হি:), পৃ. ৬।
২. ইমাম নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, তা.বি.), পৃ. ৭৩।
৩. উক্ত আটটি বিষয় হলো: আকীদা বা বিশ্বাস, আহকাম (শরী‘আতের আদেশ-নিষেধ), আখলাক ও আদব, তাফসীর, সীরাতে ও ইতিহাস ও আশরাত (বিশৃংখলা ও কিয়ামতের আলামত), রিকাক ও মানাকিব ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী, বুখারী শরীফ, বঙ্গানুবাদ: মাওলানা কাজী মু‘তাসিম বিল্লাহ ও অন্যান্য, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খৃ.), পৃ. ২৭
৪. যে সকল হাদীসের বর্ণনার ধারাবাহিকতা সরাসরি রাসূল (সা:) পর্যন্ত পৌঁছে, মধ্যখানে কোথাও কোন রাবী বাদ পড়েনি, তাকে মারফু‘ হাদীস বলে। দ্রষ্টব্য: মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ‘জমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৬ খৃ.), পৃ. ভূমিকা. ৬।

৫. হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্রে ও যে বর্ণনা পরম্পরা ধারায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছে, একেই 'ইলমে হাদীসের পরিভাষায় সনদ বলা হয়। এতে হাদীসের বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে। দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ আবু যছ, আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'আরবী ১৯৮৪ খৃ.), পৃ. মুকাদ্দিমা ; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকা: খায়রুণ প্রকাশনী, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ৪৩।
৬. এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র:) বলেন, خرجت الصحيح من ست مائة الف حديث দ্রষ্টব্য: ইবন হাজার আল আসকালানী, হাদযুস সারী (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১৪১০/১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ৫।
৭. এ সম্পর্কীয় আরবী ভাষ্যটি নিম্নরূপ: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وترك من الصحيح حتى لا يطول দ্রষ্টব্য: ইবন হাজার আল-আসকালানী হাদযুস সারী, পৃ. ৪৯০।
৮. মুফতী মুহাম্মদ ইদরীস কাসেমী, কাশফুল বারী, শারহ সহীহিল বুখারী, ১ম খণ্ড (দেওবন্দ: আজীম বুক ডিপো, ১৪০৭ হি:/ ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ২৮৬।
৯. প্রাপ্ত।
১০. ড. আকরম জিয়া আল-দ্বীন আল-উমরী ১৩৬১হি: (১৯৪২ খৃ.) হিজরীতে উত্তর ইরাকের মসুলে জন্মগ্রহণ করেন। বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩৮২হি: (১৯৬২ খৃ.) হিজরীতে বি. এ এবং ১৩৮৬হি: (১৯৬৬ খৃ.) হিজরীতে ইসলামের ইতিহাসে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি কায়রোর আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩৯৪হি: (১৯৭৪ খৃ.) হিজরীতে তিনি পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৩৮৬-১৩৯৬ হি: (১৯৭৭-১৯৮২ খৃ.) হিজরী পর্যন্ত মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান এবং একাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ড. জিয়া আল-উমরী ইসলামী ইতিহাস বিশেষ করে রাসুল (সা:)-এর জীবনী সম্পর্কে প্রায় ২০ খানা গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। দ্রষ্টব্য: ড. আকরম জিয়া আল-উমরী, রাসুলের যুগে মদীনার সমাজ, ১ম খণ্ড, অনুবাদ: মো: সাজ্জাদুল ইসলাম (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০০৭ খৃ.), পৃ. মলাট শেষ পৃষ্ঠা।
১১. ইবন হাজার আল-আসকালানী মিশরের আতিকাহ নামক স্থানে ৭৭৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বংশ ধারা নিম্নরূপ: আহমদ ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ 'আলী ইবন আহমদ আল-কুনানী। উপাধি: আল-আসকালানী। হাফিয ইবন হাজার আল-আসকালানী(র:)-এর পিতার কোন সন্তান জীবিত থাকত না। এজন্য তিনি তৎকালীন এক প্রখ্যাত 'আলিমের নিকট উপস্থিত হয়ে সন্তানের জন্য আল্লাহর নিকট দো'য়া করতে বলেন। তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করেন এবং বলেন, তোমার সন্তান জ্ঞান-বিজ্ঞানে এমন এক ব্যক্তি হবে, যার সারা দুনিয়া ব্যাপী খ্যাতি ও সুনাম সৃষ্টি হবে। তিনি ৮৫২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। দ্রষ্টব্য: মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ, যাকরুল মুহাসসীলিন বি আহওয়ালিল মুসান্নিফীন (করাচী: কুতুব খানা আরাম বাগ, তা.বি.), পৃ. ১৭৬-১৮৮।
১২. ড. আকরম জিয়া আল-উমরী, বুহসু ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ (আল-মদীনাতুল মুনাওয়্যারাহ: মাকতাবাতুল 'উলুম, ১৪০৫/১৯৮৪ খৃ.), পৃ. ১৬৮; তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪।
১৩. ড. মুহাম্মদ ইবন আতার আল-যাহরানী, তাদবীনুস সুন্নাহ (তায়েফ: মাকতাবাহ আল-সিদ্দিক, ১৪১২ হি.), পৃ. ১১২।
১৪. ইবনুল আসীর, আল-লুবাব, ১ম খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৫৭ হিজরী), পৃ. ১০১; আস-সাম'আনী, আল-আনসাব, ১ম খণ্ড বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪১৪/১৯৯৮ খৃ.),
১৫. শামসুদ্দীন আয যাহাবী, তাযকিরাতুল ছফফায, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, তা. বি), পৃ. ৫৫৫; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা 'আওনুল বারী, ১ম খণ্ড (আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ২০০৪ খৃ.), পৃ. ২০-২৩।
১৬. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, হায়াতুল মুহান্নিফীন (ঢাকা: আল-কাওছার প্রকাশনী, ১৯৯৭ খৃ.) পৃ: ৪৭-৫১; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, 'উলুমুল হাদীস (রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০০০ খৃ, পৃ: ২৮৮-২৭২।
১৭. প্রাপ্ত, পৃ: ২৭২।
১৮. ইমাম মুসলিম, আস-সুনান, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারু এহইয়ায়িত তুরাখিল 'আরবী, তা.বি.), পৃ. ২২৯৮, হাদীস নং- (৩০০৪)-৭২।

১৯. ইবন হাজার আল-আসকালানী, *হাদযুস সারী*, পৃ. ৪।
২০. ইমাম আবু হানিফা: ইমাম আবু হানিফার প্রকৃত নাম নো‘মান ইবন সাবিত ইবন যুতা ইবন মারযুবান। তিনি ৮০ হি: /৬৯৯ খৃ. ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামী ফিকহের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত চারটি মাযহাবের একটি ‘হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ১৪৮ হি: / ৭৬৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। দ্রষ্টব্য: *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃ. ৪৪৫; [https://bn.wikipedia.org/wiki/ আবু হানিফা](https://bn.wikipedia.org/wiki/আবু_হানিফা). ১২/৭/১৯ ইং
২১. ইমাম মালিক (র:) ৯৩ হি: /৭১১ খৃ. মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদের প্রধান চার ইমামের একজন। মালেকী মাযহাব তারই প্রণীত মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তার সংকলিত মুয়াত্তা বিখ্যাত ও প্রাচীনতম হাদীস গ্রন্থ। তিনি ১৭৯ হি: /৭৯৫ খৃ. ইন্তেকাল করেন। দ্রষ্টব্য: *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃ. ৩১৩-৩১৯ ; [https://bn.wikipedia.org/wiki/ মালিক ইবনে আনাস](https://bn.wikipedia.org/wiki/মালিক_ইবনে_আনাস) তাং-১২/৭/১৯ ইং
২২. সুফিয়ান সওরী কুফায় ৯৭ হি: জন্মগ্রহণ করেন। ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি ও ইমাম আবু হানিফা একই মতের অনুসারী ছিলেন। ১৬১ হি: তিনি ইন্তেকাল করেন। দ্রষ্টব্য: *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃ. ৩১৩-৩১৯ ; [https://www.facebook.com/ Islamic.Online/ media/posts/1629 047740530664/](https://www.facebook.com/Islamic.Online/media/posts/1629047740530664/) date: 12/7/19
২৩. ইবন আবী শাইবা হিজরী তৃতীয় শতকের প্রথম দিকে ১৫৯ হিজরীতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও তাদের সমসাময়িক হাদীসের ইমামগণ তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ২৩৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রষ্টব্য: *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃ. ৩৫৫-৩৫৬ ; [https://ahlehamedia.com/মুসান্নাফ-ইবনে-আবী শাইবা-২/](https://ahlehamedia.com/মুসান্নাফ-ইবনে-আবী_শাইবা-২/).
২৪. আব্দুর রাযযাক প্রখ্যাত হাদীস বেত্তা। তার সংকলিত গ্রন্থ মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক দীর্ঘদিন পর ছাপা হয়েছে। এ গ্রন্থে মূলত তিনজন বর্ণনাকারী, যথাক্রমে: মা‘মার ইবন রাশিদ, ইবন জুরায়য ও সুফিয়ান সওরী। দ্রষ্টব্য: [https://bn.wikipedia.org/ wiki/ মুসান্নাফ-আবদুর -রাযযাক#ইতিহাস](https://bn.wikipedia.org/wiki/মুসান্নাফ-আবদুর-রাযযাক#ইতিহাস) তাং ১২/৭/১৯ ইং
২৫. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল ১৬৪ হি: /৭৮০ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামী আইন ও হাদীস বিশারদ। প্রসিদ্ধ চার ইমামের অন্যতম এবং হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। হাদীস শাস্ত্রে তার মহান কীর্তি ‘মুসনাদ’। তিনি ২৪১ হি: /৮৫৫ খৃ. ইন্তেকাল করেন। দ্রষ্টব্য: *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯ ; [https:// .bn.wikipedia.org/wiki/আহমদ-রিন-হাম্বল](https://bn.wikipedia.org/wiki/আহমদ-রিন-হাম্বল).
২৬. শায়: কোন ছিকাহ (নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত) বর্ণনাকারীর হাদীস অপর কোন ছিকাহ বর্ণনাকারীর বা বর্ণনাকারীগণের হাদীসের বিরোধী হলে, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর ‘যবত’ (মুখস্ত শক্তি) গুণ অধিক বা অপর কোন সূত্র দ্বারা যার হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায় অথবা যার হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ব অপর কোন কারণে প্রতিপাদিত হয়, তার হাদীসটিকে ‘হাদীসে মাহফুয’ এবং অপর বর্ণনাকারীর হাদীসটিকে ‘হাদীসে শায়’ বলে। দ্রষ্টব্য: মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ‘জমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৬ খৃ.), পৃ. ৮।
২৭. কোন য‘ঈফ বর্ণনাকারীর হাদীস অপর কোন য‘ঈফ বর্ণনাকারীর হাদীসের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত কম য‘ঈফ বর্ণনাকারীর হাদীসটিকে ‘হাদীসে মারুফ’ এবং অপর বর্ণনাকারীর হাদীসটিকে ‘হাদীসে মুনকার’ বলে। দ্রষ্টব্য: *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, পৃ. ৮।
২৮. যে হাদীসের বর্ণনাকারী হাদীসের সনদে স্বীয় উস্তাদের নাম উল্লেখ না করে উস্তাদের উপরস্থ কোন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে বোঝা যায় যে, তিনি উল্লেখিত উপরস্থ বর্ণনাকারীর নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন। অথচ তিনি উপরস্থ বর্ণনাকারীর নিকট হাদীস শ্রবণ করেন নাই। এ ধরনের হাদীসকে ‘মুদাল্লাস হাদীস’ বলে। আর এরূপ করাকে তাদলীস বলা হয়। দ্রষ্টব্য: ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অনুবাদ: মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, ভূমিকা, বঙ্গানুবাদ: (ঢাকা: মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ১৯৯৩ খৃ.), পৃ. ২৮।
২৯. যে হাদীসের সনদে এমন কোন সূক্ষ্ম দোষ বা ত্রুটি রয়েছে, যা বড় হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যতীত বুঝতে পারে না। এ ধরনের হাদীসকে ‘হাদীসে মুয়াল্লাল’ বলে। এটি সহীহ হাদীস নয়। দ্রষ্টব্য: *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, পৃ. ৮।
৩০. ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইসহাক ইবন রাহওয়াই (র:) ১৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। হাজার হাজার হাদীস তাঁর মুখস্ত ছিল। তিনি কোন কিতাব না দেখেই ছাত্রদের হাদীস মুখস্ত শুনতে ও লেখায়ে দিতে পারতেন। ২৩৮ হিজরী সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দ্রষ্টব্য: *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮।

৩১. قال ابو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى
 ۳۲. এ সম্পর্কীয় আরবী ভাষ্য নিম্নরূপ: - فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الصحيح - দ্রষ্টব্য: ইবন হাজার আল-আসকালানী, হাদয়ুস সারী, পৃ. ৫ ; আবু বকর আহমদ ইবন 'আলী ইবন সাবিত ইবন
 ৩৩. এ বিষয়ে তার আরবী ভাষ্য নিম্নরূপ: - سمعت البخاري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا بين يديه وبيدي مرجح أذب - দ্রষ্টব্য: ইবন হাজার আল-আসকালানী, হাদয়ুস সারী, পৃ. ৫; ইমাম নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪।
 ৩৪. এ সম্পর্কীয় আরবী ভাষ্য নিম্নরূপ: - أنت تذب عنه الكذب - দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ আবু যহ, আল-হাদীস ওয়াল মুহাদিসুন, পৃ. ৩৭৮।
 ৩৫. এ বিষয়ের আরবী ভাষ্যটি নিম্নে বর্ণিত হলো: - فهو الذي حملني علي إخراج الجامع الصحيح - দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ আবু যহ, আল-
 ৩৬. মুফতী মুহাম্মদ ইদরীস কাসেমী, কাশফুল বারী, শারহ সহীহিল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯।
 ৩৭. সূরাহ আল-বাকারাহ: ২৬৩।
 ৩৮. মুফতী মুহাম্মদ ইদরীস কাসেমী, কাশফুল বারী, শারহ সহীহিল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯।
 ৩৯. প্রাপ্ত, পৃ. ২৯০।
 ৪০. শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া (র:) দেওবন্দের একজন হাদীস বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি ১৮৯৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারী ভারতের
 ৪১. প্রাপ্ত, পৃ. ২৯০।
 ৪২. মুহাম্মদ আবু যহ, আল-হাদীস ওয়াল মুহাদিসুন (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'আরবী, ১৪০৪/১৯৮৪ খৃ.), পৃ. ৩৭৮ ; আহমদ
 ৪৩. প্রাপ্ত।
 ৪৪. হাফয সাখাভী, ফাতহুল মুগীস, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইমাম আত-তাবারী, ১৪১২ হি:/১৯৯২ খৃ.), পৃ. ২৭-২৮।
 ৪৫. ইমাম নববী বহু গ্রন্থ প্রণেতা, ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ছিলেন। তিনি ৬৩১ হি:/১২৩৩ খৃ. দামেস্কের নওবী
 ৪৬. ইমাম নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩।
 ৪৭. আরবী ভাষ্যটি নিম্নরূপ: - جمع نحوست مائة ألف حديث إختار منها في صحيحه ما وثق برواته وهو أول من وضع في الإسلام كتابا علي هذا - দ্রষ্টব্য: খায়র উদ্দীন আল-যিরকলী, আল-আ'লাম (বৈরুত: দারুল 'ইলম লিল মালাইন, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ২৭-২৮।
 ৪৮. এ সম্পর্কীয় হাদীসটি নিম্নরূপ: - قال البخاري ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغسلت قبل ذلك و صليت ركعتين - দ্রষ্টব্য: ইমাম
 নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪।

৪৯. ইবন হাজার আল-‘আসকালানী, *হাদযুস সারী*, পৃ. ৫।
৫০. এ সম্পর্কীয় ‘আরবী ভাষ্যটি নিম্নরূপ: *إنه قال خرسست الصحيح نم ست مائه الف حديث و جعلته بيني وبين الله*। দ্রষ্টব্য: ইবন হাজার আল-‘আসকালানী, *হাদযুস সারী*, পৃ. ৫।
৫১. *হাদযুস সারী*, পৃ. ৪৯০।
৫২. আবু বকর আহমাদ ইবন ‘আলী ইবন সাবিত ইবন আহমদ ইবন মাহদী আল-খতীব আল-বাগদাদী, *তারিখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকার, তা.বি.), পৃ. ৯।
৫৩. *হাদযুস সারী*, পৃ. ৪৯০।
৫৪. ইমাম নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪ ; *হাদযুস সারী*, পৃ. ৪৯০।
৫৫. *হাদযুস সারী*, পৃ. ৪৯১।
৫৬. প্রাপ্ত।
৫৭. প্রাপ্ত, পৃ. ৯।
৫৮. কাশফুল বারী, *শারহু সহীহিল বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬ ; *হাদযুস সারী*, পৃ. ৯।
৫৯. আবদুল্লাহ ইবন আস‘আদ আল-ইয়া‘ফিদি, *মিরআতুল জিনান* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, ১৪১৭/১৯৯৭ খৃ.), ১২৫; তাজ উদ্দীন আল-সুবকী, *তাককাতুশ শাফি‘ঈয়াহ*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘আরাবী, তা.বি.), পৃ. ২২১।
৬০. *মিরআতুল জিনান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫।
৬১. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা ‘আওনুল বারী’*, ১ম খণ্ড (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ২০০৪ খৃ.), পৃ. ৬১।
৬২. আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী বহু গ্রন্থে প্রণেতা, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি ৭৬২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বুখারীর শরাহ তাঁর অতি মূল্যবান গ্রন্থ। তিনি ৮৫৫ হিজরী সালে মৃত্যু বরণ করেন। দ্রষ্টব্য: আল্লামা বদর উদ্দীন ‘আইনী, *উমদাতুল কারী*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকার, তা.বি.), পৃ. ৫ ভূমিকা।
৬৩. তাঁর প্রকৃত নাম: তকী উদ্দীন ইবন উছমান। উসূলে হাদীসে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আল-মুকাদ্দি:মাহ’ মূল্যবান কিতাব। তিনি ৬৪৩ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। দ্রষ্টব্য: *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, পৃ. ১৩২।
৬৪. আল্লামা বদর উদ্দীন ‘আইনী, ‘*উমদাতুল কারী*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, ২০০১ খৃ.), পৃ. ৬ ; ড. আকরাম জিয়া আল-উমরী, *বুহসু ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ*, পৃ. ১২০।
৬৫. ইমাম নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫।
৬৬. যে হাদীসের সনদের ‘এনকেতা’ (রাবী বা বর্ণনাকারী বাদ পড়া) প্রথম দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মু‘আল্লাক হাদীস বলে। দ্রষ্টব্য: মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজ‘মী, *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ভূমিকা (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৬ খৃ.), পৃ. ৬ : ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম, অনুবাদ*: মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, ভূমিকা, পৃ. ২৮।
৬৭. এক বর্ণনাকারীর হাদীছের অনুরূপ হাদীস যদি অপর বর্ণনাকারীর হাদীস পাওয়া যায়। আর উভয় হাদীসের মূল বর্ণনাকারী (অর্থাৎ সাহাবী) যদি একই ব্যক্তি হন তাহলে দ্বিতীয় বর্ণনাকারীর হাদীসকে প্রথম বর্ণনাকারীর হাদীছের জন্য ‘মুতাবি’ বলা হয়। আর এরূপ হাদীসকে ‘মুতাবাত’ বলা হয়। দ্রষ্টব্য : *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, পৃ. ৮ : ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম, অনুবাদ*: মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, ভূমিকা, পৃ. ২৯।

৬৮. যে হাদীসের সনদ তথা বর্ণনা সূত্র উর্ধ্বদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে। অর্থাৎ যে হাদীসে কোন সাহাবীর কথা, কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে ‘হাদীসে মাওকুফ’ বলা হয়। দ্রষ্টব্য: হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ভূমিকা, পৃ. ৬ ; ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অনুবাদ : মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, ভূমিকা, পৃ. ২৭-২৮।
৬৯. যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতায় কোন রাবীর নাম বাদ পড়ে নাই। সনদের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক রাবীর নাম উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত হাদীসকে মুত্তাসিল হাদীস বলা হয়। দ্রষ্টব্য: হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ভূমিকা, পৃ. ৬ ; ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অনুবাদ: মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, ভূমিকা, পৃ. ২৮।
৭০. যে হাদীসের সনদ পরস্পরায় রাসূলুল্লাহ (সা:) পর্যন্ত পৌঁছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা:) হতে গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সনদের ধারাবাহিকতা সুরক্ষিত রয়েছে। মধ্যখানে কোন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে নাই। এ প্রকারের হাদীসকে হাদীসে মারফু’ বলা হয়। দ্রষ্টব্য: হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ভূমিকা, পৃ. ৬ ; ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অনুবাদ: মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, ভূমিকা, পৃ. ২৮।
৭১. আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন, পৃ. ৩৭৯।
৭২. যে হাদীসের সনদ বা বর্ণনাসূত্র উর্ধ্বদিকে তাবিঈ’ পর্যন্ত পৌঁছে। অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন তাবিঈ’র কথা, কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়, তাকে মাকতু’ হাদীস বলা হয়। দ্রষ্টব্য: হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ভূমিকা, পৃ. ৬ ; ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অনুবাদ: মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, ভূমিকা, পৃ. ২৮।
৭৩. মুহাম্মদ আবদুল আযীয আল-খাওলী, মিসর: আল-মাকতাবাতুল ‘আরাবীয়াহ, ১৩৪৭ হি:/১৯২৮ খৃ.), পৃ. ৪০; বদর উদ্দীন ‘আইনী, উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬ ; আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন, পৃ. ৩৭৯।
৭৪. মিসর: আল-মাকতাবাতুল ‘আরাবীয়াহ, ১৩৪৭ হি:/১৯২৮ খৃ.), পৃ. ৪০।
৭৫. সূলাসিয়াত হলো হাদীসের একটি প্রকার। হাদীস শাস্ত্রে এর মান অত্যন্ত উঁচু। যে সকল হাদীসে গ্রন্থকার ও রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর মাঝে মাত্র তিন জন বর্ণনাকারী পাওয়া যায়, যাদের প্রথম জন তাবিঈ’র তাবিঈ’, দ্বিতীয় জন তাবিঈ’র এবং তৃতীয় জন সাহাবী তাকে সূলাসী হাদীস বলে। দ্রষ্টব্য: মুফতী মুহাম্মদ ইদরীস কাসেমী, কাশফুল বারী, শারহ সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৫।
৭৬. Dr. Muhammad Zubayr Siddiqi, *Hadith Literature* (Calcutta: Calcutta University, 1961), p. 95.
৭৭. J. Robson, *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. 1 (London: Luzac & Co, 1971), p. 1297 ; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, আস-সিহাহ সিহাহ আস-সিন্জাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুল-শাফিয়া, ২০১৫ খৃ:), পৃ. ৭৭।
৭৮. *Hadith Literature*, p. 95; আস-সিহাহ সিহাহ আস-সিন্জাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা, পৃ. ৭৭।
৭৯. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী(র:) ও তাঁর আল-জামি’ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৪২৬ হি:/২০০৫ খৃ.), পৃ. ৬১।
৮০. J. Robson, *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. 1, p. 1297.
৮১. ছিকাহ: যে বর্ণনাকারীর মধ্যে ‘আদালত’ (ন্যায়পরায়নতা) ও ‘যাবত’ (প্রখর স্মৃতিশক্তি) উভয় গুণ পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান থাকে তাকে ‘ছিকাহ’ বর্ণনাকারী বলে। দ্রষ্টব্য: ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অনুবাদ : মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, ভূমিকা, পৃ. ২৫।
৮২. ড. মুহাম্মদ সাব্বাগ, আল-হাদীসুন নববী (ঢাকা: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪৬০ হি:/১৯৮২ খৃ.), পৃ. ৩৬৫ ; জামালুদ্দীন আল-কাসেমী, কাওয়াইদ তাহদীস (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমীয়াহ, ১৪০৬ হি:/১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৯৬।
৮৩. ড. মুহাম্মদ সাব্বাগ, আল-হাদীসুন নববী, পৃ. ৩৬৫ ; মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, আস-সহীহ, ১ম খণ্ড (পাকিস্তান: নূর মুহাম্মদ আসাহল মাতাবি’, ১৩৮১ হি:/১৯৬১ খৃ.), পৃ. ২।
৮৪. ইবন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, মুকাদ্দিমাহ (বৈরুত: দারুল ‘ইয়াযিল কুতুবিল ‘আরাবী, ১৪০২ হি:), পৃ. ৫।

৮৫. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (র:) ও তার আল-জামি', পৃ. ৬২।
৮৬. প্রাগুক্ত ; আস-সিহাহ সিহাহ আস-সিভাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা , পৃ. ৭৮।
৮৭. ফাতহুল বারী, মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ৬ ; হাদয়ুস সারী, পৃ. ৫।
৮৮. খণ্ডায়ন: একটি হাদীসকে খণ্ড খণ্ড করে একাধিক অনুচ্ছেদে উল্লেখ করাকে 'খণ্ডায়ন' বলে। হাদীস খণ্ডায়নের ব্যাপারে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন পূর্ববর্তী আলিমের মতে হাদীস খণ্ডায়ন বৈধ নয়। তাদের ভাষ্য হলো, রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর হাদীসকে খণ্ডায়ন করা যাবে না। অপরদিকে ইমাম বুখারী (র:) সহ অধিকাংশ মুহাদ্দিস একে বৈধ বলে মনে করেন। দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ ইদরীস কাসেমী, কাশফুল বারী, শারহু সহীহিল বুখারী খণ্ড, পৃ. ৩০২।
৮৯. প্রাগুক্ত।
৯০. হাদীসের একাংশ উল্লেখ করে অপরাংশ ছেড়ে দেওয়াকে 'ইখতিসার' বলা হয়। দ্রষ্টব্য: কাশফুল বারী, শারহু সহীহিল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০২।
৯১. প্রাগুক্ত।
৯২. হাদয়ুস সারী, পৃ. ৫।
৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।
৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
৯৫. ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, 'উলুমুল হাদীস (রাজশাহী : সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০০০ খৃ.)', পৃ. ২৭৮।
৯৬. প্রাগুক্ত।
৯৭. প্রাগুক্ত।
৯৮. প্রাগুক্ত।
৯৯. প্রাগুক্ত।
১০০. তার পূর্ণ নাম 'আলী ইবন উমর ইবন আহমদ। তিনি হাদীসের যুগশ্রেষ্ঠ হাফেয ও ইমাম। তিনি ৩০৬ হিজরী সনে বাগদাদের 'দারে কুতন' মহল্লায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ 'আল-ইলজামাত'। ৩৮৫ হিজরী সনেই তিনি বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। দ্রষ্টব্য: হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ৪০০।
১০১. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ১ম খণ্ড (দিমাশ্ক: দারু তাওকিন নাজাত, ১৪২২ হি:), পৃ. ১১৫। হাদীস নং- ৫৫১।
১০২. হাদয়ুস সারী, পৃ. ৩৫০।
১০৩. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৫ ; হাদীস নং-১৩৯৭।
১০৪. ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাতান বিশিষ্ট তাবয়ী ও হাদীসবেত্তা। তাকে 'ইমাম ও শায়খুল ইসলাম' নামে অভিহিত করা হয়। ১২০ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ এবং ১৯৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। দ্রষ্টব্য: আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন, পৃ. ২৯১ ; হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ২৪২-২৪৩।
১০৫. যে ব্যক্তি সনদ ও মতনের সমুদয় বৃত্তান্তসহ কমপক্ষে এক লক্ষ হাদীস আয়ত্ত্ব করেছেন তাকে হাফিযে হাদীস বলা হয়। দ্রষ্টব্য: ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অনুবাদ: মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, ভূমিকা, পৃ. ২২।
১০৬. ফাতহুল বারী, মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ৩৮১।
১০৭. মিসফতাহুস সুন্নাহ, পৃ. ৪৫।

১০৮. প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ও হাফিযে হাদীস ছিলেন। ২৬৪ হিজরীতে তিনি ইস্তেকাল করেন। দ্রষ্টব্য: আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন, পৃ. ৩৪৫-৩৪৬।
১০৯. তার পূর্ণ নাম মুহাম্মদ ইবন খুযায়মাহ নিশাপুরী। তিনি হাদীস ও দ্বীনি মাসআলা সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ৩১১ হিজরীতে তিনি ইস্তেকাল করেন। দ্রষ্টব্য: হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ৩৪৬।
১১০. মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ইল আল-বুখারী (র:) ও তার আল-জামি', পৃ. ৬৬।
১১১. হাজী খলীফাহ, কাশফুয যুনুন, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪০২ হি:/১৯৮২ খ.), পৃ. ৫৪৫।
১১২. ফুয়াদ সিয়গীন, তারিখুত তুরাসিল 'আরবী, ১ম খণ্ড (সউদী 'আরব: ইরাদাতুস সাকাফী, ১৪০৩ হি:/১৯৮৩ খ.), পৃ. ২২৯-২৪৫।
১১৩. কাশফুয যুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৫-৫৪৬; মিসফতাহুস সুন্নাহ, পৃ. ৪২; তারিখুত তুরাসিল 'আরবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৯-২৪৫।
১১৪. কাশফুল বারী, শারহ সহীহিল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১।
১১৫. কাশফুয যুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৫-৫৪৬।
১১৬. তারিখুত তুরাসিল 'আরবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩১; কাশফুয যুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৫।
১১৭. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩০।
১১৮. কাশফুয যুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৬।
১১৯. তারিখুত তুরাসিল 'আরবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩০।
১২০. কাশফুয যুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৯।
১২১. মিসফতাহুস সুন্নাহ, পৃ. ৪২।
১২২. তারিখুত তুরাসিল 'আরবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩-২৪৫; কাশফুয যুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৭-৫৪৯; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়াহ, ১৪২২ হি:/২০০১ ক.), পৃ. ৭১-৭২।
১২৩. হানিফ গাংগুহী, যাকরুল মুহাসসিলীন (দেওবন্দ: হানিফ বুক ডিপো, ১৯৮০ খ.), পৃ. ১৩৫।
১২৪. কাশফুয যুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৯।
১২৫. প্রাগুক্ত।
১২৬. তারিখুত তুরাসিল 'আরবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮।
১২৭. কাশফুয যুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৬।
১২৮. তারিখুত তুরাসিল 'আরবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮; কাশফুয যুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৬।
১২৯. তারিখুত তুরাসিল 'আরবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯-৪০।
১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।
১৩১. প্রাগুক্ত।
১৩২. কাশফুল বারী, শারহ সহীহিল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০১।

রবীন্দ্রনাটকে মুক্তির সন্ধান: অচলায়তন

সুমনা সরকার*

Abstract: The literary works of Rabindranath Tagore have huge connection with the announcing of freedom. His plays are not even different. In his plays, Tagore continuously had searched for the freedom of the people. To give freedom to the spirit of the people he has destroyed superstitions and the middle of the darkness and has also given freedom to the inner spirit. In his play *Dakghar*, he took the wailing of different souls and in *Achalayatan* he removed superstition education in the society and showed the way. The main freedom of life is obtained by being attached with the nature of the world. In his plot *Achalayatan* the search of finding a working way by breaking all obstacles of the past, is merely a synonym of freedom? In the different sequences of the play the search for freedom is the main subject of this article.

বৃথা আচার, কুসংস্কার, প্রগতিবর্জিত, গোঁড়ামিপূর্ণ আয়তনই এক একটি অচলায়তন। এই অচলায়তন বা আচারবিলাসী সমাজের বুকে যেমন আচারসর্বস্ব, গোঁড়ামিপূর্ণ মানুষ আছে তেমনি আবার এই সমাজের বুকেই জন্মগ্রহণ করেন শিল্পী-সাহিত্যিক যারা শিল্পের আঁচড়ে প্রতিনিয়ত ভাঙতে থাকেন সকল প্রথা, বৃথা আচার, অর্থহীন ক্রিয়াকর্ম, ছিঁড়তে থাকেন আচারসর্বস্বতার বেড়া জাল এবং কুসংস্কারকে খণ্ডন করেন প্রতি পদে পদে, প্রতি ক্ষণে যারা মানবাত্মার মুক্তির সন্ধান করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তেমনি একজন শিল্পী যিনি অচলকে সচল করবার ব্রতে দীক্ষা নিয়েছেন; সর্বত্র আলো ছড়িয়ে দেবার ব্রতেও থেকেছেন দীক্ষিত। যিনি প্রতিনিয়ত আলোর সন্ধান করেছেন; করেছেন মুক্তির সন্ধান। তিনি সেই মুক্তির সন্ধান করেছেন যে মুক্তি আচারসর্বস্বতার থেকে মুক্তি, কুসংস্কার থেকে মুক্তি, অজানা ভয় থেকে মুক্তি, অন্ধকার থেকে মুক্তি, সেইসাথে আত্মার মুক্তি, আত্মোপলব্ধিও বটে। কুসংস্কারের সু-উচ্চ প্রাচীর ভেঙ্গে মানবাত্মার বা অন্তরাত্মার মুক্তিকে করেছেন সুনিশ্চিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতন্ত্র দর্শনচিন্তা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়ে উঠেছেন কালজয়ী। শুধু নাটক নয়; সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে বিচরণ নেই তাঁর। বহুমাত্রিক শিল্পসৃজনের স্রষ্টা তিনি। তাঁর লেখা নাটক যেন সর্বকালের কথা বলে। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি নাটকের মূলেই রয়েছে মুক্তির সন্ধান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালের সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে *বিদ্যাবদান* *মালায়* বর্ণিত 'পঞ্চক' আখ্যানকে আশ্রয় করে রচনা করেছিলেন *অচলায়তন* নাটকটি। আখ্যানের সার-সংক্ষেপ অনেকটা এরূপ:

জনৈক ব্রাহ্মণ তার কোন সন্তানকে বাঁচাতে না পেরে শেষে শ্রমণ ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদে ছোট সন্তানকে বাঁচাতে সক্ষম হন। সেই সন্তানই মহাপঞ্চক। একদা মহাপঞ্চক 'মহাজ্ঞানী' সন্ন্যাসী হয়ে অর্হৎ লাভ করেন। কিন্তু ছোট ভাই পঞ্চক রয়ে যায় 'মহামূর্থ'। উপরন্তু মহাজ্ঞানলাভে পঞ্চকের

* সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

তীব্র অনীহায় অতিষ্ঠ হয়ে মহাপঞ্চক তাকে বিহার থেকে বিতাড়িত করেন। ক্রন্দনরত পঞ্চককে পথে পেয়ে গৌতমবুদ্ধ তাকে বিহারে নিয়ে আসেন। জৈনিক ভিক্ষুর কাছে তার শিক্ষার ভার দিলে পঞ্চক অল্প দিনেই জ্ঞানী হয়ে অর্হন্ত লাভ করে।^১

রবীন্দ্রনাথের *অচলায়তন* এরূপ ঘটনার আশ্রয়ে নির্মিত হলেও গভীরে বিরাজমান মুক্তির সন্ধান। সে মুক্তি আত্মার, মানবতার, সংস্কৃতির, আচারের, প্রথার সর্বোপরি শিক্ষাব্যবস্থার। *অচলায়তন*-এ পঞ্চক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি মুক্তির সন্ধান করেছেন। সমস্ত অচলায়তনিকদের মুক্তি। সমাজে বিদ্যমান কুসংস্কারে আচ্ছন্ন অন্ধকার দূর করে দিয়ে দিতে চেয়েছেন আলোর সন্ধান। *অচলায়তন* একটি প্রথা বা সিস্টেম। রবীন্দ্রনাথ সমকালীন জীবনবোধ, সমকালীন সমাজ বাস্তবতা ও শিক্ষাব্যবস্থাকে তুলে ধরতে অচলায়তনরূপ বিদ্যায়তনকে আমাদের সামনে নিয়ে আসেন।

পর্বত প্রমাণ কুসংস্কার আর কুপ্রথার প্রাচীর সৃষ্ট হয়ে *অচলায়তন* গড়ে ওঠে তখনই, যখন সংস্কার, আচার, প্রথা ইত্যাদির অন্তর্নিহিত ভাব হারিয়ে শুধুমাত্র বাহিরের নিয়মের দিকটাই প্রাধান্য পায়। মুক্ত আকাশে উড়ছে যে পাখিটি, তার স্বাধীনতাকে খাঁচায় বন্দি করলে পাখিটি টিকে থাকবে কতদিন তাও সুনিশ্চিত করে বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর “ছুটি” গল্পে গ্রামের এক কিশোর ছেলে ফটিককে দেখিয়েছেন; যার বেড়ে ওঠা গ্রামীণ পরিবেশে; মুক্ত, স্বাধীন, দুরন্ত প্রকৃতির ছেলে। পড়াশোনার জন্য একমাত্র আপনজন মা আর চিরপরিচিত গ্রাম, গ্রামের পথ-ঘাট-মাঠ, খেলার সাথী সব ছেড়ে চলে যেতে হয় মামার সাথে শহরে। শহুরে যান্ত্রিকতায় বন্দি হয়ে যায় ফটিক। মুক্তি চায়, একটু ছুটি চায় মায়ের কাছে গ্রামে ছুটে যাবার জন্য। মামীর অত্যাচারে ছুটি মেলে ফটিকের। সত্যিই অবশেষে বন্দি ফটিক মুক্তির সন্ধান পায়; পায় ছুটি। গ্রামের এক দুরন্ত ছেলে ফটিক, গ্রাম পেরিয়ে শহরে এসে ভালবাসা পেল না। সে ভাবে, পূজোর ছুটিতে বাড়ি গিয়ে লুকাবে মায়ের আঁচলে, কিন্তু অবশেষে অনন্ত ছুটির মধ্য দিয়ে পালাল সে বিশ্বমায়ের প্রাণ্ডলে।

তেমনি এক ফটিক নয়; প্রগতিবর্জিত, গৌড়ামিপূর্ণ অচলায়তন নামক আশ্রমে বাস করে অনেক শিক্ষার্থী এবং আচার্য, উপাচার্য, উপাধ্যায়, অধ্যাপক, মহাপঞ্চক। উচ্চ প্রাচীরে আশ্রমটি সুদৃঢ়ভাবে ঘেরা, ভিতরে লোহার দরজা। বাহিরের পৃথিবী থেকে একে স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে, বাহিরের কোন লোকের এখানে প্রবেশ নিষেধ। এখানকার ছাত্ররা কেবল নানা মন্ত্র মুখস্থ করে, নানা তন্ত্রানুসারে ক্রিয়াকাণ্ড করে, শাস্ত্র-বচন অনুসারে জীবন-যাপন করে। শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ তারা নিখুঁতভাবে পালন করে। সামান্য একটু নিয়ম লঙ্ঘনে তাদের মহাপাতকের ভয়। শিক্ষকগণ তাদের শাস্ত্র, তন্ত্র-মন্ত্র, বিধি-নিষেধ বিশেষ যত্নের সাথে শিক্ষা দেন এবং এই শাস্ত্রনির্দেশ পালন ব্যতীত জীবনের আর কোন মহোত্তর আদর্শ নেই, তা তাদের বাক্যে ও ব্যবহারে প্রকাশ করেন। ছাত্র ও অধ্যাপকের জীবন এখানে কঠিন নিয়ম ও নিষ্ঠার বাঁধনে দৃঢ়ভাবে বাঁধা। অতি প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠান।

আবার প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাস্কেতিক নাটক *ডাকঘর*-এ দেখিয়েছেন কেন্দ্রীয় চরিত্র অমলের বন্দি থেকে মুক্তি অর্জনের কী সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। প্রকৃতি, প্রকৃতির বিচিত্র খেলা থেকে অমলকে বিচ্ছিন্ন করে রাখায় তার মধ্যে মুক্তি লাভের যে পিপাসা তা অকল্পনীয়। একটু আলোর সন্ধানী অমল ছুটে যেতে চায় উঠোনটাতে, দইওয়াল হয়ে দই বেঁচে বেঁচে ছুটে বেড়াতে চায় এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে, প্রহরী হতে চায়, ডাকহরকরা দেখে জানতে চায় রাজার কাছ থেকে তার নামে কোন চিঠি এসেছে কিনা, আবার নিজেও ডাকহরকরা হতে চায় বন্দি জীবন থেকে মুক্তি লাভের আশায়। আর তাই গেয়ে ওঠে অমল:

ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে

ও বন্ধু আমার !

না পেয়ে তোমার দেখা একা একা দিন যে আমার কাটে নারে॥

বুঝিগো রাত পোহালো

বুঝি ওই রবির আলো

আভাসে দেখা দিল গগন পারে

সমুখে ওই হেরি পথ তোমার কি রথ পৌঁছবেনা মোর দুয়ারে॥^২

অমলের এই গানের সুরের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মূলত অমলের চরিত্রের প্রকৃত-স্বরূপ তুলে ধরেছেন। দেখিয়েছেন মুক্তিপিপাসু অমলের বন্দীত্ব। মুক্তি পিপাসু অমলকে যখন ব্যধি গ্রাস করছে, চিকিৎসাশাস্ত্র তখন তাকে আবদ্ধ করছে ঘরে। দীর্ঘ একটা সময় পৃথিবীর আলো, শরতের রৌদ্র-হাওয়া, সবুজ প্রকৃতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা অমলকে রাজকবিরাজ যখন আলোর সন্ধান দেয়, খুলে দেয় বদ্ধ ঘরের সকল দ্বার তখনই পৃথিবীর আলো-বাতাসে সহসা প্রাণ ফিরে পায় অমল। সহসা প্রাণ ফিরে পাওয়া অমলকে অসুস্থতার জন্য বন্দি করে রেখেছে সবাই। ‘শাসনের চাপে ক্লান্ত পীড়িত আত্মার ক্রন্দন ও তার মুক্তির ইঙ্গিতই নাটকে করা হয়েছে। আর তার জন্যই শিশু অমলকে আশ্রয়।’^৩

আবদ্ধ ঘরে অমল যে সত্যিই হাঁপিয়ে উঠেছিল সে কথা কেউ কখনো বোঝে নি, বুঝতে চায়ও নি। তাইতো কেউ কখনো তাকে বাইরে বেরোনোর কথা বলেনি, সেজন্য অসুস্থ অমলের কাছে যখন রাজকবিরাজ জানতে চায় রাজা এলে বেরোতে পারবে কিনা, তখন একটু আলোর সন্ধান পাওয়া অমল মুক্তির স্বাদ পাবে, পাবে জীবনের সকল বাধা, অন্ধকার দূর করে মুক্ত প্রকৃতির সাথে মিশে যেতে, এই ভেবে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে:

পারব, আমি পারব। বেরোতে পারলে আমি বাঁচি। আমি রাজাকে বলব, এই অন্ধকার আকাশে
ধ্রুবতারাটিকে দেখিয়ে দাও। আমি সে তারা বোধ হয় কতবার দেখেছি। কিন্তু সে যে কোনটা
সেতো আমি চিনি।^৪

বলতে বলতে একপর্যায়ে অমলের চোখে ঘুম নেমে আসে। হয়তো ঘুম। হয়তো মুক্তি। হয়তো মৃত্যু। এভাবেই তো মুক্তিপিপাসু অমলও পায় চির মুক্তির সন্ধান। যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে যুক্ত করো হে বন্ধন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবের বিচ্ছিন্নতাকে বন্দিত্ব আর যুক্ত হওয়াকে মুক্তি বলতে চেয়েছেন।

অচলায়তন নাটকে তিনটি ভিন্ন শ্রেণির অচলায়তন বিদ্যমান। অচলায়তনিকদের অচলায়তন, শোণপাংশুদের অচলায়তন ও দর্ভকদের অচলায়তন। তিন দলের অপরাধেই অচলায়তন সৃষ্টি হয়েছে। কুসংস্কার আর কুপ্রথার প্রাচীর গড়ে তুলেছে তিনটি দল-ই। তবে তিনটি দলই স্বতন্ত্র। আর তাই তাদের সাধনার পথও ভিন্ন। তিনটি ভিন্ন পথের সাধনার মধ্যে কোন সমন্বয়ের চেষ্টাও নেই, নিজ নিজ সাধনার পথকেই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পথ বলে ভাবে, সেজন্য কেউই গুরুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে না। অথচ প্রত্যেকেই গুরুর অন্বেষণে রত। গুরুর অন্বেষণে ‘মহাপঞ্চকের অচলায়তনের সাধনা জ্ঞানমার্গে, শোণপাংশুর অচলায়তনের সাধনা কর্মমার্গে, দর্ভকদের অচলায়তনের সাধনা ভক্তিমার্গে’।^৫

জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই আসলে প্রকৃত মুক্তি লাভ সম্ভব, সম্ভব আত্মমুক্তি, সম্ভব মনের অন্ধকার দূর হয়ে আলোর সন্ধান পাওয়া। তবেই আবির্ভাব ঘটবে গুরুর, অবসান ঘটবে সমস্ত বিরোধের, দূরীভূত হবে ঘনীভূত যেকোন মুহূর্ত বা সংকট তথা আদর্শগত বিরোধের।^৬

যুগ যুগ ধরে এ সমাজের বুকে গড়ে ওঠেছে অচলায়তন। পরিবার, সমাজ, জীবন, রাষ্ট্র প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুসংস্কার, কুপ্রথা, বৃথা আচার, নিয়মের বেড়াজালে পর্বত সমান প্রাচীর পরিবেষ্টিত হয়ে আয়তনকে করেছে অনড়, অচল, স্থির। রবীন্দ্রনাথ নিয়মের এই বেড়াজালকে ছিন্ন করে বারংবার ভাঙতে চেয়েছেন কুসংস্কারের সু-উচ্চ প্রাচীরকে। অচলায়তন নাটকে আশ্রমের অচলায়তনিকগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গের সাধনার একাত্মতায় মন্ত্রকে মননের চেয়ে, আচারকে মানুষের চেয়ে এবং পুঁথিকে গুরুর চেয়ে বড় মনে করেছিল। তাই জীবন-সংসার, মানুষ, প্রকৃতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখবার চেষ্টায় রত ছিল। সেজন্য নিজেদের চারিদিকে যে প্রাচীর তুলেছিল তা শুধু পাথরের নয়, কুসংস্কার আর কুপ্রথার গাঁথুনিতে তা দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছিল। এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভাঙবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর অচলায়তন নাটকে আবির্ভাব ঘটান গুরুর।

অচলায়তন নাটকে একমাত্র পঞ্চক চরিত্রটির মধ্যেই দ্বন্দ্বিকতা বিদ্যমান। আশ্রমের আচার-নিষ্ঠা, প্রথা, নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ তাকে ধরে রাখতে পারে না বটে কিন্তু আবার আয়তনের বাইরে যে বিশাল মুক্ত স্বাধীন পৃথিবী সেখানে গিয়েও থাকতে পারে না। বাইরে গিয়ে শোণপাংশুদের মুক্ত স্বাধীন প্রাণ, কর্মচাঞ্চল্য দেখে আনন্দ পায় কিন্তু তারপর অচলায়তনের কাঁসরের ঘণ্টা বাজলে ‘আমার আর থাকবার জো নেই’^৭ বলেই দীপকেতন পূজোর জন্য মাটি দিয়ে ছোট ছোট মন্দির গড়তে ছোট। অর্থহীন আচার-প্রথা, নিয়ম-কানুন বিশ্বাস না করলেও বা তা মন থেকে না মানতে চাইলেও সেই গণ্ডি বা অচারের বেড়াজাল ছিন্ন করে বাহিরের জগতে একেবারে চলে যাবার সাহস পায় না কেননা বাহিরেও যে পরিপূর্ণ সার্থকতা নেই, তা সে বোঝে। কারণ ওই শোণপাংশুর দলও যে অন্তরের মুক্তি চায় না, চায় বাহিরের স্বাধীনতা; সে স্বাধীনতা কাজ করবার স্বাধীনতা। তাই পুরাতনকে ছাড়বার বা চিরপরিচিত গণ্ডি পেরুতে ভয় পঞ্চকের:

খাঁচায় যে পাখিটার জন্ম, সে আকাশকেই সবচেয়ে ডরায়। সে লোহার শলাগুলোর মধ্যে দুঃখ পায়
তবু দরজাটা খুলে দিলে তার বুক দূরদূর করে, ভাবে, বন্ধ না থাকলে বাঁচব কেমন করে।
আপনাকে যে নির্ভয়ে ছেড়ে দিতে শিখিনি। এইটেই আমাদের চিরকালের অভ্যাস।^৮

আবার খাঁচার দরজা খুলে বা ক্ষুদ্র গণ্ডি পেরিয়ে মানুষ যখন সুবৃহৎ মুক্ত আয়তনে বিচরণ করে তখন মনের সকল গণ্ডি, বাধা দূরে সরে যায়। তখন নিজেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বড় হতে থাকে-মনে-মননে, জ্ঞানে ও কর্মে। প্রকৃতির বিশালতা তাকে বিশাল হতে শেখায়। তারই ইঙ্গিত দাদাঠাকুরকে বলা পঞ্চকের কথা ‘যতবার বাইরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হয় ততবার ফিরে গিয়ে অচলায়তনে আমাকে যেন আর ধরে না। হয় ওটাকে বড় করে দাও নয় আমাকে আর বাড়তে দিও না।’^৯

বিভেদসৃষ্টিকারী জ্ঞান কখনো বিকাশ লাভ করতে পারে না। অচলায়তনের জ্ঞান সাধনা নীরস, কঠোর, বিভেদসৃষ্টিকারী, দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্মাণকারী। তাই শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ তথা শাস্ত্রীয় অনুশাসন হয়েছে অচলায়তনিকদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। শাস্ত্রের পাকে পাকে তাদের জীবন হয়েছে স্থির-নিশ্চল। তাদের বুদ্ধি, শক্তি, ধর্ম ও অন্ধ আচারও শাস্ত্রীয় সংসারে আবদ্ধ। তবে অচলায়তনের কুসংস্কার, কুপ্রথা প্রতিনিয়ত আবর্জনা সৃষ্টি করেছে। বাইরের প্রগতিশীল, পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, জীবন যুদ্ধের সঙ্গে যে যোগ থাকা প্রয়োজন অচলায়তন প্রতিনিয়ত সে সম্পৃক্ততা হারিয়ে ফেলছে। প্রতিনিয়ত ভুলে যাচ্ছে সাধনার মূল লক্ষ্য। কেননা তারা জানে না সাধনা হবে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে। একের দম্ব অথবা গুরুকে পাবার প্রচেষ্টা বা পথকে ভেঙ্গে তিনকে মেলাতে পারলেই গুরুর সাথে দেখা হবে, হবে মুক্তির স্বাদ আনন্দ। তাহলেই সাধনা বিকাশ লাভ করবে এবং সার্থক হবে।

...ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্যই বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে মেলায় না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এইজন্যে কৃচ্ছ্রসাধনকে যখন কোন ধর্ম আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে, যখন সে আচার-বিচারকে মুখ্য স্থান দেয়, তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে; তখন তার নীরস কঠোরতা সকলের সঙ্গে তাকে মিলতে বাধা দেয়, সে আপনার নিয়মের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে আবদ্ধ করে রাখে; সর্বদায় ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে নিয়মের ত্রুটিতে অপরাধ ঘটে এইজন্যেই সবাইকে সরিয়ে সরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হয়। শুধু তাই নয়, নিয়ম পালনের একটা লোভ তাকে পেয়ে বসে এবং এই সকল নিয়মকে ধ্রুব ধর্ম বলে জানা তার সংস্কার হয়ে যায় বলেই যেখানে এই নিয়মের অভাব দেখতে পায় সেখানে তার অত্যন্ত একটা অবজ্ঞা জন্মে।^{১০}

সাধনা যখন অন্যের সাথে মিলতে বাধা দেয়, মন্ত্র যখন সর্বস্ব হয়ে মানুষের মনের উদারতা তথা বিকাশের পথে বাধা দেয় এবং যখন তা মানবকল্যাণের পরিপন্থী হয়, ধর্মের নামে মিথ্যা আচার যখন মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়, ভিতরের রস শুকিয়ে শুষ্ক হয়, ধর্মের মূল দিকটা হারিয়ে বাহিরের দিকটা প্রাধান্য পায়, কঠোর নিয়মের বেড়া জালে মানুষ যখন নিজেকে আবদ্ধ করে, যখন মানুষের মাঝে তোলে বিভেদের প্রাচীর তখনই প্রয়োজন হয় আঘাত হানার আর তাই দাদাঠাকুরের যুদ্ধোয়োজন। উল্লেখ্য যে, অচলায়তনে অচলায়তনিকরা যাকে গুরু বলে জানেন, শোণপাংশুদের কাছে তিনিই দাদাঠাকুর আর দর্ভকদের কাছে গোসাই, মূলত তিন শ্রেণির কাছে তিনিই দেন মুক্তির সন্ধান, আলোর সন্ধান।

চতুর্থ শোণপাংশু : আমাদের দেশ থেকে দর্শজন শোণপাংশু ধরে নিয়ে গিয়েছে, হয়তো ওদের কালবাণি

দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর: চলো তবে।

সকলে: ওরে চল রে চল।

দাদাঠাকুর: আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি

আচ্ছন্ন করতে উঠবে, তখনই সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।^{১১}

আঘাতে আঘাতে ভেঙ্গে ফেলেন অচলায়তনের সুউচ্চ প্রাচীর। ভ্রান্তি যখন বোধকে ছাড়িয়ে যায় তখন আর আত্মোপলব্ধির সুযোগ থাকে না। ঠিক তখন কঠোর আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলতে হয় ভ্রান্তি আর কুসংস্কারের সুউচ্চ প্রাচীরকে। তাহলে অসত্য, অন্যায় যে মানুষ বা মানুষগুলোর চারিদিকে পরিবেষ্টিত তাদের আত্মোপলব্ধি ঘটে, মুক্তি লাভ করে মানুষ। এটা সত্য যে আঘাত কিংবা ভেঙ্গে ফেলার মধ্যে কোন মঙ্গল নিহিত থাকে না। কিন্তু একথা সুনিশ্চিত করে বলা যায়, যে আঘাত কুপ্রথা আর কুসংস্কারের গাঁথুনিতে সৃষ্ট দুর্ভেদ্য প্রাচীরকে ভেঙ্গে ফেলে, যে আঘাত মানুষে মানুষে বিভেদসৃষ্টিকারী প্রাচীরকে ভেঙ্গে ফেলে, সে আঘাতের চূড়ান্ত ফলাফলের হিসেবের খাতায় মঙ্গল থাকবেই। অচলায়তন নাটকের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙ্গে ফেলে। যে বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গম পথস্ তৎ করায়ো বদন্তি-দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে-আতঙ্কে সে দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি-তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, কেননা নায়মাাত্রা বলহীনেন লভ্যঃ। 'অচলায়তনে' এই কথাটাই আছে।.....আমি তো মনে করি আজ যুরোপে যে যুদ্ধ বেঁধেছে তা ও গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেকদিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহঙ্কারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে।^{১২}

শোণপাংশুদের সাহায্যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে দাদাঠাকুর। যখন অচলায়তনের সমস্ত প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা হলো, খুলে ফেলা হলো সমস্ত লোহার দরজা তখন আচারসর্বস্ব মহাপঞ্চক বলে ওঠে:

উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এসো আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।...পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পারো, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পারো, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া, তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।...কিসের ভয় দেখাও আমায়। তোমরা মেরে ফেলতে পারো, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।^{১৭}

গ্রীষ্মের প্রখরতায় বা অগ্নিক্ষরা দহনে পৃথিবী যখন দক্ষ তখনি আবির্ভাব ঘটে ঘন-যৌবনা বর্ষার। দহন দূর করে প্রকৃতিকে করে শীতল, বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতি হয়ে ওঠে সজীব ও প্রাণবন্ত। অচলায়তন নামক আশ্রমে বিধি-নিষেধ, শাস্ত্র, মন্ত্র-তন্ত্র, প্রথা সর্বত্র যখন ছড়িয়ে দিয়েছে শুষ্কতা, তখন সেই শুষ্কতার মাঝে ঘন গৌরবে নব যৌবনা বর্ষার দূত হয়ে আসে পঞ্চক। মুক্তি চায় আচারের অত্যাচার থেকে, শুধু নিজের মুক্তি নয়, আয়তনের সবার মুক্তি কামনা করে বলেই এসব শাস্ত্র, মন্ত্র-তন্ত্র, প্রথা, বিধি-নিষেধ-এর বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন করে। রসের অভাবে অচলায়তনে যখন শুষ্কতা তখন পঞ্চকের আহ্বান:

তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা-আয় রে নবীন কিশোরলয়-তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শুনছ না, আকাশের ঘননীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে, আজ নৃত্য কর রে নৃত্য কর।^{১৮}

প্রাণহীণ আচার ও মননহীন মন্ত্রে মহাপঞ্চকের মধ্যে একমাত্র বিরাজ করে গ্রীষ্মের শুষ্কতা ও শক্তি। অচলায়তনিকদের মধ্যে একমাত্র পঞ্চক-ই জানে বর্ষাতেই মুক্তি, রসের বর্ষণই এই শুষ্কতা দূর করতে পারে, প্রকৃতি যেমন বর্ষায় নবরূপে, নবযৌবনে, নবসাজে নিজেকে সজ্জিত করে তেমনি রসের বর্ষণেই অচলায়তন নবসাজে সজ্জিত হবে, হবে প্রাণবন্ত, পাবে সজীবতা। আর সে রসের বর্ষণ ঘনীভূত হয়ে আসছে। বর্ষা আসন্ন। তা তখনি বোধে খেলে যায় যখন দাদাঠাকুরকে পঞ্চক বলে:

ঠাকুর আমি তো সেই বর্ষণের জন্যে তাকিয়ে আছি। যতোদূর শুকোবার তা শুকিয়েছে, কোথাও সবুজ আর বাকি নেই, এইবার তো সময় হয়েছে—মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে গুরু গুরু ডাক শুনতে পাচ্ছি। বুঝি এবার ঘননীল মেঘে তপ্ত আকাশ জুড়িয়ে যাবে, ভরে যাবে।^{১৯}

সত্যিই যখন গুরু এলেন তখন বর্ষা এলো। প্রকৃতি ধারণ করলো বর্ষা ঋতু। মনে নেমে এলো রসের বর্ষণ। মিলল মুক্তি, দূর হলো গ্রীষ্মের শুষ্কতা আর শক্তি। গুরুর আঘাতে ভেঙ্গে গেল কুসংস্কারে পরিবেষ্টিত প্রাচীর, ছিন্ন হলো আচারসর্বস্বতার বেড়া জাল। অচলায়তন শুধু ভাঙবার কথাই বলেন নি, ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে গড়বার কথাও বলেছেন। তাই পঞ্চক যখন বন্ধন ছেড়ে উধাও হতে চেয়েছিল তখন গুরু বলেন: ‘না যাইতে পারিবে না—যেখানে ভাঙ্গা হইল এখানেই আবার প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে। গুরুর আঘাত নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড়ো করিবার জন্যই। তাঁহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করা নহে, স্বার্থক করা।’^{২০}

সংস্কার, আচার-প্রথা, মন্ত্র-তন্ত্র, শাস্ত্রের অনুশাসনে স্থবির অচলায়তনের পাঠক্রমে সকলেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। একটার পর একটা মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে আত্মস্থ বা আয়ত্ত করে ফেলে সবাই। কিন্তু ব্যতিক্রম পঞ্চক।

সহপাঠীদের মতো গতানুগতিক পাঠ্যক্রমে সে নিজেকে অভ্যস্ত করতে পারে না। মেনে নিতে পারে না নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের স্থবিরতা ও জড়ত্বকে। সর্বদা অতিক্রম করতে চায় সংস্কারের বেড়াঝালকে, ভাসতে চায় স্থবিরতার প্রাচীরকে। কিন্তু অচলায়তনিকদের মধ্যে এই চেষ্টাটা একমাত্র তারই মধ্যে বিদ্যমান। তাই গতানুগতিক পাঠ্যক্রমে একমাত্র তারই ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। একটি মন্ত্রই সে আত্মস্থ করতে পারে না। বজ্রবিদারণ মন্ত্রটা সাত দিন চেষ্টা করেও মুখস্ত করতে পারে না সে বরং সাতদিন আগে যেটা তাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল ভুল আওড়াতে আওড়াতে আজ তা এতটাই ভিন্ন হয়েছে যে চেনা শক্ত। আর যাই হোক জোর কিংবা চাপিয়ে দেয়া শিক্ষা কখনো মানুষকে সৃষ্টিশীল করে না বরং মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততাকে নষ্ট করে ফেলে। তারই প্রমাণ মেলে পঞ্চক চরিত্রের দ্বন্দ্বিকতা থেকে।

প্রথাগত ও সামাজিক সংস্কারের আচ্ছন্নতা, গতানুগতিক পাঠ্যক্রম বা সংস্কার-সংস্কৃতির আড়ষ্টতা আমাদের বিদ্যায়তন তথা শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রতিনিয়ত অচল চিত্রে পরিণত করছে। যে সীমা, যে প্রাচীর, যে আয়তন, যে পাঠ্যক্রম, যে সিলেবাসকেন্দ্রিক পড়াশোনার মধ্য দিয়ে আমরা তথা আমাদের সমাজ সামনের দিকে অগ্রসরমান তা কোনোক্রমেই আমাদের চিন্তের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের অনুকূল নয়। কেননা জীবনটা জড় আর ক্ষুদ্রত্বের সীমানায় বদ্ধ হবার জন্য নয়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় চির অভ্যস্ততা সৃষ্টিশীলতাকে ক্রমাগত সৃষ্টিহীন করে তুলছে। সৃষ্টিহীন পাঠ্যক্রমের অভ্যস্ততাকে উপরে ফেলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সৃষ্টিশীল বিদ্যায়তন; যেখানে ধর্ম, কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়ে চর্চিত হবে মুক্তবুদ্ধির চর্চা। রবীন্দ্রনাথের পথের সঞ্চয় থেকে আবিষ্কার করতে পারি বদ্ধ, অচল, অনড়, স্থবির আয়তনের যে শিক্ষাব্যবস্থা *অচলায়তন* নাটকে সমস্যারূপে বিদ্যমান আমাদের সম্মুখে তার সমাধান কী হতে পারে :

মাঠের মাঝখানে এই আমাদের আশ্রমের বিদ্যালয়। এখানে আমরা বড়োয় ছোটোয় একসঙ্গে থাকি, ছাত্র ও শিক্ষকে এক ঘরে শয়ন করি, তেমনি এখানে আরো আমাদের সঙ্গী আছে; আকাশ আলোক এবং বাতাসের সঙ্গেও আমরা কোনো আড়ালের সম্পর্ক রাখি নাই। এখানে ভোরের আলো একেবারে আমাদের চোখের উপর আসিয়া পড়ে, আকাশের তারা একেবারে আমাদের মুখের উপর তাকাইয়া থাকে। বাড় যখন আসে সে একেবারে দিকপ্রান্তে ধুলার উত্তরীয় দুলাইয়া বহু দূর হইতে আমাদের খবর দিতে থাকে। কোনো ঋতু যখন আসন্ন হয় তখন তাহার প্রথম সংবাদটি আমাদের গাছের পত্রে পত্রে প্রকাশিত হয়। বিশ্বপ্রকৃতিকে এক মুহূর্ত আমাদের দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয় না।^{১৭}

চাপিয়ে দেয়া শিক্ষাব্যবস্থা পদ্ধতি দূর করতে হবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় একটি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায় কতটা স্থবির হয়ে পড়ছে শিশুটি এবং তার পাশাপাশি এ সমাজ। প্রতিনিয়ত শিশুরা বই বোঝাই করা ব্যাগ বহন করে হারিয়ে ফেলছে নিজেদের চাঞ্চল্যতাকে। বইয়ের স্তুপে চাপা পড়ে যাচ্ছে শিশুদের শৈশব। জন্মের কিছুদিন পরেই শিশুরা হারিয়ে ফেলছে তাদের শিশুসুলভ আচরণ বা স্বাধীনতা। বুঝবার বয়স হতে না হতেই বই-বোঝাই ব্যাগ কাঁধে ছুটে চলছে বিদ্যালয় নামক একটি আয়তনে। যেখানে শিশুর মানসিক বিকাশের চেয়ে মুখ্য হয়ে পড়ছে অক্ষর জ্ঞান। সর্বদাই শিক্ষক পাঠদানে রত, ছোট শিশুটি কতটা নিতে পারছে তা মুখ্য নয়, মুখ্য হচ্ছে বইটি বা সিলেবাসটি শেষ করা। এরপর শিশুটি বাসায় ফিরে পারিবারিক নিয়মমাফিক সকল কাজ শেষ করে আবার পড়তে বসে। হয় বাবা-মা অথবা কোনো শিক্ষক আবার তাকে বিদ্যালয়ের পড়া মুখস্থ করাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যে শিশুটির বিকেল কাটবার কথা খেলার মাঠে বা খেলার সাথীদের সাথে, কিছু না বুঝেই সেই শিশুটির বিকেল থেকে সন্ধ্যা কেটে যায় হোমওয়ার্ক মুখস্থ করতে করতে। পুঁথির চাপে চাপা পড়ে

যায় শিশুটির স্বাভাবিক ও মানসিক বেড়ে ওঠা। প্রতিযোগিতার এ যুগে এভাবে শিশুটি বেড়ে ওঠে বটে কিন্তু মনে মনে প্রতিনিয়ত মুক্তি খোঁজে, বেরিয়ে আসতে চায় এই নির্দিষ্ট গণ্ডি ও নিয়মের বেড়াজাল থেকে। তাই প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা বিশ্ব ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানতে সহায়তা করছে না বরং বাধ্য করছে মুখস্থ করে আত্মস্থ বা আয়ত্ত করতে। *অচলায়তন* তাই সমকালেও প্রাসঙ্গিক। প্রাথমিক পর্যায়ে থেকে বেরিয়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একই চিত্র দৃশ্যত। ছাত্র-শিক্ষকের যে সম্পর্ক বিরাজ করবার কথা বা যে পদ্ধতিতে শিক্ষাদান বা শিক্ষাগ্রহণ করবার কথা তা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় নামটি থেকেই এর বিশালত্বকে আঁচ করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় হবে উন্মুক্ত চিন্তার কেন্দ্রস্থল। কিন্তু নিয়মের বেড়াজাল, প্রথা, সিলেবাসকেন্দ্রিক পড়াশোনা, পরীক্ষা পদ্ধতি উন্মুক্ত চিন্তার আকাশকে করছে বদ্ধ আয়তনে আবদ্ধ। জানার জন্য শিক্ষা না হয়ে প্রতিনিয়ত শিক্ষা হয়ে পড়ছে পরীক্ষায় পাস বা ভাল ফল অর্জনের জন্য। নিয়মপাশে, পুঁথিগত বিদ্যার চাপে জীবনের গতি ক্রমাগত হচ্ছে রুদ্ধ।

আমাদের বিদ্যার যে আয়তন তা মূলত একটা সমগ্র দেশ বা জাতির সংস্কৃতির প্রতীক। এই আয়তন জড়তাগ্রস্ত, বদ্ধ, প্রাণহীন, শুষ্ক, প্রগতিবর্জিত হয়ে পড়ছে। আর তাই জানবার, শিখবার, বুঝবার মধ্য দিয়ে যে মুক্তির সুরপথ সচল হবার কথা তা প্রতিনিয়ত ক্রমাগত অচল হয়ে পড়ছে। বৃথা নিয়মের বেড়াজালে দুর্ভেদ্য প্রাচীরে দিনদিন অচলায়তনে পরিণত হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়েই উপলব্ধি করেছেন আজকের বাস্তবতা, তাইতো ছুটি গল্পে ফটিক চরিত্র, ডাকঘর নাটকে অমল চরিত্র ও অচলায়তন নাটকে পঞ্চক চরিত্রের মধ্য দিয়ে বন্দী জীবন থেকে মুক্তির স্বাদ আশ্বাদন এবং অন্ধকার থেকে আলোর পথ অন্বেষণ করেছেন। অচলায়তনে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে গুরুর মাধ্যমে মুক্তির বার্তা পাঠিয়েছেন। মূলত প্রেমের আঘাতেই সমাজে গড়ে উঠা অচলায়তন ভেঙ্গে অচলায়তনিকদের মুক্তির সন্ধান, আলোর সন্ধান দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন মানবাত্মার মুক্তি, আকাশময় আলোর সন্ধান, প্রকৃতির মাঝে প্রাণের স্পন্দন। অচলায়তনে মুক্তির সূত্রসন্ধান এরূপেই বিবেচিত।

তথ্যনির্দেশ

১. আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *নাটক ও চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ*, (ঢাকা : অনুশিলা প্রকাশনী, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৩৯
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (অখণ্ড), (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১২), পৃষ্ঠা ২৯
৩. ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-নাট্য সমীক্ষা রূপক-সাংকেতিক*, (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ২০১১) পৃষ্ঠা ১১০
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪০২), পৃষ্ঠা ৩৭০
৫. প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ*, (ঢাকা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ২০১০), পৃষ্ঠা ১৭৭
৬. তদেব
৭. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা*, (ঢাকা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৪১৯), পৃষ্ঠা ২৩৫
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪০২), পৃষ্ঠা ৩২৬
৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩০
১০. “রসের ধর্ম”, *শান্তিনিকেতন*, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬। উদ্ধৃত: উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা*, (ঢাকা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৪১৯), পৃষ্ঠা ২৩৭
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪০২), পৃষ্ঠা ৩৩০

১২. শ্রী অশোক সেন, *রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা*, (কলকাতা : এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০), পৃষ্ঠা ২৯২-২৯৩
১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪০২), পৃষ্ঠা ৩৪৪
১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪০২), পৃষ্ঠা ৩৩২
১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪০২), পৃষ্ঠা ৩২৭
১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪০২), পৃষ্ঠা ৫০৬
১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষোড়বিংশ খণ্ড, (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৪), পৃ. ৪৬

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক প্রকরণে শিল্পসংস্কৃতি ও বিনোদন

ড. বিপুল কুমার বিশ্বাস*

Abstract: Driśyakāvya (drama) is a piece of poetry which is written through dialogues and can be acted out on the stage by the actors-actress. Prakaraṇa is one kind of Driśyakāvya. It contains particular forms. Here the words of the general masses in the society are expressed through the poet's imagination instead of using plot portraying famous peoples. Śhūdraka is an extraordinary dramatist of the 6th century AD. *Mṛicchakatika* written by him is an exceptional Prakaraṇa in Sanskrit literature. It is true that different features of the society are found hidden in literature. *Mṛicchakatika* is not an exception. Therefore art, culture and different aspects of recreation of the contemporary society can be found through the analysis of dialogues and characters of the Prakaraṇa. This article aims to portray all elements of art, culture and recreation in an argumentative way as found in this Prakaraṇa.

প্রথাগত রাজমহিমাকীর্তনের ঊর্ধ্বে ওঠে সমাজের সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবহৃদয়ের অনুভূতির স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে বৈদিক মিত্রদেবতার মতো আলোকবর্তিকা নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্য-আকাশে যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনিই নাট্যকার শূদ্রক। মৃচ্ছকটিক তাঁরই রচিত একটি প্রকরণধর্মী দৃশ্যকাব্য। সংলাপ আকারে লিখিত যে কাব্য কুশীলবের অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে উপস্থাপন সম্ভব এবং শ্রবণের পাশাপাশি দর্শক যা দেখতে পারেন তার নাম দৃশ্যকাব্য— “দৃশ্যং তত্রাভিনয়ং...”^১। আবার, দৃশ্যকাব্যের মাধ্যমে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নিজের ওপর আরোপ করে রূপ দান করেন। তাই একে বলা হয় রূপক— “রূপারোপাৎ তু রূপকম্”^২। সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব অনুসারে দশবিধ রূপকের মধ্যে দ্বিতীয়টির নাম প্রকরণ। কোনো ইতিহাস, পুরাণ বা লোকপ্রচলিত বিখ্যাত কাহিনী এর উৎস নয়। কবির স্বকল্পজ কাহিনীর আশ্রয়ে সমাজের সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরা হয় প্রকরণ-কাব্যে^৩। ভাস, কালিদাস, শ্রীহর্ষ প্রমুখেরা যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিখ্যাত কাহিনীর আশ্রয়ে বিখ্যাত চরিত্র রাজা বা দেবাতাদের প্রশস্তিতে ব্যস্ত থেকেছেন, সেখানে প্রকরণকার শূদ্রক স্বকল্পজ কাহিনীর মাধ্যমে রূপকের আশ্রয়ে সমাজের সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরার সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক^৪ তেমনি একটি প্রকরণ।

নাট্যকার শূদ্রকের পরিচিতি ও সময়কাল

সমালোচক ও কাব্যকারদের উদ্ধৃতি বা রচনায় শূদ্রকনামধারী বিচিত্র ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। দণ্ডীর ‘অবন্তীসুন্দরীকথা’য় শূদ্রককে একজন বিখ্যাত কবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আরো জানা যায়,

*প্রফেসর, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

উজ্জয়িনীর রাজা শূদ্রক জাতিতে একজন ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। বাল্যকালে আন্ধ্রদেশীয় একজন রাজকুমারের সাথে তাঁর বিরোধের কথাও উল্লিখিত হয়েছে আলোচ্য কাব্যে^৭। বাণভট্টের *কাদম্বরী* অনুসারে,^৮ তিনি ছিলেন বিদিশার রাজা। কহলণের *রাজতরঙ্গিণী*তে তাঁকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক বলা হয়েছে। সোমদেবের *কথাসরিৎসাগরে* শূদ্রককে শোভাবতীর রাজা বলা হয়েছে এবং একজন ব্রাহ্মণ নিজের জীবনের বিনিময়ে তাঁর জীবন রক্ষা করেছিলেন। শূদ্রকের নামে অথবা তাঁকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থও প্রচলিত রয়েছে— যেমন *বিক্রান্তশূদ্রক*, *শূদ্রককথা*, *শূদ্রকচরিত* ইত্যাদি। *বিক্রান্তশূদ্রক* কোনো অজ্ঞাত লেখক-কর্তৃক রচিত একটি নাটক শ্রেণির দৃশ্যকাব্য; ভোজদেবের ‘*সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*’ নামক গ্রন্থে যার উল্লেখ রয়েছে। রামিল ও সোমিল-কর্তৃক লিখিত হয়েছে *শূদ্রককথা* নামক কাব্যটি, যার নাম ‘*সূক্তিমুক্তাবলী*’ নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। আবার পঞ্চগশিখ-কর্তৃক রচিত হয়েছে *শূদ্রককথা* নামক কাব্যটি।

কিন্তু *মৃচ্ছকটিকের* রচয়িতা শূদ্রক এবং উপর্যুক্ত কাব্যগ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট শূদ্রক এক ব্যক্তি নন। ভাসপ্রণীত চারুদত্ত প্রকরণটি আবিস্কৃত হওয়ার পর এ-বিষয়ে আমরা মোটামুটি একটি দিকনির্দেশনা পেয়ে থাকি। পণ্ডিতদের ধারণা, ভাসের চার অঙ্কের *চারুদত্তের* অনুকরণকৃত ও বর্ধিত রূপ শূদ্রকের দশ অঙ্কের *মৃচ্ছকটিক*। সে কারণে শূদ্রককে ভাস-পরবর্তী নাট্যকার বলা যেতে পারে। আবার দেখা যায়, কালিদাস তাঁর মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের প্রস্তাবনায় ভাস, কবিপুত্র, সৌমিল্ল প্রমুখ কাব্যকারদের নাম উল্লেখ করেছেন এবং উল্লিখিত ব্যক্তিদের পাশাপাশি নিজের রচনা দর্শকদের গ্রহণ করার জন্য সাহসী আহ্বান জানিয়েছেন^৯। কিন্তু সেখানে তিনি শূদ্রকের নাম উল্লেখ করেন নি। পণ্ডিতদের মতে, এমন একজন শ্রেণিসংগ্রামী, প্রথাগত রাজমহিমা-কীর্তন বিরোধী কাব্যকারের নাম কালিদাস জানবেন না, অথবা জেনেও অন্যান্য জনপ্রিয় দৃশ্যকাব্যকারদের পাশাপাশি তাঁর নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করবেন না, সেটি গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে, ঐ সময়ে শূদ্রকের জন্মই হয় নি। এই হিসেবে শূদ্রককে কালিদাসের (খ্রি. চতুর্থ শতক) পরবর্তী সময়ের কাব্যকার মনে করা যেতে পারে। অন্যদিকে বামন (খ্রি. অষ্টম শতক) তাঁর *কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি*গ্রন্থে বিশেষোক্তির উদাহরণ প্রসঙ্গে “দ্যুতং হি নাম পুরুষস্যসিংহাসনং রাজ্যম্।”^{১০}—এই বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন, যা শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিকের* দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায়। উল্লেখ্য ভাসের *চারুদত্তের* সাথে শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিকের* প্রথম চার অঙ্কের সাদৃশ্য থাকলেও *চারুদত্ত*-প্রকরণে উদ্ধৃতিটি নেই। অতএব কালিদাসের রচনায় শূদ্রকের অনুল্লেখ এবং বামনের রচনায় শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিকের* শ্লোকের উল্লেখ থেকে শূদ্রককে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের পরবর্তী এবং খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের পূর্ববর্তী মনে করা সমীচীন। সেই হিসেবে *মৃচ্ছকটিকের* রচয়িতা শূদ্রককে খ্রি. ষষ্ঠ শতকের নাট্যকার মনে করাই যুক্তিযুক্ত।

মৃচ্ছকটিক প্রকরণের বিষয়বস্তু

গণিকাকন্যা বসন্তসেনার সাথে বৃত্তিতে বণিক জাতিতে ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রণয় ও রাজস্বীকৃতির বিষয় নিয়ে রচিত শূদ্রকের দশ অঙ্কের প্রকরণ *মৃচ্ছকটিক*। উত্তরাধিকার সূত্রে চারুদত্ত অটেল ধনসম্পত্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু আজ তিনি নিঃশ্ব। প্রার্থীর প্রার্থনা অনুসারে দান করতে করতে তাঁর এই দরিদ্র অবস্থা। অন্যদিকে গণিকাকন্যা হলেও বসন্তসেনা গণিকাপেশাকে গ্রহণ করেন নি। বরং, গণিকাবৃত্তি থেকে বেরিয়ে এসে স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনের ঘরণী হওয়াই তাঁর লক্ষ্য। তাই তিনি বিত্তশূন্য অথচ প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী চারুদত্তকে ভালবেসেছেন। একদা সন্ধ্যাবেলা কামদেবতার মন্দিরের উৎসব মেলাঙ্গন হতে বসন্তসেনা গৃহে ফিরে আসছিলেন। পথে অন্ধকার নেমে এল। ভিড়ের মধ্যে সঙ্গীসাথীরাও অনেক পিছনে পড়ে গেছে। সেই সুযোগে রাজশ্যালক লম্পট শকার তাঁর সহযোগী বিটকে সাথে নিয়ে বসন্তসেনার পিছু ধাওয়া করেন। ঘটনাক্রমে বসন্তসেনা নিজের প্রিয়জন চারুদত্তের

বাড়িতে ঢুকে পড়তে সক্ষম হন। একপর্যায়ে নিজের অলঙ্কারগুলি চারুদত্তের কাছে গচ্ছিত রেখে তাঁরই তত্ত্বাবধানে নিজ আবাসে আবার ফিরেও আসেন। কিন্তু গচ্ছিত অলঙ্কারগুলি চুরি হয়ে যায়। চারুদত্ত জুয়াখেলায় অলঙ্কারগুলি হারিয়ে ফেলেছেন, একথা বলে বিনিময়মূল্য হিসেবে নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া মহামূল্য রত্নহার বসন্তসেনার কাছে পাঠিয়ে দেন। প্রকৃত সত্য জানতে পেরে চারুদত্তের মহত্বের পরিচয় পেয়ে বসন্তসেনা চারুদত্তের বাড়িতে অভিসারে আসেন। রাত্রি শেষে সকাল বেলা তাঁদের দুজনের উদ্যান বিহারে যাওয়ার কথা। চারুদত্ত আগে থেকে পুষ্পকরগুপ্ত উদ্যানে বসন্তসেনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু গাড়িবদলের (প্রবহণবিপর্যয়) কারণে বসন্তসেনা একই উদ্যানের অন্য পাশে শকারের থল্লরে পড়েন। সেখানে বসন্তসেনাকে বশে আনতে ব্যর্থ শকার তাঁর উপর দৈহিক নির্যাতন শুরু করেন। এক পর্যায়ে বসন্তসেনা অজ্ঞান হয়ে যান এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। মৃত মনে করে শকার তাঁকে শুকনো পাতার আড়ালে লুকিয়ে রাখেন। শেষে নিজের এই অপকর্মের দোষ চারুদত্তের উপর চাপানোর দুরভিসন্ধিতে তিনি বিচারালয়ে গিয়ে নালিশ রুজু করেন। যুক্তি-তথ্য-প্রমাণের ফাঁদে আইনের দৃষ্টিতে চারুদত্ত দোষী সাব্যস্ত হন। চণ্ডালেরা মৃত্যুদণ্ডদেশপ্রাপ্ত চারুদত্তকে নিয়ে বধ্যভূমির দিকে রওনা হন। ইতোমধ্যে একজন বৌদ্ধভিক্ষুর সেবায়ত্তে সুস্থ হয়ে ওঠা বসন্তসেনা সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। চারুদত্ত নির্দোষ প্রমাণিত হন। সেই মুহূর্তে জানা যায়, দুর্বৃত্ত রাজা পালককে হত্যা করা হয়েছে এবং আর্যক রাজা হয়েছে। নতুন রাজা আর্যক বসন্তসেনাকে ব্রাহ্মণপুত্র চারুদত্তের বধু হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

মূচ্ছকটিক প্রকরণে শিল্পসংস্কৃতি ও বিনোদন

নাট্যচর্চা

মূচ্ছকটিক প্রকরণে নাট্যশিল্পীদের সুনিখুঁত অনুশীলন এবং মঞ্চে নাট্য-পরিবেশনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখা যায়, শকার ও বিট কর্তৃক তাড়িত হয়ে বসন্তসেনা অন্ধকারের সুযোগে চারুদত্তের বাড়িতে ঢুকে পড়েন। একই মুহূর্তে চারুদত্তের বাড়ি থেকে চারুদত্তের দাসী রদনিকা বাইরে আসছিলেন। তখন শকার রদনিকাকেই বসন্তসেনা মনে করে জাপটে ধরেন। রদনিকা চিৎকার করে উঠলে শকার বুঝতে পারেন, এ-তো বসন্তসেনা নয়। এই অবস্থায় বিচক্ষণ বিট রদনিকাকেই বসন্তসেনা বলে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যুক্তি দেন – ‘নিশ্চয়ই রঙ্গালয়ে নাট্যচর্চা করে এই নারী কণ্ঠস্বর পরিবর্তনের কৌশল শিখে নিয়েছে।’^৯ বিটের এই যুক্তি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, তখনকার দিনে নাট্যকাব্য পরিবেশিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত রঙ্গালয় ছিল, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সেখানে নিখুঁত ও শিল্পসম্মতভাবে নাট্যকাব্য পরিবেশন করার জন্য নিয়মিত অনুশীলন করতেন এবং সেই অনুশীলনের একটি ধাপ ছিল কণ্ঠস্বরের অনুশীলন।

সঙ্গীতচর্চা

প্রকরণের নায়ক চারুদত্ত একজন কলাপরায়ণ নায়ক, যাকে ধীরললিত শ্রেণির নায়ক বলা যায়। সঙ্গীতের সুর-তাল-লয়, সঙ্গীতের বাদ্যবাজনা, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদিবিষয়ে তাঁর গভীর চর্চা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রকরণের তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়, বৃক্ষবেষ্টিত প্রাচীরে ঘেরা বহিরাঙ্গসুন্দর চারুদত্তের বাড়িতে প্রবেশ করেন শর্বিলক। উদ্দেশ্য মহামূল্যবান ধনরত্ন সেখানে থেকে চুরি করা। কিন্তু ভিতরে ঢুকে তিনি ধনরত্নের পরিবর্তে মৃদঙ্গ, বাঁশি, বীণা দেখতে পেয়ে মন্তব্য করলেন— “কথং নাট্যাচার্যস্য গৃহমিদম্।”^{১০} চারুদত্তের গৃহে এসকল বাদ্যযন্ত্র থেকে তখনকার দিনে এককভাবে নিজগৃহসঙ্গীতচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্যক্তিপর্যায়ের পাশাপাশি, তখনকার লোকেরা সমবেতভাবে সঙ্গীতানন্দ উপভোগ করতেন। সঙ্গীতপিপাসু মানুষেরা সমস্ত ব্যস্ততা ভুলে গিয়ে সুরের মাধুর্য আশ্বাদন করতে পূর্বঘোষিত কোনো একটি স্থানে সমবেত হতেন এবং স্বনামধন্য গায়কদের সঙ্গীত পরিবেশনা উপভোগ করতেন। প্রকরণের তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়, গায়ক রেভিল-পরিবেশিত এ-ধরনের একটি সঙ্গীতাসরে বিদূষককে সাথে নিয়ে চারুদত্ত উপস্থিত হয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার কালে সঙ্গীতের সাথে মানব মনের সুগভীর সম্পর্কের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন –

“উৎকণ্ঠিতস্য হৃদয়ানুগুণা বয়স্য
সংকেতকে চিরয়তি প্রবরো বিনোদঃ।
সংস্থাপনা প্রিয়তমা বিরহাতুরাণাং
রক্তস্য রাগপরিবৃদ্ধিকরঃ প্রমোদঃ ॥”^{১১}

(ভালোবাসা বিরহিত প্রেমিক-প্রেমিকাদেরকে হৃদয়ের অনুসঙ্গ প্রদান করে সঙ্গীত। বিরহদগ্ধ মানুষের সময় কাটানোর ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ উপায় সঙ্গীত। তাদের মনের সাত্ত্বনায় বিশেষ উপকরণ সঙ্গীত। আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি সঙ্গীতপ্রেমিক - প্রেমিকার মনের আকর্ষণকে আরো বাড়িয়ে তোলে।)
তাছাড়া, সুগায়ক রেভিলের সুরমাধুর্যের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন–

“তং তস্য স্বরসংক্রমং মৃদুগিরঃ শ্লিষ্টঞ্চ চ তন্ত্রীস্বনং
বর্ণনামপি মূর্ছনান্তর্গতং তারং বিরামে মৃদুম্।
হেলাসংযমিতং পুনশ্চ ললিতং রাগদ্বিরুচ্চারিতং
যৎতস্যং বিরতে হৃপি গীতসময়ে গচ্ছামি শৃণ্বন্বিব ॥”^{১২}

(অনুরাগে পূর্ণ, শ্রুতিসুখকর, সুর তাল লয়ে স্পষ্ট, নানা ভাব যুক্ত, সুন্দর মনোহর তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনা। মনে হচ্ছিল আড়াল থেকে কোনোনারীকণ্ঠই সঙ্গীত পরিবেশন করছিল।)

গণিকাপল্লীতে শিল্পচর্চা

মহার্ষি বাৎস্যায়ন-প্রণীত কামসূত্রে চৌষট্টি-কলা^{১৩} অভিজ্ঞা সুশিক্ষিতা বেশ্যাকে গণিকা বলা হয়েছে। বাৎস্যায়ন প্রণীত চৌষট্টি-কলার মধ্যে মূচ্ছকটিক প্রকরণে বর্ণিত গণিকালয়ে অথবা গণিকাকন্যা বসন্তসেনাসহ অন্যান্য গণিকাদের চরিত্রে নৃত্য, গীত, আলেখ্য, বাদ্য ও রন্ধনশিল্পে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকরণের প্রথম অঙ্কে শকার ও বিট-কর্তৃক তাদিত বসন্তসেনার চলার ছন্দকে বিট “নৃত্যপ্রয়োগবিশদৌ চরণৌ ক্ষিপন্তী”^{১৪} অথবা “উদ্বিগ্ন-চঞ্চল-কটাক্ষ-বিসৃষ্ট-দৃষ্টির্ব্যাধানুসারচকিতা হরিণীব”^{১৫} – ইত্যাদি বলে উপমিত করেছেন, যা থেকে নৃত্যপটু বসন্তসেনার পায়ের তাল এবং চোখের কারুকাজ ধরা পড়ে। আবার, প্রকরণের চতুর্থ অঙ্কে চারুদত্ত-বিরহিত বসন্তসেনা চারুদত্তেরই ছবি এঁকেছেন। শিল্পী মনের অতৃপ্ততা, তাই কেমন হয়েছে ছবিটি বসন্তসেনা মদনিকাকে জিজ্ঞাসা করেছেন। ঠিক যেন অবিকল চারুদত্ত, উত্তরে জানিয়েছেন মদনিকা। মদনিকার এই সনদ থেকে বসন্তসেনার আলেখ্য অঙ্কনের দক্ষতা প্রকাশ পায়। চতুর্থ অঙ্কে বিদূষক অষ্টমহল বিশিষ্ট গণিকালয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। চতুর্থ মহলে দেখা যায়–

“যুবতিকরতাড়িতা জলধরা ইব গম্ভীরং নদন্তি মৃদঙ্গাঃ, ক্ষীণপুণ্য ইব গগনাতারকা নিপতন্তি কাংস্যতালাঃ। মধুকরবিরুতমধুরং বাদ্যতে বংশঃ। ইয়মপরেষ্যা-
প্রণয়কুপিতকামিনীবাক্ষারোপিতা কররুহপরামর্শেন সার্যতে বীণা। ইমাপরাশ্চ কুসুমরসমত্তা ইব মধুকর্যঃ অতিমধুরং প্রগীতা গণিকাদারিকাঃ নর্ত্যন্তে, নাট্যং পাঠ্যন্তে সশৃঙ্গারম্।”^{১৬}

—এথেকে প্রমাণিত হয় মূচ্ছকটিকের গণিকালয়ের যুবতীরা নৃত্য ও গীতের সাথে সাথে মৃদঙ্গ, করতাল, বাঁশি, বীণা ইত্যাদি বাজনায়ে যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। পঞ্চম মহলে রন্ধনশিল্পের বর্ণনা রয়েছে। হিং আর তেলের গন্ধসহ রান্না করা নানা রকম খাবারের সুগন্ধে গণিকালয়ের রন্ধনশালাটি মৌ মৌ করছে, যা আশ্রয় করে কান্সালের ক্ষুধাও বেড়ে যায়। অনবরত রান্নার ফলে মহানসটির অবসরের কোনো সুযোগ নেই। প্রকরণের ভাষায়—

“ইতঃ অপি পঞ্চমে প্রকোষ্ঠে অয়ং দরিদ্রজন-লোভোৎপাদনকরং আহরতু্যপচিতো হিঙ্গুতৈলগন্ধঃ। বিবিধ-সুরভি-ধূমোদগারৈঃ নিত্যং সন্তাপ্যমানং নিঃশ্বসিতীব মহানসং দ্বারমুখৈঃ। অধিকমুৎসুকায়তে মাং সাধ্যমানবহুবিধ-ভক্ষ্যভোজনগন্ধঃ।”^{১৭}

—এসকল বর্ণনা মূচ্ছকটিকের গণিকালয়ের গণিকাদের রন্ধনশিল্পে দক্ষতা জানিয়ে দেয়।

অলংকার ও ধাতবশিল্প

ধাতবপদার্থ ও রত্ননির্মিত বিভিন্ন অলঙ্কারের উল্লেখ রয়েছে প্রকরণটিতে। শকার ও বিটকর্তৃক তড়িত বসন্তসেনা চারুদত্তের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তাঁর অলঙ্কারগুলি চারুদত্তের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন, যা চুরি হয়ে যাওয়ার পর বিনিময়মূল্য হিসেবে চারুদত্ত তাঁর সহধর্মিণীর মহামূল্য রত্নহার উপহার দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। আবার, বসন্তসেনাকে বশীভূত করার জন্য শকার দশহাজার মোহরের গহনা পাঠিয়েছিলেন। স্ত্রীলোকদের পাশাপাশি সে যুগে পুরুষেরা অলঙ্কার পরিধান করতেন। প্রকরণের অষ্টম অঙ্কে আমরা জানতে পারি, বসন্তসেনাকে বধ করার জন্য শকার তাঁর নিজের ব্যবহৃত অলঙ্কার ভূত্য স্থাবরককে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন^{১৮}।

স্থাপত্যশিল্প

মূচ্ছকটিক প্রকরণে উন্নত স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন রয়েছে। বাগানবাড়ি শোভিত, প্রাচীরে ঘেরা, চতুঃশালায় বিভক্ত চারুদত্তের দৃষ্টিনন্দন বাসভবন, অষ্টমহল বিশিষ্ট গণিকালয়, বৌদ্ধবিহার, গণিকালয়ের সুসজ্জিত তোরণ, শকারের চিলেকোঠায়ুক্ত প্রাসাদ, কামদেবতার মন্দির, বিচারালয়, কারাগার, রাজপথ, প্রমোদবন সবই উন্নত স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। উজ্জয়িনী নগরীর অনেক জনগণও সে যুগে সুউচ্চ প্রাসাদে বসবাস করতেন। দণ্ডপ্রাপ্ত চারুদত্তকে উজ্জয়িনীর রাজপথ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার কালে অশ্রুসিক্ত পুরবাসীর বর্ণনা দিতে গিয়ে চারুদত্ত নিজেই বলেছেন, সৌধস্থিত নারীরা জানালার অর্ধেকাংশে মুখ বার করে, আমাকে লক্ষ করে ‘হায় চারুদত্ত’ একথা বলে যেন জলনিষ্কাশন প্রণালী দিয়ে অশ্রুধারা বর্ষণ করছে। প্রকরণের ভাষায়—

“এতাঃ পুনর্ইর্ম্যগতাঃ স্ত্রিয়ো মাং

বাতায়নার্দ্ধেন বিনিঃসৃতাস্যাঃ

হা! চারুদত্তেত্যভিভাষমাণা

বাম্পং প্রণালীভিরিবোৎসৃজন্তি।”^{১৯}

—বাতায়ন ও জলনিকাসনের প্রণালীযুক্ত সুউচ্চ প্রাসাদের এই বর্ণনার মাধ্যমে তখনকার দিনে উন্নত স্থাপত্যশিল্পের পরিচয় ফুটে উঠে। গবেষক বলেদ্রনাথ ঠাকুর তাই সঠিক বলেছেন—

“উজ্জয়িনী তখন ভারতবর্ষের মধ্যে মহাসমৃদ্ধিশালী নগরী। প্রশস্ত রাজপথের দু’ধারে পণ্যবীথিকা, শ্রেণীবদ্ধ সুরম্য হর্ম্যমালা ও নিত্য উৎসবময় বিলাসভবন; নগরপ্রান্তে অহরহ সঙ্গীতধ্বনিত প্রমোদকানন শ্রেণী, পাদমূল বিধৌত করিয়া চঞ্চলা শিপ্রা কলস্বরে বহিয়া গিয়াছে। অদূরে বৌদ্ধবিহার— পরিব্রাজকরা যেখানে বসিয়া বৌদ্ধ নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন; এবং নগরীমধ্যে মহাকালমন্দিরে মহাসমারোহে প্রতিদিন ব্রাহ্মণদিগের শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়।”^{২০}

যাতায়তের জন্য ধনাঢ্য ব্যক্তির গরুর টানা গাড়ি, সুসজ্জিত শকট ব্যবহার করতেন। গাড়োয়ান স্থাবরক-চালিত শকারের এবং বর্ধমানক-চালিত চারদণ্ডের— দু’টোই ছিল গরুর গাড়ি। “যাতং গাবৌ! যাতম্” (চলরে বলদজোড়া চল),^{২১}— গাড়ি চালাতে গিয়ে গাড়োয়ান দু’জনের কর্ণে উচ্চারিত একথাই তাঁর প্রমাণ। গাড়িতে গদি ও ঢাকনার ব্যবস্থা ছিল। ভুলবশত ফেলে আসা গাড়ির গদি আনতে বর্ধমানক বাইরে গেলে সেই ফাঁকে কারাপলায়নকারী আর্যক তাঁর গাড়িতে উঠে বসেন। আবার, বসন্তসেনার জন্য শকার বহিরাবৃত গাড়ি^{২২} (অবগুণ্ঠনং প্রবহণম্) পাঠিয়েছিলেন। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা একেবারে নগণ্য ছিল না। প্রকরণের ষষ্ঠ অঙ্কে চোট স্থাবরকের সামনে গাড়িজট সৃষ্টি হওয়াই তার উদাহরণ।

উজ্জয়িনী নগরে অবস্থিত গণিকালয়ে সু-উন্নত স্থাপত্যকলার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকরণের চতুর্থ অঙ্কে বিদূষক অষ্টমহলবিশিষ্ট গণিকালয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। গণিকালয়ে হাতির দাঁতের তোরণ, তোরণের দু’পাশে স্তম্ভের নিচে মঙ্গলকলস, মহিষাসুরের বুকের মতো দুর্ভেদ্য কপাট, কপাটের দু’পাশে মল্লিকা ফুলের মালা— যা প্রথম দর্শনেই বড় আকর্ষণীয়। সেখানে হাতি, ঘোড়া, গরু, গাধা প্রভৃতি পশু সমভেদে লালিত হয়। কোকিল, শালিক, ময়না, টিয়া, শুক-শারি অতি আদরে বেঁচে থাকে। মল্লিকা, চম্পা, যুঁই, শেফালী, অশোক প্রভৃতি ফুল সেখানে শোভা বর্ধন করে। নৃত্য-গীত-কলাপরায়ণ গণিকারা সেই গণিকালয়ে মধুপানে মত্ত ভ্রমরের মতো মদমত্ত হয়ে উঠে, কখনও বা আগন্তুক কামার্ত পুরুষকে কর্পূর মেশানো পান খাওয়ায়, বাজনার তালে তালে সুরের মূর্ছনায় গণিকারা পুরুষদের প্রতি কটাক্ষ হানে। বিদূষক এমন সুপরিপাটি গণিকালয়কে স্বর্গের নন্দনকানন অথবা কুবেরের আলের সাথে তুলনা করেছেন^{২৩}।

চৌর্যবৃত্তিতে শৈল্পিকতা

একটি প্রশিক্ষিত গুরুনিষ্ঠ চৌর্যবৃত্তির প্রমাণ রয়েছে মৃচ্ছকটিক প্রকরণে। চারদণ্ডের বাড়িতে চুরি করার কালে শর্বিলক বরদাতা কুমার কার্তিক, দেবব্রত কনকশক্তি, ভাস্করনন্দীসহ গুরুদেব যোগাচার্যকে প্রণাম জানিয়েছেন। গুরুদেবই সম্ভ্রষ্ট হয়ে তাঁকে চুরি করার সমস্ত কলাকৌশল শিখিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া, চুরি করার প্রাকপ্রস্তুতি হিসেবে শর্বিলক গায়ে তেল মেখে নিয়েছেন এবং সহায়ক উপকরণ হিসাবে আগুনে-পোকা, নকল মানুষ এবং সিঁধ কাটার যন্ত্র ইত্যাদি সাথে নিয়েছেন। কোন্ যায়গায়, কোন্ পদ্ধতিতে কোন্ আকৃতির সিঁধ কাটতে হবে, সেটিও তাঁর জানা। কার্তিক-ঠাকুরের মতে ঝামা ইট খসাতে হবে, কাঁচা ইট কাটতে হবে, মাটির দেওয়াল জল ঢেলে নরম করে নিতে হবে। সিঁধের আকৃতির মধ্যেও রয়েছে শৈল্পিক রূপ, যেমন— ফোটা পদ্ম, সূর্য, বালচন্দ্র, বড়দীঘি, স্বস্তিকা। প্রকরণের ভাষায়—

“পদ্মব্যাকোশং ভাস্করং বালচন্দ্রং
 বাপী বিস্তীর্ণং স্বস্তিকং পূর্ণকুম্ভম্ ।
 তৎকস্মিন্ দেশে দর্শয়াম্যাত্মশিল্পং
 দৃষ্ট্বা শ্বো যং যদ্বিস্ময়ং যান্তি পৌরাঃ ॥”^{২৪}

শর্বিলকের মতে একজন দক্ষ চোরের বৈশিষ্ট্য হবে – “নিঃশব্দে পদসঞ্চারে বিড়াল, দ্রুতগমনে হরিণ, গ্রহণ-
 ছেদনে বাজপাখি, নিদ্রা ও জাগরণ অনুধাবনে কুকুর, রত্নপ্রবেশে সাপ, নানা ভাষা-মানুষ-বেশ-রচনায় মায়া,
 বিভিন্ন ভাষার্থ বুঝতে সাক্ষাৎ সরস্বতী, রাত্রিতে দীপ, সঙ্কটে শৃগাল, স্থলে ঘোড়া এবং জলে নৌকা। প্রকরণের
 ভাষায়–

“মার্জারঃ ক্রমণে মৃগঃ প্রসরণে শ্যেণো গ্রহালুপ্ধনে
 সুপ্তাসুপ্তমনুষ্যবীর্যতুলনে শ্বা, সর্পণে পন্নগঃ ।
 মায় রূপ-শরীর-বেশ-রচনে, বাগ্ দেশভাষান্তরে,
 দীপো রাত্রিষু, সঙ্কটেষু ডুডুমো, বাজী স্থলে, নৌর্জলে ॥”^{২৫}

চৌর্যবৃত্তি নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। তবু শর্বিলকের এ-সকল যুক্তি, বুদ্ধি, নিষ্ঠা একটি গুরুপরম্পরায় চৌর্যবৃত্তির
 মাধ্যমে তখনকার সমাজে একজন পেশাদারী ব্যক্তির শিল্পদক্ষতা প্রকাশ করে।

বিনোদন

নাটক ও সঙ্গীত ছাড়াও বিনোদনের আরও কিছু নিদর্শন মূচ্ছকটিক প্রকরণে লক্ষ করা যায়, যেমন–
 প্রমোদবিহার, উৎসবসমাবেশ, পানাহার ইত্যাদি। প্রকরণের ষষ্ঠ অঙ্কে ‘পুষ্পকরগুপ্ত’ নামে একটি উদ্যানের কথা
 আমরা জানতে পারি, যেখানে বসন্তসেনাকে প্রমোদবিহারের জন্য আহ্বান জানিয়ে চারুদত্ত অপেক্ষা
 করছিলেন। বাঁপিতে ফুল স্তরে স্তরে সাজালে যেমন সুন্দর হয়, পুষ্পকরগুপ্ত উদ্যানটি তেমনি। এই উদ্যানের
 গাছপালা, ফল, ফুল এবং ফুলে বিচরণকারী ভ্রমরের বর্ণনা দিয়ে চারুদত্ত বলেছেন–

“বণিজ ইব ভাস্তি তরবঃ পণ্যানীব স্থিতানি কুসুমানি ।
 শুক্কমিব সাধয়ন্তো মধুকরপুরুষাঃ প্রবিচরন্তি ॥”^{২৬}

উদ্যানটির আয়তনও বিশাল। এর একপাশে চারুদত্ত বসন্তসেনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অন্য পাশে শকার
 ও তাঁর সহযোগী বিট। উদ্যানের মধ্যে থাকা জলাশয়ে নতুন বৌদ্ধভিক্ষু (দ্যুতকর সংবাহক) স্নান করেছিলেন।
 এসকল তথ্য উদ্যানের বিশালতা ও সৌন্দর্য প্রমাণ করে। তখনকার সমাজে কামদেবতার পূজার প্রচলন ছিল।
 পূজা উপলক্ষে মন্দিরমেলাঙ্গনে সার্বজনীন উৎসবও অনুষ্ঠিত হত। ব্রাহ্মণ চারুদত্ত, গণিকাকন্যা বসন্তসেনা,
 রাজশ্যালক সংস্থানক, বিট – সকলে সেই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। প্রকরণের প্রথম অঙ্কে শকারের কথার
 মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, বসন্তসেনা ঐ উৎসব-মেলাঙ্গনে চারুদত্তকে দেখার পর তাঁর প্রেমাসক্ত হন।
 আবার, “পানশালায় আনা রাঙা মূলের মতো তোর মাথাটা আমি মট করে ভেঙে ফেলব ॥”^{২৭} বৌদ্ধ ভিক্ষুর
 প্রতি শকারের এই উক্তি তখনকার দিনে পানশালার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

উপসংহার

একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক যুগে সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। উন্নত প্রযুক্তির আবিষ্কার, আকাশসংস্কৃতির বিস্তারের ফলে এই পরিবর্তন। সেই সাথে সমাজজীবনের উপকরণ শিল্পসংস্কৃতি ও বিনোদনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু সেই সুদূর অতীতে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রকরণকাব্য শূদ্রকের মূচ্ছকটিক প্রকরণের শিল্পসংস্কৃতি ও বিনোদন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর অনেক উপকরণ অনেক বৃষ্টি একটু ভিন্নভাবে ভিন্ন আঙ্গিকে হলেও বর্তমান সমাজে রয়েছে। আবার, শিল্পসংস্কৃতি ও বিনোদনের অনেক দিক এখনকার সময় থেকে তখনকার যুগে ছিল জগত ও জীবনের জন্য অধিক কল্যাণকর। বিশেষত সমবেত বিনোদন আনন্দ। ব্যক্তিকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, ব্যস্ত যুগের মানুষদের মনোজগতের পরিবর্তনের জন্য তা ছিল অধিক মঙ্গলজনক। তখনকার স্থাপত্যকলার সুনিপুণ শৈল্পিকতা বর্তমান বিশ্বের মানুষদের চোখে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। আবার, একজন চোরের চোর্যকর্মে যে নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, দক্ষতা, সততা, সাহস তা সত্যিই লক্ষণীয়। বর্তমান সমাজের ডাক্তার, প্রকৌশলী, অধ্যাপক, আইনজীবী প্রমুখ পেশাজীবীরা যদি স্ব স্ব পেশায় সততার সাথে সার্বিক দক্ষতা অর্জন করতেন তবে একবিংশ শতাব্দীর সমাজ আরো সুন্দর হতো বলে আমাদের বিশ্বাস।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ*, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৯), ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ-২৮১।
- ^২ *তদেব*, ৬/১।
- ^৩ “ভবেৎ প্রকরণে বৃত্তং লৌকিকং কবিকল্পিতম্।”- *তদেব*, ৬/২২৪
- “অথ প্রকরণে বৃত্তমুৎপাদ্যং লোকসংশ্রয়ম্”- ধনঞ্জয়, *দশরূপক*, সীতানাথ আচার্য ও দেবকুমার ঠাকুর সম্পাদিত। (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, আগস্ট, ১৯৯৭), ৩/৪০
- ^৪ “Sudraka has drawn on different strata of the society for his characters, his men and women do not belong to any particular social order nor do they profess any religious outlook or idealist sentiment.”- Biswanath Banarjee, *Shudraka* (New Delhi: Sahitya Akademi, 1999), page- 45
- “It is a picture of contemporary society, not a dull narration of the doings of divine or semi-divine personages.” - M. R. Kāle, *The Mṛichchhakaṭika of Sūdraka* (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, Reprint: 1994), Introduction, page-liv.
- ^৫ “In the Avantisundarikathasara, a work of Dandin recently discovered in Madras, a life-sketch of king Sudraka is given. He is described as a Brahmana king of Ujjayini and a great poet and is said to have defeated Svati, a prince of the Andhrabhritya dynasty.”-M. R. Kale, *The Mṛichchhakaṭika of Sūdraka*, Ibid, Introduction, page-xxiv.
- ^৬ বাণভট্ট, *কাদম্বরী*, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ৮ম খণ্ড, গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), গৌরী ধর্মপাল(কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮০), পৃষ্ঠা-২৫৩।

- ^৭ “প্রথিতযশসাং ভাসকবিপুত্রসৌমিল্লকাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমানকবেঃ কালিদাসস্য ক্রিয়ায়াং কথং পরিষদো বহুমানঃ।” – কালিদাস, *মালবিকাগ্নিমিত্র*, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ১১’শ খণ্ড, প্রথমঅঙ্ক, গৌরী নাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), রত্না বসু (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮১), প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা -২৫৯।
- ^৮ বামন, *কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃষ্টিঃ*, অনিল চন্দ্র বসু সম্পাদিত। (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৭), ৪/৩/২৩।
- শূদ্রক, *মূচ্ছকটিকম্*, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য সম্পাদিত। (কলকাতা: সিদ্ধান্তবিদ্যালয়, তৃতীয় সংস্করণ, ১৮৭৮ শকাব্দ), পৃ- ১৪৯
- ^৯ “ইয়ং রঙ্গপ্রবেশেন কলানাং চোপশিক্ষয়া। বঞ্চনাপণ্ডিতত্বেন স্বরনৈপুণ্যমাশ্রিতা ॥” – শূদ্রক, *মূচ্ছকটিকম্*, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য সম্পাদিত., প্রাগুক্ত, ১/৪২।
- ^{১০} তদেব, তৃতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা-২২৩।
- ^{১১} তদেব, ৩/৩।
- ^{১২} তদেব, ৩/৫।
- ^{১৩} বাৎস্যায়ন, *কামসূত্রম্*, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী সম্পাদিত। (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৩), প্রথম অধিকরণ, তৃতীয় অধ্যায়, ১৬।
- ^{১৪} শূদ্রক, *মূচ্ছকটিকম্*, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য সম্পাদিত। প্রাগুক্ত, ১/১৭।
- ^{১৫} তদেব।
- ^{১৬} (সংস্কৃতছায়া)– তদেব, চতুর্থ অঙ্ক, পৃষ্ঠা-৩১৫-৩১৬।
- ^{১৭} (সংস্কৃতছায়া)– তদেব, পৃষ্ঠা-৩১৭।
- ^{১৮} “পুত্রক স্বাবরক চোট। সুবর্ণকটকানি দাস্যামি।” (সংস্কৃতছায়া)– তদেব, অষ্টম অঙ্ক, পৃ-৫৪১
- ^{১৯} তদেব, ১০/১১।
- ^{২০} বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মূচ্ছকটিক*, সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। *সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড(কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৬), পৃষ্ঠা-১২৯।
- ^{২১} শূদ্রক, *মূচ্ছকটিকম্*, প্রাগুক্ত, (সংস্কৃতছায়া) ষষ্ঠ অঙ্ক, পৃষ্ঠা-৪৩৫, ৪৪০।
- ^{২২} (সংস্কৃতছায়া)– তদেব, চতুর্থ অঙ্ক, পৃষ্ঠা-২৫৮।
- ^{২৩} “যং সত্যং খলু নন্দননবমিব মে গণিকাগৃহং প্রতিভাসতে।” – তদেব, চতুর্থ অঙ্ক, পৃ-৩২৫
- ^{২৪} তদেব, ৩/১৩
- ^{২৫} তদেব, ৩/২০।
- ^{২৬} তদেব, ৭/১।
- ^{২৭} “আপানকমধ্যপ্রবিষ্টস্যোব রক্তমূলকস্য শীর্ষং তে ভঙ্ক্ষ্যামি।” (সংস্কৃতছায়া)– তদেব, অষ্টম অঙ্ক, পৃষ্ঠা-৪৯৪।

বাল্মীকির সীতা ও ভবভূতির সীতা: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ড. বেবী বিশ্বাস*

Abstract: Based on the story of the famous epic Ramayana by ancient poet Valmiki, renowned Sanskrit poet Bhavabhuti compose two dramas namely Mahavircharita and Uttararamacharita. Though Bhavabhuti adopts the story of the Ramayana while composing these two plays, the stories are not identical. In portraying the characters of the drama, he has made an effort to impersonate them rather just following the Ramayana always. Seeta is one of the important characters of the Ramayana. Daughter of Janaka and wife of Rama, Seeta, is also sketched in both of the mentioned plays by Bhavabhuti. However, the playwright Bhavabhuti does not portray exactly similar of Valmiki's Seeta rather he has outlined his own thought through Seeta in particular cases. Seeta, both by Valmiki and Bhavabhuti is a lover of nature and worshipper of husband. On the other hand, opposite scenario is also found in the dramas. Valmiki's Seeta is rational, resistant while Bhavabhuti's Seeta is the most comprehensive, simple. The article represents a comparative analysis of the portrayal of Seeta by these renowned poets.

সীতা মহাকবি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ মহাকাব্যের অন্যতম একটি চরিত্র। তিনি মিথিলার রাজা জনকের পালিত কন্যা এবং ত্রিলোকবিখ্যাত রাজা নিমির বংশের দ্বিতীয় জনকরূপে পরিচিত। তাঁর অপর নাম সীরধ্বজ।^১ একদা যজ্ঞীয়ভূমি কর্ষণকালে তিনি একটি সদ্যপ্রসূত কন্যাশিশুকে দেখতে পান। সীতা বা লাঙ্গলরেখায় কন্যাকে পাওয়া যায় বিধায় তাঁর নাম রাখা হয় সীতা। এ বিষয়ে রামায়ণে বলা হয়েছে—

অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুখিতা ততঃ॥

ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধ্বা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।^২

রামায়ণ অনুসারে অযোনিসম্ভূত সীতার পূর্বজন্মের একটা ইতিহাস আছে। বৃহস্পতিপুত্র কুশধ্বজের কন্যা বেদবতীর বেদপাঠকালে জন্ম বিধায় তাঁর এরূপ নাম রাখা হয়। পিতার ইচ্ছা ভগবান বিষ্ণুর কাছেই তাঁর যোগ্য কন্যাকে সম্প্রদান করবেন। কিন্তু দৈত্যরাজ শম্ভু তা না মেনে বেদবতীর পাণি প্রার্থনা করেন। শম্ভুর সঙ্গে কুশধ্বজের যুদ্ধ শুরু হয়। কুশধ্বজ মারা যান। পিতার ইচ্ছানুসারে বিষ্ণুকে স্বামীরূপে পাওয়ার বাসনায় বেদবতী তপস্যা শুরু করেন। লঙ্কেশ্বর রাবণ এসময় বেদবতীর কাছে উপস্থিত হয়ে কামার্ত হয়ে কেশাকর্ষণ করেন। তখনই কন্যার খড়্গতুল্য হাত সৃষ্টি হয় এবং নিজের কেশ নিজেই ছিঁড়ে ফেলেন। আত্মহত্যার পূর্বে তিনি ঘোষণা করেন, “তুই পাপমনে কেশাকর্ষণ করে আমার পবিত্রতা নষ্ট করলি তাই তোর বধের জন্য পুনরায় আমি জন্ম নেব।” রামায়ণের ভাষায়—

*সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

যস্মাত্ত্ব ধর্ষিতা চাহং ত্বয়া পাপাত্মনা বনে ।
তস্মান্তব বধার্থং হি সমুৎপৎস্যত্যহং পুনঃ॥^৩

পূর্বজন্মের সেই বেদবতীই জনকের অযোনিসম্ভূতা কন্যা সীতা ।

বাল্মীকির *রামায়ণ* অনুসারে সীতা এক অপূর্ব দৈহিক সৌন্দর্যের অধিকারী । তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, পূর্ণেন্দুবদনা, বিশালাক্ষ্মী সীতার মধ্যদেশ অতি ক্ষীণ ।^৪ উন্নত নাসিকা, সুন্দর কেশ, আকর্ষণীয় উরুর সীতা যেন বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অথবা দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করেন । *রামায়ণের* ভাষায়—

সা সুকেশী সুনাসোরুঃ সুরূপা চ যশস্বিনী ।
দেবতেব বনস্যাস্য রাজতে শ্রীরিবা পরা॥^৫

পঞ্চবটী বনে সীতাকে অপহরণকালে রাক্ষসরাজ রাবণও বলেছিলেন, “সীতার গায়ের বর্ণ রৌপ্যযুক্ত কাঞ্চনের ন্যায়, পরনে পীতবর্ণের কৌশেয় বস্ত্র, গলে পদ্মফুলের মালা, সীতা যেন পদ্মিনীর ন্যায় বনে বিচরণ করেছেন । সে যেন নারায়ণের স্ত্রী, হ্রী, শ্রী, কীর্তি, লক্ষ্মী । অথবা সে যেন অঙ্গরারূপী সীতা হিসেবে বনে বিচরণ করছে । *রামায়ণের* ভাষায়—

রৌপ্যকাঞ্চনবর্ণাভে পীতকৌশেয়বাসিনি ।
কমলানাং শুভাং মালাং পদ্মিনীব চ বিভ্রতী ॥
হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্তিঃ শুভা লক্ষ্মীরঙ্গরা বা শুভাননে ।
ভূতির্বা ত্বং বরারোহে রতির্বা স্মৈরচারিনী ॥
সমাঃ শিখরিণঃ স্নিগ্ধাঃ পাণ্ডুরা দশনাস্তব ।
বিশালে বিমলে নেত্রে রক্তান্তে কৃষ্ণতারকে ॥^৬

ভবভূতির *মহাবীরচরিত* অনুসারে উন্নতবক্ষা, মধ্যক্ষীণা, লাভ্যসার সীতার গায়ের বর্ণকে মধুপ পুষ্পের সাথে তুলনা করা হয়েছে ।^৭ কামান্ন রাবণ তাই আসন্ন যুদ্ধে কর্তব্য-অকর্তব্য ভুলে গিয়ে সীতার রূপসৌন্দর্য বর্ণনা করে বলেছেন—

মুখং যদি কিমিন্দুনা যদি চলাঞ্চলে লোচনে
কিমুৎপলকদম্বকৈর্যদি তরঙ্গভঙ্গী দ্রুবৌ ।
কিমাভ্রাববধম্বনা যদি সুসংযতাঃ কুণ্ডলাঃ
কিমম্বুবহডম্বরৈর্যদি তনুরিয়ংকিশ্রিয়া ॥^৮

(যদি সীতার আনন থাকে তবে চন্দের কী দরকার? নীলকমলগুলোর কী প্রয়োজন, যদি তাঁর চঞ্চল অপাঙ্গময় দুটি নয়ন থাকে? তরঙ্গের মত বক্র দ্রুদুটি থাকে— কী দরকার কামদেবের ধনুতে? যদি তাঁর সুসংযত কুণ্ডলদাম থাকে, মেখমালার বা কী প্রয়োজন? এই যদি তাঁর দেহ কী দরকার লক্ষ্মীতে?)

রামায়ণে সীতার সৌন্দর্য সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন রূপে সুন্দরী, গুণে স্বয়ং লক্ষ্মী । বোধ হয় সেজন্যই বহু পাণিপ্রার্থী রাজকুমার এসেছিলেন রাজা জনকের কাছে ।^৯

ভবভূতির *মহাবীরচরিতে* সীতার চরিত্র অতি অল্প বিস্তৃত। মাত্র প্রথম, দ্বিতীয় ও সপ্তম অঙ্কে তাঁর উপস্থিতি। *রামায়ণে* বিবাহকালীন সীতা কিশোরী; কিন্তু *মহাবীরচরিত* ও *উত্তররামচরিতের* সীতা পূর্ণ যৌবনবতী।^{১০} স্বাভাবিক রূপলাবণ্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। ঋষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আগত রামচন্দ্রকে দেখে মুগ্ধ হয়ে সীতা বলেছেন— “কিংন্তু সজ্জই ইমস্মিং লোঅণাণন্দে মে দিঠ্ঠী।”^{১১} অর্থাৎ— এ কী! নয়নাভিরাম, এর দিকেই যে নিবন্ধ আমার এই দৃষ্টি।

ভবভূতির *উত্তররামচরিতের* সীতার চরিত্রে প্রকৃতির প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা লক্ষ করা যায়। প্রকৃতির জীবজন্তু গাছপালাকে তিনি আন্তরিকভাবে ভালবাসেন। তারা যেন সীতার পরিবারেরই সদস্য। সীতার প্রথম বনবাসজীবনে পঞ্চবটীতে বসবাসকালে প্রকৃতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে। ময়ূরপাখিকে হাতে তালি দিয়ে নাচানো, হরিণশিশুদের তৃণ বিতরণ করা, হাঁসের সাথে খেলায় মেতে ওঠা ইত্যাদি তার প্রমাণ। একটি হস্তীশাবককে তিনি নিজের পুত্রতুল্য মনে করতেন। শাবকটি নির্ভয়ে সীতার কানের পল্লবালঙ্কার আকর্ষণ করত। বনপ্রকৃতির দেবীমূর্তি বাসন্তীতো সীতারই বান্ধবী। সীতার ঐ পালিত পুত্রতুল্য হস্তীশাবক বিপদে পড়লে তিনি সেকথা নেপথ্য থেকে জানিয়ে দিয়েছেন। বনে উপস্থিত ছায়াসীতা পূর্ব অভ্যাসবসত বলেছেন— “আর্যপুত্র আমার পুত্রকে রক্ষা করুন।”^{১২} প্রকৃতির গাছপালা, জীবজন্তু, পশুপাখি, নদীর জল তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করেছে। তাই সন্তানসম্ভবা সীতা নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য রামের কাছে বলেছেন, “আমি আবার সেই সুন্দর ও গভীর অরণ্যে বিচরণ করতে চাই। ভাগীরথীর সচ্ছসলিলে অবগাহন করতে চাই।”^{১৩}

আবার বাল্মীকির সীতাকেও প্রকৃতি প্রেমিক হিসেবে দেখা যায়। সেখানেও বৃক্ষ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, পশুপাখি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তিনি উপভোগ করেছেন। অরণ্যকাণ্ডে পদ্মশোভিতা নদীর বর্ণনা রয়েছে যার উভয় তীর বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। সেখানে বৃক্ষ ও ফুলের মধ্যে রয়েছে শাল, তাল, তমাল, খজ্জুর, পনস, তিনিশ, নীবার, পুনাগ, আশ্র, অশোক, তিলক, কেতক, চম্পক, চন্দন, নীপ, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী, কিংশুক ও পাটল। পশু-পাখির মধ্যে হরিণ, হংস, চক্রবাক, ময়ূর ইত্যাদি। রয়েছে পাহাড়-পর্বতের বর্ণনা। আর বাল্মীকির সীতা সেখানে পাখির সাথে, পাহাড়-নদী-বৃক্ষশোভিত অরণ্যে বসবাস করার একান্ত ইচ্ছা পোষণ করেছেন যা তাঁর প্রকৃতিপ্রেমেরই পরিচয় বহন করে। তবে ভবভূতির সীতা যেখানে স্বহস্তে বৃক্ষ, পশুপাখিদের সযত্নে প্রতিপালন করেছেন, বাল্মীকির সীতা সেখানে শুধু মন থেকে প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এক্ষেত্রে বাল্মীকির সীতাকে ভবভূতির সীতা থেকে কিছুটা ব্যতিক্রমী মনে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে *রামায়ণে* বলা হয়েছে—

ইদং পুণ্যমিদং রম্যমিদং বহুমৃগদ্বিজম্।

ইহ বৎস্যাম সৌমিত্রে সার্দ্রমেতেন পক্ষিণা ॥^{১৪}

অর্থাৎ— সুমিত্রানন্দন এই স্থান অত্যন্ত মনোরম, পুণ্যজনক এবং অনেক হরিণ ও বিহঙ্গসমূহে শোভিত। সুতরাং আমরা জটায়ু পাখির সাথে এই স্থানেই বাস করব।

ভবভূতির *উত্তররামচরিতে* দেখা যায়— সীতা তাঁর পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক। পিত্রালয়, শশুরালয় উভয়ক্ষেত্রে তাঁর এই আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। সন্তানসম্ভবা সীতাকে দেখতে আসেন জনক। বিদায় নেওয়ার কালে পিতার বিরহে সীতা কষ্ট পান। সহধর্মিণীকে সান্ত্বনা দিতে রামচন্দ্র তাই অন্তপুরে প্রবেশ করেন। ননদ শান্তা, ননদপত্নী ঋষ্যশৃঙ্গের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে তিনি ভুল করেন নি। চিত্রদর্শন পর্বে অঙ্কিত চিত্রপটে উর্মিলাকে দেখে নিজের স্নেহাস্পদ দেবর লক্ষ্মণের প্রতি রম্যকৌতুকপূর্ণ ইঙ্গিতে

বলেন, “এইটি কে?”^{১৫} এসকল আচরণ আপনজন ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি তাঁর আন্তরিকতার প্রকাশ। স্বামী রামচন্দ্র সদ্যবিবাহিতা সীতা ও বিবাহ পরবর্তী দিনগুলোর প্রতি স্মরণ করে বলেছেন, “সীতার কুসুমকলির মত দাঁতের সৌন্দর্য। মুখের দুপাশে ছড়িয়ে পড়া সুন্দর কেশগুচ্ছ। সবকিছু মিলে তাঁর সৌন্দর্য ছিল স্বাভাবিক লাভণ্যময় যা চাঁদের আলোর মত স্নিগ্ধ ও মধুর।”^{১৬} রাম আরও বলেছেন, “তখন পিতা জীবিত ছিলেন। আমাদের বিবাহ কেবল সম্পন্ন হয়েছে। মাতৃগণ আমাদের কথা চিন্তা করতেন।”^{১৭} রামের এসকল মন্তব্যে পরিবারের সদস্যদের প্রতি যেমন সীতার তেমনি সীতার প্রতি পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ভবভূতির সীতাচরিত্রে যেমন পারিবারিক বন্ধন ছিল বাল্মীকির *রামায়ণের* সীতাচরিত্রেও তদ্রূপ পারিবারিক বন্ধন দেখা যায়। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— “*রামায়ণের* প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ, *রামায়ণ* তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।”^{১৮} *উত্তররামচরিতে* পারিবারিক বন্ধনের চিত্র আরও একধাপ উন্নীত। ‘চিত্রদর্শন’ পর্ব, ‘ছায়াসীতা’ অংশ, গর্ভনাটক উপস্থাপনা ইত্যাদির মাধ্যমে রাম-সীতার দাম্পত্য প্রেম ঘনিষ্ঠভাবে প্রকাশ পেয়েছে যা *রামায়ণ* থেকে আরও সুদৃঢ় একথা বলাই যুক্তিযুক্ত।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বিবাহিত নারীদের সবচেয়ে আপনজন হলেন ধর্মপতি। অগ্নি স্বাক্ষী করে তাকে বিবাহ করা হয়। যিনি তাঁর ভরণ-পোষণ করেন, তিনি তাঁর স্বামী, ভর্তা, আর্ঘ্যপুত্র। *উত্তররামচরিতে* স্বামী রামচন্দ্রের প্রতি সীতার গভীর ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে। স্বামীর প্রতি সীতার সকল নির্ভরতা, সকল আস্থা। সেখানে যেকোন অবস্থাতেই কোন ক্ষোভ, অভিযোগ বা অতৃপ্ততা নেই। নাটকের প্রথম অঙ্কে মুনি অষ্টবক্র কুলগুরু বশিষ্ঠের বার্তা নিয়ে আসে— “রামচন্দ্র তুমি প্রজানুরঞ্জে তৎপর হও। তাহলে তোমার বংশের পরম যশ তা তুমি প্রাপ্ত হবে।”^{১৯} উত্তরে রামচন্দ্র জানান, “প্রজানুরঞ্জনের জন্য আমি স্নেহ, দয়া, সৌখ্য এমনকি জানকীকে পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারি।”^{২০} রামচন্দ্রের এই মন্তব্যে সীতার কোন অভিযোগ নেই; বরং তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন, গর্বিত হয়েছেন। সূর্যবংশের উত্তরপুরুষ রামচন্দ্র। তিনি রঘু কুলশ্রেষ্ঠ। হরধনুভঙ্গ, তাড়কাসুরবধ, পরশুরামকে পরাজিত করা, রাক্ষসরাজ রাবণবধ ইত্যাদির মাধ্যমে রামের এই বীরোত্তম বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। আবার ভ্রাতা ভরত রামের অনুপস্থিতিতে তাঁর পাদুকাকে সিংহাসনে রেখে রামের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য পরিচালনা করেছেন। সেই রামের পক্ষে প্রজানুরঞ্জন করা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যেকোনো ত্যাগের বিনিময়ে প্রজানুরঞ্জনই রামের কর্তব্য। তাই সীতা বলেছেন, “রঘুকুলধুরন্ধর-আর্ঘ্যপুত্রঃ।”^{২১} এক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সীতার স্বামীভক্তি ও দূরদর্শিতা প্রকাশ পেয়েছে।

উত্তররামচরিতে সীতার পতিভক্তির সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায় ছায়াসীতা অংশে। ভবভূতির স্বকল্পজ এই ছায়াসীতা মূল *রামায়ণ* থেকে একেবারে ভিন্ন। এ বিষয়ে Vimla Gera বলেন, “The psychological representation of Sita supplied by this Act is the work of the imagination and great skill of the dramatist hand is undoubtedly and advance over the epic-story.”^{২২}

এদিকে রামচন্দ্র পঞ্চবটী বনে এসেছেন। রাজকাজে ব্যস্ততাহেতু অযোধ্যায় বসে রামের শোকপ্রকাশের সুযোগ নেই। আজ তাই নির্জনে পূর্ববনবাস জীবনের স্মৃতিবিজড়িত পঞ্চবটী দেখে রামের শোক জেগে উঠেছে। এ

বিষয়টি ভাগীরথী-গঙ্গা আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই রামকে সুস্থ রাখার জন্য, মূর্ছিত রামের চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি ছায়াবিধী অদৃশ্য সীতাকে পঞ্চবটীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বনমধ্যে মূর্ছিত রামচন্দ্রকে ছায়াসীতা কোলে তুলে নিয়েছেন যার স্পর্শে রামচন্দ্র বলে ওঠেন, “একি হরচন্দন পল্লবের নির্যাস অথবা নিষ্পেষিত চন্দ্রকিরণের সমষ্টির নির্যাস অথবা আমার অতপ্ত প্রাণের উজ্জীবনের জন্য কোন মহৌষধি হৃদয়ে নিষিক্ত হয়েছে।”^{২৩} সখি বাসন্তী ও সীতা এখানে হরিণদের তৃণ বিতরণ করতেন, ময়ূরদের হাতে তালি দিয়ে নাচাতেন। আর এসকল কথা বলে রামের শোককে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। আবার রামচন্দ্রকে সীতা মহারাজ বলেও সম্বোধন করেছেন। অদৃশ্য সীতা তাই বাসন্তীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, “আর্যপুত্র সকলের কাছে ভাল ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য আর অন্তত আমার বান্ধবী বাসন্তীর কাছ থেকেতো অবশ্যই।”^{২৪} অন্যদিকে পূর্বে রামের আচরণ এবং বর্তমান বিরহদশা দুটোই সীতা দেখেছেন। আবার স্বর্ণসীতা নির্মাণ করে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছেন সেকথা জেনে সীতা বলেছেন, “আমি তাঁর হৃদয় জানি। সেও আমার হৃদয় জানে।”^{২৫} স্বামীর প্রতি সীতার এসকল মন্তব্য একজন আদর্শ পতিপ্রাণা সীতাকেই প্রমাণ করে। আসলে “কালিদাস নারীর বাহিরের রূপ নিয়ে ব্যস্ত, ভবভূতি নারীর অন্তঃকরণের সৌন্দর্য লইয়া ব্যস্ত। নারী ‘তুঙ্গসুতী’, ‘শ্রোণীভারাদলসগমনা’, ‘বিষাধরা’ হইলেই কালিদাস যেন আর কিছুই চাহেন না। রসাইয়া রসাইয়া তাঁহার নানা কাব্যের নানা স্থানের রমণীর অবয়বের বর্ণনা করিতে তিনি যেন একটা বিপুল আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু ভবভূতির কাছে নারী ‘গেহে লক্ষ্মীঃ’, তাহার ‘বচনানি কর্ণামৃতানি’, ‘স্পর্শ সঞ্জীবনৌষধিরসঃ’, ‘স্নেহাদর্শীতলঃ’ তাহার পরিবস্ত ‘সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা’।”^{২৬} সমালোচকদের এই মন্তব্য সত্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাই বলেন, “দেশজয়, শত্রুবিনাশ দুই প্রবল বিরোধীপক্ষের প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাত এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণত মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনা সঞ্চার করে থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, যে যুদ্ধঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্যপ্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র।”^{২৭}

পিতৃসত্য পালনের জন্য চৌদ্দ বছর বনে গমনের পূর্বে সীতা রামের সঙ্গে যেতে চাইলে রামচন্দ্র সীতাকে বললেন— “কল্যাণী তুমি ব্রত উপবাসে নিরত থাকবে, প্রত্যহ দেবার্চনার পর আমার পিতার পাদবন্দনা করবে, আমার শোকার্তা বৃদ্ধা মাতা কৌশল্যার সেবা করবে, অন্য মাতৃগণতেও নিত্য বন্দনা করবে।”^{২৮} প্রত্যুত্তরে সীতা বললেন, “আর্যপুত্র আমি, তোমর সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী, তোমাকে ভক্তি করি, আমাকে নিয়ে চল, নয়তো বিষপানে বা অগ্নিপ্রবেশে বা জলমজ্জনে প্রাণত্যাগ করব।”^{২৯} আর এসকল উক্তি থেকে পতিব্রতা সীতার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ বাল্মীকির সীতা যেমন পতিগতপ্রাণা ভবভূতির সীতাও তদ্রূপ।

ভবভূতির মহাবীরচরিতে সীতার চরিত্র ভীতসন্ত্রস্ত দুর্বলা নারী হিসেবে পরিচিত। প্রথম অঙ্কে ভয়ঙ্করী তাড়কাসুরের আগমনে ভয় পান। দ্বিতীয় অঙ্কেও ভীমদর্শনা পরশুরামের আগমনে, পরশুরাম কর্তৃক রামকে যুদ্ধের আহ্বানে সীতা অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। সখিরা সীতাকে আশ্বস্ত করে বলেন, ত্রিলোকের মঙ্গলকারী রামচন্দ্রের কোন ক্ষতি হতে পারে না। ভয়েভীতা সীতা তবুও অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে রামকে বিরত করার চেষ্টা করেন। এমনকি রামের ধনু টেনে ধরেন। একপর্যায়ে কেঁদেও ফেলেন। সীতার এই মানসিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে রামচন্দ্র বলেছেন—

আতঙ্কশ্রমসাধবব্যতিকরোৎকম্পঃ কথং সহ্যতা-

মঙ্গৈর্মুখ্যামধুকপুষ্পরচিভিলাবণ্যসারৈরয়ম্ ।

উন্নদ্ধস্তনযুগাকুড্‌মলগুরুশ্বাসাবভূগ্‌স্য তে

মধ্যস্য ত্রিবলীতরঙ্গকজুযো ভঙ্গঃ প্রিয়ে মা চ ভুৎ ॥^{৩০}

(মধুকপুষ্পের মত কান্তিময়, লাবণ্যসার তোমার এই শরীরে আতঙ্কজাত শ্রমের ফলে উৎপন্ন যে কম্প তা কি করে সহ্য করবে? স্তনযুগল সুতীক্ষ্ণ, কুঁড়ির মত উঁচু করে বাঁধা। ভয়ে দেখা দিয়েছে গভীর শ্বাস, ফলে গভীর আনত তোমার কটিদেশ ত্রিবলীর তরঙ্গরেখায়। প্রিয়ে, দেখ তোমার মধ্যভাগ যেন ভেঙ্গে না পড়ে।)

আবার নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে সীতাকে জটিলতাপূর্ণ স্বামীমঙ্গলাভিলাষী নারী হিসেবে দেখা যায়। এ নাটক অনুসারে মহুরারূপী শূর্ণগা কৈকেয়ীর পূর্বপ্রাপ্ত বরের কথা ঘোষণা করেন। রাম চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসী হবে। সীতা ও লক্ষ্মণ ভিন্ন অন্য কেউ সঙ্গী হতে পারবে না। এ বিষয়ে সরলা সীতার ভাষ্য, “দিট্ঠিআ অণুমোদিদং ক্ষি অজ্জেন।”^{৩১} অর্থাৎ— ভাগ্যবশে আমি স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছি।

নাটকের সপ্তম অঙ্কে জটিলতাপূর্ণ, প্রকৃতিপ্রেমী, স্বামীসোহাগী সহধর্মিণী সীতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণের সাথে রামের যুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি, সাগরবন্ধন, যুদ্ধের ভয়াবহতা ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। লঙ্কাপুরীতে বসবাসের কষ্টকর দিনগুলোর কথা তিনি কিছুই প্রকাশ করছেন না। ভর্তৃহ্নেহ মাতুলা সীতা এখানে রামচন্দ্রের ফ্রোড়ে বসে শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখছেন। কিন্তু বাল্মীকির সীতা অনেক দায়িত্বশীলা, বুদ্ধিমতী ও যুক্তিবাদী। ‘অযোধ্যাকাণ্ডে’ বনবাসজীবনের কষ্টকর দিকগুলো তুলে ধরে রামচন্দ্র সীতাকে প্রথমে বিরত করার চেষ্টা করেন এবং অযোধ্যায় বসে পূজার্চনা ও গুরুসেবার মাধ্যমে দিনাতিপাত করার অনুরোধ জানান। কিন্তু যুক্তিবাদী সীতা বলেন—

ভর্তৃর্ভাগ্যস্ত নার্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ ।

অঙ্গশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যমিত্যপি ॥

ন পিতা নাত্নজো নাত্না ন মাতা ন সখিজনঃ ।

ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতঃ সদা ॥

যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদৈব রাঘব ।

অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদান্তী কুশকণ্টকান্ ॥^{৩২}

(পিতামাতা, পুত্রবধূ এরা স্ব স্ব ভাগ্য অনুসারে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে থাকে। কিন্তু বিবাহিত নারী স্বামীর ভাগ্যানুসারে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে থাকে। অতএব আমিও বনবাসের জন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। নারীর ইহকালে বা পরকালে সর্বদা পতিই গতি, কোনকালেই আত্মীয়, পিতা, মাতা, পুত্র বা সখিরা কেউই তার আশ্রয় নয়। তাই তুমি দুর্গম বনে গেলে আমিও কুশকণ্টক মর্দন করে তোমার আগে আগে যাব।)

রামচন্দ্র তবুও সীতাকে বনবাসজীবনের সাথী হিসেবে নিতে না চাইলে সীতা একপর্যায়ে রামকে তিরস্কার করে বলেন— তুমি পুরুষ হয়েও স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করছো। বনে আমার কোন কষ্ট হবে না। আমার ভরণ-পোষণের জন্য তোমার কোন কষ্ট করতে হবে না। আমি পূজার্চনার দ্বারা অযোধ্যাবাসীদের স্মরণ করব।

তোমার সাথে বাস আমার স্বর্গ, তোমা ব্যতিরেকে আমার নরক। আমি মুহূর্তকাল তোমার বিরহে থাকতে পারি না। কি করে চৌদ্দ বছর থাকব। *রামায়ণের* ভাষায়—

ইমং হি সহিতুং শোকং মুহূর্তমপি নোৎসহে।

কিং পুনর্দশবর্ষাণি ত্রীণি চৈকঞ্চঃ দুঃখিতা॥^{৩৩}

এখানে দৃঢ়চেতা এবং যুক্তিবাদী সীতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আবার যুদ্ধকাণ্ডে রাম-রাবণের যুদ্ধশেষে সীতা রামের সম্মুখে উপস্থিত হলে *রামায়ণের* রাম তাঁকে সরাসরি গ্রহণ করতে রাজি হন নি। রামের ভাষ্যমতে, “আমি শত্রুকে জয় করেছি নিজের অপবাদ দূর করার জন্য, বীরত্ব প্রকাশ করার জন্য এবং নিজের বংশমর্যাদা রক্ষা করার জন্য। সীতা বহুবার রাবণের গৃহে বসবাস করেছে। রাবণ নিশ্চয়ই সীতার প্রতি কুদৃষ্টি দিয়েছেন। তাই তিনি সীতাকে গ্রহণ করতে রাজি হন নি।”^{৩৪} এ ক্ষেত্রেও যুক্তিবাদী সীতার প্রতিবাদী ভাষ্য—

কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।

রুক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রকৃতঃ প্রাকৃতামিব॥

মদধীনস্ত যন্তন্থে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ততে।

পরাদীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বর৷

ত্বয়া তু নৃপশার্দূল রোষমেবানুর্ভতা।

লঘুনেব মনুষ্যেণ স্ত্রীত্বমেব পুরস্কৃতম্ ॥

অপদেশো মে জনকান্নোৎপত্তির্বসুধাতলাৎ।

মম বৃত্তাঞ্চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্কৃতম্ ॥

ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।

মম ভক্তিঞ্চ শীলঞ্চ সর্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্ ॥^{৩৫}

(নীচ লোকেরা তাদের স্ত্রীলোকদের প্রতি যেভাবে নিষ্ঠুর আচরণ করে তুমিও আমার প্রতি সেরকম করলে। আমার নিজের অধীন যে হৃদয় তা তোমারই ছিল, তা কেউ স্পর্শ করতে পারে নি। কিন্তু আমার শরীর আমার অধীনে ছিল না। সেই অরক্ষক শরীর যদি রাবণ স্পর্শ করে থাকে তাতে আমার অপরাধ কী? তুমি রাগবশে সাধারণ মানুষের ন্যায় আমার কেবল স্ত্রীত্বই বিবেচনা করলে। কিন্তু রাজর্ষি জনকের যজ্ঞভূমি হতে উৎপন্ন হয়েছি, লোকে আমাকে জানকি বলে জানে। জনকের ঔরসজাত আমি নই। পৃথিবী হতে আমার জন্ম। কিন্তু আমার চরিত্র বিষয়ে তুমি সেসকল বিষয় বিবেচনা করলে না। বাল্যকালে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করেছিলাম, সেটি তুমি বিবেচনা করলে না। আমার চরিত্র এবং তোমার প্রতি আমার যে ভক্তি তা তুমি বিবেচনা করলে না।)

ভবভূতির উত্তরামচরিতের সীতা নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন অযোনিসম্ভূতা। তাঁর চরিত্র জন্ম থেকেই পবিত্র। তাঁর চরিত্রের পবিত্রতার স্বীকৃতি দিয়ে ভবভূতি তাই অলংকার মাধ্যমে বলেছেন—

পতিব্রতাময়ং জ্যোতির্জ্যোতিষান্যেন শোধ্যতে।

ইদমাশ্চর্যমথবা লোকস্থিত্যনুবর্তনম্ ॥^{৩৬}

(পতিব্রতের আলোকে আলোকিত যে জ্যোতি কী করে অন্য জ্যোতি অগ্নি তা বিশুদ্ধ করতে পারে। তাহলে এটা কি লোকাচারের জন্যই করা হল।)

আকাশে উড়ন্ত কিন্নরমিথুনও সীতার স্তুতি করে বলেছেন—

যাবৎফণীন্দ্রশিরসি ক্ষিতিচক্রমেতদ্যাবৎ-

পুনর্গ্রহগণৈঃ শবলং বিহায়ঃ।

বৈদেহি তাবদমলো ভুবনেষু পুণ্যঃ শ্লোকঃ

প্রশস্তচরিতৈরুপগীয়াতং তে ॥^{৩৭}

(যতদিন এই ধরণীমণ্ডল শেষনাগের মস্তকে থাকবে, যতদিন আকাশে গ্রহরাজি থাকবে, ততদিন ভুবনে-ভুবনে পুতপবিত্ররা তোমার পবিত্র নির্মল স্তবগান করবে।)

কুলগুরু বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীও সীতাকে জগৎপ্রসিদ্ধা নারী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন—

লোপামুদ্রানসূয়াহমিতি তিস্তস্তয়া সহ।

পতিব্রতাস্ততশ্চো হত্রসম্ভ জানকি সাম্প্রতম্ ॥^{৩৮}

(লোপামুদ্রা, অনসূয়া আর অরুন্ধতী এই তিনজন প্রসিদ্ধা পতিব্রতা ছিল। এ বিষয়ে আজ তুমি যোগ হয়ে মোট চারজন হল।)

এ প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস পণ্ডিত তাঁর রামায়ণ গ্রন্থে বলেছেন— “সীতার জীবনে দুঃখের শেষ নেই, তথাপি ধর্মের জন্য তিনি সব সহ্য করেছেন। তাঁর এই নির্ভীকতা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। প্রাণের বিনিময়েও সতীত্ব-ধর্ম ত্যাগ করেন নি। তিনি ভারতের চিরন্তন আদর্শ— যা শচী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, সাবিত্রী, দয়মন্তী প্রভৃতি নারীগণের আদর্শ তা পালন করেছেন।”^{৩৯}

বাল্মীকির রামায়ণে যজ্ঞসম্বৃতা হলেও সীতার জীবনের অনেক ত্যাগ ও কষ্টের কথা বলা হয়েছে। সেখানে সীতা দুর্বৃত্ত রাবণ কর্তৃক অপহৃতা, স্বামী পরিত্যক্তা ও সম্মানবিচ্যুতা। কিন্তু উত্তররামচরিতের সীতা প্রকৃতির আশীর্বাদপুষ্টা, সাহায্যপ্রাপ্তা। সীতার সদ্যপ্রসূত সন্তানদ্বয়কে সেখানে নদীচরিত্রের মাধ্যমে ধরিত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। পরে ঋষি বাল্মীকির আশ্রমে সন্তানদের লালন-পালন হয়েছে, শিক্ষা-দীক্ষা ঘটেছে। রামায়ণের সীতা রাজ্যের একজন সাধারণ প্রজা হিসেবেও সুবিচার পান নি— বিষয়টি সীতা নিজমুখে প্রতিবাদ করেন। কিন্তু ভবভূতির উত্তররামচরিতের সীতা নিজমুখে প্রতিবাদ না করলেও কৌশল্যা প্রমুখাদি বলেছেন, সীতাবিহীন অযোধ্যায় আর ফিরে যাব না। ধরিত্রী দেবীও বলেছেন—

ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে বালেন পীড়িতঃ।

নাহং ন জনকো নাগ্নির্নানুবৃতির্ন সন্ততিঃ ॥^{৪০}

(বালক অবস্থায় রামচন্দ্র যে পাণিগ্রহণ করেছিলেন তাঁর সম্মান তিনি রক্ষা করেন নি। আমার প্রতি, জনকের প্রতি, অগ্নির প্রতি কোন মর্যাদা দেখান নি এবং সন্তানের প্রতিও কোন কর্তব্যের পরিচয় দেন নি)

আবার উত্তররামচরিতে গর্ভনাটক উপস্থাপনের মাধ্যমে সীতাকে প্রজাদের সম্মুখে ভাগীরথীদেবী এবং পৃথিবী বলেছেন, “তুমি জগতের মঙ্গলস্বরূপ, তোমার কারণে আমরা দুজনে পবিত্র হলাম। তুমি আমাদের শূচিতাকে আরও বর্ধিত করেছো। তুমি নিজেকে কেন ক্ষুদ্র মনে করছো?”^{৪১} দর্শকসারিতে বসে থাকা রামচন্দ্রও বলেছেন, “বিশ্ববাসী একথা শ্রবণ করুক।”^{৪২} বাল্মীকির রামায়ণের সীতাকে রামচন্দ্র গ্রহণ করতে চাইলেও সীতা তা মেনে নেন নি; বরং ধরিত্রীদেবীর কাছে নিজের আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেছেন—

যথাহং রাঘবাদ্যনং মনসাপি ন চিন্তয়ে ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্বি রামাং পরং ন চ ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥^{৪৩}

(যেহেতু আমি রামভিন্ন অন্য কাউকে মনে স্থান দেই নি, আমি কায়মনোবাক্যে রামেরই অর্চনা করেছি, আমি সত্য বলছি, যেহেতু আমি রামভিন্ন অন্যকাউকে সত্য বলে জানি না তাই হে বসুন্ধরা, তুমি আমাকে তোমার গর্ভে স্থান দাও।)

এখানে একজন প্রতিবাদী নারী হিসেবে সীতার চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ভবভূতির উত্তররামচরিতে সীতাকে গর্ভনাটক উপস্থাপন করে জনগণের মাধ্যমে সর্বজনস্বীকৃতিতে গ্রহণ করানো হয়েছে। তাই তাঁকে দময়ন্তী, সাবিত্রী, দ্রৌপদী প্রমুখ ত্যাগী ও বিশুদ্ধা আদর্শ নারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে M. R. Kale বলেছেন, “She belongs to the noble company of ladies like Savitri, Damayanti, Draupadi and others, who have been Hindu ideals of womanly virtues and who have exalted womanhood to the height of divine perfection.”^{৪৪}

তথ্যনির্দেশ

১. বাল্মীকি, রামায়ণম্, পঞ্চমস্তম তর্করত্ন সম্পা. (কলকাতা: বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ়, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ), ১/৭১ তম সর্গ।
২. তদেব, ১/৬৬/১৩-১৪।
৩. তদেব, ৭/১৭/৩১।
৪. রামস্য তু বিশালাক্ষী পূর্ণেন্দুসদৃশাননা।
ধর্মপত্নী প্রিয়া নিত্যং ভর্তৃঃ প্রিয়হিতে রতা ॥— তদেব, ৩/৩৪/১৫।
৫. তদেব, ৩/৩৪/১৬।
৬. তদেব, ৩/৪৬/১৬-১৮।
৭. ভবভূতি, মহাবীরচরিতম্, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পা. (কলকাতা: সরস্বতীযন্ত্রে, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৬০), ২/২১।
৮. তদেব, ৬/৯।

৯. কৃষ্ণিবাস, *রামায়ণ*, সুখময় ভট্টাচার্য সম্পাদিত। মোহন পাল ভূমিকা সম্বলিত (কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৪), পৃ. ১৮৬।
১০. ভবভূতি, *মহাবীরচরিতম্*, প্রাগুক্ত, ২/২১।
১১. তদেব, ১ম অঙ্ক, পৃ. ১১।
১২. “অজ্ঞউত্ত পরিভ্রাহি পরিভ্রাহি মহ তং পুত্তঅম্”— তদেব, ৩য় অঙ্ক, পৃ. ৭১।
১৩. “জাণে পুণোবি পসন্নগম্ভীরাসু বণরাইসু বিহরিসং পবিত্তণিম্মলসিসিরাবগাহা ভাবদি ভাষ্টরহি ওগাহিসং তি।”
— তদেব, ১ম অঙ্ক, পৃ. ৩৪।
১৪. বাল্মীকি, *রামায়ণম্*, প্রাগুক্ত, ৩/১৫/১৯-২০।
১৫. “বচ্ছ ইঅং বি অবরা কা।”— ভবভূতি, *উত্তররামচরিতম্*, সীতানাথ আচার্য, দেবকুমার দাস সম্পাদিত। (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০০১), ১ম অঙ্ক, পৃ. ২২।
১৬. তদেব, ১/২০।
১৭. তদেব, ১/১৯।
১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *প্রাচীন সাহিত্য* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ), ভূমিকাংশ, পৃ. ৯।
১৯. ভবভূতি, *উত্তররামচরিতম্*, প্রাগুক্ত, ১/১১।
২০. তদেব, ১/১২।
২১. তদেব, ১ম অঙ্ক, পৃ. ১৬।
২২. Vimla Gera, *Mind & Art of Bhavabhuti* (Delhi: The Sanskrit book depot. 1973), p. 153.
২৩. ভবভূতি, *উত্তররামচরিতম্*, প্রাগুক্ত, ৩/১১।
২৪. “পিআরুহো কখু সর্বসস অজ্ঞউত্তো বিসেসদো মহ পিসসহীএ।”— ভবভূতি, *উত্তররামচরিতম্*, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), তারাপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, জুন, ২০১১), ৩য় অঙ্ক, পৃ. ১০৯।
২৫. “অহং এদসং হিঅং জাণামি মমাংবি এসো।”— তদেব, ৩য় অঙ্ক, পৃ. ১০৫।
২৬. সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ‘কালিদাস ও ভবভূতি’, পৃ. ৭৬।
২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *প্রাচীন সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।
২৮. বাল্মীকি-*রামায়ণ*, রাজশেখর বসু সারানুবাদ, (কলকাতা: এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৩), পৃ. ৮৯।
২৯. তদেব, পৃ. ৯০।
৩০. ভবভূতি, *মহাবীরচরিতম্*, প্রাগুক্ত, ২/২১।
৩১. ভবভূতি, *মহাবীরচরিতম্*, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ১৩শ খণ্ড, গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), তারাপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, আগস্ট, ১৯৮২), ৪র্থ অঙ্ক, পৃ. ১৬৬।
৩২. বাল্মীকি, *রামায়ণম্*, প্রাগুক্ত, ২/২৭/৫-৭।

৩৩. তদেব, ২/৩০/২১।
৩৪. তদেব, ৬/১১৭/২, ৬/১১৭/৪, ৬/১১৭/১৩, ৬/১১৭/১৬-১৭।
৩৫. তদেব, ৬/১১৮/৫, ৬/১১৮/৯, ৬/১১৮/১৪-১৬।
৩৬. ভবভূতি, মহাবীরচরিতম্, প্রাগুক্ত, ৭/৪।
৩৭. তদেব, ৭/২৬।
৩৮. তদেব, ৭/৩৬।
৩৯. কৃত্তিবাস, রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১।
৪০. ভবভূতি, উত্তররামচরিতম্, প্রাগুক্ত, ৭/৫।
৪১. তদেব, ৭/৮।
৪২. “শৃগোত্ম লোকঃ”— তদেব, ৭ম অঙ্ক, পৃ. ১৭৭।
৪৩. বাল্মীকি, রামায়ণম্, প্রাগুক্ত, ৭/১১০/১৪-১৬।
৪৪. Bhavabhuti, *Uttararamacharita*, M. R. Kale ed. (Bombay: Messrs Gopal Narayan and Co. 2nd edition, 1928), Introduction, p. 35.

মুদ্রারাক্ষস নাটকে প্রধান চরিত্রচিত্রণে বিশাখদত্তের সার্থকতা

ড. হোসনে আরা আরজু*

Abstract: An attempt has been taken in this article to show the skill of the dramatist in depicting principal characters of the political drama mudrarakshasa. This Sanskrit drama Mudrarakshasa of Vishakhadatta is purely a political drama without any reference to principal women characters. The drama describes the attempts and success of Chanakya in firmly establishing the sovereignty of Chandragupta, by winning over to his side another Brahmin politician of the period whose name was Rakshasa and who was at first hostile to Chandragupta, having been one of the ministers of king Nanda. The play is founded on politics and diplomacy and not on love. The defeat of Rakshasa, ancient despotic ruler on one hand and the rise of the new royal power Chandragupta by the intelligence political wisdom and diplomacy of Chanakya add a new era to the play's overall appeal. The principal characters in the play are the pairs- Chanakya and Rakshasa, Chandragupta and Malayaketu, Chanakya being the most important of them all. The Dramatist has been successful in finely drawing the contrast between the characters of these two politicians.

ভূমিকা

বিশাখদত্ত বিরচিত মুদ্রারাক্ষস উল্লেখযোগ্য স্ত্রীচরিত্র বর্জিত প্রণয়গন্ধহীন ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিরচিত একটি রাজনৈতিক নাটক। মুদ্রারাক্ষস নাটকে দেখা যায়, নন্দবংশের উচ্ছেদ এবং সে স্থানে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা। নন্দবংশের রাক্ষস অনুগত মন্ত্রী মৌর্যবংশের রাজা চন্দ্রগুপ্তকে উৎখাত করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন। অন্যদিকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য বিপক্ষদের বিরুদ্ধে প্রতিচক্রান্ত করে প্রতিপত্তিশীল মন্ত্রী রাক্ষসকে নিজদলে আনার চেষ্টা করেছেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে রাজ্য পরিচালিত হয়েছে। মন্ত্রী খবরাখবর সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করতেন। গুপ্তচরদের ভূমিকা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের সংবাদের ওপর নির্ভর করেই রাজা এবং মন্ত্রীর কর্মপদ্ধতি, রণকৌশল ও রণনীতি স্থির করা হতো। রাজতন্ত্রের রাজা এবং মন্ত্রীদের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্ট হয়েছে নাটকের মধ্যে।

নাটক রূপকের শ্রেণিভেদ। রূপকে রূপের আরোপ করা হয়। বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণে বলেছেন ‘রূপারোপাত্ত্ব রূপকম্।’^১ চরিত্রকে কেন্দ্র করেই ইতিবৃত্ত বিকশিত হয়। চরিত্রই ইতিবৃত্তের প্রাণ। চরিত্র রস-অভিব্যক্তির আলম্বন মাত্র—“আলম্বনং নায়কাদিস্তমালম্ব্য রসোদ্যমাৎ।”^২ চরিত্রের একাত্মতায় পাঠক ও দর্শকের চিত্তে রস অভিব্যক্ত হয়। এই সূত্রেই বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যভেদে শ্রেণিকরণ যথা নায়ক, সহনায়ক,

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

পীঠমর্দক, বিট, বিদূষক, নায়িকা (স্বীয়া, পরকীয়া, সাধারণী স্ত্রী) ইত্যাদি চরিত্রসৃজন কাহিনির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এয়ারিস্টটলের মতে নাটক ত্রিাশীল মানুষের অনুকরণ (men in action)। অনুকরণমূলক শিল্পই হলো শ্রেষ্ঠ শিল্প, কারণ এই শিল্পই বিশ্বজনীন জীবনকে প্রকাশ করে “an expression of universal element in human life”^৭

নাটকের ভাবগাম্ভীর্য মূর্ত হয়ে ওঠে চরিত্রের মাধ্যমে। চরিত্রের প্রথম গুণ উল্লেখ করতে গিয়ে এয়ারিস্টটল বলেছেন: ‘First and most important, it must be good, for any speech or action that manifests moral purpose of any kind will be expressive of character.’^৮ নাট্যকার দুটি চরিত্রের গোপনীয়তা বজায় রেখে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। প্রকৃত পরিচয় ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হয়। অনেক সময় নাটকের শেষদিকে কোনো চরিত্রের দীর্ঘবক্তৃতার মধ্য দিয়ে রহস্য উন্মোচিত এবং প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হয়। যেখানে নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দর্শকের কাছে সব রহস্য উদ্ঘাটিত হয় সেখানেই নাট্যকারের প্রকৃত শিল্পচাতুর্য প্রকাশ পায়।

জীবন কখনো হাসিতে মধুর আবার কখনো বা কান্নায় গভীর। নাটকে জীবনের একটি রূপকে বেছে নিতে হয়। সেই বিশেষ রূপ অনুযায়ী নাটকের ঘটনা, চরিত্র সব একটি সুস্পষ্ট শিল্পরীতি ও শিল্পপরিণতি লাভ করে। নাটকে মিলনান্তক পরিণতি দেখাতে গেলে তার ঘটনাসংঘটিত চরিত্রপ্রকৃতি, সংঘাতসৃষ্টি ও ভাষারূপ যেমন হবে বিয়োগান্তক পরিণতির ক্ষেত্রে তা হবে না। নাটকের চরিত্র ও দর্শকের মধ্যে যখন একাত্মতা হয় তখনই ব্যক্তিগত অনুভূতি এক বিশ্বজনীন আনন্দানুভূতিতে পরিণত হয়। এই বক্তব্য কেবলমাত্র আধুনিক নাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে আলঙ্কারিকদের মতানুসারে বিরচিত সংস্কৃত নাটকেও এই লক্ষণের প্রভাব মেলে।

মুদ্রারাক্ষস নাটকটি নাট্যগুণোৎকর্ষে দর্শকসাধারণের কাছে যতই উপভোগ্য বলে মনে হোক না কেন রাজনীতি ও কূটনীতির গহন তত্ত্বনির্ভর বুদ্ধিদীপ্ত এ নাটক সর্বসাধারণের জন্য নয়। তদানীন্তন সমাজের শাস্ত্রজ্ঞ প্রতিভূস্বরূপ কাব্যবিশেষবেত্তা দর্শকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যেই এ নাটক রচিত হয়েছিল। এ যুগের সীমিত সহৃদয় নাট্যরসবেত্তার কাছে এ নাটকের অবদান অনস্বীকার্য। প্রধান প্রধান চরিত্রচিত্রণেই বিশাখদত্তের সৃষ্টিশীলতা ব্যয়িত হয়নি, তাঁর সৃষ্ট গৌণ চরিত্রগুলোর আলেখ্যও কোনো অংশে কম আকর্ষণীয় নয়। নাটকের প্রতিটি চরিত্রের স্বকীয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি আরেকটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। যুগ্ম চরিত্র নির্মাণে পরস্পরের তারতম্যের নিরিখে উভয় চরিত্রেরই স্বীয় বৈশিষ্ট্য সুপ্রকট হয়েছে। চাণক্য এবং রাক্ষস, চন্দ্রগুপ্ত এবং মলয়কেতু এমনই দুটো যুগ্ম চরিত্র।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের অমাত্য চাণক্য এবং নন্দরাজ ও মলয়কেতুর অমাত্য রাক্ষস এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত মুদ্রারাক্ষস নাটকের উপজীব্য বস্তু। এই দুই রাজনীতিবিদের কূটনৈতিক চালে ঘটনাপ্রবাহ টানটান উত্তেজনার মধ্যে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। অবশেষে নন্দবংশের একান্ত অনুগত মন্ত্রী রাক্ষস তীক্ষ্ণধী পুরস্কার চাণক্যের বুদ্ধির কাছে পরাজিত হয়ে নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন। রাক্ষসের নামাঙ্কিত মুদ্রা কৌশলে হস্তগত করে চাণক্য রাক্ষসকে বশীভূত করে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করেছেন— এই হলো নাটকের মূল উপজীব্য।

প্রধান চরিত্রসমূহ (Principal Characters)

চন্দ্রগুপ্ত	: মগধের নতুন অধিপতি।
চাণক্য	: নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত পুরস্কার রাজনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, চন্দ্রগুপ্তের আচার্য এবং প্রধানমন্ত্রী [বিষ্ণুগুপ্ত, কৌটিল্য প্রভৃতি নামেও অভিহিত।]

রাক্ষস	: নন্দরাজবংশের একান্ত অনুগত ব্রাহ্মণ অমাত্য।
মলয়কেতু	: পার্বত্যরাজ পর্বতকের পুত্র।
চন্দনদাস,	: বণিক, রাক্ষসের অন্তরঙ্গ বন্ধু।
শকটদাস	: রাজকর্মচারী, রাক্ষসের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

মূলত নাটকে কাহিনির পরেই দ্বিতীয় স্থান চরিত্রচিত্রণের। পাত্রপাত্রীর চরিত্র্যই হচ্ছে চরিত্রচিত্রণের মূল কথা। কোনো ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ প্রদর্শন করে তার নৈতিক প্রয়োজন ব্যক্ত করাই চরিত্রবর্ণন। এই চরিত্রে ব্যক্তির নৈতিক গুণ-দোষের অব্যক্তি প্রকাশ পায়। মুদ্রারাক্ষসের ঘটনাপ্রবাহে বহুসংখ্যক চরিত্র এসেছে। এই নাটকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে নাটকটি মুখ্য স্ত্রীচরিত্রবর্জিত।

মুখ্যরূপে চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য, রাক্ষস ও মলয়কেতুর চরিত্রচিত্রণ করা হয়েছে। অন্যান্য পাত্র গৌণ। প্রত্যেক পাত্রই আপন দোষগুণে পূর্ণ, প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে দোষগুণের মিশ্রণ। ছোট ছোট পাত্রও দোষগুণের আধার। প্রত্যেক পাত্রই ব্যক্তিতে স্বতন্ত্র। এখানে বিশেষত্ব এই যে সব পাত্রই তুলনাত্মক ভঙ্গিতে চিত্রিত হয়েছে। এসব পাত্র কল্পিত হয়েও কৃত্রিম রূপে প্রতীত হয়নি। চাণক্য এক স্থিরচিত্ত, জাগরুক, কঠোর এবং নীতিনিপুণ। অন্যদিকে রাক্ষস অস্থিরচিত্ত, বিস্মৃতিপরায়ণ, সজ্জন এবং শেষে মাথা নত করেছেন। এভাবেই চন্দ্রগুপ্ত এবং মলয়কেতু, ভাণ্ডারায়ণ এবং সিদ্ধার্থক, নিপুণক এবং বিরোধগুপ্ত, বৈহিনরি এবং জাজলি প্রভৃতির মধ্যে বৈপরীত সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

চরিত্রগুলো সম্পর্কে M.R. Kale এর মন্তব্য থেকেই এদের পারস্পরিক গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়-“Of the characters represented in the play, Chānakya and Chandragupta are real historical personages. Rakshasa, too, must be so, For such an important character in the play could not have been a creation of the poet’s fancy. Again, had it been a fictitious name, the poet could not have chosen such a reprehensible name as Rakshasa, Malayaketu may also be a historical person.”^৭

চাণক্য

নাটকে সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি চাণক্যে আকৃষ্ট হয়। তিনি কোনো রাজবংশসম্বৃত নন, তাঁর মেধাবলে তিনি সমগ্রনাটকে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি অভিমাত্রী, কপটপ্রবীণ, ক্রোধী, আত্মপ্রশংসা কারক। বিশাখদত্তের সর্বোত্তম সৃষ্টি চাণক্যচরিত্র মুদ্রারাক্ষস নাটকের মধ্যমণি। চণক ঋষির পুত্র চাণক্য। তাঁর নিজ নাম বিষুগুপ্ত। কুটিল নীতির জন্য কৌটিল্য, কুটলগোত্রসম্বৃত বলেও কৌটিল্য নামে পরিচিত ছিলেন।^৮ কামসূত্রপ্রণেতা বাৎস্যায়নের সমগোত্রীয় বলেও অনেকে মন্তব্য করেছেন। তিনি ছিলেন বেদজ্ঞ এবং অথর্ববেদোক্ত যাগযজ্ঞ এবং রহস্যবিদ্যায় পারদর্শী। তিনি ছিলেন রাজনীতিতে অভিজ্ঞ। কামন্দকীয় নীতিসারপ্রণেতা কামন্দক তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভে চাণক্যের উদ্দেশে প্রণতি জানিয়ে বলেছেন-

“নীতিশাস্ত্রামৃতং ধীমানর্থশাস্ত্রমহোদধেঃ।

সমুদধে নমস্তস্মৈ রিষুগুপ্তায় বেধসে ॥”^৯

অর্থাৎ: যিনি ধীশক্তি-সম্পন্ন হয়ে অর্থশাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্র থেকে নীতিশাস্ত্ররূপ অমৃত উদ্ধৃত করেছিলেন, আমি সেই বিধাতার তুল্য অতুলশক্তিশালী সুধিবর বিষুগুপ্তকে (চাণক্যকে) নমস্কার করি।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজ্যশাসনের সুবিধার্থে তিনি রাজনীতিশাস্ত্রের সংক্ষিপ্তসারস্বরূপ একটি গ্রন্থের রচয়িতা বলে চাণক্যের নাম উল্লেখ করেছেন আচার্য দণ্ডী।^৮

বিষ্ণুগুপ্ত তথা চাণক্য সম্পর্কে কালে মহোদয় যথার্থই মন্তব্য করেছেন-

Chanakya is represented as a clear sighted statesman of sound judgement, never erring in his estimate of men or selection of proper agents. He is firm of resolve and cool-headed and resourceful even under trying circumstances. By his foresight he not only frustrated the plans of his enemies, but by his wisdom and vigilance turned them to his own advantage.^৯

চাণক্য রয়েছেন নাটকের কেন্দ্রস্থলে। নিজস্বার্থের জন্য তিনি কোনো কিছুই করেননি; লোককল্যাণে যুক্ত থেকে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলক্ষ্মীকে স্বৈর্যপ্রদানে ইচ্ছুক ছিলেন। লোকহিতের ভাবনায় প্রেরিত হয়ে ছল ও ছদ্ম কার্য করেছেন। আবার আবশ্যিক হলে কাউকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেননি। বিশাখদত্তবিরচিত মুদ্রারাক্ষসে চাণক্য নীতিশাস্ত্রে নিপুণ এবং নিজ কাজে সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক গতিবিধির দিকনির্দেশনায় সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন। মুদ্রারাক্ষসে তিনটি অঙ্কে আমরা চাণক্যকে রঙ্গমঞ্চে দেখি। প্রথম অঙ্কে প্রস্তাবনার পর রঙ্গমঞ্চে এসে স্বপ্রতিপক্ষদের বেছে নিয়ে-‘আমি জীবিত থাকালীন কে চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করতে চায়?’ বলে আঞ্চালন করেন। প্রথম অঙ্কে রাজনীতির পরিচয় দিতে দিতে বলেন, সবাই তাঁকে পরিত্যাগ করলেও তিনি একাই সকল কিছু সম্পাদনে সক্ষম। তাঁর মুখে তাই শোনা যায়-

“একা কেবলমেব সাধনবিধৌ সেনাশতেভ্যো”ধিকা
নন্দোন্মুলনদৃষ্টবীর্যমহিমা বুদ্ধিস্ত মা গান্ধাম।”^{১০}

অর্থাৎ: কার্যসম্পাদনবিষয়ে শত শত সৈন্য অপেক্ষাও যার ক্ষমতা অধিক এবং নন্দবংশধ্বংস করায় যার শক্তিমাহাত্ম্য লোকে প্রত্যক্ষ করেছে, একমাত্র আমার সেই বুদ্ধি যেন কেবল না যায়।

দ্বিতীয় অঙ্কে বিরোধগুপ্ত রাক্ষসের পরিকল্পনায় অসাফল্যের কারণ বর্ণনায় চাণক্যের কথা এনেছেন, ক্ষণিকের জন্যও মানসলোক থেকে চাণক্য সরে যাননি। তাই বলা হয়েছে-

“কৌটিল্যধীরজ্জুনিবদ্ধমূর্তির্মন্যে স্থিরাং মৌর্যনৃপস্য লক্ষ্মীম।
উপায়হস্তৈরপি রাক্ষসেন নিকৃষ্যমাণামিব লক্ষ্যামি ॥”^{১১}

অর্থাৎ: চন্দ্রগুপ্তবংশের রাজলক্ষ্মী, চাণক্যের বুদ্ধি-রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হয়েছে, সুতরাং ওকে নিশ্চলা বলে মনে করছি। আবার রাক্ষসও সামদানাদি উপায়রূপ হাত দিয়ে ওকে আকর্ষণ করছে বলে ধারণা করছি।

রাক্ষসকে বিভ্রান্ত করার জন্যই তৃতীয় অঙ্কে কৃত্রিম কলহের আয়োজন করা হয়েছে। চাণক্যর মুখে তাই শোনা যায়-

“মড়ুতৈঃ কিল সেছপি পর্বতসুতো ব্যাণ্ডঃ প্রবিষ্টান্তরৈ
রদ্যুজাঃ স্বনিয়োগসাধনবিধৌ সিদ্ধার্থকাদ্যাঃ স্পশাঃ।
কৃত্বা সম্প্রতি কৈতবেন কলহং মৌর্যেন্দুনা রাক্ষসং
ভেৎস্যামি স্বমতেন ভেদকুশলং হ্যেষ প্রতীপং দ্বিষাঃ॥”^{১২}

অর্থাৎ: আমার অনুচরগণ বিপক্ষের হৃদয় অধিকার করে মলয়কেতুকে বেঁধে রাখে এবং সিদ্ধার্থক প্রভৃতি গুপ্তচরগণ আমার আদেশ সম্পাদনে সর্বদা উদ্যত আছে। অতএব ভেদনিপুণ আমি এখন ছলপূর্বক চন্দ্রগুপ্তের সাথে কলহ করে, নিজবুদ্ধি দ্বারা প্রতিকূল রাক্ষসকে শত্রু মলয়কেতু হতে পৃথক করব।

অন্তিমে সপ্তম অঙ্কে আমরা চাণক্যের রাজনৈতিক উৎকর্ষের পরিচয় পাই। যেখানে রাক্ষস আত্মসমর্পণ করে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অঙ্কেও চাণক্যের মন্ত্রণায় প্রেরিত বিভিন্ন পাত্র নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে। চাণক্যের ভিতরে কার্যসম্পাদনে প্রভূত শক্তি ছিলো। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কূটনীতিবিশারদ এবং মহান রাজনীতিক ছিলেন। চাণক্যের রাজনৈতিক সফলতায় রহস্য ছিলো। পুরুষার্থে তাঁর ছিল দৃঢ়বিশ্বাস। ভাগ্যে মূর্খেরা বিশ্বাস করে বলে তিনি মনে করেন। তাই চাণক্যের উক্তি ‘দৈবমবিদ্বাংসঃ প্রমাণয়ন্তি।’^{১৩} নিজ কর্তব্যকে তিনি কার্যসিদ্ধির লক্ষ্য বলে মনে করতেন। তাই মৌর্যসাম্রাজ্যের অমাত্যপদ স্বীকার করেন। চাণক্যের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত নন্দসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মৌর্যসাম্রাজ্যের অমাত্যপদে অধিষ্ঠিত হয়েও রাজকীয়বিলাসের থেকে দূরে নগরের মধ্যে একটি ছোট কুটীরে বাস করতেন। তাঁর কুটীরের বর্ণনায় কপ্পুকী বলেছেন-

“উপলশকলমেতদ্রেদকং গোময়ানাং
বটুভিরূপহৃতানাং বর্হিষাং স্তূপমেতৎ।
শরণমপি সমিদ্ভিঃ শুষ্যমাণাভিরাভি
বিনমিতপটলাস্তং দৃশ্যতে জীর্ণকুড়ম্ ॥”^{১৪}

অর্থাৎ: গোময় চূর্ণ করার জন্য এই প্রস্তরখণ্ড রয়েছে এবং ব্রাক্ষণবালকগণের আনা এই কুশরাশি রয়েছে; আর এই যে ঘরটা দেখছি, এর চালের প্রান্তভাগ গুরু সমিধের ভারে অবনত হয়ে পড়েছে এবং এর দেয়ালও জীর্ণ হয়ে গেছে।

যখন চাণক্যের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে কিংবা তাঁর কোনো পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হয় না তখন তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন। চাণক্যের ক্রোধের গভীরবর্ণনা তার স্বভাবের পরিচায়ক-

“শিখাং মোজুং বদ্ধামপি পুনরয়ং ধাবতি করঃ
প্রতিজ্ঞারোহণং পুনরপি চলতোষ চরণঃ।
প্রণাশানন্দানাং প্রশমমুপযাতং তুমধুনা
পরীতঃ কালেন জ্বলয়সি মম ক্রোধদহনম্ ॥”^{১৫}

অর্থাৎ: শিখাটাকে বেঁধে থাকলেও আবার এই হাত সে শিখাকে খুলে দিবার জন্য ধাবিত হচ্ছে। এই চরণ আবারও প্রতিজ্ঞারোহন করার জন্য চলছে। কারণ নন্দবংশের ধ্বংসবশতঃ আমার ক্রোধানল নির্বাপিত হয়েছিল; কিন্তু তুমি কালধর্মে বেষ্টিত হয়ে আবার তা জ্বালিয়ে তুলেছ।

চাণক্য আলোচিত নাটকে আত্মবিশ্বাসের এক মূর্তি ছিলেন। সকল পরিকল্পনা তিনি একাই নিয়েছেন। তাঁর সর্বত্র জয়লাভের পশ্চাতের রয়েছে এই একনায়কতন্ত্রী মনোবৃত্তি।

চাণক্য প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধের অবতার ছিলেন। সম্পূর্ণ ঘটনাচক্রের নিয়ন্ত্রা ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের এবং মৌর্যসাম্রাজ্যের উন্নতির জন্য তিনি সবকিছুই করেছেন। বৈরী আচরণকারী রাক্ষসকেও তিনি তাঁর আদর্শের জন্য বিশ্বাস করেছেন। নাটকের সমাপ্তিকালে রাক্ষসও চাণক্যকে দেখে তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন-

“আকরঃ সর্বশাস্ত্রাণাং রত্নানামিব সাগরঃ ।

গুণৈর্ন পরিতুষ্যামো যস্য মৎসরিণো বয়ম্ ॥”^{১৬}

অর্থাৎ: সাগর যেমন রত্নরাশির আকর, ইনি তেমনি সর্বশাস্ত্রের আকর। বিদেষ-বশে এ’র এতো গুণেও কিন্তু আমরা তুষ্ট নই।

চাণক্যের প্রকৃত নাম বিষ্ণুগুপ্ত। চাণক্য স্পষ্টভাষী, আত্মবিশ্বাসী, কূটনীতিজ্ঞ, ষড়যন্ত্রসম্পাদক, কঠোররাজনীতিজ্ঞ, নিজের কূটনৈতিক ইচ্ছার পূরণ সর্বাঙ্গিকভাবে দৃঢ়নিশ্চয় সহকারে পূরণকারী। কূটনীতির পরিকল্পনায় শেষ পর্যন্ত নির্বাহক রূপেই চিত্রিত হয়েছেন। ইতিহাসের চাণক্য কুটিল, প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্রোধী ব্রাহ্মণরূপে চিত্রিত। বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, প্রখর ব্যক্তিত্ব, নীতিপারঙ্গমতা প্রভৃতি গুণের আরোপ করে নাট্যকার চরিত্রটিকে স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন। তাঁর অসামান্য দীপ্ত ব্যক্তিত্বের প্রভাব অন্য চরিত্রগুলো স্তান হয়ে উঠেছে।

চাণক্য সদাসতর্ক এক রাজনীতিবিদ। কূটনীতির নিপুণ প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত। অসির পরিবর্তে মেধার প্রয়োগেই তিনি আত্মশীল। শত্রুপক্ষের সকল প্রচেষ্টাকে তিনি বুদ্ধিবলেই সমূলে বিনাশ করেছেন। তাঁর কার্যপ্রণালির গতিধারা দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির পক্ষে অনুধাবন করা অসম্ভব। চন্দ্রগুপ্তও তাঁর বুদ্ধিবৈভবে স্তম্ভিত। অমাত্য রাক্ষসের পক্ষেও চাণক্যচরিত্র বোঝা সম্ভব নয়। ষষ্ঠ অঙ্কে চণ্ডালবেশধারী রাজপুরুষ সিদ্ধার্থকের মন্তব্য থেকেও তা সহজেই অনুমিত হয়: “অমচ্চরকথসেণ বি অণবগাহিঅপুব্বং অজ্জচাণক্কচরিতং অবগাহিদুং ইচ্ছসি (অমাত্যরাক্ষসেনাপি অনবগাহিতপূর্বমার্যচাণক্যচরিত্রমবগাহিতুমিচ্ছসি)”^{১৭} তাঁর প্রতিটি চেষ্টা ও কাজে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকে। স্বপ্নেও তিনি বৃথা চেষ্টা করেন না-“ন প্রয়োজনমন্তরা চাণক্যঃ স্বপ্নে’পি চেষ্টতে।”^{১৮} কেবলমাত্র বুদ্ধিবলেই তিনি শত্রুসৈন্যকে পরাজিত করেছেন। সপ্তম অঙ্কে চন্দ্রগুপ্ত তাই স্বগতোক্তি করেছেন-“বিনৈব যুদ্ধাদার্যেণ জিতং দুর্জয়ং পরবলমিতি লজ্জিত এবাস্মি।”^{১৯}

গুপ্তচর নিয়োগের ক্ষেত্রেও অসামান্য তাঁর পারদর্শিতা। উপযুক্ত পরীক্ষা না করে চর নিয়োগে তিনি অসম্মত। তাঁর নিযুক্ত চরেরা পরস্পর জানতেও পারে না যে তাঁরা একই নিয়োগকর্তার উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত। ভাণ্ডারায়ণ, সিদ্ধার্থক, সমিদ্ধার্থক প্রত্যেকেই চাণক্যের নিযুক্ত গুপ্তচর। কোন শত্রুকে মিত্র করবেন তা কেবল তাঁরই জানা ছিলো। বৈরোচকের অভিষেক এবং শোভাযাত্রা, চাণক্যের উদ্ভাবনশীলতার এক অনুপম নিদর্শন। অর্থাৎ শত্রুর দুর্বলতাগুলো তাঁর নখদর্পণে অথচ তাঁর কার্যক্রম অপরের কাছে অজ্ঞাত। ‘নাস্য গুহ্যং পরে বিদ্যুঃ ছিদ্রং বিদ্যাং পরস্য চ’ এই নীতিতে চাণক্য ছিলেন বিশ্বাসী। শত্রুর ছিদ্রান্বেষণে তাঁর দৃষ্টি সদাজাগরক। রাক্ষসের সব কৌশল তার সদাজাগ্রত দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। জাগতিক ক্ষমতা বা ঐশ্বর্য তার কাম্য নয়। অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মগধের সিংহাসনে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তকে আরোহণ করিয়েছেন তিনি। এখন সে সিংহাসন কণ্টকশূন্য করাই তাঁর অভিপ্রায়। বুদ্ধির বলে রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাই চাণক্যের মুখে উচ্চারিত হয়েছে।

“স্বাচ্ছন্দমেকচরমুজ্জ্বলদানশক্তিমুৎসেকিনা মদবলেন বিগাহমানম্ ।

বুদ্ধ্যা নিগৃহ্য বৃষলস্য কৃতে ক্রিয়ায়া মারণ্যকং গজমিব প্রগুণী করোমি ॥ ”^{২০}

অর্থাৎ: প্রধানভাবে বিচরণকারী, উৎকৃষ্টদানশক্তিশালী এবং উদ্রিক্ত-মদ-গর্ব-বশতঃ ইচ্ছানুসারে সঞ্চরী তোমাকে, বন্য হস্তীর ন্যায়, চন্দ্রগুপ্তের জন্য, বুদ্ধিবলে আয়ত্ত করে, তাঁরই কার্যে অচিরকাল মধ্যে অনুকূল করছি।

পরিশেষে বলা যায় নীতিশাস্ত্রে পারদর্শিতা, বুদ্ধির উৎকর্ষে, পুরুষকারে সীমাহীন আস্থায়, বিভবে নির্লোভ, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও পুরুষকারের বিমূর্ত প্রতীক এই মানুষটি বিশাখদত্তের অনন্য সৃষ্টি। এম.আর. কালে মহোদয় তাই যথার্থই বলেছেন—

“The following traits of his character are well brought out in the play. (1) He is self-confident, (2) He is a kind-hearted preceptor. He is a harsh but generous master, else his servants could not have loved him so well (3) His magnanimity is exceptional. (4) He is always ready to praise his enemies for their noble qualities (5) the simplicity of his life and his utter disregard of earthly grandeur do ample credit to him as the scion of a saintly family (6) His mastery over his mind. Even the cleverest of his servants were not able properly to gauge his mind or to comprehend his policy.”^{২১}

অন্তে নাট্যকার চাণক্যকে নন্দসাম্রাজ্যের সংহারক তথা মৌর্যসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাপকরূপে চিত্রিত করেছেন। তিনি চাণক্যের চরিত্রের যে চিত্রণ করেছেন তা অনবদ্য।

রাক্ষস

নাটকের অন্য প্রধান চরিত্র অর্থাৎ চাণক্যের প্রতিপক্ষরূপে রাক্ষসকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোনো কোনো পণ্ডিত রাক্ষসকেই এই নাটকের নায়ক মনে করেন। তাঁদের মতানুসারে নাটকের নামকরণ তাঁর নামানুসারেই করা হয়েছে। মুদ্রা জিতঃ রাক্ষসঃ যস্মিন্ ইতি মুদ্রারাক্ষসঃ তমধিকৃত্য কৃতং নাটকম্ ইতি মুদ্রারাক্ষস।’ এই নাটকে রাক্ষসও চাণক্যতুল্য উচ্চাদর্শের পোষক ছিলেন। কখনো কখনো সদৃশ্যে তিনি চাণক্যকেও পরাজিত করেছেন। নাট্যকার রাক্ষস চরিত্রে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ভাবের যথার্থ চিত্রণ করেছেন। প্রথম ও তৃতীয় অঙ্ক ছাড়া নাটকের সর্বত্রই রাক্ষসকে রঙ্গমঞ্চে দেখা যায়। দ্বিতীয় অঙ্কে রাজনৈতিক ভূমিকায় রাক্ষসের চরিত্র সুপরিষ্কৃত। তিনি ব্রাহ্মণবংশের ভূষণ, নন্দবংশের মুখ্য অমাত্য ছিলেন। নন্দবংশের সাম্রাজ্যের সঞ্চালকও ছিলেন তিনি। নন্দবংশের প্রতি অনন্যপ্রভুভক্তি ছিল তাঁর সঞ্চালক শক্তি। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হলেও কূটনীতির যুদ্ধে তিনি সার্থক ছিলেন না। তিনি সকলকে বিশ্বাস করতেন। একারণে, তাঁর সমস্ত নীতি ব্যর্থ হতো। তাঁর সরলতার সুযোগে শত্রুর গুণ্ডচরেরা সহজেই তাঁকে ব্যর্থ করে দিত।

চাণক্যের কুটিলতার পরিধি যে কত ব্যাপক হতে পারে তা সরলমতি রাক্ষসের বুদ্ধিতে কুলায় না। নিজের স্বরূপও তিনি প্রচ্ছন্ন রাখতে অক্ষম। কখনো বা নিজের অনবধানতায় প্রকাশ্যে গুণ্ডচরকে প্রকৃত নামে ডেকে ফেলেন। তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রভুভক্তি। তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ও আয়োজন নন্দবংশধরকে পুনরায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করার অভিলাষে। মলয়কেতুর দাসত্ব স্বীকার করে শত্রুবধের মাধ্যমে স্বর্গত প্রভুকে সম্ভট করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাই তিনি বলেছেন: “দেবঃ স্বর্গগতো’পি শাশ্রববধেনারাধিতঃ স্যাদিতি।”^{২২}

রাক্ষস কূটনীতিতে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। মেধাবী এবং শাস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ রাক্ষসের সৈন্যসঞ্চালনযোগ্যতাও ছিল। এই নাটকে রাক্ষস আদর্শমিত্ররূপে চিত্রিত হয়েছেন। নিজ বন্ধুর প্রাণরক্ষার্থে নিজ প্রাণের মোহও তিনি করেননি। তাঁর মৈত্রীভাবনা অনুকরণযোগ্য। সত্যিই তিনি একজন সৎমিত্র। রাক্ষসের মৈত্রীভাবনার যে চিত্র নাট্যকার চিত্রিত করেছেন তা ভারতীয় সংস্কৃতিতে এক অপূর্ব নিদর্শন।

রাক্ষস চরিত্রের লক্ষণীয় দিক তাঁর কুসংস্কার। বাম চোখের স্পন্দন তাঁর কাছে অশুভলক্ষণ ^{২৩} শুভ কাজের শুরুতে সাপ দেখার কথায় তিনি আঁতকে ওঠেন, সন্ন্যাসীর অসংস্কৃত রূপ তাঁর কাছে অশুভ লক্ষণ। তাই রাক্ষস বীভৎস রূপ পরিত্যাগ করে ক্ষপণককে দেখা করতে বলেছেন।^{২৪} এম অঙ্কে চণ্ডালের স্পর্শে কলুষিত বলে তিনি

নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন।^{২৫} বন্ধুর আসন্ন বধের খবর শুনে তিনি বধ্যভূমিতে ছুটে গিয়েছেন বন্ধুর মুক্তিপণ রূপে নিজেকে সমর্পণ করতে। বন্ধুর মুক্তির স্বার্থে মান অপমান ভুলে শত্রুর হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। তিনি বলেছেন-

“ঔদাসীন্যং ন যুক্তং প্রিয়সুহৃদি গতে মৎকৃতে চাতিঘোরাং।

ব্যাপত্তিং জ্ঞাতমস্য স্বতনুমহিমমাং নিষ্ক্রয়ং কল্পয়ামি ॥”^{২৬}

অর্থাৎ: আমারই জন্য প্রিয়বন্ধুর এই চরম সংকট, ঔদাসীন্য আমার সাজেনা। এখন বুঝেছি, আমি আমার শরীরকে চন্দনদাসের পরিবর্তে সমর্পণ করব।

চন্দ্রগুপ্তের উপর বিতৃষ্ণা হলেও চাণক্যের নীতির জয়কে তিনি নির্দিধায় অভিনন্দন জানিয়েছেন-“সাপু কৌটিল্য সাধু।” দীর্ঘদিন মলয়কেতুর আশ্রয়ে ছিলেন তিনি। তাই চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্বগ্রহণের অব্যবহিত পরে তিনি মলয়কেতুর মুক্তি প্রার্থনা করেছেন-“রাজন্ চন্দ্রগুপ্ত বিদিতমেব তে যথা বয়ং মলয়কেতৌ কিঞ্চিৎ কালমুযিতান্তং পরিরক্ষ্যন্তামস্য প্রাণাঃ”^{২৭} -এই উক্তি রাক্ষসের কৃতজ্ঞতা এবং মহানুভবতার নিদর্শন।

চাণক্যের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চিত্রিত এই চরিত্রটির সংবেদনশীলতা চরিত্রটিকে মাধুর্যে মণ্ডিত করেছে। কুটিল রাজনীতির আবর্তের মধ্যে রাক্ষস হলেন দোষেগুণে ভরপুর এক রক্তমাংসের মানুষ। তাঁর মধ্যে রয়েছে ঔদার্য, বিনয়, প্রভুভক্তি, দৈবনির্ভরতা, কোমলতা, কঠোরতা ও বন্ধুবাৎসল্য।

রাক্ষস ও চাণক্য এই দুই চরিত্রচিত্রণে নাট্যকারের দক্ষতা সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য তাই যথার্থ রূপেই প্রতিভাত হয়-

Another forte of Viśākhadatta is the consummate skill with which he has delineated the various characters in the play. Like all high ranking literary artists, Viśākhadatta was thoroughly aware of the importance of the principle of contrast in this aspect of the art of composing a play (cf. Venīsamhāra Śakuntalā). Thus there are ministers, the astute, resolute, impulsive, irascible but ever vigilant, ever resourceful Cānakya who is to be contrasted with Rāksasa, prime minister of the Nandas, given to anxious meditation, finding fault with fate, occasionally blundering, not careful enough in the choice of men, devoted to the master no doubt, but having an a dravya like Malayaketu to depend on and therefore failing in his object of ousting Candragupta from the throne.^{২৮}

চন্দ্রগুপ্ত

নাট্যকার বিশাখদত্ত ইতিহাসখ্যাত প্রবল পরাক্রান্ত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত করেছেন। চাণক্যের প্রতি তাঁর অপার ভক্তি এবং অগাধ বিশ্বাস, সার্বভৌম নৃপতি হয়েও তিনি চাণক্যের আজ্ঞাবহ। চাণক্যের পরামর্শব্যতীত কোনো কাজই তিনি শুরু করেন না। তিনি সচিবায়ত্ত সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি, চাণক্যের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। চাণক্যের সঙ্গে কৃত্রিম কলহে লিপ্ত হয়ে কিছুদিন স্বতন্ত্রভাবে রাজ্যশাসনের প্রস্তাবে তাই তিনি প্রথমে সম্মত হননি: “অন্যচ্চ কৃতককলহং কৃত্বা স্বতন্ত্রেণ কিঞ্চিৎ কালান্তরং ব্যবহর্তব্যমিত্যার্যাদেশঃ। স চ

কথমপি ময়া পাতকমিবাভ্যুপগতঃ।”^{২৯} এরই ফলে তিনি শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। কপট কলহের শেষে তাঁর স্বগতোক্তি-

“আর্যাজ্ঞয়েব মম লঙ্ঘিতগৌরবস্য
বুদ্ধিঃ প্রবেষ্টুমিব ভূবিবরং প্রবৃত্তা।
যে সত্যমেব হি গুরুনতিপাতয়ন্তি
তেষাং কথং নু হৃদয়ং ন ভিনন্তি লজ্জা।”^{৩০}

অর্থাৎ: আর্য চাণক্যের আশেই তাঁর গৌরব লঙ্ঘন করেছে। তথাপি আমার বুদ্ধি যেন ভূমির গর্তে প্রবেশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। আর যারা সত্যই গুরুজনদের অতিক্রম করে, অবমাননা করে লজ্জা তাদের হৃদয় কেন বিদীর্ণ করেনা।

চন্দ্রগুপ্ত বিনয়ের পরিচায়ক। সর্বত্র তিনি গুরুভক্ত শিষ্যরূপেই প্রতিভাত হয়েছেন। চাণক্যের প্রতি তিনি ছিলেন অতিরিক্ত নির্ভরশীল। রাজ্যের প্রতি তাঁর প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হওয়া, গ্রহণবর্তী তো দূরে থাক পর্বতকের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে তিনি চাণক্যের অনুমতি প্রার্থনায় আগ্রহী। নাটকে তাঁর চরিত্রের স্বতন্ত্রবিকাশ কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। তাঁর মধ্যে এর ন্যূনতম অনুভূতিও পরিলক্ষিত হয়নি। কৃত্রিম কলহের ব্যাপারেও গুরুর প্রতি করা আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেই তিনি উপরোক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ করেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত নিখিল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। তাঁর আজ্ঞা সকল রাজারই শিরোধার্য “মৌর্যস্তেজসি সর্বভূতলভুজামাজ্ঞাপকো বর্ততে”^{৩১} রাক্ষসের এই উক্তিভেদেই তার পরিচয় মেলে। চন্দ্রগুপ্ত জানেন, চাণক্য সকল কিছুরই মূলে। তাঁর সিংহাসনপ্রাপ্তি এবং রাজ্যের সমৃদ্ধির মূলে আছে চাণক্যের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দূরদর্শিতা। গুরুবাক্য তাঁর কাছে বেদবাক্য। রাজ্যেশ্বর হয়েও তিনি চাণক্যের অনুগত শিষ্য। সচিবায়ত্ত রাজ্য বলেই চন্দ্রগুপ্ত অনেকটা নিশ্চিত। চাণক্যের মত সুযোগ্য মন্ত্রীকে পেয়ে রাজ্যশাসনে তিনি উদাসীন। চন্দ্রগুপ্ত কেবলমাত্র চাণক্যের হাতের কাঠের পুতুল মাত্র। মৌর্যসম্রাটরূপে চাণক্যের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন- ‘চাণক্যমতিপরিগৃহীতং চন্দ্রগুপ্তমবলোক্য’। চন্দ্রগুপ্ত একজন বীর সম্রাট। তথাপি যুদ্ধ ছাড়াই, পৌরুষপ্রদর্শন না করেই চাণক্যের কূটনীতির কারণেই শত্রুদের পরাজয় হয়েছিল। ‘বিনৈব যুদ্ধার্থেণ পরাজিতং দুর্জয়ং রিপুকুলমিতি লঙ্ঘিত এবাস্মি’ স্বতন্ত্র শব্দটি অবশ্য তাঁর কাছে স্বৈরাচারিতা নয়। তিনি জানতেন যে তিনি নিদ্রিত থাকলেও আর্য চাণক্যের সদাজাগ্রত দৃষ্টি সর্বদা রাজকার্যে থাকবে। চন্দ্রগুপ্ত তাই বলেছেন-‘মমেব যস্য তন্ত্রে গুরবো জাগ্রতি কার্যজাগরুকাঃ’ নিসর্গসৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। শরতের সৌন্দর্য বর্ণনাকালে চন্দ্রগুপ্ত বলেছেন-

“শনৈঃ শ্যামীভূতাঃ সিতজলধরচ্ছেদপুলিনাঃ
সমস্তাদাকীর্ণাঃ কলবিরতিভিঃ সারসকুলৈঃ।
চিতাশ্চিত্রাকারৈর্নিশি বিকচনক্ষত্রকুমুদৈ-
র্নভস্তঃ স্যন্দন্তে সরিত ইব দীর্ঘা দশ দিশঃ ॥”^{৩২}

অর্থাৎ: দশটা দিকই ক্রমশঃ শান্ত হয়ে গেছে, শুভ্রবর্ণ মেঘখণ্ড সকল নদীর বালুকাময় চরের মতো দেখা যাচ্ছে। মধুর ও অস্পষ্ট রবকারী সারসপক্ষিগণ সর্বত্রই ব্যস্ত হয়েছে। রাত্রিতে কুমুদের ন্যায় নক্ষত্র সকল প্রকাশ পেয়ে যেন দশটা দিককেই ব্যস্ত করেছে এবং সে দিক গুলিকে সুদীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে। সুতরাং দশটা দিকই নদীর ন্যায় আকাশ হতে যেন গলে পড়ছে।

চন্দ্রগুপ্ত বিনয়ী, বীর, অতিগম্ভীর এবং প্রজাবৎসল ছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ধীরোদাত্তনায়কের সকল গুণ তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। চন্দ্রগুপ্তের ব্যক্তিত্ব উত্তরোত্তর বিকাশ পেয়েছে। তাই বলা হয়েছে-

“বাল এব হি লোকে স্মিন্‌সংভাবিতমহোদয়ঃ।

ক্রমেণারূঢ়বান্ রাজ্যং যুথৈশ্বর্যমিব দ্বিপঃ ॥”^{৩৩}

অর্থাৎ: এ সেই চন্দ্রগুপ্ত বাল্য দশাতেই যে জগতে তার ভাবী সমুন্নতির স্বাক্ষর রেখেছিল। হাতি যেমন কালে যুথপতি হয়, তেমনি ইনি ক্রমে রাজ-ঐশ্বর্য অধিকার করেছেন।

তঁার পরিচয় কোথাও মৌর্য, মৌর্যপুত্র, নন্দাশ্বয়, বৃষল ইত্যাদি। বংশপরিচয় ছাড়াই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলেই চন্দ্রগুপ্ত দর্শক ও পাঠকের কাছে সর্বদা জাগরুক। ধীরোদাত্ত নায়কের প্রভূত গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। সপ্তম অঙ্কে কিছুক্ষণের জন্য নাটকের সমাপ্তিকালে চন্দ্রগুপ্ত উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী অন্য দুই অঙ্কে তাঁর আবির্ভাব সামাজিক জনের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। প্রকৃতিপ্রেমী ছিলেন বলেই তৃতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে কৌমুদীমহোৎসবের জন্য রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন এবং বিভিন্ন দিকের সৌন্দর্যে আনন্দিত ও উৎফুল্ল হন। এই নাটকে তিনি যোগ্য, উৎসাহী, বিচারক্ষমতাসম্পন্ন শাসকরূপে চিত্রিত হয়েছেন। তিনি বিচারে দক্ষ এবং উৎসাহী শাসক ছিলেন। চাণক্যে ছিল তাঁর অবিচল বিশ্বাস। কিন্তু চাণক্য নাটকে প্রায় সর্বত্র চন্দ্রগুপ্তকে বৃষল সম্বোধনে সম্বোধিত করেছেন। বৃষল শব্দটি শূদ্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। চাণক্য বলেছেন-

“নন্দৈবির্যুক্তমনপেক্ষিতরাজরাজৈরধ্যাসিতং চ বৃষলেন বৃষেণ রাজ্ঞাম্।

সিংহাসনং সদৃশপার্শ্বিবসংগতং চ প্রীতিং পরাং প্রগুণয়ন্তি গুণা মমৈতে ॥”^{৩৪}

অর্থাৎ: রাজধর্মের লঙ্ঘনকারী নন্দবংশীয়রা সিংহাসন ত্যাগ করেছে। রাজশ্রেষ্ঠ চন্দ্রগুপ্ত তাতে আরোহণ করেছে; অতএব এই সিংহাসন উপযুক্ত রাজার সাথেই মিলিত হয়েছে। সুতরাং বিধাতার এই গুণগুলি আমার অত্যন্ত আনন্দ জন্মাচ্ছে।

এম. আর. কালে মহোদয় চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন: “Chandragupta is a very competent prince who has the good sense to put absolute confidence in the ability and diplomatic skill of his preceptor and entirely submits to his counsels.”^{৩৫} চন্দ্রগুপ্ত মন্ত্রাধিকারকে বলাধিকাররূপে অঙ্গীকার করেছেন। চাণক্যের প্রতি তাঁর অনন্যশ্রদ্ধাভক্তি এবং বিশ্বাস ছিলো। নাটকের শেষের দিকে রাক্ষসকে সচিব রূপে পেয়ে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। চাণক্যও চন্দ্রগুপ্তকে এ অবস্থায় পেয়ে নিশ্চিত বোধ করেছেন।

মলয়কেতু

নাট্যকার বিশাখদত্ত চাণক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যেমন অমাত্য রাক্ষসের সৃষ্টি করেছেন তেমনই মলয়কেতু চরিত্র চন্দ্রগুপ্তের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে চিত্রিত। পার্বত্যরাজ পর্বতকের পুত্র মলয়কেতু অপরিণতবুদ্ধি, তরলমতি ও অনভিজ্ঞ যুবক। রাজোচিত গুণবর্জিত এক রাজা। নন্দবংশের একান্ত অনুগত মন্ত্রী রাক্ষস নন্দরাজের পতনের পর প্রভুর রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বিজিগীষু বিবেচনায় একমাত্র মলয়কেতুকেই আশ্রয় করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের খামখেয়ালিপনা, সন্দেহবাতিক, হঠকারিতা ইত্যাদি দোষ নন্দবংশের অনুগত মন্ত্রী রাক্ষসের নজরে এসেছিল। মলয়কেতু একমাত্র রাজকুমার যিনি নন্দবংশের পরে রাক্ষসের সঙ্গে মিলিত হয়ে চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যচ্যুত করতে চেয়েছিলেন। চাণক্য বিষকন্যাপ্রয়োগে পর্বতকে নিহত করেছিলেন। রাক্ষস মলয়কেতু পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে এই চিন্তা করেই মলয়কেতুকে সম্মুখে এনেছিলেন। মলয়কেতু চাণক্যের বিরোধী রূপে প্রতিভাত হন।

মলয়কেতুকে সঙ্গে নিয়ে রাক্ষস দুটো সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। প্রথমত সমূলে নন্দবংশধ্বংসের প্রতিশোধগ্রহণ ও দ্বিতীয়ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে প্রতিস্থাপন। মলয়কেতু একজন বিজিগীষু নরপতি ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল প্রতিপক্ষ বিনাশে সর্বথা যুদ্ধই শ্রেয়-

“উভুঙ্গাস্তঙ্গকূলং শ্রুতমদসলিলাঃ প্রস্যান্দিসলিলং

শ্যামাঃ শ্যামোপকণ্ঠদ্রুমমতিমুখরাঃ কল্লোলমুখরম্।

শ্রোতঃস্বাতাবসীদন্তটমুরদশনৈরুৎসাদিততটাঃ

শোণং সিন্দূরশোণা মম গজপতয়োপাস্যন্ত শতশঃ ॥”^{৩৬}

অর্থাৎ: অতিউচ্চ মদজলশ্রাবী, কৃষ্ণবর্ণ, ভ্রমরদ্বারা শব্দায়মান বিশাল দন্ত দ্বারা তীরভঙ্গকারী এবং সিন্দূরলেপনে রক্তবর্ণ আমার শত শত হস্তিশ্রেষ্ঠ, উচ্চতীর, জলপ্রবাহশালী, তীরবর্তী তরুলতাদি দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ সন্নিহিতদেশ, মহাতরঙ্গ দ্বারা শব্দায়মান এবং শ্রোতের বেগে বিচ্ছিন্ন ও ভগ্নতীর শোণনদকে পান করবে।

মলয়কেতুর রাজনৈতিক জ্ঞান ছিলো শূন্য। বিবেকরহিত, পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা না করেই কার্যসম্পাদন করতেন। অসমীক্ষ্যকারী, হৃদয়ের গভীরতাহীন, অযোগ্য এবং অহঙ্কারী যুবক ছিলেন। নাট্যকার চতুর্থ এবং পঞ্চম অঙ্কে মলয়কেতুকে নিয়ে আসেন। একমাত্র রাক্ষস যে তাঁর হিতৈষী ছিলেন তাঁকেও তিনি নিজের বিপক্ষে মনে করতেন। সেরূপ ভাণ্ডারায়ণ, ক্ষপণক, সিদ্ধার্থক যারা তাঁর শত্রুপক্ষের ছিল তাদেরকেই তিনি নিজহিতৈষী মনে করতেন। সম্পূর্ণ নাটকে আমরা তাঁকে ভাণ্ডারায়ণের হাতের কাষ্ঠপুত্তলিকার মতো দেখেছি। চতুর্থ অঙ্কে শকটদাসের সঙ্গে রাক্ষস পূর্বের ঘটনাসমূহ তথা আগামী পরিকল্পনা সমূহের বিচার ও পরামর্শ করেছিলেন। সে সময়ে ভাণ্ডারায়ণকে সঙ্গে করে সেখানে উপস্থিত হন এবং অন্তরালে থেকে উভয়ের কথোপকথন শোনে।

তিনি স্বভাবে উদ্ধত, অশান্ত, বিবেকহীন, অবিমূষ্যকারী ছিলেন যদিও তিনি শক্তিশালী ছিলেন তথাপি রাজনীতিজ্ঞানশূন্য ছিলেন। তাঁর মূর্খতার কারণ এটিও ছিলো যে রাক্ষসের মতো নীতিজ্ঞ ব্যক্তির থেকে তিনি পৃথক হয়েছিলেন। শেষে চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে বন্দী করেন। চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে মলয়কেতুর চরিত্রের বিকাশ অবলোকন করে বোঝা যায় যে তিনি রাক্ষসের আশ্রয়ের অনুপযুক্ত ছিলেন। তিনি রাজপুরুষদের নিবেদনে সব দিক দিয়েই অক্ষম ছিলেন। রাক্ষসের গৃহে প্রবেশের মুখে আড়িপেতে সংলাপ শোনা, শিবির ত্যাগে ব্যস্ত ভাণ্ডারায়ণের চোখ চেপে ধরা ইত্যাদি আচরণ মলয়কেতুর শিশুসুলভ ছেলেমানুষীর পরিচয় বহন করে। সাধারণ সমস্যারও তিনি সমাধান করতে পারেন না। অপরের পরামর্শ নিতে তিনি সদা তৎপর। বৃথা আশ্ফালন তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শত্রুমিত্রের স্বরূপও তিনি অনুধাবনে অক্ষম। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে অচিরেই শত্রুজায়াদের শোকসাগরে নিমজ্জিত করবেন। এরপর পিতৃতর্পণ করবেন এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা।^{৩৭} অথবা পিতার কার্যভার গ্রহণের জন্য যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। তাঁর মুখে তাই শুনি-

“উদ্যচ্ছতা ধুরমকাপুরাণানুরূপাং

গন্তব্যমাজিনিধনে পিতুঃ পথা বা ॥”^{৩৮}

অর্থাৎ: আমি মহাপুরুষের যোগ্য কার্য ভারই বহন করছি। সুতরাং যুদ্ধবিহিত পিতার পথেই যাব।

কিন্তু প্রকৃত অর্থে কোনো কাজই তিনি পালনে সক্ষম হননি। শত্রুপক্ষের প্রকৃত শক্তি না জেনে তিনি কুসুমপুর অবরোধে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ছিল অবিমূষ্যকারিতার পরিচায়ক। তাঁর অপরিণামদর্শিতার কারণেই পাঁচজন নিরপরাধ রাজাকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। রাক্ষসকে তিরস্কার করতে গিয়ে তিনি সদর্পে আশ্ফালন করেছেন-

“বিষ্ণুগুপ্তং চ মৌর্যং চ সমমপ্যাগতো তুয়া ।

উন্মূলয়িতুমীশো*হং ত্রিবর্গমিব দুর্নয়ঃ ॥”^{৩৯}

অর্থাৎ: দুর্নীতি একাই যেমন ত্রিবর্গকে উন্মূলিত করতে পারে তেমনি কৌটিল্য, চন্দ্রগুপ্ত এবং রাক্ষসের সম্মিলিত শক্তিকে তিনি একাই পরাজিত করতে পারেন। এ আক্ষালন অপরিণামদর্শী এক যুবকের বাগাড়ম্বর মাত্র।

মলয়কেতু অস্থিরচিত্ত বলেই উপদেষ্টার মর্যাদা দিলেও রাক্ষসকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি। পিতৃবন্ধু রাক্ষসকে তিনি নানাভাবে সন্দেহ করেন। সন্দেহ ব্যাকুলিত মনে তিনি নিজ কর্তব্য নির্ধারণে অক্ষম। তাঁর স্বগতভাষণ তাঁর অস্থিরচিত্তের কথা ব্যক্ত করে—“অহো রাক্ষসং প্রতি বিকল্পবাহুল্যাদাকুলা মে বুদ্ধির্ন নিশ্চয়মধিগচ্ছতি।” রাক্ষসের পর ভাণ্ডারায়ণ হয়েছে তাঁর পরম বন্ধু। অথচ শুভানুধ্যায়ী রাক্ষসকে বিশ্বাস করে তড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। চাণক্যের গুপ্তচরেরা মিত্রের ছদ্মবেশে তাকে ঘিরে রেখেছে তা বোঝার মত দূরদর্শিতা ছিলনা বলেই শত্রুমিত্রের স্বরূপ তিনি বুঝতে পারেন নি। পিতৃবন্ধু রাক্ষসকে শুধু নির্মম তিরস্কার করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। রাক্ষসকে সার্থকনামা বলে ব্যঙ্গ করে বলেছেন: ‘অম্বর্থতো’পি ননু রাক্ষস রাক্ষসো’সি।’^{৪০} কঠোর বাক্যে রাক্ষসকে ভর্ৎসনা করে তিনি বলেছেন—

“সংপ্রত্যাহিতগৌরবেণ ভবতা মন্ত্রাধিকারে রিপৌ ।

প্রারদ্ধাঃ প্রলয়ায় মাংসবদহো বিক্রেতুমেতে বয়ম্ ॥”^{৪১}

অর্থাৎ: এখন আবার শত্রুর মন্ত্রিত্বপদে (মন্ত্রণা দানে) গৌরবস্থাপনপূর্বক শত্রুরই প্রণয়লাভের জন্য তুমি আমাকে মাংসের মত বিক্রি করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, কি আশ্চর্য!

চন্দনদাস

অমাত্য রাক্ষসের অভিনুহৃদয় বন্ধু চন্দনদাস। নিজ আবাসে তিনি রাক্ষসকে আপৎকালে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রাক্ষসের অবর্তমানে তাঁর স্ত্রীপুত্রদের রক্ষা করেছেন। তাঁর চরিত্রের উজ্জ্বলতম দিক হচ্ছে বন্ধুবাৎসল্য। তাঁর চরিত্রের নির্ভীক মনোবৃত্তি ও দৃঢ়তা সকলের মনে গভীর শ্রদ্ধার উদ্বেক করে।

প্রথম অঙ্কে চাণক্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দৃশ্যে চন্দনদাস এক মহনীয় ব্যক্তিত্ব। অমাত্য রাক্ষসের পরিবারকে চাণক্যের হাতে সমর্পণ না করলে স্ত্রীপুত্রসহ তাঁকে নির্যাতিত হতে হবে—চাণক্য এই ভয় দেখালে তিনি এর যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে বলেছেন—“আর্য কিং মে ভয়ং দর্শয়সি। সন্তমপি গেহে অমাত্যরাক্ষসস্য গৃহজনং ন সমর্পয়ামি কিং পুনরসন্তম্।” চন্দনদাস চাণক্যের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন: (বাঢ়ম্। এষ মে নিশ্চয়ঃ)। চাণক্য প্রাণদণ্ডের ভয় দেখালে উত্তরে তিনি বলেছেন যে বন্ধুর উপকার করতে গিয়ে তাঁকে প্রাণত্যাগ করতে হলেও সেটাকে তিনি সৌভাগ্য বলে মনে করবেন। বধ্যস্থানে নিয়ে যাওয়ার পরও তিনি অবিচল। স্ত্রীর হাহাকার, পুত্রের আকুল ক্রন্দন কোনো কিছুই তাঁকে সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। অন্তরঙ্গ মিত্রের প্রাণরক্ষার জন্য অবশেষে রাক্ষস যখন চাণক্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেন তখন চন্দনদাস বলেছেন— “অমাত্য সর্বমপীমং প্রয়াসং নিষ্ফলং কুবর্তা তুয়া কিমনুষ্ঠিতম্।” বন্ধুর জন্য আত্মত্যাগ করা চন্দনদাসের কুলধর্ম। তাঁর বালকপুত্রও তাই যথার্থই বলেছে “কুলধর্মঃ খল্বেষো’স্মাকম্।” কুটিলমতি চাণক্যও তার বন্ধুবাৎসল্যে মুগ্ধ হয়ে স্বগতোক্তি করেছেন—“সাপু চন্দনদাস! সাধু!” অমাত্য রাক্ষসও তাঁর উদ্দেশ্যে বলেছেন—

“সুলভেত্বর্থলাভেষু পরসংবেদনে জনে ।

ক ইদং দুষ্করং কুর্যাদিদানীং শিবিনা বিনা ॥”^{৪২}

অর্থাৎ: রাক্ষসের স্ত্রীকে দিলে অর্থলাভ অনায়াসসাধ্য হতো, না দিলে দারুণ যাতনা হবে, তথাপি তৎকালের শিবি রাজা ভিন্ন এখন কোন্ ব্যক্তি এরূপ দুষ্কর কার্য করতে পারে?

অমাত্য রাক্ষসের মতে সুকৃতিতে তিনি বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের কৃতিত্বকেও হার মানিয়েছেন। রাক্ষস তাই বলেছেন-

“দুষ্কালে’পি কলাবসজ্জনরুটো প্রাণৈঃ পরং রক্ষতা

নীতং যেন যশস্বিনাতিলঘুতামৌশীনরীয়ং যশঃ।

বুদ্ধানামপি চেষ্টিতং সুচরিতৈঃ ক্লিষ্টং বিশুদ্ধাত্মনা

পূজার্হো’পি স যৎকৃতে তব গতৌ বধ্যত্বমেমো’স্মি সঃ ॥”^{৪৩}

অর্থাৎ: দুর্জনের বাধ্যনীয় এই দুষ্ট কলিকালেও যিনি নিজের প্রাণদিয়ে অন্যকে রক্ষা করে যশস্বী হয়ে, শিবিরাজার যশকে খর্ব করেছেন এবং নির্মলহৃদয় যিনি অহিংসাপ্রভৃতি সচ্চরিত্র দিয়ে বুদ্ধের ব্যবহারকেও হার মানিয়েছেন; সম্মানেরযোগ্য হলেও সে চন্দনদাস যার জন্য তোমার বধ্য হয়েছেন; এই আমি সে রাক্ষস।

চন্দনদাসের চরিত্রের দৃঢ়তা সপ্তম অঙ্কে রাক্ষসের উদ্দেশে তাঁর তিরস্কারে পরিস্ফুট হয়েছে। রাক্ষস যে চন্দনদাসকে বিশুদ্ধাত্মা বিশেষণে সম্বোধন করেছেন তা তাঁর পক্ষে উপযুক্ত। চাণক্য ‘সবনগর-শ্রেষ্ঠী’র পদে তাঁকে বসিয়ে তাঁর যোগ্য মর্যাদাই দিয়েছেন। আদর্শ স্বামী হিসেবেও চন্দনদাস প্রশংসার দাবিদার। তাঁর সহধর্মিণী স্বামীর আসন্ন মৃত্যুর কথা শুনে তাঁর অনুগামিনী হতে চেয়েছেন- “ভর্তৃশরণাবনুগচ্ছন্ত্যা আত্মানুগ্রহো ভবতি।” পুত্রবৎসল পিতা হিসেবেও তিনি ছিলেন স্বমহিমায় ভাস্বর। অকৃত্রিম বন্ধুবাৎসল্যই তাঁর চরিত্রকে মহান করে তুলেছে। চাণক্য ও রাক্ষস উভয়েই তাঁর কৃতকর্মের প্রশংসাই করেছেন। এ প্রসঙ্গে এম.আর. কালে মহোদয় তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন:

“Of the minor characters Chandanadasa stands out as a noble example of friendly affection. He would rather lose all than be treacherous to a trusting friend. Even Chanakya is impressed by this trait of his character and admires him inwardly. A devoted faithfulness to their master marks the other characters. They subordinate the consideration of right or wrong to the cause of their chief and adhere to it with a singular tenacity. They neither betray trust nor grow remiss in the discharge of their duty, although treated with indignity or subjected to physical punishment.”^{৪৪}

শকটদাস

চন্দনদাসের অকৃত্রিম বন্ধু শকটদাস রাক্ষসেরও বন্ধু। তিনি কেবল রাক্ষসের বন্ধু নন, বিশ্বস্ত কর্মচারীও বটে। রাক্ষস তাই অনেক টাকা দিয়ে গুপ্তচরদের অর্থ সাহায্য করার কাজে শকটদাসকে কুসুমপুরে নিয়োগ করেছেন। চাণক্য ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে অভিযুক্ত করে তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। কায়স্থকুলজাত শকটদাস কৌশলে কৌটিল্যের কবল থেকে মুক্ত হয়েছেন। মূলত চাণক্যের গুপ্তচর সিদ্ধার্থকের দ্বারা বধ্যস্থান থেকে নীত হয়েছেন। রাক্ষস অবশ্যই এটা না জেনে বলেছেন ‘কৌটিল্যগোচরগতো’পি ত্বং দৃষ্টো’সি ॥’

শকটদাসের হৃদয় অত্যন্ত সরল। ঘাতকরূপী চণ্ডালবেশধারী সিদ্ধার্থক তাঁকে বধ্যস্থান থেকে উদ্ধার করে এনেছে। এর পেছনে ছিল চাণক্যের বিশেষ উদ্দেশ্য। তাঁর সরলতার সুযোগে চাণক্য স্বাক্ষরবিহীন

শিরোনামছাড়া এক চিঠি লিখিয়ে নেন। শকটদাস বুঝতে পারেননি যে, তাঁর উদ্ধারকর্তা সিদ্ধার্থক প্রকৃতপক্ষে চাণক্যের গুপ্তচর। তিনি এতটাই অকৃত্রিম হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন যে বন্ধু রাক্ষসের পরিবর্তে তিনি চন্দ্রগুপ্তের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। রাক্ষসও তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে মেনে নিতে পারেননি। অকৃত্রিম বন্ধু রাক্ষসের উপকার করার পরিবর্তে সরলমনা এই শকটদাস প্রথম থেকেই রাক্ষসকে বিব্রত করেছেন। তথাপি তাঁর সারল্যের জন্য পাঠকসমাজের কাছে তিনি আদৃত হয়েছেন।

নানা দিক থেকে *মুদ্রারাক্ষস* নাটক এক অদ্বিতীয় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। এ নাটকের প্লট নাট্যকারের নূতন আবিষ্কার নয়। সাধারণত নাট্যকারেরা যেসব উৎস বা আধার থেকে তাদের প্লট আহরণ করেছেন এ নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যকার সেই চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। প্লট পরিকল্পনায় এবং বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় এ নাটক এক নূতন দিগন্তের দিশারী।

চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে দর্শনীয় কোন স্ত্রী চরিত্র নেই। এ জাতীয় নাটক সংস্কৃত নাটকের ইতিহাসে অভিনব ঘটনা। প্রতিটি চরিত্রই আপন আপন বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। চন্দ্রগুপ্ত, মলয়কেতু, চাণক্য রাক্ষস ইত্যাদি চরিত্র তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্য নাট্যকার চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন। চন্দ্রগুপ্তের বুদ্ধি পরিপক্ব এবং তিনি অভিজ্ঞ। অপরদিকে মলয়কেতুর বুদ্ধির পরিপক্বতা নেই, তদুপরি তিনি যুবক – ফলে যৌবনের ধর্ম যে চাপল্য তা তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। চাণক্য রাজনীতিতে অভিজ্ঞ। স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, সংযমী, সতর্ক ও আত্মপ্রত্যয়যুক্ত। অপরদিকে রাক্ষস কটুকৌশলী হলেও তাঁর অন্তর কোমল এবং আবেগপ্রবণ। এই দুর্বলতাই তাঁকে ভুল পথে পরিচালিত করে। শেষে তিনি চাণক্যের ফাঁদে ধরা পড়েন। রাক্ষসের চক্রান্তের ও চাণক্যের প্রতিচক্রান্তের ঘটনাবলিকে এক সূত্রে গেঁথে *মুদ্রারাক্ষসের* সুপরিকল্পিত কাহিনি। সবভূমিকাই সুগঠিত এবং প্রত্যয়যোগ্য। প্রণয় *মুদ্রারাক্ষস* থেকে নির্বাসিত হলেও, সাধারণ নাট্যধারা বর্জিত হলেও এ নাটকের আকর্ষণ প্রণয়ধর্মী নাটককেও হার মানায়। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক পটভূমিতে বিরচিত নাটক সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। “The poet has been successful in finely drawing the contrast between the characters of two politicians Chanakya and Rakshasa”^{৪৫}—M.R.Kale মহোদয়ের এই মন্তব্য যথার্থ বলেই প্রতিপন্ন হয়। চরিত্র ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চাণক্য, তাঁর বুদ্ধিমত্তায় রাক্ষসকে নিজের পক্ষে এনেছেন—এটি চাণক্যেরই কৃতিত্ব। চন্দ্রগুপ্ত রাজাধিরাজ হয়েও চাণক্যকে গুরু বলে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। আপন ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ না নিয়ে চাণক্যের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেছেন— এ সবই প্রতিটি চরিত্রের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য। চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংস করে সিংহাসনে আরোহণের প্রত্যাশা না করে চন্দ্রগুপ্তকে এবং একই সাথে রাক্ষসকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখিয়েছেন। সমুদয় চরিত্রমাহাত্ম্য কীর্তনেই নাট্যকারের সার্থকতা

তথ্যনির্দেশ

- ^১ বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত*। (কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, ২য় সংস্করণ), ৬.১, পৃ. ২৮১।
- ^২ তদেব, ৩.৩৫, পৃ. ৯৫।
- ^৩ ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, *এয়ারিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব*, (কলিকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০১) পৃ. ১২৫।
- ^৪ তদেব, পৃ. ২০০।

- ৫ বিশাখদত্ত, মুদ্রারাক্ষস, এম.আর.কালে সম্পা. (দিল্লি : এম এল বি ডি, ১৯৯১, পুনর্মুদ্রণ), পৃ. xxx.
- ৬ ‘বিষ্ণুগুপ্ত কৌটিল্যচাণক্যো দ্রামিলো’সুলঃ।
বাৎস্যায়নো মল্লনাগপক্ষিলস্বামিলাবপি ॥’ ত্রিকাণ্ড শেষ ।, ব্রহ্মবর্গ ২২-২৩।
- ৭ কামন্দক, কামন্দকীয় নীতিসার, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. (কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৯), ১.৬. পৃ. ১।
- ৮ “অধীষ্য তাবদগুনীতিম্। ইয়মিদানীমাচার্যবিষ্ণুগুপ্তেন মৌর্যার্থে ষড়ভিঃ শ্লোকসহশ্ৰৈঃ সংক্ষিপ্তা।” দণ্ডী, দশকুমারচরিতম্, এম.আর.কালে সম্পা. (দিল্লী: মতিলাল বনারসীদাস প্রা.লি. ১৯৯৬, ৪র্থ সংস্করণ) পূর্বগীটিকা, ৮. পৃ. ১৯১।
- ৯ বিশাখদত্ত, মুদ্রারাক্ষস, এম.আর.কালে সম্পা. প্রাগুক্ত, ভূমিকাংশ, পৃ. xxxi-xxxii।
- ১০ তদেব, ১.২৫, পৃ. ৪৬।
- ১১ তদেব, ২.২, পৃ. ৫০।
- ১২ তদেব, ৩.১৩, পৃ. ৭৮।
- ১৩ তদেব, ৩য় অঙ্ক, পৃ. ৯৪।
- ১৪ তদেব, ৩.১৫, পৃ. ৮১।
- ১৫ তদেব, ৩.২৯, পৃ. ৯৪-৯৫।
- ১৬ তদেব, ৭.৭, পৃ. ১৬০।
- ১৭ তদেব, ৬ষ্ঠ অঙ্ক, পৃ. ১৪১।
- ১৮ তদেব, ৩য় অঙ্ক, পৃ. ৮৫।
- ১৯ তদেব, ৭ম অঙ্ক, পৃ. ১৬১।
- ২০ তদেব, ১.২৬, পৃ. ৪৬।
- ২১ তদেব, ভূমিকাংশ, পৃ. ৩৩।
- ২২ তদেব, ২.৫, পৃ. ৫১।
- ২৩ “রাক্ষস—বাগীশ্বরী বামাক্ষিস্পন্দনেন প্রস্তাবগতা প্রতিপাদয়তি।” তদেব, ৪র্থ অঙ্ক, পৃ. ৯৯।
- ২৪ “রাক্ষস—অবীভৎসদর্শনং কৃত্বা প্রবেশয়।” তদেব, ৪র্থ অঙ্ক, পৃ. ১১১।
- ২৫ “বিষ্ণুগুপ্ত ন চাগ্রলস্পর্শদৃষিতং স্পষ্টমহঁসি।” তদেব, ৭ম অঙ্ক, পৃ. ১৬০।
- ২৬ তদেব, ৬.২১, পৃ. ১৫৩।
- ২৭ তদেব, ৭ম অঙ্ক, পৃ. ১৬৪।
- ২৮ Viśakhadatta, *Mudrārāksasam*, R.R. Deshpande edt. (Bombay : R. R. College, 1915), p. 14.
- ২৯ বিশাখদত্ত, মুদ্রারাক্ষস, এম.আর.কালে সম্পা. প্রাগুক্ত, ৩য় অঙ্ক গদ্যাংশ, পৃ. ৭৫।
- ৩০ তদেব, ৩.৩৩, পৃ. ৯৭।
- ৩১ তদেব, ২.২৩, পৃ. ৭২।
- ৩২ তদেব, ৩.৭, পৃ. ৭৬-৭৭।
- ৩৩ তদেব, ৭.১২, পৃ. ১৬১।
- ৩৪ তদেব, ৩.১৮, পৃ. ৮৪।
- ৩৫ তদেব, p. xxxiii.

- ৩৬ তদেব, ৪.১৬, পৃ. ১১০।
- ৩৭ তদেব, ৪.৫, পৃ. ১০০।
- ৩৮ তদেব, ৪.৬, পৃ. ১০১।
- ৩৯ তদেব, ৫.২২, পৃ. ১৩৬।
- ৪০ তদেব, ৫.৭, পৃ. ১২২।
- ৪১ তদেব, ৫.২১, পৃ. ১৩৫।
- ৪২ তদেব, ১.২৩, পৃ. ৪৩
- ৪৩ তদেব, ৭.৫, পৃ. ১৫৮।
- ৪৪ তদেব, p. xxxiv.
- ৪৫ তদেব, p. xxxi.

ইকবাল সাহিত্যে ধর্ম ও জীবন দর্শন : একটি পর্যালোচনা

ড. মো. আতাউর রহমান*

Abstract: The first page of the *Reconstruction of Religious Thought in Islam* is an excellent example of Iqbal's provocative style. The question is, he says, what kind of a universe do we live in, what are the unimagined potentialities of human beings and what help can we find from the history of human religiousness as a whole to help shed light on these questions? He also says in his Introduction that no answer to these questions should be considered final. Iqbal's perspective is better appropriated if people keep on struggling with this questions. It is not faithful to Iqbal to assume that his answers were final, or to suppose that people should cease to think for themselves. He thought that human religiousness in general was threatened by the positivism of modern thought, and that defence of any one religion needed to be a defence of the possibility of being religious in the context of a sceptical age. But defence in this respect does not mean a blind defensiveness; it rather means an on-going critical approach to whatever new information comes forth. Therefore, although, sixty years after his death, new linguistics, anthropology, physics, biology, religious sciences, economics, computer science have occurred and raised many new questions, these developments do not undermine his approach.

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের নবযুগ প্রবর্তক কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মের পরে অর্থাৎ ১৮৯৯ সালে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন মহাকবি আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল। একই বছর তিনি লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে দর্শন ও ইতিহাসের অধ্যাপক পদে অভিষিক্ত হলেন। লাহোর সরকারি কলেজে দর্শন ও ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনাকালে ১৯০৫ সালে তিনি দর্শনে উচ্চতর গবেষণার জন্যে ইংল্যান্ড যান। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘পারস্য দর্শন’ নিয়ে তিনি গবেষণা শুরু করলেন এবং ১৯০৭ সালে এই থিসিসটির জন্যে জার্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ভূষিত করলো ডক্টরেট ডিগ্রিতে। প্রায় একই সময়ে (১৯০৬ সালে) তিনি লন্ডনের আইন বিষয়ক সর্বোচ্চ শিক্ষায়তন লিনকনস ইন থেকে লাভ করেন বার-এট-ল ডিগ্রি। ইউরোপ অবস্থানকালে আল্লামা ইকবাল কিছুকাল লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এর রাজনীতি শাস্ত্রের এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক পদে কাজ করেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট. ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যবর্তী সময়টায় অর্থাৎ এই শতাব্দীর প্রথম দশকে ভাষা সাহিত্য ও দর্শনের একজন পণ্ডিত হিসাবেই সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর খ্যাতি। কিন্তু বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং প্রাচ্যের এক অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রমী দার্শনিক হিসেবে খ্যাতির চূড়ায় উঠতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরও গোটা একটি দশক। ১৯২০ সালে তাঁর দর্শন আশ্রয়ী অবিস্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ “আসরার-ই-

* প্রফেসর, উর্দু বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

খুদি'র" ইংরেজি অনুবাদ 'দি সিকরেট্‌স্ অব দা সেল্‌ফ্' আত্ম বা অহম রহস্য প্রকাশিত হওয়ার পরই বলতে গেলে প্রায় রাতারাতি তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যে। ফার্সী ভাষায় রচিত এই কাব্য গ্রন্থের প্রথম মূল সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৫ সালে। অধ্যাপক ডক্টর আর.এ. নিকলসন এই ফার্সী ভাষ্যের ইংরেজি অনুবাদ করেন। নিকলসন ছিলেন বিশ্বখ্যাতি একজন প্রাচ্য ভাষা বেত্তা। আরবী এবং ফার্সী ভাষায় তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। এরপরও তিনি 'আসরার'-এর ইংরেজি ভাষ্যের ভূমিকায় দ্বিধান্বিত হয়ে লিখেছিলেন : 'ইকবালের মত মহান কবি দার্শনিকের কাব্যকলার সঠিক মর্মবাণী আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি কি-না এবং আমার ভাষায় এর রূপান্তর কতখানি যথার্থ হয়েছে, তা বলা কঠিন।'

এই গ্রন্থে আল্লামা ইকবাল মানুষের ব্যক্তিসত্তার চরমতম বিকাশের তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সীমারেখায় অবস্থান করেও নিরন্তর সাধনার দ্বারা মানুষ তার ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞান ও বোধকে বিকশিত করে এমন পূর্ণতার স্তরে উপনীত হতে পারে যখন তার এবং স্রষ্টার মাঝখানে দূরধিগম্য ব্যবধান সংকুচিত হয়ে আসবে একটি সূক্ষ্মতর রেখায়। যখন স্রষ্টা তাঁর প্রতিনিধিত্বের অমলিন ও জ্যোতির্ময় গুণাবলীসম্পন্ন এই পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তি মানুষকে আপনা থেকেই ডেকে বলবেন: 'বলো আমার বান্দা, তোমার আকাঙ্ক্ষা কী?' অর্থাৎ সর্বোচ্চ চারিত্রিক, মানবিক ও আত্মার অধিকারী মানুষের চাইবার আর কিছুই থাকবে না। সবকিছুই এসে যাবে তাঁর নিয়ন্ত্রণে।

ইসলামী দর্শনের পরিভাষায়

বিশ্বজগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহ হলেন পরম জ্ঞানময় জ্যোতির্ময় সত্তা। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। এই একত্ববাদই তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাগতিক এবং মহাজাগতিক সমস্ত জ্ঞানের তিনি উৎস। সৃষ্টির পালন, সংরক্ষণ এবং বিকাশই তাঁর রুবুবিয়্য তথা পালনময় একত্ববাদী সত্তার মৌল উদ্দেশ্য। বস্তু ও প্রাণ জগতে মানুষকে তিনি বিবেক, জ্ঞান ও বুদ্ধির অনন্য ব্যতিক্রমী উপাদান সহযোগে সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে তাঁর প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করতে পারে। এই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ অর্জন করতে পারলেই মানুষ উন্নীত হতে পারবে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত প্রতিনিধির মর্যাদার আসনে।

আল্লামা ইকবাল স্রষ্টার প্রতিও এই পূর্ণাঙ্গ মানবিক গুণাবলীর অধিকারী মানুষকেই চিহ্নিত করেছেন 'মর্দে মুমিন' হিসাবে এবং তাঁর ভাষায় যিনি মর্দে মুমিন তাঁর মধ্যে খুদি অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তা স্রষ্টার আকাঙ্ক্ষা অনুসারে পূর্ণতায় মণ্ডিত হবে এবং আত্মদর্শনের দ্বারা তিনি উপলব্ধি করবেন অতীন্দ্রিয় তথা মহাজাগতিক দর্শন।^২

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দার্শনিকরা আল্লামা ইকবালের এই মর্দে মুমিনকে জার্মান দার্শনিক গেটে (১৭৪৯-১৮৩২) এবং নীটসে (১৮৪৪-১৯০০) বর্ণিত 'উবার মেন্স' বা 'সুপারম্যান'-এর সাথে তুলনা করেছেন। সুপারম্যান বা অতিমানব তত্ত্বের ধারণা বিশ্লেষণে নীটসে প্রভাবিত হয়েছেন গেটের দ্বারা। দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শাউয়ার তাঁর 'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান' নাটকে ব্যবহার করেছেন অতিমানব বিষয়ক এই পরিভাষাটি। কিন্তু আল্লামা ইকবালের মর্দে মুমিনের সাথে এঁদের বর্ণিত 'সুপারম্যান'-এর বিরাট তফাৎ। পাশ্চাত্য ধারণায়, দোষ-ত্রুটিমুক্ত সুপারম্যান হলেন সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এবং সমস্ত সামাজিক গণ্ডির উর্ধ্বে। কিন্তু আল্লামা ইকবালের মর্দে মুমিন-এর অবস্থান সমাজে এবং তিনি রক্তমাংসের মানুষ। সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর ব্যবধান হলো, যিনি সর্বোচ্চ দ্বারা পরিচালিত। অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে তিনি আদর্শ মানুষ এবং এখানেই তাঁর ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তিসত্তার সর্বোচ্চ বিকাশ সংক্রান্ত আল্লামা ইকবালের এই ধারণায় প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিশুদ্ধ একত্ববাদী দর্শন এবং মানবিক মূল্যবোধের উচ্চতম আদর্শেরই প্রতিফলন ঘটেছে। ইসলামী দর্শনের মূল বিষয়বস্তুই হলো মানুষ এবং তার মনন ও চিন্তার বিকাশ। এটি বিশ্বজনীন মানবিকতার উৎকর্ষণ ও পল্লবায়নের মহত্তম সাধনার

অন্তর্গত। ইমাম গাজ্জালী (রহ:) এবং মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী এই আদর্শটিকেই তাঁদের তত্ত্বের রূপ দিয়েছেন। আর আল্লামা ইকবাল আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা এবং সমকালীন মানবিক ও গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রেক্ষাপট থেকে একে ইসলামের মৌল দর্শনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করে একটি পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন। এ কারনেই তাঁর এ তত্ত্বটি মানবিক মূল্যবোধের আদর্শ অভিজ্ঞান হিসাবে চিন্তার জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম।^৩

আল্লামা ইকবাল তাঁর দার্শনিক চিন্তাকে সুষমামণ্ডিত করেছেন তাঁর অনন্যসাধারণ কাব্য প্রতিভার দ্বারা। তাঁর পরবর্তী রচনাবলী যথা ‘রুমুয-ই-বেখুদি’ (প্রাচ্য-বাণী), ‘শিক্ওয়া’ ও ‘জওয়াব-ই-শিক্ওয়া’ (অভিযোগ ও অভিযোগের উত্তর), ‘জাভিদনামা’, (শাস্ত্রের বাণী) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে বিধূত তাঁর এই অসামান্য কবি-প্রকৃতির স্বাক্ষর বস্তুত কাব্য জগতে এই অবিস্মরণীয় অবদানের জন্যেই তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন একজন কালোত্তীর্ণ কবি এবং দর্শন জগতের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা হিসেবে।^৪

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে উচ্চতম ধারণা পোষণ করতেন এবং বিশ্বের তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে আল্লামা ইকবালকে পরিচিত করেন। আল্লামা ইকবালের তিরোধানের সময় এক শোকবাণীতে কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: ‘এই প্রকাণ্ড মৃত্যুতে উপমহাদেশীয় সাহিত্যে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো, তা সহজে পূরণ হবে না। ইকবাল বহির্বিশ্বে উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এদেশকে। বিশ্বজ্ঞান আবেদনকুশল এ কবিকে হারানো প্রকৃত অর্থেই আমাদের জন্যে একটি দুর্ভাগ্য। আল্লামা ইকবাল যে কত বিরাট মানের একজন কবি ছিলেন, সমকালীন যুগের আরেকজন বিশ্বনন্দিত কবির এই মূল্যায়ন থেকেই তা অনুধাবন করতে পারা যায়।

কবি এবং দার্শনিক কবি-এ দু’টি পদের মধ্যে কি কোন বিভাজন রেখা টানা যায়? যদিও প্রত্যেক কবিরই একটি নির্দিষ্ট নিজস্ব জীবন দর্শন আছে এবং কবিতায় একটি দার্শনিক প্রেক্ষাপট বর্তমান তথাপি কবি দার্শনিক নন তাঁর বক্তব্যকে দার্শনিকের বক্তব্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। একটি দার্শনিক বক্তব্যের পটভূমিকায়- মূর্তিকায় কবিতার ফসল প্রস্ফুটিত- কিন্তু দার্শনিক কবির সৃষ্টি তেমন নয়। তাঁর সৃষ্টি একই সাথে দর্শন ও কবিতা। তিনি শুধু দার্শনিক বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে সাহিত্যকে ব্যবহার করেন না। অনেক দার্শনিকই তাঁদের দর্শন প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে সাহিত্যকে ব্যবহার করেছেন, যেমন বিখ্যাত দার্শনিক দাস্তে। কিন্তু তাঁদের অনেকের সাহিত্য প্রতিভা আমাদের নিকট প্রধান কর্ম হিসাবে প্রস্ফুটিত নয়। এই শ্রেণির দার্শনিক সাহিত্যিকদের মাঝে উল্লেখযোগ্য কিন্তু ব্যতিক্রমশীল ব্যক্তিত্বের মাঝে দার্শনিক কবি আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল। তিনি যথার্থই দর্শন ও কবিতাকে জটিল রাসায়নিক ক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করেছেন।^৫

আল্লামা ইকবালের কবিতায় বা সাহিত্যে যে বক্তব্য প্রস্ফুটিত তা হলো জীবন দর্শন বা খুদী দর্শন। তিনি জীবন দর্শনকেই খুদী দর্শন হিসাবে প্রকাশ করেছেন। খুদী হলো আত্মসচেতনতা-মানব প্রজাতি যে সৃষ্টিশীল সত্তা এ সত্যই খুদী দর্শনে প্রস্ফুটিত। ইকবালের জীবন দর্শন বা খুদী দর্শন আলোচনার প্রথমে আমাদের মনে যে প্রশ্নটি জাগে তা হল ইংরেজি ‘Ego’ শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে তিনি ‘খুদী’ শব্দটি কেন নিলেন? খ্যাতনামা দার্শনিক নীটসের দর্শনের উপর টীকা লিখতে গিয়ে আল্লামা ইকবাল এ প্রশ্নটিরই জবাব দেন এভাবে-

‘খুদী’ শব্দটি বেশ কষ্ট করে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেছে নেওয়া হয়েছে। সাহিত্যের দিক থেকে এর প্রচুর অসুবিধা আছে এবং নীতির দিক থেকে উর্দু ও ফার্সী উভয়

ভাষায় শব্দটি সাধারণত মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধিবিদ্যক তথ্য ‘আমি’র জন্য ব্যবহৃত উর্দু, ফার্সী বিভিন্ন শব্দ একইভাবে খারাপ অর্থবোধক। প্রয়োজন হচ্ছে আত্মা বা ইগো’র জন্য একটি বিশুদ্ধ শব্দ। আমি যতদূর জানি উর্দু কিংবা ফার্সী ভাষায় এরূপ শব্দ নেই। ফার্সী ভাষার শব্দটি অনুরূপে একটি মন্দ অর্থজ্ঞাপক শব্দ।^৬

ফার্সী ও উর্দু ভাষায় খুদীর যে অর্থ, মহাকবি আল্লামা ইকবাল কিম্ব সে অর্থে শব্দটির ব্যবহার করেননি। তাঁর দর্শন হিসেবেই শব্দটি তিনি চয়ন করেছেন। প্রমাণিক ফার্সী ও উর্দু অভিধানসমূহে খুদী শব্দের অর্থে লিখা হয়েছে: গর্ব, অহংকার, অহমিকা, দাম্ভিকতা, আত্মলিপ্সা, আত্মাভিমান, আত্মগৌরব, স্বার্থবাদ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি।^৭

উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যিকের প্রায় সবাই ‘খুদী’ শব্দটিকে এসব অর্থেই ব্যবহার করেছেন। একমাত্র মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী ‘সর্বোত্তরবাদ’-এর ঘোর প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিশ্ববিখ্যাত মহাকাব্যে এসব অর্থ ছাড়াও ‘খুদী’ শব্দটিকে আত্মসচেতনতা, আত্মপরিচয়, আত্মোপলব্ধি, আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা অর্থেও ব্যবহার করেছেন। আল্লামা ইকবালের কালজয়ী এ খুদী দর্শন কবির কোন এক বিন্দু রজনীর ফসল। স্বপ্নাবিষ্টচিত্তে রুমী কর্তৃক ব্যক্ত খুদীর আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যাদা সম্পর্কীয় অর্থটিকে কেন্দ্র করে তিনি কল্পনার জগতে বিচরণ করতে থাকেন। অবশেষে মুর্শিদ রুমীর আধ্যাত্মিক নির্দেশ পেয়ে এবং তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে উক্ত দর্শনের ভিত্তিমূলে এ কাঠামো নির্মাণ করেন। এ কথা তিনি তাঁর ‘আসরারে খুদী’ গ্রন্থের সূচনা বক্তব্যে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করতেও ভোলেন নি। অবশ্য, পরবর্তীতে তাঁর উক্ত দলিলের পুরো সমর্থন তিনি কুরআনুল কারীম থেকেই খুঁজে পান।^৮

আল্লামা ইকবাল খুদীর সংজ্ঞায় বলেছেন: খুদী আত্মিক অনুভব শক্তির এমন একটি একক বা আত্মসচেতনতার এমন একটি কেন্দ্রবিন্দু, যা থেকে মানুষের যাবতীয় আবেগ, ভাবধারা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রজ্জ্বলিত ও আলোকিত হয়। এটা কখনো লয়প্রাপ্ত হয় না। এটি এমন এক খাঁটি ও নিখাদ সত্য, মানব স্বভাবের বিক্ষিপ্ত ও অপরিসীম অবস্থাসমূহের মধ্যে বাঁধন হিসেবে কাজ করে। এটা হচ্ছে মানব দেহে একটি নীরব শক্তি যার মাধ্যমে বিকশিত হবার জন্য সদা অস্থির। খুদীর বাসস্থান মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে নিহিত। যেমন ইকবাল বলেছেন—

خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ
خودی بے تیغ، فساں لا الہ الا اللہ ۹

অর্থ:

খুদীর গোপন রহস্য নিহিত রয়েছে— ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ,

তাওহীদের এ কালেমায় খুদী হলো তলোয়ার, এর শান হলো— ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

ইকবালের মতে খুদী হলো আত্মসচেতনতা-মানব প্রজাতি যে সৃষ্টিশীল সত্তা এ সত্যই খুদী দর্শনে প্রস্ফুটিত। যেমন তিনি বলেন:

توشب آفریدی چراغ آفریدم
سفال آفریدی ایام آفریدم
بیابان و کھساوراغ آفریدی
خیابان و گلزار و باغ آفریدم۔ ۵۰

অর্থ:

তুমি তৈরি করেছ রাত্রি, আমি তো জ্বলেছি আলোক।

মাটি তোমার তাই দিয়ে রচলাম পান পাত্র।

তোমার ছিল মরুভূমি, পর্বত, অরণ্য

আমার হলো তৈরি ফুলের কানন, গোলাপ ফুলের বাগান।

তিনি অন্যত্র বলেছেন:

تری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا
عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ ۵۱

অর্থ:

সৃষ্টি হয় যদি বিপ্লব তোমার খুদীতে,

বিচিত্র নয় যদি তাতে বদলে যায় চার দিক।

কার্যত মানব প্রজাতি সৃষ্টিশীল নিরন্তর প্রবহমান সত্তা। এ পৃথিবীতে মানব বৃক্ষতার অস্তিত্বেও সৃষ্টিশীলতাকে উর্বর জমিনে প্রস্ফুটনে সক্রিয়। আর তাই মানব প্রতি মুহূর্তে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতার সম্মুখীন এবং নিজ দায়িত্বে নিজেকে রূপান্তর ক্রিয়াশীল। যেমন তিনি বলেন—

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے
سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ ۵۲

অর্থ:

জীবিতদের মধ্যে যদি স্থান করে নিতে চাও

তবে নিজ পৃথিবী নিজেই গড়ে নাও;

এখানেই রয়েছে মানবজীবনের গূঢ়তত্ত্ব,

‘হও’ তাই হয়ে গেল— এখানেই নিহিত রয়েছে জীবনের রহস্য।

আল্লামা ইকবাল বলেন, আধুনিক তত্ত্ব বিজ্ঞানসূর কাছে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট-এর নিরেট যুক্তিবাদ সংক্রান্ত অসিদ্ধান্তগুলো সুপরিচিত। এ সিদ্ধান্তগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, খুদীকে আত্মাবস্তু হিসেবে বুঝাবার বেলায় আমাদের চেতনাজাত অনুভূতি থেকে কোন হাদিসই পাওয়া যায় না। তবুও একথা সত্যি যে, খুদীকে বুঝতে পারা যদি সম্ভব হয় তাহলে একমাত্র চেতনাজাত অনুভূতির প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেই তা সম্ভব হবে। অতএব, আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খুদী সম্পর্কে কি আলোকপাত করে, এখন তাই আমরা বিবেচনা করব।

মনস্তাত্ত্বিকবিদ উইলিয়াম জেমস-এর মতে, চেতনা একটি চিন্তাপ্রবাহ- ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ঘটনাধারা। জেমস-এর ধারণা থেকে খুদী সম্পর্কে কোন তথ্য উদঘাটন দূরে থাকুক, বরং তা থেকে অনুভূতির চিরন্তনতার অস্তিত্বকেই একেবারে অস্বীকার করতে হয়। পরম্পরাগত চিন্তাসমূহ থেকে একটি অখণ্ড ধারাবাহিকতা কল্পনা করা যায় না। এদের একটি যখন থাকে হাজির তখন অন্যটি একেবারে অতীতের মধ্যে হারিয়ে যায়। অতীত চিন্তাকে যদি বিলীয়মান বলেই ধরে নেওয়া হয়, তবে তা হারিয়েই যাবে, বর্তমান চিন্তার সাথে তাকে যুক্ত করা যেতে পারে কিরূপে?

আল্লামা ইকবাল বলেন, তাঁর বক্তব্য এই নয় যে, খুদী আমাদের অভিজ্ঞতার নাগালের বাইরের জিনিস। অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতাই সক্রিয় খুদীর নামান্তর। উপলব্ধি, বিচার ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশে আমরা খুদীরই কার্যকারিতা দেখতে পাই। সে প্রাণশক্তি আহরণ করে চলছে পারিপার্শ্বিকতার সাথে নিজের আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের তীব্রতা থেকে। অতএব, এই পরস্পর-আক্রমণের ক্ষেত্র থেকে খুদী বাইরে দাঁড়িয়ে নেই; এর মধ্যেই সে পরিচালনাকারী শক্তিরূপে বিরাজিত। এখানেই সে নিজ অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে পূর্ণাবয়বে গড়ে তুলছে এবং নিজের পথনির্দেশ করেছে।

খুদীর এই নির্দেশাত্মক সত্তা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ - قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي - وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا - ١٥٦

অর্থ:

“তাঁরা তোমাকে আত্মার কথা বিজ্ঞেস করছে। বল: আত্মা আমার প্রভুর ‘আমর’ (আদেশ) থেকে উদ্ভূত; কিন্তু জ্ঞানের মাত্র সামান্য অংশই তোমাদের দেওয়া হয়েছে।”

খুদীর কার্যকলাপের মধ্যে এই যে পরিচালনা ও নির্দেশ দানের ভাব, এর থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, এ একটি স্বাধীন ব্যক্তিত্ব-অধিকারী হেতু স্বরূপ। এই খুদী পরমে খুদীরই জীবন ও স্বাধীনতার অংশীদার। স্বয়ং পরমখুদী এই উদম্যধর্মী, সসীম অহংকে অভ্যুদয়ের অবকাশ দিয়ে তার নিজ বুদ্ধি প্রয়োগের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করেছেন। চেতনাত্মক আচরণের এই স্বাধীনতার কথা কোরআন সমর্থিত খুদীর ক্রিয়াশীলতা থেকেও পাওয়া যায়। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ - مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ - ١٨

অর্থ:

এবং বল, সত্য তোমাদের প্রভুর নিকট থেকেই আসে; অতএব যার ইচ্ছা, সে বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাসী থাকুক।”

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন—

ان احسن تم احسن تم لا نفسكم، وان اساءتم فلها۔ ১৫

অর্থ:

“তোমরা যদি সৎকর্ম কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই করছ; আর তোমরা যদি অসৎ কর্ম কর, তাও তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই করছ।”

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা বলা আবশ্যিক যে, ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যে ‘খুদী’ শব্দের প্রচলিত অর্থ থেকে সরে গিয়ে তাকে একটি সাবলীল পরিভাষায় রূপান্তরিত করা এবং পরে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শনে পরিণত করা মহাকবি আল্লামা ইকবালের অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ জীবন দর্শন আজ সমগ্র বিশ্বে নন্দিত, সমাদৃত, বহুল আলোচিত। এই জীবন দর্শন প্রচার ও প্রসার করাই ইকবাল জীবনের বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। বিভিন্নভাবে খুদীর ব্যাখ্যা প্রদান করার নিমিত্তে তিনি তাঁর কাব্য জীবনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। এর জন্য তিনি জোরালো ও দৃঢ় বক্তব্য পেশ করেছিলেন যে, এটা আজ তাঁরই জীবন দর্শন রূপে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। তাঁর সমস্ত শিক্ষা ও মতবাদের কেন্দ্রবিন্দুই হলো এই ‘খুদী’ দর্শন। তাঁর অন্যান্য কথাবার্তা এ খুদীকে দিয়েই ব্যক্ত হয়েছে।

‘খুদী’ শব্দটি দ্বারা জনমনে ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়ে পড়তে পারে মনে করে আল্লামা ইকবাল পরিভাষার দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন— তার ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, খুদী অর্থ-এ ক্ষেত্রে গর্ব ও অহংকার-অহমিকা নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মপরিচয় ও আত্মসচেতনতা, যার বদৌলতে মানুষের মূল্যবান জীবন সঠিক পথে পরিচালিত হয়। আর আল্লাহ প্রদত্ত মহত্ত্ব ও শান-শওকত পুনরুদ্ধার হতে পারে। ইকবাল কাব্যকারে ব্যক্ত করেছেন এভাবে—

خودی اندر خودی گنجد محال است!

خودی را عین خود دودن کمال است!۔ ১৬

অর্থ:

এক খুদীর মধ্যে অপর খুদীর লয় প্রাপ্তি অসম্ভব।

খুদীর হুবহু অস্তিত্ব বজায় রাখাই হবে তার পূর্ণতা সাধন।

আল্লামা ইকবালের দর্শন হচ্ছে ধর্ম দর্শন। অবশ্য দর্শনকে তিনি কোনদিন ধর্মের পরিচালিকা মনে করেননি। তাঁর মতে, ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশে সমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। তিনি আদর্শ সমাজ বলতে বুঝাতেন হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর প্রচারিত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আদর্শ এবং নিখাদ কল্যাণ রাষ্ট্র। একটা মুক্ত স্বাধীন মুসলিম ‘দ্রাতৃ’ যার

কেবলা কাবা শরীফ। সংঘবদ্ধ এক আল্লাহর প্রেমে আর তাঁর প্রিয় পয়গম্বরের ব্যক্তিত্বে এই ছিল আল্লামা ইকবালের আদর্শ। তিনি এই আদর্শ প্রচার করেছেন অতুলনীয় আন্তরিকতার সাথে। তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থে দেখিয়েছেন, কিভাবে এ লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। মুসলিম মানুষের ব্যক্তি জীবন এবং মুসলিম জাতির জাতীয় জীবনে প্রেরণার উৎস তিনি নির্ণয় করেছেন অত্যন্ত সফলতার সাথে।^{১৭}

আল্লামা ইকবাল পাশ্চাত্য সাহিত্যের সুধা পাত্র উজাড় করে পান করেছিলেন। তাঁর দর্শন নীটসে ও বার্গসঁর কাছে অনেকখানি ঋণি। তাঁর কাব্য স্মরণ করে দেয় মহাকবি শেলীর ভাবালুতা। তথাপি তিনি চিন্তা করেছেন, উপলব্ধি করেছেন সত্যিকার মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গিতে। সে জন্যই তাঁর দর্শন মানুষকে এত গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। তিনি ছিলেন আগাগোড়া ধর্মানুপ্রাণিত। স্বপ্ন দেখতেন এক নবমিলন ক্ষেত্রের। যেখানে বিশ্ব-মুসলিম দেশ-বর্ণের, বৈষম্যের উর্ধ্বে হবে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। তাঁর কাছে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের কোন স্থান ছিল না। আল্লামা ইকবালের চিন্তাধারা ও বিষয়বস্তুকে আমরা তিনভাগে বিভক্ত করতে পারি। যেমন, (১) কবিত্ব ২. দর্শন ৩. সংস্কার আন্দোলনের গতিচারণ্য। অর্থাৎ, ইকবালের অনুভূতি ছিল কাব্যধর্মী, চিন্তাধারা হলো দার্শনিক আর দার্শনিক মতবাদ ছিল সম্পূর্ণ ইসলামী আদর্শভিত্তিক।^{১৮}

মহাকবি আল্লামা ইকবালের মতে, যাদের জীবনে কোন আশা নেই, সাধ নেই, নিজীব জড়পিণ্ডের ন্যায়, যারা দিন অতিবাহিত করে চলে, তাদের দেহ বাস্তবিকই তাদের আত্মার সমাধি! তারা সত্যিই মরে বেঁচে আছে। ইকবাল তাই পরিস্কার ভাষায় তাদের উদ্দেশ্য বলেছেন: "Negation of desire is death to the living" বাস্তবিকই তাই। আশা-আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির নামই ত মরণ! আশা-আকাঙ্ক্ষা না থাকলে কিসের জীবন? আর জীবন না থাকলে কিসের ধর্ম? কিসের আদর্শ? জীবনকে বাদ দিলে সকল কিছুই যে ব্যর্থ! তাই ইকবাল জীবনের দিকে আমাদের দৃষ্টি এমন করে আকর্ষণ করেছেন।

এখানে স্মরণ করে দেয়া উচিত— মহাকবি ইকবাল নিছক আনন্দবাদীও নন। 'Eat, drink, and be merry' 'খাও দাও, ফুটি কর'— এই অর্থে তিনি জীবনকে ব্যাখ্যা করেন নাই।^{১৯} জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্যে সিদ্ধ করবার জন্যই তিনি জীবনকে চান। সে জীবন পরিপূর্ণ সুন্দর ও সতেজ। সাহিত্য, আর্থ, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানবের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ এই জীবন বিকাশের জন্যই নিয়োজিত হওয়া উচিত। জীবন বিকাশই ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার করবার একমাত্র মাপকাঠি। যে সাহিত্য, যে আর্ট, যে বিজ্ঞান এই জীবন বিকাশের যখন সহায়ক তাহা ততখানি সুন্দর। আর যাহা এই উদ্দেশ্য সাধনে যতখানি বিঘ্ন উৎপাদক তাহা ততখানি মন্দ।

এ প্রসঙ্গে ইকবাল বলেন:

"The ultimate end of all human activity is life-glorious. Powerful exuberent, All human art must be subordinate to this inal purpose, and the value of everything must be determined in reference to its life-yielding capacity. The highest art is that which awakens our dormant will force and nerves us to face trials of life manfully. All that brings drowsiness and make us shut our eyes to reality around, on the mystery of which alone life depends, is a message on decay and death. There should be no opium eating in art. The dogma of 'Art for the sake of Art' is a clever invention of decadence to cheat us out of life and power."^{২০}

আল্লামা ইকবালের জীবন দর্শনের মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা। ইসলামই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্ম দিয়েছে। কুরআনের মতে, জ্ঞানের তিনটি উৎস আছে: আত্মিক অভিজ্ঞতা, প্রকৃতি ও ইতিহাস। ইসলামী সমাজ গঠনের জন্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগানো অপরিহার্য: যেমন তিনি বলেন:

ہر چیز ہے مخلوقِ نمائی
ہر ذرہ شہیدِ کبریائی
ہے ذوقِ نمودِ زندگی موت
تعمیرِ خودی میں ہے خدائی۔ ۲۱

অর্থ:

প্রত্যেকটি বস্তু আত্মপ্রকাশে মগ্ন,
প্রত্যেকটি অনু আপন বড়ত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রাণান্ত।
আত্মপ্রকাশের চেতনাবিহীন জীবন-মৃত্যুরই নামান্তর,
খুদী প্রতিষ্ঠার মধ্যে রয়েছে খোদায়িত্ব।

আল্লামা ইকবালের ধর্ম ও জীবন দর্শনের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহ সম্পর্কে তাঁর ধারণা। ইকবালের নিকট আল্লাহ হলেন জীবন্ত এবং গতিশীল। এ বিশ্বজগত এবং আল্লাহ এক এবং অভিন্ন নয়। বরং আল্লাহ হলেন এক, অদ্বিতীয়; তাঁর সত্তা, অস্তিত্ব এবং সারসত্তায় তাঁর সমকক্ষ কিছুই নেই। এ বিশ্বজগত এবং জীবন হলো তাঁর সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ এবং যা তরঙ্গায়িত হয় (vibrant) জীবনীশক্তি দ্বারা। তাঁর অধিবিদ্যিক ভাষায়, “সত্য হলো এক অনন্ত জীবনের নাম। এ অনন্ত জীবন আত্ম-নিয়ন্ত্রিত, আত্ম-চেতনায় শক্তিতে সর্বদা কর্মরত। এর প্রতিটি কর্মই জীবনীশক্তি দ্বারা পূর্ণ এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রিত শক্তিতে হয় রূপান্তরিত। বাইরে থেকে দেখলে এসব কর্মসমূহ স্থান ও কালের ঘটনাবলীরূপে হয় প্রতীয়মান। আবার কিছু কিছু কর্ম আত্ম-চেতনায় হয়ে উঠে উন্নীত। আত্ম-চেতনায় উন্নীত হয়ে ওঠা এসব কর্মই তখন হয়ে ওঠে ‘আমি’ এবং ‘তুমি’।”^{২২}

ইকবালের অধিবিদ্যিক ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড. ইশরাত হাসান আনওয়ার বলেন, “সমগ্র বিশ্বজগতে ধ্বনিত হয়ে জেগে উঠছে এক খুদী। আমরা প্রথম সচেতন হয়ে উঠি এ খুদী সম্পর্কে নিজেদের মধ্যেই; অতঃপর আমাদের চারপাশের বস্তুজগতে; অতঃপর বিশ্বজগতের সকল প্রাণের চূড়ান্ত মূলনীতি, অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে।”

প্রকৃতপক্ষে আল্লামা ইকবালের ধর্ম ও জীবন দর্শনের দর্শনকে বলা যায় খুদী দর্শন। কেননা, খুদী হলো ইকবালের নিকট সকল সত্যের কেন্দ্রবিন্দু।” যেমন তিনি বলেছেন—

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ۲۰

অর্থ:

তুমি তোমার ব্যক্তিত্বকে এতটা উন্নত করে নাও যে, প্রতিটি ভাগ্য লেখার পূর্বেই
খোদা তোমায় জিজ্ঞেস করবেন তোমার ভাগ্য কিরূপ হওয়ার দরকার।

আল্লামা ইকবাল মানুষের ব্যক্তিগত পর্যায়ে খুদীকে শক্তিশালী করার নির্দেশনাবলী দিয়ে ১৯১৫ সালে প্রকাশিত
হয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ “আসরারে খুদী” (secret of the self) ইকবালের দৃষ্টিতে এই খুদীর ক্রম উন্নয়নে
তিনটি স্তর অতিক্রম করে। তিনি তাঁর ‘জাভিদনামা’ কাব্য গ্রন্থে এর যে বিবরণ প্রদান করেন তা হলো—

قطره چوں حرف خودی از هر کند
هستی ہے مایہ را گوهر کند
کوه چوں از خود رود صحر اشود
سبز هوں تاب و مید از خویش یافت
همت او سینہ گشن شکافت
چو زمیں هر هستی خود محکم است
ماه پابند طواف پیهم است
هستی مہراز زمیں محکم تر است
پس زمیں مسور چشم خاواست۔

২৪

অর্থ:

উন্নত করে নেয় বারিন্দু যখন নিজ খুদীকে
তখন তার মূল্যহীন অস্তিত্ব পরিণত হয় মুক্তায়।
পাহাড় যখন খুদী হারায়, তখন তা মরুতে পরিণত হয়,
মরু যখন সাগর-তরঙ্গে প্লাবিত হয়
তখন তা অভিযুক্ত করে সাগরকে।
বীজ যখন উদগত হওয়ার শক্তি পেল
তখন তার সাহস বাগানের বক্ষভেদ করে বেরিয়ে এল
পৃথিবী তার খুদীকে দৃঢ় করে নিয়েছে
চাঁদ তাই সদা তার চারদিকে আবর্তন করছে।
সূর্যের অবস্থান অধিকতর দৃঢ় পৃথিবীর চাইতে,
তাই পৃথিবী তার চারদিকে আবর্তন করছে।

সুতরাং মানুষের অস্তিত্বের প্রথম স্তর হলো তাঁর নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠা এবং নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের মাধ্যমে নিজ সত্তা এবং ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্রীভূত করা, অভ্যন্তরীণ দৃষ্টির আলোতে নিজ সত্তাকে বিশ্লেষণ করে নিজ ক্ষমতা ও সম্ভাবনাগুলোর আলোকে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন করা। যখন সে স্তর অতিক্রম করতে সক্ষম হয় তখন সে অন্যের বুদ্ধিমত্তার আলোকে এবং ইতিহাসের মানদণ্ডে নিজের ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ইতিহাসের পটভূমিতে নিজের ব্যক্তিত্বের এবং কর্মের স্বাক্ষর রাখতে হয়ে উঠে সক্ষম। অবশেষে তার উন্নয়নের তৃতীয় স্তরে আল্লাহর সত্তাকে তার নিজ সত্তার সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করে। নিজেকে তখন সে আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করে। আল্লামা ইকবাল তাঁর ‘জাভিদনামা’ কাব্য গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এভাবে—

چوں حیات عالم از زور خودی است
پس بقدر استواری زندگی است۔
۲۴

অর্থ:

টিকে আছে বিশ্বের জীবন খুদীর জোরেই

বিশ্ব-জীবনের ভিত রচিত হয় খুদীর শক্তিতেই।

ইকবালের নিকট আত্মা হলো—

"Self is like an ocean without shore.

However, there is no way if though shoudst

Mistake it for a stream.

আল্লামা ইকবাল তাঁর আত্মার গোপন রহস্য উদঘাটন করার প্রচেষ্টায় প্রকৃতিজগতকে পর্যবেক্ষণ করতে বলেন—

'Every object is obsessed

with each self-expression,

And each particle is subservient To God.

Without the urge of expression life itself

(Turns) into Death, as the (Essence)

Divinity lies in the cultivation of self".^{২৫}

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লামা ইকবালের ধর্ম ও জীবন দর্শনের মূলে রয়েছে তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী খুদী দর্শন। তাঁর খুদী দর্শন আজ বিশ্বে ক্রমবর্ধমানভাবে সমাদৃত ও গৃহীত হচ্ছে। যদিও এসব চিন্তাধারা সাহিত্য কথা বলতে কি, অনেক উঁচু স্তরের এবং একদম বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক ও সুফী সাধকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষ এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাদের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। তবে, তার

জীবনদর্শন প্রসূত বহু কবিতা যে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারা তাতে চিন্তার খোরাক ও কর্মোদ্দীপনার উপাদান খুঁজে পান। তাই, ইকবাল কাব্য, প্রাচ্যন্তোর, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সুফীসাধক ও সাধারণ মানুষকে সমভাবে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর জনপ্রিয়তার কারণও মূলত এখানেই।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ ড. জাভিদ ইকবাল, *যিন্দা রোদ*, ১ম খণ্ড (লাহোর : ইকবাল একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ২৬। 'Eminent Scholar Iqbal as a Thinker', Lahore: S.M. Ashraf, 1944, p. 46
- ^২ প্রফেসর ড. ইফতেখার আহমদ সিদ্দীকী, *উরুজে ইকবাল* (লাহোর: কওমী কুতুবখানা, ১৯১৪), পৃ. ৩৩।
- ^৩ মাওলানা নুরুদ্দীন আহমেদ, *সৃষ্টি ও দর্শন (আল হিকমাত ফী মাখলুকাতিয়াহ-এর বাংলা অনুবাদ)*, (ঢাকা: হাবিবিয়া বুক ডিপো, ১৯৮৭), পৃ. ১৯৬।
- ^৪ তদেব, পৃ. ২০২।
- ^৫ ড. জাভিদ ইকবাল, *যিন্দা রোদ*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬।
- ^৬ কাজী আহমদ মিয়া আক্তার, *ইকবালিয়াত কা তানকিদী জায়েজাহ* (লাহোর: ইকবাল একাডেমী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭) পৃ. ৮৬।
- ^৭ তদেব, পৃ. ৮৯।
- ^৮ তদেব, পৃ. ৯৪।
- ^৯ আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল, *কুল্লিয়াতে ইকবাল (ফার্সী) যরবে কালীম* (লাহোর: শাইখ গোলাম আলী এন্ড সন্স পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫), পৃ. ৭।
- ^{১০} *কুল্লিয়াতে ইকবাল*, (ফার্সী) পায়ামে মাশরিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২।
- ^{১১} আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল, *কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু) যরবে কালীম* (লাহোর: শাইখ গোলাম আলী এন্ড সন্স পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫), পৃ. ১৬৭।
- ^{১২} *কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু)*, বালে জিব্রীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।
- ^{১৩} আল-কুরআন, সূরা: বনী ইসরাইল, আয়াত ৮৫।
- ^{১৪} আল-কুরআন, সূরা: কাহ্ফ, আয়াত ২৯।
- ^{১৫} আল-কুরআন, সূরা: বনী ইসরাইল, আয়াত ৭।
- ^{১৬} *কুল্লিয়াতে ইকবাল (ফার্সী) যবুরে আযম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২।
- ^{১৭} খলীফা আবদুল হাকীম, *রুমী-নিটশে আওর ইকবাল (উর্দু)*, (লাহোর: ইকবাল একাডেমী, দা.বি.), পৃ. ৮৩।
- ^{১৮} তদেব, পৃ. ৮৬।
- ^{১৯} তদেব, পৃ. ৮৮।
- ^{২০} Dr. Ishrat Enver, *The Metaphysics of Iqbal* (Lahore: S.K. Muhammad Ashraf, 1944), p. 52.
- ^{২১} *কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু)*, বালে জিব্রীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯।
- ^{২২} ড. এম. হুদা, *মুসলিম দর্শনের মূলতত্ত্ব* (ঢাকা: ইউরেকা বুক হাউস, পুনঃমুদ্রণ, ১৯৯১), পৃ. ৬৬-৬৭।
- ^{২৩} *কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু)*, বালে জিব্রীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।

^{২৪} কুন্সিয়াতে ইকবাল (ফার্সী), আসরার ও রুমুয, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।

^{২৫} তদেব, পৃ. ১৪।

^{২৬} Dr. Mohammad Iqbal, *The Secrets of the Self Eng. tr. Khudi, by R.A. Nicholson* (Lahore, 1950), p. 53.